আনন্দ বাগচী

প্রথম প্রকাশ ৩১ জানুয়ারি ১৯৬২ / প্রকাশক ভারতী দত্ত পুষ্প প্রবন্ধে
ঘোষ লাইব্রেরী / ১৩ বাঙ্গুর অ্যাভেন্যু বি ব্লক কলকাতা ৫৫ / মুদ্রণে
মাদার প্রিন্টার্স সত্যরঞ্জন জানা / ৩৮এইচ্ ১৮/১ মানিকতলা মেইন
রোড কলকাতা-৫৪ / প্রচ্ছদ মুদ্রণে প্রসেস সিণ্ডিকেট / কলকাতা-৬

প্রয়াত সমরেশ বসু'র স্মৃতিতে

গোড়ার কথা

যেন ছোট্ট একটি কাঠির ডগায় এক বিন্দু বারুদ মাখানো ছিল কখন কবে, তারপর হঠাৎ একদিন জীবনের দৈনন্দিন খোলসের বিপরীত বারুদে ঘর্ষিত হয়ে জ্বলে উঠলো এক তরফা আগুন আর আলো। আগুন হয়তো স্থূল প্রয়োজন মেটালো কিন্তু তার সেই মুহূর্তের আলো, অন্ধকারের পটভূমিকায় একটি ক্ষণ-কালের প্রোফাইল জ্বেলে দিয়ে গেল চিরকালের করে। আচমকা একটি মুখচ্ছবি, মুখের চলচ্ছবি বলাই সঙ্গত। বলা ভাল, জ্বলে উঠল ক্ষণকালের এক কৌতূহল, আর পরক্ষণেই অন্ধকার হয়ে থাকল চিরকালের অতৃপ্তি। ক্ষণমুক্তি যে চিরসত্য হতে পারে, হয়তো সেই কথাও। সারা জীবন ধরে কাছে দেখে যে মানুষকে—বহুরাত্রি পাশে শুয়ে এবং ছুঁয়েও যে মানুষটাকে চেনা-জানা-ধরা যায়নি, চূড়ান্ত মুহূর্তের একটি বিদ্যুচ্চকিত উদ্ভাসে তাকেই চিরদিনের মত স্বচ্ছ করে জানা হয়ে গেল আমাদের। একেই হয়তো বলি ছোটগল্প।

জমাখরচের সব হিসেবের বাইরে, যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ উল্টে দেওয়া প্রতি-ক্রিয়ার চাবুকে, অনেক বিবৃতি বিবরণের তলায় প্রায় অলক্ষিত ইনিসিয়াল বা স্বাক্ষর-সংক্ষেপের মত এই সংকেত আমাদের চমকে দেয়, আচ্ছন্ন আর ভাবিত করে। কোন মানবিক ছন্দপতন অথবা মানসিক তালফেরতা, কোন সুরের খেয়ালে মীড়গমকমূর্চ্ছনার ছোট্ট মোচড়ের মধ্যেই ছোটগল্পের জন্মরহস্য লুকিয়ে থাকে। প্রতিদিনের খাওয়া-পরা-শোয়ার মধ্যে দিনযাপন প্রাণধারণের গ্লানি বা গৌরবের মধ্যে হঠাৎ একদিন আসে এক কচিৎ চকিত মুহূর্ত, যখন সব পরিকল্পনা এবং ছক উলটপালট হয়ে যায়, হিসেব মেলে না কতদিনের জানা অঙ্কেরও। প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের সেই প্রলয়ের মধ্যে এমন এক প্রতীতি জন্মায় যা প্রায় রূপকথার মত অবিশ্বাস্য হয়েও ভেতরে ভেতরে অনিবার্য বাস্তব। কোন যুক্তিবুদ্ধির দোহাই পেড়েও যাকে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। সেই বিকল্পহীন বোধের মধ্যে, আলোছায়ায় শঙ্কর বহতা রক্তের মধ্যে, ছোটগল্পরূপী বিপন্ন বিস্ময় জন্ম নেয়।

বাংলা সাহিত্যের যে শিল্পরূপকে আমরা অভিধানসম্মত অর্থে যথার্থ ছোট-গল্প বলে থাকি তার বয়স খুব বেশী নয়। কিন্তু এরই মধ্যে মুহুর্মুহু রূপান্তর, আঙ্গিক প্রকরণ পদ্ধতির রদবদল তাকে এমনই বহুধাবিচিত্র ব্যাপ্তি দিয়েছে যে, প্রচলিত সংজ্ঞায় তাকে আর বেঁধে রাখা যাচ্ছে না। নিরন্তর ঋতুবদল আর রীতিবদলের ভেতর দিয়ে যে অজ্ঞাতকল্প ভবিষ্যতের দিকে সে এখন এগিয়ে চলেছে তাতে তার সম্পর্কে এখনই শেষ কথা বলার সময় আসেনি। তবে সমকালীন বিশ্বের সেরা ছোটগল্পের সঙ্গে বাংলা গল্প এখন অনায়াসেই পাল্লা দিয়ে চলেছে

তাতে সন্দেহ নেই। এবং বাংলা গদ্যভাষারও নিকষ নিরীক্ষার সার্বিক এবং সর্বাধুনিক পরীক্ষা-ক্ষেত্রটিও এখনো পর্যন্ত এই ছোটগল্পই। অথচ মজার ব্যাপার এই, বাংলা ছোটগল্পের প্রামাণ্য নমুনা, নিপুণ নির্মিতি এবং বিস্ময়কর উৎকর্ষ এক কবির হাতে। তিনিই অদ্যাবধি বাংলাগল্পের নাভিবিন্দু। কেন্দ্রীয় উৎস। তাঁর নাম বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ।

গল্পকর্মটি রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু হলেও রবীন্দ্রনাথেই থেমে থাকেনি। পরবর্তী চারদশকে উত্তরকালের গল্পকারেরা কেবল গল্পের খোলনলচে না, তার বস্তু এবং বাস্তু বদল করে সেই বহুমুখী গল্পকে অনেক দূরে নিয়ে এসেছেন। ছোটগল্পের এই অবিচ্ছিন্ন ধারাটির দিকে নজর রেখেই বিভিন্ন কোটির একুশজন লেখককে আমরা বেছে নিয়েছি যাতে বাংলা সাহিত্যের একটা সামগ্রিক চিত্র চোখের সামনে ধরা দেয়।

অদ্যাবধি বর্তমান, খ্যাতনামা লেখকদের প্রথম সাড়া জাগানো গল্পের একটি প্রামাণ্য সঙ্কলন প্রকাশের অভিপ্রায় ছিল প্রকাশকের। কিন্তু গ্রন্থটির সীমিত পরিসরের জন্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমাকে স্বভাবতই অনিচ্ছুক কৃপণতার আশ্রয় নিতে হয়েছে। আমার কতিপয় প্রিয় লেখক এবং তাঁদের অবশ্যগ্রহণীয় গল্পকেও শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে বাদ দিতে বাধ্য হয়েছি। এই ধরণের সঙ্কলনে বোধ করি কিছু অসম্পূর্ণতা এবং অতৃপ্তি থেকেই যায়। আমার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। আর একটি গভীর দুঃখের কথা, কিছু কালবিলম্বের দরুন সমরেশ বসুর গল্পটি তাঁর জীবদ্দশায় আমরা প্রকাশ করতে পারলাম না! তাঁর প্রতি আমাদের এই মরণোত্তর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ছাড়া আর উপায় ছিল না।

এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন, গল্পের নির্বাচন এখানে স্বয়ং গল্পকারই করেছেন, সুতরাং বাছাইয়ের ব্যাপারে সম্পাদকের স্বাধীনতা বা পরামর্শ ছিল না। এবং যেহেতু নির্বাচনের মাপকাঠি ছিল 'প্রথম সাড়া জাগানো গল্প' সেহেতু অনেক লেখকেরই কার্যত তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পটির দিক থেকে মুখ ফেরাতে হয়েছে। এতে অবশ্য ক্ষতি হয়নি, বরং লাভবানই হয়েছেন পাঠকেরা, কারণ তাঁদের সুপরিচিত এবং একাধিক সঙ্কলনে অন্তর্ভুক্ত গল্পের বদলে তাঁরা অপরিচিত কিংবা প্রায় বিস্মৃত গল্পটি নতুন মাত্রায় দেখতে পেলেন।

সাড়া জাগানো গল্প মানেই যে, কোন লেখকের প্রথম গল্প, এমনকি প্রথম দিকের গল্পই হবে এমন কথা অবশ্যই নেই, তবে কোন কোন লেখক তাঁর প্রথম সাড়া জাগানো গল্প আমাদের দেননি। দ্বিতীয় বা তৃতীয় পর্বের গল্পেই মনোনীত করেছেন। এর প্রধান কারণ হয়তো সে গল্পের দুষ্প্রাপ্যতা। অথবা কালক্রমের বিস্মৃতি। লেখক নিজেই হয়তো ভুলে গিয়েছেন। তাঁর প্রথম সাড়া জাগানো গল্পটির তুলনায় হয়তো অন্য গল্পটি কোন বিশেষ কারণে স্মৃতিতে বেশী উজ্জ্বল হয়ে

আছে—এমনও হতে পারে। কিংবা বর্তমান গল্পটি যেহেতু ইদানীং উপেক্ষিত এবং অলক্ষিত হয়ে উঠেছে, তাই তার প্রতি তাঁর স্নায়বিক দুর্বলতা অধিক।

অবশ্য এতে কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না। কারণ যে কোন সাড়া জাগানো গল্পেরই গুরুত্ব এবং গৌরব অন্যত্র।

ভূমিষ্ঠ হবার মুহূর্ত থেকেই মানুষের একলা চলার শুরু! পৃথিবীর আলোবাতাস জল হাওয়ার সঙ্গে প্রথম সমঝোতা, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির এই আদিম স্বীকরণ-সংঘর্ষেই মানবযাত্রার ইতিহাসের সূত্রপাত। গর্ভগৃহ নিষ্ক্রান্ত সদ্যোজাতক তার প্রথম প্রশ্বাসটিকে প্রতিধ্বনির মত ফিরিয়ে দেয় যে-চিৎকৃত ক্রন্দনে সেটিই তার ব্যাটলক্রাই, তার আত্মঘোষণা এবং যুদ্ধঘোষণা একসঙ্গে। এই মুহূর্ত থেকেই সে একা, তার বাঁচা-মরার অধিকার তার নিজের অর্জন। জরায়ুর বন্ধন ছিন্ন করে সে আয়ুর গ্রন্থিহীন বন্ধন মেনে নেয়। পরজীবিতা থেকে স্বজীবিতায় উত্তরণের সময় নিজের নাড়ির বাঁধনও তাকে কাটাতে হয়।

একজন লেখকের জীবনেও তাঁর স্বরূপে ভূমিষ্ঠ হবার একটা লগ্ন আসে। যখন সে অগ্রজের প্রভাব থেকেই শুধু মুক্ত হয় না, নিজের অন্ধ অনুবৃত্তি থেকেও বেরিয়ে আসে। প্রথম সাড়া জাগানো গল্প সেই আদিম আত্মঘোষণা, সেই ব্যাটলক্রাই, যা কেবল অপরকেই সচকিত করে না, নিজেকেও স্পন্দিত, প্রাণিত এবং সচেতন করে। সেই প্রথম সে নিজের নাড়ির গতি নিজে টের পেতে থাকে। সে যে এই শিল্পচরাচরে একলা, একক এবং অনন্য সেটাও। সব লেখক সব সময় যে তার এই আত্মপ্রকাশের পারিপার্শ্বিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত থাকেন তাও নয়। কারণ উৎস কেন্দ্র থেকে তরঙ্গবৃত্ত যতই বিস্তারিত হতে থাকে, ততই তার স্বরূপটি, আঘাতের গুরুত্বটি স্পষ্ট হয়। আর সে ব্যাপারটা আমরা যারা তার পাঠক-প্রতিবেশী অথচ দূরে আছি, তারাই বেশী করে জানতে পারি।

এই সংকলনের কোন কোন লেখক লেখককথায় যে বিনয়বশত বলেছেন, সাড়া বলতে যা বোঝায় তা এই গল্পটির ক্ষেত্রে ঘটেনি—সেটা সত্যি নাও হতে পারে। কারণ পাঠকের চাঞ্চল্য অনেক সময়েই তাঁদের চোখে না পড়বারই কথা। বিমল করের কথাই ধরা যাক। তাঁর আত্মজা প্রকাশের সঙ্গে যে আলোড়ন, বিতর্ক এবং অনুপ্রাণন ঘটেছিল তা তাঁর সম্যক জানার কথা নয়। সমরেশ বসু কিংবা আরও কয়েকজন লেখকের ক্ষেত্রেও প্রতিক্রিয়াটা তাঁদের কাছে পৌঁছেছে বাসী খবরের মতই। আসল ইতিহাস রয়ে গেছে পাঠকদের প্রত্যক্ষ স্মৃতির মধ্যে।

এই সংকলন সেই স্মৃতিকে উদ্দীপ্ত করলে এবং গল্পেতিহাসের আধুনিক বাঁকগুলি নতুন লেখক এবং পাঠকের দৃষ্টিগোচর হলে আমরা খুশী হব। সাহিত্যের নতুন ধারা এবং ধারান্তরের নথি হিসেবে অন্তত এই সংগ্রহটি গৃহীত হবে এই আশা আমাদের।

আনন্দ বাগচী

সূচী

আত্মজা

বিমল কর

হিমাংশু স্বামী ; যূথিকা স্ত্রী। ওরা বছর পাঁচেকের ছোট-বড়ো। দেখলে মনে হবে, ব্যবধান পাঁচের নয়, আট কিংবা দশের। মেয়ে পাশে থাকলে এ-হিসেবটাও গোলমাল হওয়া বিচিত্র নয়। পুতুল যদি পনেরোয় পা দিয়ে থাকে, আর যূথিকা সত্য-সত্যই গর্ভধারিণী হয় ও-মেয়ের, তাহলে বলতে হবে, রোগা খাটো চেহারার মেয়েরা বেশ বয়স লুকোতে পারে। যেমন যূথিকা। অবশ্য যূথিকা কখনো বয়স লুকোবার চেষ্টা করত না। বরং পুতুল যে তার মেয়ে—এ-কথা হাবে-ভাবে, সাজে-পোশাকে পরিস্ফুট করার ঝোঁকটা স্বভাবে দাঁড়িয়েছিল। এই চেষ্টা সত্ত্বেও পুতুলের মা যূথিকাকে মোটেই পঞ্চদশী কন্যার জননী বলে মনে হত না। বরং এই ধরনের সাজ-পোশাক ওর রোগা, খাটো চেহারার ওপর শালীনতা ও আভিজাত্যের একটা সুষমা ফুটিয়ে তুলত। যা দেখলেই মনে হওয়া স্বাভাবিক, পনেরো বছরের মেয়ের মা সাজার চেষ্টাটাও কৃত্রিম। আসলে, পরিচ্ছন্ন ও পরিমিত সজ্জার আশ্রয়ে একটি খাটো লঘু নারীদেহে মেদ-শুষ্ক দুর্বল অস্থিগুলো আশ্চর্যভাবে আত্মগোপন করত ; এমন কি, পানপাতা ঢঙের ছোট একটি মুখে ব্যাধির যে-বিবর্ণ রেখাঙ্কন স্বভাবতই দৃষ্টিগোচর হওয়ার কথা—তাও ঢাকা পড়ে যেত। বলা মুশকিল, যূথিকার মনের সুগোপন কোণে, ওরই অজ্ঞাতে এই দ্বিতীয় বাসনা ছিল কিনা—যদিও আচরণে উলটোটাই প্রকাশ পেত।

স্ত্রীর তুলনায় স্বামী বিপরীত মেরু। যূথিকা একত্রিশ হলে হিমাংশুর ছত্রিশ হওয়ার কথা। স্বতন্ত্রভাবে ওকে দেখলে পরিণত যৌবনের দীপ্তিতে চোখ ঝলসে যায়। সুগঠিত অঙ্গ ; স্বাস্থ্য সমৃদ্ধ। সর্বাঙ্গে তার সেই প্রাণবন্ত যৌবনের খুশি, হাসি। আর হিমাংশু তো সব সময়েই হাসছে। সকাল-দুপুর-সন্ধ্যে—সব সময় ; সর্বত্রই। একটা মানুষ যে এত হাসতে পারে,

ওকে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। এমনিতেই গলার স্বরটা ভরাট। জোরে হাসলে বাতাসের ঢেউ এমনভাবে গলা দিয়ে বাইরের হাওয়ায় এসে শব্দ তুলত, যা শুনলে মনে হবে—এক জোড়া পায়রা আগল-দেওয়া ঘরে ডানার শব্দ তুলে উড়ছে। এমন হাসি দিনে অসংখ্যবার শোনা যায় হিমাংশুর পাশে থাকলে; যদিও সবসময়ের হাসিটা তার ঠোঁটে-গালে লেগে থাকে, চোখেও কিছুটা। অনেকের এ-হাসি পছন্দ; অনেকের নয়। যেমন, পুতুলের খুবই ভালো লাগে; যূথিকার লাগে না। বরং দেখা গেছে—মাঝে মাঝে রীতিমত বিরক্ত হয় যূথিকা, কড়া সুরে ধমক দেয়; বলে, 'ইস্ অমন বিকট শব্দ করে কি হাসো?'···অফিস যাবার মুখে হিমাংশু তখন হয়ত রুমালটা ট্রাউজারের পকেটে পুরছে, খুবই ব্যস্তভাব; তবু এক লহমা স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে চোখে বিস্ময় তুলে বলে 'বল কি—যে হাসি এককালে বাঁশির চেয়ে মধুর মনে হত তোমার, আজ তা বিকট হয়ে গেল!' একটু হয়ত অপ্রতিভ হয় যূথিকা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সামলে জবাব দেয়, এককালে রঙ্গ করার বয়স ছিল—করতুম। তা বলে আজও কি তোমার মতন ছেলেমানুষি করতে হবে?' স্ত্রীর কথায় আর একদফা হেসে দমকা হাওয়ার মতন বাইরে এসে দাড়ায় হিমাংশু, পাশের ঘরের দিকে মুখ বাড়িয়ে ডাকে, 'পুতুল. রেডি? আমি নিচে নামলাম। তাড়াতাড়ি আয়।' কথা শেষ হতে না হতে দেখা যায় তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে হিমাংশু নিচে গেছে। পুতুল সবে বারান্দায়। মা-মেয়েতে চোখাচোখি হয়। যূথিকা পাশ কাটিয়ে নিচে নামতে থাকে হঠাৎ, তারপর সিঁড়ির মাঝবাঁকে দাঁড়িয়ে পড়ে। হিমাংশু পায়ে ক্লিপ লাগিয়ে সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে হাত রেখে অপেক্ষা করছে; চোখ সিঁড়িতে। যূথিকা বিরস চোখে তাকিয়ে শুরু করে. 'তুমি যাও, পুতুল যাবে না।'···'যাবে না! কেন?' হিমাংশু বুঝেও না-বোঝার ভান করে। অসহ্য বিরক্তি মেশানো গলায় যূথিকা এবার জবাব দেয়, 'এক কথা একশোবার বলতে আমার ভালো লাগে না। কতবার না বলেছি, ওকে তুমি সাইকেলের পেছনে চাপিয়ে রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাবে না!' হিমাংশু চকিতে একবার স্ত্রীর মাথা টপকে দেখে নেয়ঃ পুতুল এক সিঁড়ি এক সিঁড়ি করে নিঃশব্দে মার প্রায় পিঠের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। চোখে-মুখে চট করে একটু অপরাধের ভাব ফুটোয় হিমাংশু. 'আজ কিভাবে যে একটু দেরি হয়ে গেল গো—বুঝতেই পারলাম না! পুতুলের স্কুলের বাসটাও ফিরে গেল। কিন্তু অযথা স্কুল কামাই করা কি ভালো হবে? ওর আবার আজ অঙ্কের ক্লাস। কি রে, আজ না-হয় নাই গেলি, পুতুল!' বাপের কথায় মা ঘাড় ফিরিয়ে মেয়ের দিকে তাকায়! কান্না-কান্না মুখ করতে

তিলমাত্র দেরি হয় না মেয়ের। আস্তে অথচ শব্দটা যাতে বাবার কানে যায় ততটুকু চড়িয়ে পুতুল বলে, অংকের ক্লাস কামাই গেলে বড্ড যা-তা করে বলে মিস্ সরকার।' যূথিকা চূড়ান্ত শাসনের সুরে জবাব দেয়, 'সে-কথা আগে মনে থাকে না ; হেলাফেলা করে কেন তুমি স্কুলের বাস ফেল কর ? শুনবে, বকুনি শোনাই উচিত।' একটু থেমে যূথিকা এবার স্বামীকে উদ্দেশ করে বলে, 'ট্রাম বাসে পেঁছে দিতে বললে এক্ষুনি তো বলবে তোমার অফিসের লেট হয়ে গেছে। বুড়োধাড়ি মেয়েকে সঙ সাজিয়ে সাইকেলের পেছনে করে রাস্তা দিয়ে না নিয়ে গেলে তোমার বাহার হয় না। যাও, যা খুশি কর গে।' কথা শেষ করেই যূথিকা ওপরে উঠতে থাকে—মেয়ে, স্বামী কারুর দিকে ফিরে তাকায় না। না তাকাক যূথিকা। পুতুল হরিণ-গতিতে নীচে নেমে এসে বাবার পাশটিতে দাঁড়ায়। হিমাংশু মুচকি হেসে মেয়েকে সদরের দিকে পা বাড়াতে ইঙ্গিত করে।

মেয়ে-শাসনের রাশটা ইদানীং যূথিকা শক্ত করেই ধরেছে। ফলে, সাই-কেলের পেছনে চেপে স্কুল যাওয়াই শুধু নয়, আরো অনেক খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে নিত্যই স্বামীকে ভর্ৎসনা করেছে যূথিকা। মেয়েকেও। তবু যেমন বাপ, তেমনি মেয়ে। গায়ে মেখেও মাখে না। শতেক রকম ফন্দি করে এড়িয়ে যায় সমস্ত শাসন। কাজেই যূথিকার তরফ থেকে প্রায়ই কথা ওঠে।

মেয়েদের সাঁতারে ফার্স্ট হয়েছিল পুতুল। কাপ পেল, মেডেল পেল ; সুইমিং কস্টিউম-পরা ছবি উঠল তার। কাপ-মেডেল দেখে যূথিকা অখুশি হয় নি। কিন্তু যেদিন পুতুলের সেই বিজয়িনী ছবিটা নিয়ে এল হিমাংশু, যূথিকার সারা মুখ কুঁচকে উঠল। মেয়ের অসাক্ষাতে ছবিটা বাক্সের অন্ধকারে চালান করে দিয়ে বলল যূথিকা স্বামীকে, 'আচ্ছা, মেয়ের তোমার বয়স বাড়ছে না কমছে ?'

'কেন ?' হিমাংশু অবাক হয়ে চোখ তোলে।

'কেন কি, ওই নেংটিটা পরিয়ে কেউ ছবি তোলে ডাগর মেয়ের ? ছি-ছি।'

'নেংটি ? নেংটি আবার কোথায় পেলে তুমি ? ওটা তো সাঁতারের জামা। বাঃ, আমারও তো অমন জামা আছে, ছবিও আছে ; দেখনি নাকি তুমি ?'

'তোমার থাকে থাক, মেয়ের থাকবে না।' যূথিকার গলায় এবার স্পষ্ট আদেশ, 'হেদোর জলে সাঁতার কেটে মেয়ের তোমার জীবন কাটবে না ; তাকে

ঘর সংসার করতে হবে।—ছি-ছি, কী জঘন্য ছবি! পাঁচজনে তো চোখ দিয়ে তাই গিলে খাবে!'

'কি যে বল?' হিমাংশু স্ত্রীর কথায় হেসে ফেলে, 'রসগোল্লা না পান্তুয়া যে গিলে ফেলবে! তবে হ্যাঁ, দেখবে। দেখানর জন্যই তো ওই ছবি; ওতে তোমার মেয়ের গর্ব। আর যদি অন্য কথা বল, তবে বাপু, সত্যি কথাই তো. ভালো চেহারা দেখাবার জন্যেই।' একটু থেমে আবার, 'এই ধর-না তোমার আমার কথা। বিয়ের আগে দাদু, মা—দুজনই তোমায় দেখেছিলেন; লুকিয়ে-চুরিয়ে আমিও। আর দিব্যি করে বল তুমি, আমাকেও তুমি দেখেছিলে কিনা? হুঁ-হুঁ, বাব্বা—এত দেখাদেখি, ভালোলাগা, তবেই না বিয়ে?'

স্বামীর বাগবিন্যাসের তরলতায় যূথিকার গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ণ হতে চলেছিল। তাড়াতাড়ি অন্তিম উষ্মাটুকু প্রকাশ করে ও বলল, 'সব কথা নিয়ে হালহেলে ভাব আমার ভালো লাগে না! ওসবের বয়স পেরিয়ে গেছে, এখনো তোমার এই ছেলেমানুষি কি ভালো লাগে, না মানায়?' কথা শেষ ক'রে যূথিকা আর দাঁড়ায় না; চলে যায়।

স্ত্রীর কথায় মুচকি হাসে হিমাংশু। ও লক্ষ্য করেছে—যূথিকা দিনে অন্তত দু-পাঁচবার চেষ্টা করে, হিমাংশু যে ছেলেমানুষির বয়স কাটিয়ে প্রায় প্রবীণত্বের সীমানায় এসে পেঁছেছে, সেটা স্মরণ করিয়ে দেবার। অথচ হিমাংশু জানে, এটা বাড়াবাড়ি যূথিকার! জোর করে বয়স পাকাবার চেষ্টা। বাস্তবিক, কি এমন বয়স ওর বা যূথিকার। নেহাত এক সেকেলে দাদুর পাল্লায় পড়ে গোঁফ ঘন হওয়ার বয়সে, সেই কুড়িতে, কলেজে পড়ার সময়ই তাকে বিয়ে করতে হয়েছিল পনরো বছরের যূথিকাকে! নয়ত আজ তার বা যূথিকার এমন একটা বয়স হয় নি, যাতে বুড়োটে মেরে যেতে হবে। বরং আজকাল ছেলেরা কে-ই বা ত্রিশ-বত্রিশের আগে, আর মেয়েরা তেইশ-চব্বিশের আগে বিয়ে করে? একটু বয়সে বিয়ে হওয়াই ভালো—হিমাংশুর আজকাল এই ধারণা। অল্প বয়সে বিয়ে হওয়ায় তার বা যূথিকার কিছু ক্ষতি হয়েছে বই কি! একটা আশ্চর্য সিরসিরে তারুণ্যের আনন্দ যদিও বিয়ের সময় ওদের ঘিরে ছিল, বিয়ের পরেও, তবু ষোল বছরে মা হয়ে যূথিকা মরতে বসেছিল! কি কষ্ট তার, কি ভয় হিমাংশুর! ভেবে ভেবে ভয়ে দুশ্চিন্তায় হিমাংশুর চেহারা শুকিয়ে গিয়েছিল, অমন সাঁতারু বুকের ফুসফুসটাও দুর্বল হয়ে পড়েছিল, কালি ধরেছিল চোখের নিচে। যাক্, ঈশ্বরের কৃপায় প্রচুর অর্থ সামর্থ্য ব্যয় করার পর যূথিকা বেঁচে উঠল।

আবার সে ফিরে এল এই আলোয়, হিমাংশুর স্পর্শানুভূতির গণ্ডির মধ্যেই। কিন্তু সে-যূথিকা আর নয়। মিষ্টি, মোলায়েম চেহারা আর নেই ; বিবর্ণ, শুষ্ক, অস্থিসার, দীপ্তিহীন। তার শরীরে একটা গোলমেলে অঙ্গই চিরকালের জন্যে বিকল করে দিলে ডাক্তাররা। দ্বিতীয় কোনো পুতুলের সম্ভাবনা থাকল না আর ওর জীবনে। না থাকুক, এক পুতুলই যথেষ্ট। যাকে হারাবার আশঙ্কায় প্রতি মুহূর্ত দুঃসহ হয়ে উঠেছিল, সে-ই যখন ফিরে এল, তখন হৃতস্বাস্থ্য, বাঁ-পা টেনে টেনে হাঁটা নির্জীব স্ত্রীই এক মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের আনন্দসংবাদ বয়ে এনেছে হিমাংশুর জীবনে। খুঁত নিয়ে কে তখন মাথা ঘামায়? হিমাংশু ঘামায়নি ; আজও ঘামায় না বোধ হয়। খালি এইটুকুই মনে হয়, দুর্বল স্বাস্থ্যের আর সম্ভবত শারীরিক গোলমালের জন্যে যূথিকার স্বভাবেও কেমন একটা নির্জীবত্ব এসে পড়েছে দিনে দিনে।

সে-তুলনায় হিমাংশু অবশ্য ছেলেমানুষই, অন্তত ছেলেমানুষের মতন চঞ্চল, চপল, দুরন্ত স্বভাবের। এর জন্যে যদি দোষারোপ করতে হয়, তবে তার স্বতঃস্ফূর্ত জীবনীশক্তিকেই করা উচিত। প্রখর যৌবনের অমিত তাপে তার প্রাণশক্তি উথলে উঠছে, উপচে পড়চে। তা নিয়ে কি করবে হিমাংশু তাই যেন ভেবে পায় না। অফিস শেষে সাইকেলটাকে হাওয়ার গতিতে রাস্তার পাশ ছুঁয়ে উড়িয়ে নিয়ে যায় ; র‍্যাকেট হাতে খেলতে নামলে হার্ড সার্ভিসে অপর পক্ষকে নাস্তানাবুদ করে তোলে, প্রতিটি অঙ্গ মত্ত হয়ে ওঠে টেনিস বলের চকিত বিচরণে। এতেই সে শেষ নয়, বা এতটুকুতেই। সুইমিং ক্লাবে আজও সে ট্রেনার ; ব্যাকস্ট্রোকে সাঁতারু যুবকদের ভীতিস্থল। ছোটদের দল হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় চাঁদা উঠোতে, পুজোর প্যাণ্ডেল সাজাতে, বন্ধুরা ধরে নিয়ে যায় তাসের আড্ডায়, চৌরঙ্গী পাড়ার পানীয়-কক্ষে কখনো হয়ত। শেষের জিনিসটা সম্পর্কে তার আকর্ষণ বা অনুৎসাহ কোনোটাই নেই, কেমন একটা ঝোঁকের মাথায় চলে যায়। আর দেখা যায়, এমন দিনে বেশ রাত্তিরেও কার্জন পার্কে চক্কর মারছে হিমাংশু। মনে মনে হিসেব কষে যতক্ষণ না স্থির ধারণা জন্মাচ্ছে পুতুল ঘুমিয়ে পড়েছে, ততক্ষণ ট্রামে উঠবে না ও। রাগ করলেও যূথিকার কাছে ক্বচিৎ-কদাচিৎ এ অপরাধের মার্জনা আছে, ভয় পুতুলকে। পাছে পুতুল বুঝতে পারে, বাবা তার মদ খেয়েছে—সেই ভয়ে অনেক রাত করে অসাড় পায়ে হিমাংশু বাড়ি ঢোকে ; উঁকি দিয়ে দেখে, মেয়েটা ঘুমিয়েছে কিনা। বিছানায় শুয়ে সেদিন নিজের ওপর যত রাগ, তত ঘৃণা হিমাংশুর। ছি-ছি—এমন নেশার দরকার কি, যাতে মেয়ের কাছে যেতে লজ্জা, মেয়েকে পাশে ডাকতে ভয়। সারা সন্ধ্যে

মেয়েটা নিশ্চয়ই কান পেতে বসে থেকেছে, পড়ার টেবিলে বসে বই খুলে রেখেছে অযথাই, একটা অক্ষরও চোখে দেখেনি। খেতে বসে খুঁত খুঁত করেছে। শেষ পর্যন্ত অভিমানভরেই হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে। মনটা ভয়ংকর রকম মুষড়ে পড়ে হিমাংশুর। শুয়ে শুয়ে প্রতিজ্ঞা করে, আর নয়—বন্ধুদের এই বাজে ফুর্তির পাল্লায় পড়ে নেশা-টেশা আর করছে না সে।

পরের দিন ভোর হতে না হতেই মেয়েকে নিয়ে আদরের আতিশয্য শুরু হয়ে যায়। যেন প্রায়শ্চিত্ত করছে হিমাংশু। সকাল-দুপুরটুকু কোনো রকমে কাটল, বিকেল থেকে বাপ-মেয়ে পাশাপাশি, ছায়ায়-ছায়ায় জোড়া। দোতলার খোলা বারান্দায় ফুলের টবে জল দিচ্ছে হিমাংশু, একদমে দুশো আড়াইশো ক্রস স্কিপ করে পুতুল ঘন ঘন শ্বাস টানছে, মুখ লালচে। তারপর মুখ হাত ধুয়ে সেজেগুজে বেড়াতে বেরোয় মেয়ে নিয়ে হিমাংশু। ট্যাক্সি চড়ো, টফি কেনো, গল্পের বই চাও তো তাই ঃ রিবন, পেনসিল, গ্রামোফোনের রেকর্ড যা চাও!

এমনি এক প্রায়শ্চিত্তের দিনে সকাল থেকে যা শুরু হয়, যূথিকা তা মোটেই সহ্য করতে পারে না। মুখ ফুটে স্পষ্ট করে বলাও যাচ্ছে না কিছু। এক পিসতুতো বোন এসেছে ওর দিল্লি থেকে আজ সকালেই। বিকেল পর্যন্ত থাকবে; তারপর যাবে তার ভায়ের বাসায়। সেই বোন শিপ্রা মিত্র যার নাম, দিল্লির কোন এক মেয়ে-কলেজে পড়ায়, এখনো কুমারী। যূথিকার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রয়েছে শিপ্রা। ওর সংসারের খুঁটিনাটি দেখছে আর গল্প করছে দিল্লির, আত্মীয়স্বজনের। আর বলতে কি, এরই ফাঁকে তার রোল্ডগোল্ডের চশমার ফাঁক দিয়ে বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখছে বাপ আর মেয়েকে। যূথিকাও সেটা লক্ষ্য করছে। কিন্তু অবস্থাটা এমন, কিছুই বলা যায় না। সবচেয়ে বেশি রাগ হয় যূথিকার ক্যালেন্ডারের লাল তারিখের ওপর। এত ছুটি যে কেন থাকে অফিস আর স্কুলের, যূথিকা বুঝতে পারে না। না থাকত ছুটি আজ, মেয়ে নিয়ে অত ঘটাপটা করে আদিখ্যেতা করার অবসর জুটত না হিমাংশুর ছি ছি, শিপ্রাদি দেখছে তো! কি ভাবছে কে জানে। নিশ্চয়ই ভালো কিছু নয়। আভাসে, যেন শিপ্রাদি বুঝতে না পারে, তেমন ইঙ্গিতে, তবু কয়েকবার চেষ্টা করল যূথিকা হিমাংশুকে সরিয়ে নেবার—কিন্তু কেউ গায়ে মাখল না সে-কথা। প্রকাশ্যে কিছু বলতেও সংকোচ হয়। কে জানে শিপ্রাদি যদি তেমন একটা খারাপ চোখে না নিয়েও থাকে, যূথিকার কথায় হয়ত অন্য রকম একটা ধারণা হবে। অগত্যা রুষ্ট হলেও ভয়ংকর একটা অস্বস্তি চেপে রেখে যূথিকাকে

সহজভাবেই সব দেখতে হয়, সহ্য করতে হয়। ওদিকে, ফাঁকা উঠোনে শীতের রোদ্দুরে, বালতিতে ঠাণ্ডা-গরম জল মিশিয়ে হিমাংশু তরল সাবানের ফেনা দিয়ে পুতুলের চুল ঘষে দেয়, পা-হাত রবারের স্পঞ্জ দিয়ে রগড়ে তেল উঠিয়ে ধবধবে করে, অলিভঅয়েল মাথায়!

বেলা গেল, দুপুরও। বিকেলের দিকে শিপ্রাদির ভাইপো গাড়ি নিয়ে হাজির। জোর তাগিদ তার। তাড়াতাড়ি চলে গেল শিপ্রাদিও।

খানিক পরে দেখা যায়, বাপ-মেয়ের সাজগোজও শেষ হয়েছে। এবার বেরুবেন। যূথিকা থমথমে মুখে সব দেখে যাচ্ছে, একটাও কথা বলে নি। বলবে না এই তার প্রতিজ্ঞা বোধ হয়। শেষ পর্যন্ত দেখবে এবং তারপর। আজ যেন সেও মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে, ধূমায়িত হচ্ছে ভেতরে ভেতরে।

যাবার আগে হিমাংশু স্বভাবমতন কিছু টাকা চাইল। চাবিটাই দিয়ে দিল যূথিকা। তারপর কাপড় কাচতে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। ফিরে এসে দেখে হিমাংশুরা চলে গেছে। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে এরই মধ্যে। বেশ অন্ধকার।

একটু রাত করেই ফেরে হিমাংশুরা। পায়ের শব্দ শোনে ঘরে বসে যূথিকা। হাসিখুশি মুখ আর একটা অয়েলপেপারে মোড়া প্যাকেট হাতে ঘরে ঢোকে হিমাংশু একাই। চেয়ারে বসতে বসতে প্যাকেটটা যূথিকার দিকে এগিয়ে দেয়, 'নাও, দেখ তো কেমন হল তোমারটা।'

হাত বাড়াবার আগ্রহ দেখা যায় না যূথিকার। নিস্পৃহভাবে ও বসে থাকে, নির্বিকার মুখে। ধৈর্য ধরতে পারে না হিমাংশু। অয়েলপেপারের আচ্ছাদনটা খুলে ফেলে পশমের জামাটা এবার এগিয়ে দেয়। যূথিকা দেখে অল্প একটু সময়, তারপর কেমন একটা অভ্যাসবশে হাত বাড়িয়ে জামাটা টেনে নেয়।

জামা দেখছে না মনে মনে কিছু ভাবছে যূথিকা, ঠাওর করা মুশকিল। হয়ত ভাবছে এবং ভাবনাটাই ওর আড়ষ্ট হাতকে অল্প একটু চঞ্চল করেছে; যার ফলে পাট খুলে গেছে পশমের জামার! নরুন-সরু হাসির ছোঁয়া যূথিকার ঠোঁটে ফুটি-ফুটি করছে যেন।......এমন সময়টিতে দেখা গেল পুতুলকে, দরজার গোড়ায়, একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যূথিকার। চোখাচোখি হল মা আর মেয়েতে। মার চোখ মেয়ের সর্বাঙ্গ লেহন করল। আর পরমুহূর্তেই যূথিকার সারা মুখ থমথমে হয়ে আসে, আবার একটু রোদের আভাস ফুটতে-না-ফুটতেই আকাশ যেন আবার কালো মেঘে ছেয়ে যায়। থমথমে মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে নেয় যূথিকা। ভুরুর ওপর আঁচড় কেটে

অদ্ভুত একটা বিরক্তি চোখের পাতায় এসে জমেছে। দৃষ্টিটা এখন তার দেওয়ালে ; তীরের ফলার মত ছুঁচলো হিংস্র একটা টিকটিকির মুখের ওপর। হাতের আঙুলগুলোও যে জ্বালা করছে, এতক্ষণে স্পষ্ট যেন অনুভব করতে পারে যূথিকা। তবে তাই হবে, মোলায়েম পশমে নয়, তুষের আগুনেই অজান্তে হাত রেখেছিল ও।

ছুঁড়েই দিয়েছে, নাকি হাত থেকে খসেই পড়েছে ঠিক বোঝা যায় না, দেখা গেল পশমের জামাটা যূথিকার পায়ের তলায় মেঝেতে পড়ে! এক পলক মা'র দিকে তাকিয়ে, এগিয়ে এল পুতুল, টুপ করে জামাটা কুড়িয়ে নিল। চোখে-মুখে তার অনেক বিস্ময়, কিছু কাতরতা। কি হল মা'র? পছন্দ হয় নি? এমন আকাশ-নীল রঙ জামাটার, গলার কাছে দু-সুতোয় তোলা শাদা ফুল আর লতার কাজ, দামও প্রায় বাইশ, বাস্তবিক যা সুন্দর, খুবই পছন্দ হয়েছে ওদের – ওর আর বাবার, তাই কিনা অপছন্দ মার? মনটা মুষড়ে পড়ে পুতুলের। তবু চুপচাপ সে দাঁড়িয়ে থাকে, মোলায়েম পশম মুঠোয় ভরে, বোকার মতন, বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে।

হিমাংশু মেয়েকেই দেখছে, সেই মেয়েকেই যার নাম পুতুল, দেখতেও পুতুলের মতনই—অমনই নধর গঠন, সুডৌল, সুশ্রী। টিয়াপাখি রঙের নিউ স্টাইল সোয়েটারে পুতুলকে যেন আরো সুন্দর দেখাচ্ছে, এতই অপরূপ যে, হিমাংশু মেয়ের দিকে তাকিয়ে তন্ময়, তদ্‌গত। ওই যে পুরু জমাট রক্তগোলাপ—পুতুলের সোয়েটারে বুকের ওপর নকশা তোলা—ওই গোলাপের লাল আভা যেন পুতুলকে আলো করে তুলেছে ; তার গায়ের সবুজ, মুখ চোখ হাত-পা'র লালচে সাদায় সেই আলোর ঢেউ ফেনার মতন ছড়ানো-ছিটানো।

খুশিতে উপচে উঠে হিমাংশু ডাক দেয়, 'গ্র্যান্ড! কাছে আয়, কাছে আয় তো পুতুল, দেখি,—

হিমাংশুর উচ্ছ্বাস আর ঘরের আলো দুইই যেন বেশ তীব্র। কাজেই যূথিকা চোখ না ফিরিয়ে পারে না। আর আশ্চর্য, হিমাংশুর কাছ ঘেঁষে দাঁড়াবার আগেই যূথিকা মেয়ের চোখে চোখ রেখে তাকিয়েছে বিষাক্ত দৃষ্টিতে।

পুতুল মার কুঞ্চিত চোখ-মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে যায়। সামনে বাড়ানো পা আস্তে আস্তে টেনে নেয় পিছনে। হঠাৎ সব যেন আড়ষ্ট হয়ে এসেছে ওর।

মেয়ের মুখ থেকে দৃষ্টিটা সরিয়ে নিয়ে স্ত্রীর ওপরই রাখতে হয়

হিমাংশুকে। আর সেদিকে তাকিয়ে চট করে চোখ ফিরিয়ে নেওয়াও সম্ভব হয় না। সহাস্য, উজ্জ্বল, মুগ্ধ একটি মুখ ধীরে ধীরে মলিন হয়ে আসে।

যূথিকা এক পাও সরে আসে নি; একটুও নড়ে নি—শুধু ঘাড় ফিরিয়েছিল যতটুকু, ততটুকুই ফিরিয়ে রেখেছে এবং মেয়েকেই দেখছে এখনো, ঠিক তেমনিভাবেই, অসহ্য একটা বিরক্তিতে। বোঝা যায় নি যূথিকা এবার কথা বলবে, ঠোঁট নড়তেই বোঝা গেল। একটা চিকন স্বরে থেমে থেমে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে লাগল, ঘরের সুপ্তি নিষ্করুণ একটি আদেশের কাঠিন্যে থমথমে হয়ে ভেঙে পড়ল।

'ও-ঘরে গিয়ে জামা ছেড়ে চুপচাপ বসগে যাও। শালটা গায়ে জড়িয়ে নিও।'

চোখ নামিয়ে নিয়েছে পুতুল অনেক আগেই। মার আকাশ-নীল রঙের পশমের জামার বোতামটাই অনর্থক খুঁটে চলেছে ও। বড্ড শক্ত, নখ বসে না। দাঁত দিয়ে কামড়াতে পারলেই যেন বেশ হত।

পুতুল ফিরেই যাচ্ছে, হিমাংশুর কথায় দাঁড়াল।

'তোমার শাসনের ঠেলায় বাপু অস্থির! তোর মার জামাটা দে তো, পুতুল।' হিমাংশু হাত বাড়ায়। পুতুলকে বাবার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে কয়েক পা এগিয়ে আসতে হয় আবার। আসতে আসতেই বাবার কথা আবার কানে যায়, 'পুতুলের গায়ে কেমন মানিয়েছে সোয়েটারটা বললে না? এবারে এই ডিজাইনটাই নতুন এসেছে।'

মার দিকে না তাকিয়েও পুতুল বুঝতে পারে, ভালো লাগে নি মার; কিছুতেই ভালো লাগতে পারে না।

'টাকাগুলোকে খোলামকুচির মতন ভাব তুমি'—যূথিকা বলছে, পুতুলও শুনে যাচ্ছে, 'ছাইভস্ম কিনে আনছ, যা-তা ভাবে খরচ করছ। বলার কিছু নেই, ভালো লাগে না বলতে আমার।'

জানা কথাই মা এই ধরনের কিছু বলবে। পুতুল তাড়াতাড়ি বাবার হাতে মার জামাটা কোনোরকমে ধরিতে দিয়ে দ্রুত পায়ে চলে যায়।

পুতুল চলে যেতে হিমাংশু যূথিকার দিকে তাকাল। যূথিকাও স্বামীর দিকে। দু-তিন পা সরে এসে বিছানায় বসে পড়ে ও।

'কি হল তোমার আবার?' হিমাংশু জানতে চায়, 'অযথা মেয়েটাকে ধমকালে কেন?'

'ধমকালেই বা কি—!' যূথিকা হাত বাড়িয়ে হিমাংশুর হাত থেকে

জামাটা টেনে নেয়। বিছানার একপাশে ছুঁড়ে দিয়ে বলে, 'তোমার মেয়ের এসব ধিঙ্গিপনা আমার ভালো লাগে না। তুমি ওকে দিন দিন কি করে তুলছ? আমি ভেবেই পাই না—এরপর ওর কি হবে?'

'ও, এই! সেই পুরনো কাসুন্দী!' খানিকটা স্বস্তি পায় হিমাংশু। মুখে আবার হাসি ফুটে ওঠে। কোলের ওপর থেকে গরম শালটা তুলে বিছানার ওপর রেখে দেয়। আরাম করে সিগারেট ধরায় একটা।

যূথিকা তাকিয়ে তাকিয়ে সব দেখে। স্বামীর ভাবভঙ্গী থেকে মনের কথাটাও বোঝা যায়। অর্থাৎ হিমাংশু যে তার কথাগুলো পরম অবহেলায় সরিয়ে রাখল, যূথিকা তা বুঝতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে রাগটা দ্বিগুণ হয়ে জ্বলে ওঠে ওর।

'এসব তোমায় ছাড়তে হবে।' যূথিকা আদেশের সুরে বলে।

'কি?'

'মেয়ে নিয়ে এই ন্যাকামি।'

হিমাংশু স্ত্রীর দিকে চেয়ে এবার হেসে ফেলে; বলে, 'মুশকিলে ফেললে। মেয়ের মাকে নিয়ে ন্যাকামি করতে চাইলেই কি তুমি রাজী হবে?'

যূথিকা ধমক দিয়ে ওঠে, 'সব সময় তোমার তাচ্ছিল্যভাব আমার ভালো লাগে না।'

'কি-ই বা আমার ভালো লাগে তোমার?' হিমাংশু উঠতে উঠতে বলল, 'ওই ত জামাটা কিনে আনলাম তোমার—ওটাই কি ভালো লেগেছে?'

'উঠো না; বসো।' যূথিকা হাত বাড়িয়ে স্বামীর পাঞ্জাবির হাতা ধরল, 'আমার জন্যে তোমায় জামা কিনে আনতে বলি নি।'

'না বললেই কি আনতে নেই?' হিমাংশু আবার বসে পড়েছে, 'ইচ্ছে করে, আদর করেও তো মানুষ কিনে আনে।'

'আমার বেলায় ইচ্ছেও নয়, আদরও নয়'—যূথিকা কুটিল সুরে বলছে, নিষ্ঠুরের মতন, ধারালো গলায়, নেহাতই না আনলে নয়, বাধ্য হয়ে, মন রাখতে এনেছ!'

হিমাংশু চুপ। যূথিকার মুখ থেকে দৃষ্টিটা তুলে নিয়েছে। এখন দেওয়ালের টিকটিকিটা তার লক্ষ্য।

যূথিকার গলায় একটা শিরা নীল হয়ে ফুটেছে, কাঁপছে দপদপ। একটু থেমে কথাগুলো যেন গুছিয়ে নিল ও।

'এভাবে আমায় তুমি ভোলাতে চাও কেন? আমি কি ছেলেমানুষ?'

'বোধ হয় তাই।' হিমাংশু আবার একবার চেষ্টা করল সহজ হবার।

'ফিকে একটু হাসি টেনে বলল, 'তুমি আজকাল অল্পতেই বড় চটে ওঠ। তোমাদের মা-মেয়ের দুটো জামা কিনে এনে কি এমন অপরাধ করেছি, বুঝছি না।'

'বুঝবে না, বুঝবে না—।' যূথিকা অধৈর্য হয়ে উঠেছে, 'মেয়ের তোমার গরম জামার অভাব আছে কিনা তাই একটা আঁটবুক, আধ-কোমরে মেমজামা কিনে আনলে? ছি-ছি—, চোখেরও একটা ভালো-মন্দ জ্ঞান থাকে মানুষের!'

'ফ্রকের সঙ্গে অমন জামাই তো পরে; মানানসই বলে না কিনেছি!'

'যে পরে পরুক, আমার মেয়েকে আমি পরতে দেব না। বেহায়াপনার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ তোমরা বাপবেটিতে। কি ভাবে লোকে—ছি-ছি—! পনেরো বছরের আইবুড়ো মেয়েকে' তুমি—তুমি—' যূথিকা ঠোঁটের কথাটা যেন চেপে নিয়ে অনেক কষ্টে অন্য কথা টানল, 'তুমি ফ্রক পরিয়ে রাস্তা-ঘাট ঘুরিয়ে আনছ!' ঘৃণায় নাক, চোখ, মুখ কুঁচকে ওঠে যূথিকার।

'বয়সটা এমন কি বেশি?' হিমাংশুকে যেন আজ তর্কের নেশায় পেয়েছে, 'শাড়ি সামলাতে পারবে কেন পুতুল?'

'আমরা কিন্তু পেরেছি।' যূথিকার গলায়, ঠোঁটে শ্লেষ ফুটেছে তীক্ষ্ণতর হয়ে 'পনরো বছরেই আমার বিয়ে হয়েছে; ষোল বছরে মা হয়েছি। শুধু শাড়ি নয়, মেয়েও সামলেছি।'

বলার কথা আর খুঁজে পায় না হিমাংশু। তর্কের নেশাটাও হঠাৎ থিতিয়ে যায়। স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে যেন ও পনরো বছরের সেই কিশোরী যূথিকাকে খোঁজবার চেষ্টা করছে এবং তুলনা করবার চেষ্টা করছে এই একত্রিশ বছরের যূথিকার সঙ্গে।

যূথিকাও উঠে পড়েছে। স্বামীর পাশে বসে থাকার মতন ধৈর্য নেই আর তার। অদ্ভুত একটা রি রি সারা গায়ে-মনে। অস্বস্তিকর, অসহ্য জ্বালা। বাইরে শীত; তবু সেই শীতের হাওয়ায় গিয়ে না দাঁড়ালে ঘামের মতন লেপটে থাকা এই অস্বস্তিকর জ্বালা থেকে যেন মুক্তি নেই।

বাঁ পা-টা টেনে টেনে যূথিকা চলে যায়। হিমাংশু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে।

তারপর দুটো দিন যূথিকা গুম হয়ে থাকে। যতদূর সম্ভব কম কথা বলে, গলার স্বর খাদে নামিয়ে সংসারে তার উপস্থিতিটাকে নিরাসক্ত রাখতে চায়। তিন দিনের দিন গুমোট ভাবটা কাটতে শুরু করে, পর্দা চড়ে যূথিকার

স্বরের। আড়ালে বাপ আর মেয়ে মজা পাওয়ার হাসি হাসে। ওরা জানে, যূথিকার রাগের বহর কতখানি, তার পরিণতি কোথায়। এবার জেরটা একটু বেশিক্ষণ স্থায়ী হল, এই যা। তা হোক, গুমোট ভাবটা কাটার সঙ্গে সঙ্গে হিমাংশু আর পুতুল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। এখন কিছুদিন শাসনের রাশটা একটু আলগাই থাকবে। যূথিকার স্বভাবই তাই। মেয়ে-বাপ—দুজনাই তা জানে। আর সেই কথা ভেবে দুজনাই পরম খুশি।

চার দিনের দিন পড়ল শনিবার। জানা গেল, দুপুরে যূথিকা যাবে শিপ্রাদিদের বাসায়। ফিরবে সন্ধ্যেবেলায়। পুতুল স্কুল থেকে ফিরে এসে বাড়িতে একাই থাকবে, হিমাংশু যেন অফিসের ছুটির পর আড্ডা মারতে না গিয়ে সকাল সকাল বাড়ি ফিরে আসে।

স্কুলের বাসে ওঠার আগে পুতুল চুপি চুপি হিমাংশুকে তারিখটা স্মরণ করিয়ে দেয়, 'আজই কিন্তু থার্টিনথ্, বাবা; ভুলো না। সেই রসিদটা আমি তোমার শার্টের বুকপকেটে রেখে দিয়ে গেলাম।'

রসিদের কথা ভোলে নি হিমাংশু, কিন্তু অফিসের পর অন্য এক ঝামেলায় পড়ে তার দেরি হয়ে গেল। বাড়ি ফিরতে বেশ বিকেল। পুতুল তখন ঝি রাসমণির সাহায্যে পিঠের উপর সাপের মত দুই বেণী ঝুলিয়ে সবে উঠে দাঁড়িয়েছে।

বাবার হাত থেকে প্যাকেটটা নিয়ে খুশির দাপটে পুতুল বলল, 'আমি ভাবছিলাম তৈরি-ই হয় নি বোধ হয়; দর্জিদের কাণ্ড তো। তুমি এত দেরি করলে কেন, বাবা?'

মেয়ের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে হিমাংশু চেয়ারে বসল পা ছড়িয়ে। টানটান হয়ে। ঝুপ করে বাবার পায়ের কাছটিতে বসে পড়ল পুতুল। তড়িৎ হাতে জুতোর ফিতে খুলে, মোজা খুলে—জুতো জোড়া হাতে করে উঠে দাঁড়াল। ঘরের এক কোণে রাখল। বলল, 'আমি তোমার চা করে আনি, হ্যাঁ—তুমি একটু জিরোও।'

'তা না-হয় জিরোচ্ছি! কেমন করল ওটা দেখলি না?'

'দেখব, দেখব। দাঁড়াও না। তোমায় চা দিয়ে নি আগে। হাত-মুখ ধুয়েই একেবারে পরবো।' সাপের মতন দুই লিকলিকে বেণী নাচিয়ে পুতুল ছুটল চা তৈরি করতে।

চা শেষ করে হিমাংশু আরাম করে সিগারেট ফুঁকল। উঠে ট্রাউজার ছেড়ে ধুতিটা জড়িয়ে নিল। বাইরের ফাঁকা দালানে অন্ধকার নেমেছে ততক্ষণে। তাতে কি? বেশ একটা আমেজ আর আরাম লাগছে। হিমাংশু

চেয়ারের ওপর এলিয়ে চোখ বুজে পড়ে থাকল। টুক করে আলো জ্বলে উঠল ঘরের। চোখ খুলে হিমাংশু দেখে, পুতুল একেবারে ঘরের মাঝটিতে দাঁড়িয়ে, আলোর তলায় সদ্যপরিচ্ছন্ন ধবধবে মুখটিতে ফুটফুটে হাসি। চোখের তারায় ফুলঝুরির দীপ্তি। গায়ে তার সদ্য-আনা ক্রিমসন রঙের সেই ল্যুজ ফ্রক। চুলের একটা বিনুনি গলার পাশ দিয়ে বাঁকা হয়ে বুকের মাঝটিতে এসে পড়েছে—আগায় যার শাদা জরির রিবনে তৈরী ফুল। ঝিকমিক করছে আলোয়। ঠিক যেন একটি লতান ডাঁটার ওপর এক থোকা ফুল ফুটে রয়েছে। আশ্চর্য, আশ্চর্য সুন্দর এই পুতুল। কি নিখুঁত অঙ্গ! কপাল, মুখ, চোখ, ঠোঁট, গলা—সব যেন সামঞ্জস্য করে কেউ এঁকেছে নিপুণ তুলিতে। দুটি হাত—যত নিটোল তত কোমল; দুটি পা তাও যেন লালচে মোমের ছাঁচে গড়া, মসৃণ, মোলায়েম, মধুর।

'মন্দ করে নি, না বাবা?' পুতুল লাজুক হাসি হাসে।

মেয়ের গলার স্বরে তন্ময়তা ফিকে হয় হিমাংশুর।

'ওয়াণ্ডারফুল! রঙটা তোকে বিউটিফ্যুলি মানিয়েছে।'

'একটু কিন্তু বেশি ঢিলে করে ফেলেছে, যাই বল—।' মেয়ে খুঁত ধরছে এবার।

'নাম যখন ল্যুজ ফ্রক তখন তো একটু ঢিলে-ঢালা হবেই, বোকা।'

'বই-কি, তা বলে এত! এই দেখ না, হাঁটুর কাছটা ঘাঘরা মতন হয়ে গেছে, আর পিঠের কাছটায় বড্ড বেশি কাপড় রেখেছে, বুকের কাছে একটা কাঁচি দিয়ে নিতে হবে নিজেকেই—। পুতুল একে একে টুকটাক খুঁত ধরিয়ে দিচ্ছে।

হিমাংশুকে উঠতে হয়। এত খুঁত যখন, তখন একবার ভালো করে দেখতে হয় অবশ্য। মেয়ের কাছটিতে এসে দাঁড়ায় ও। মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে। ফ্রকের কাপড়ের ঝুলের অংশটা একবার উঁচু করে একটু। মেয়ে বলে, হ্যাঁ—ওই পর্যন্ত হলে ভালো হত। হিমাংশু মাথা নাড়ে, ঠিক। তারপর বুক। হিমাংশু বুকের দু-পাশের কাপড় দু-হাতের আঙুলে আলতো করে ধরে কাপড়ের বিস্তৃতিটা পরখ করে, সঙ্কুচিত করে বুকের বস্ত্রাংশটা।—'কাঁচি দিয়ে নিলে কি ভালো দেখাবে রে—বরং একটু ছোট করতে দিয়ে এলে হয়।'—'না, না, দরকার কি', পুতুলের আপত্তি, 'আমি হাতেই এমন সুন্দর করে হনিকম্বের কাজ করে নেব, দেখো—।' এরপর কোমর। সত্যি বেঢপ বড়ো করেছে, কাপড় রেখেছে একরাশ! হিমাংশুর দুই বিঘতের মধ্যে পুতুলের কোমরটা আঁট হয়ে থাকে। কি সরু, সুন্দর

কোমর পুতুলের—হিমাংশু পরখ করে, ভাবছে, হাসছে, 'তুই এবার একটু-আধটু নাচ শিখলেই ত পারিস, পুতুল—যা সরু কোমর তোর···।' পুতুল আনন্দে আত্মহারা : 'সত্যি নাচ শিখতে ভীষণ ইচ্ছে আমার। আমাদের ক্লাসের রেখা, ছন্দা ওরা তো শেখে কোথায় যেন। কিন্তু আমি যেন একটু ভারী বাবা ; ওরা বেশ হালকা।'···'ভারী ?' হিমাংশু হো হো করে হেসে ওঠে, টপ করে কোমরে বিঘত জড়িয়ে শূন্যে তুলে নেয় মেয়েকে। আচমকা মাটি থেকে পা উঠে যেতেই পুতুল ভয়ে হিমাংশুকে আঁকড়ে ধরে—তার হাত হিমাংশুর মাথার চুলে ঘাড়ে টলে পড়ে। ক্রিমসন রঙের ল্যুজ ফ্রকের আড়ালে হিমাংশুর নাক, চোখ, মুখ সব ঢাকা পড়ে গেছে। শুধু একটা অট্টহাসির অনেকখানি শব্দ ঘরের বাতাসে।

পুতুলকে নামিয়ে দিতেই সে গা মুখ ঘুরিয়ে নিজেকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে গিয়ে হঠাৎ কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল। অর্ধস্ফুট শব্দ বেরুল, 'মা !'

তাকাল হিমাংশু। দরজার গোড়ায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যূথিকা আর শিপ্রা। মনে হল, ওরা অনেকক্ষণই এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছে।

'কখন এলেন আপনারা ?' হিমাংশু শিপ্রার মুখে চোখ ফেলে হাসল, 'আসুন—'

'এসেছি অনেকক্ষণ. মেয়ে নিয়ে যা মত্ত ছিলেন, বুঝবেন কি করে ?' শিপ্রার ঠোঁটের পাশে একটু বাঁকা হাসি খেলে গেল।

আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়েই যূথিকা শিপ্রাকে টেনে পাশের ঘরে চলে যায়।

আগের দিন কিছু না বললেও আজ শিপ্রা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কথা তুলল, 'তোর মেয়ের বয়স কত হল রে যূথি ?'

'পনরো।' বিরস, গম্ভীর মুখ যূথিকার।

'দেখলে যেন আরো একটু বেশি মনে হয়। তা বড়-সড় হয়েছে ; ওকে ফ্রক পরিয়ে রাখিস কেন ? চোখে কটকট করে লাগে।'

'সাধ করে কি পরিয়ে রাখি ?' যূথিকা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে তিক্তস্বরে বলছে, 'ওর বাবার শখ, মেয়েকে শাড়ি পরতে দেবে না।'

'বাবার শখ ?' ঠোঁট উলটে শিপ্রা একটা বিশ্রী শব্দ করল, 'হিমাংশুর এই শখ নিজের চোখেই দুদিন দেখলাম।' আবার একটু থামল শিপ্রা, তারপর গলার স্বর নিচু করে, যেন উপদেশ দিচ্ছে এমনভাবে বলল, 'জিনিসটা মোটেই ভালো নয়, যূথি। এসব আশকারা তুই দিবিনে। এ এক ধরনের কমপ্লেক্স !'

যূথিকা শেষ কথাটা বুঝল না। শিপ্রাদির চোখের দিকে তাকাল।

'মানে ?'

'মানে—? ও, সে তুই বুঝবি না!' শিপ্রা যূথিকার অজ্ঞতাকে উপেক্ষা জানিয়ে অনুকম্পার হাসি টেনে আনল ঠোঁটে, 'আসলে যূথি, এই—এই—ধরনের রুচি—কি বলব যেন একে—হ্যাঁ, এই ধরনের রুচি খুব খারাপ, নোংরা।'

যূথিকা কয়েক মুহূর্ত ফ্যাকাশে, অর্থহীন চোখে তাকিয়ে থাকে শিপ্রাদির মুখের দিকে। তারপর উঠে দাঁড়ায় আস্তে আস্তে। আলমারি খুলে টাকা বের করে। খান পাঁচেক দশ টাকার নোট এনে শিপ্রার মুঠোর মধ্যে গুঁজে দেয়।

'এতে হবে তোমার ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ; যথেষ্ট। আমি তাহলে উঠি যূথি। বেশি রাত হলে বাড়ি খুঁজতে বিপদ হবে। টাকাটা তোকে দিল্লি ফিরে গিয়ে পাঠাব কিন্তু।'

'সঙ্গে কাউকে নিয়ে যাও না।'

'না, না; দরকার নেই। একাই বেশ যেতে পারব। চলি, অ্যাঁ—।'

শিপ্রা চলে যায়। নিচে নেমে বিদায় দিয়ে আসে যূথিকা।

ওপরে উঠে শাড়িটা বদলে নিয়ে কোনোরকমে বাথরুমে গিয়ে তপ্ত চোখে-মুখে, হাতে-পায়ে অনেকখানি জল ঢালে, তারপর সেই সপসপে ভিজে অবস্থাতেই বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে। বাতি নিবিয়েই।

যূথিকা যে সেই শুয়ে পড়ল আর উঠল না, কথা বলল না। রাত বাড়ল। পুতুল এসে ডাকল মাকে। কেমন একটা আচ্ছন্নতার মধ্যে ভাঙা চাপা গলায় যূথিকা বলল, 'তোমরা খেয়ে-দেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়। রাসমণিকে বল, সব গোছগাছ করে নিচের চাবি রেখে দিয়ে যাবে।'

রাত বেড়ে চলেছে। ঘড়িতে দশটা বেজে গেল। পুতুল এসে শুয়ে পড়ল মার পাশে। ধোয়া-মোছা সেরে রাসমণি ওপরে এসে চাবি রেখে গেল। বাইরে থেকে ভেজিয়ে দিল দরজা। হিমাংশু অনেকক্ষণ হল পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকেছে। ও-ঘর এ-ঘরের মধ্যে যে-দরজা তাতে কপাট থাকলেও সে-কপাট বন্ধ হয় না; একটা পর্দা শুধু ঝোলে। ও-ঘরেই হিমাংশু শোয়, তার নিজস্ব কাজকর্ম করে। স্বামীর শোয়া-বসার জন্যে, পুতুল বড়ো হবার পর, যূথিকা নিজের হাতেই এ-ব্যবস্থা করেছে।

হিমাংশুর ঘরে আলো জ্বলছে। নিশ্চয়ই সে ঘুমোয়নি। হয় কোনো বইয়ে, না হয় ক্রসওয়ার্ড পাজলে ডুব দিয়েছে।

ঘড়ির কাঁটার শব্দ ঠেলে রাত গভীর হয়ে আসে। সব নিস্তব্ধ। শীতের রাত। সমস্ত পাড়াটাই এতক্ষণে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। এ বাড়িটাও। একটা বেড়াল সিঁড়ি দিয়ে পালিয়ে গেলে তার শব্দ শুনতে পাওয়া যায়, কেউ খিল খুললে জানালার ছিটকিনি দিলেও খুট করে আওয়াজ ওঠে। এমন কি, পুতুল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কেশে উঠছে—সেই খসখসে ভাঙা আওয়াজ নিবিড় নিস্তব্ধতার মধ্যে কানে লাগে। অনেকখানি ঠাণ্ডা খড়খড়ির ফাঁক দিয়েও যেন যূথিকাদের ঘরে ঢুকে পড়েছে: বারোটাও বেজে গেল। ঘড়ির সেই ঘণ্টা পেটার শব্দটা যেন বারোটা মুগুর পিটে গেল ঘরের অন্ধকারে। ধকধক করে যাচ্ছে যূথিকার বুক, খসখসে একঘেয়ে কাশি কেশে চলেছে পুতুল। ফট করে বাতি জ্বলে উঠল। যূথিকার বিছানার পাশে হিমাংশু।

দেখছে বই-কি হিমাংশু—পাশাপাশি মা আর মেয়েকে। যূথিকা ডান দিকে কাত হয়ে শুয়ে, বালিশের ভাঁজের তলায় মুখ চাপা, ডান হাতটাও গালের ওপর দিয়ে কপাল বেয়ে বালিশের প্রান্তে এসে রয়েছে। কিছু ভালো করে দেখা যায় না। চোখের পাতা বোজা।

মার দিকেই মুখ করে কাত হয়ে ঘুমচ্ছে পুতুলও। ক্রিমসন রঙের সেই লুজ ফ্রক এখনো তার অঙ্গে। গায়ের লেপটা সরে গেছে—অর্ধেক দেহটাই তার খোলা। হিমাংশু আরো একবার মুগ্ধ চোখে মেয়েকে দেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। সাদা চাদর আর বালিশের ফেনার মধ্যে সূর্যাস্তের রঙ ছোপান একটি ঢেউ যেন। হয়ত দুঃস্বপ্ন দেখে ঠোঁট খুলে কেমন একটু কঁকিয়ে উঠে থেমে গেল পুতুল, আবার কাশল খুকখুক করে। নড়ে চড়ে উঠে ফের শান্ত। রাত্রে কাশিটা আবার বেড়েছে মেয়েটার। যেভাবে শোয়, রোজই হয়ত ঠাণ্ডা লাগে। গলার কাছটায় অত খোলা না রাখলেই কি নয়। হিমাংশু হাত বাড়িয়ে গলার কাছটায় জামার টিপকলটা এঁটে দেয় পুতুলের, লেপটা টেনে দেয় গলা পর্যন্ত। কতকগুলো চুল কপালের পাশ দিয়ে চোখে এসে পড়েছিল। আস্তে আস্তে সরিয়ে দেয়। গভীর সোহাগে গালে মুখে কপালে হাত বুলিয়ে সরে আসে। বারান্দার দিকের দরজাটা ফাঁক হয়েছিল। বন্ধ করে দেয় হিমাংশু। ছিটকিনি তুলে দেয়। বাতি নিবায়। তারপর পর্দা সরিয়ে যায় নিজের ঘরে।

বিছানার দিকেই এগুতে যাচ্ছে হিমাংশু, হঠাৎ কে যেন পিছন থেকে টান দিল চাদরে।

মুখ ফেরাতেই দেখে যূথিকা।

'তুমি ঘুমও নি ?' হিমাংশু অবাক।

'না।' ঘুম থেকে তো নয়ই, যেন খুব জ্বর থেকে ও উঠে এসেছে, তেমনি শুকনো টকটকে ওর চোখ মুখ, তেমনি বিশ্রী ঝাঁঝ আর তিক্ততা তার গলায়।

'কি করছিলে তবে এতক্ষণ ?' হিমাংশু আবার এগুতে চায়।

'তোমার কীর্তি দেখছিলাম।' যূথিকা আবার বাধা দেয়!

'কীর্তি!' অবাক চোখে চায় হিমাংশু।

'তাই।' ঠোঁটটা দাঁতে কামড়ে ধরেছে যূথিকা।

'স্পষ্ট করে বল যা বলতে চাও, হেঁয়ালী করো না। আমার ঘুম পাচ্ছে।' হিমাংশু এই প্রথম বিরক্ত হল।

'বলবই তো।' যূথিকা স্বামীর চাদর ছেড়ে দিল, অপ্রকৃতিস্থ দৃষ্টিতে তাকাল ঘরের এদিক-ওদিক। তারপর হঠাৎ, যে-কপাট এতকাল খোলাই থাকত রাত্রে, সেই পাশের কপাটটা পর্দা সরিয়ে বন্ধ করে দিল। এক মুহূর্ত থামল। কি ভাবল সে, কে জানে। দু-পা এগিয়ে সুইচটা অফ করে দিল। মুহূর্তে সারা ঘর অন্ধকারে ভরে গেল। খালি একপাশের এক খোলা জানালা দিয়ে বাইরের একটু আলোর আভাস জেগে থাকল।

'বাতি নেবালে কেন ?' অন্ধকারেই বিছানার পাশে এগিয়ে গিয়ে বসল হিমাংশু।

'অন্ধকারই ভালো। আলোয় তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতেও আমার ঘেন্না হয়।'

হিমাংশু কতদূর বিস্মিত হয়েছে অন্ধকারে ঠাওর করা যায় না।

'রাত দুপুরে কি পাগলামি শুরু করলে, যূথি ? কি যা-তা বলছ ?'

'পাগলামি নয়, যা বলছি তা তোমায় শুনতেই হবে। আমি আর পারছি না—আমার সহ্য-শক্তি আর নেই—নেই।' যূথিকা সত্যিই বুঝি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে, 'তোমরা দুজনে—মেয়ে আর বাপে মিলে আমায় শেষ করে ফেলছ। কি চাও তুমি, আমি চলে যাই, আমি মরে যাই ?'

'এসব কি বলছ!'

'ঠিক কথাই বলছি। তুমি কি বল তো, মানুষ না পশু ? পুতুল না তোমার মেয়ে ?'

অন্ধকারেও হিমাংশু একবার চমকে উঠে স্ত্রীকে দেখবার চেষ্টা করল।

'রাত দুপুরে তুমি এই কথা বলতে এসেছ ?'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ। রাত দুপুরে তুমি যেমন লুকিয়ে পনরো বছরের মেয়ের ঘুমন্ত চেহারা দেখতে যাও।'

'যূথি'—হিমাংশু কি যেন বলতে চায়। কিন্তু তার গলার স্বর চাপা দিয়ে যূথিকার তীক্ষ্ণ, অসম্ভব তিক্ত, একরাশ অভিযোগ স্রোতের মতন বেরিয়ে আসে।

'তুমি বাপ হতে পার, কিন্তু সে মেয়ে ; তার রূপ আছে, বয়স আছে। তার কি নেই, কি হয় নি জান না তুমি ? তবু, এই মেয়ে নিয়ে তোমার বেহায়াপনা রোজ রোজ আমি দেখে যাচ্ছি। বাইরের লোক এসেও আজ দেখে গেল। ছি, ছি, ছি। কোন্ আক্কেলে তুমি ওর বুকে মুখ গুঁজে থাক, কোমর জড়িয়ে ধর।' যূথিকার হাঁপ ধরে যায়। তবু অনেক কষ্টে দম নিয়ে আবার সে বলে, 'এতদিন বুঝি নি, আজ বুঝতে পেরেছি, মেয়েকে ফ্রক পরাবার বায়না তোমার কেন।'

'চুপ কর, চুপ কর যূথি !' অন্ধকারেই হিমাংশু দাঁড়িয়ে উঠেছে। কাঁপছে তার গা, গলা।

'করব বইকি, চুপ ত করবই, চিরকালের মতনই। এত পাপ তোমার মনে, তবু আমি থাকব ভেবেছ। আমি—'

যূথিকা আর পারে না, কান্নায় তার গলা একেবারেই বুজে এসেছে। অনেকটা ফোঁপানো আবেগের অদ্ভুত একটা হুমছমে শব্দ উঠিয়ে, আশ্চর্য করুণভাবে ডুকরে উঠে অন্ধকারেই ও চলে যায়। একটা শব্দ শুধু ওঠে। পাশের কপাট খুলে আবার বন্ধ হওয়ার শব্দ। সেই শব্দটা যেন হিমাংশুর বুকের হৃৎপিণ্ডে এসে আঘাত করে।

ক'টি তো মুহূর্ত। কিন্তু এই অল্প একটু সময়ের ব্যবধানে হিমাংশু এই ঘর, পরিবেশ, সংসার, স্ত্রী-কন্যা সমস্ত থেকে ছিটকে এক বীভৎস অন্ধকারে গিয়ে পড়েছে। সেখানে কিছু কি আছে ? বাতাস, আলো ? কিচ্ছু না। শুধু সাপের কুণ্ডলীর একটা হিমস্পর্শ, আর প্রতি পলকে শত সহস্র বিষাক্ত দংশন। যার বিষে এখনো সে অসাড়, যার ক্রিয়ায় এখনো সে অচেতন এবং যে-দংশনে তার স্নায়ু মৃত।

নিছক একটা মানসিক প্রাণ এখনো আশ্চর্যভাবে গিরি-গোপন শীর্ণ জল-প্রবাহের মত ক্ষীণ স্রোতে বয়ে যাচ্ছে। শুধু একটুকু মাত্র অনুভূতিতেই হিমাংশু এখনো কানের কাছে যূথিকার সেই তীক্ষ্ণ নির্মম নিঠুরের মত শানিত কথাগুলো শুনতে পাচ্ছে। আর শুধু শোনা নয়, যূথিকার প্রত্যেকটি অভিযোগ অদ্ভুতভাবে একটি একটি করে অসংখ্য ছবি ফুটিয়ে তুলছে। জীবন্ত

করছে বহু ঘটনা, বহু মুহূর্ত, বহু অচেতন অভীপ্সা। পুতুলের বুকে মুখ গুঁজে হিমাংশু হাসছিল বটে, কিন্তু কোথায় একটা সুধার স্পর্শ যেন ছিল। ঠিক, ঠিক—পুতুলের হাঁটুর ওপর থেকে বস্ত্র সরিয়েছে ও, কিন্তু চোখে পড়ছে —একটি অন্য আকাশ কি ফুল, সুডৌল রক্তশ্বেত একটি মেঘ কি পাপড়ি। অস্বীকার করবে কি হিমাংশু, পুতুলের চুল, চোখ, সর্বাঙ্গের ঘ্রাণ ওর চিত্তে যে শিহরণ জাগিয়েছে, তার মধ্যে কোনো আনন্দের স্বাদ ছিল না?

কোনো কিছুই অস্বীকার করবে না হিমাংশু; করতে চায় না আজ। এই নিষ্ঠুর সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কার কাছে কি গোপন রাখতে পারে সে? নিজেকে? তারই তো অংশ পুতুল। নিজেকে গোপন করার অর্থই তো পুতুলের কাছে নিজেকে গোপন করা। হিমাংশু তা পারে না। যদি মনের সংগোপনে জট পাকিয়ে গিয়ে থাকে অজ্ঞাতে, অদ্ভুত কোনো কামনার আবর্ত সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে সব আজ প্রকাশ হোক।

জানালাটা হাট করে খুলে দেয় হিমাংশু। শীতের কুয়াশায় সমস্ত আচ্ছন্ন; পাশের বাড়িটাও হারিয়ে গেছে। হয়ত অমনিই হবে—স্নেহের আর পিতৃত্বের কুয়াশায় হিমাংশুর সত্য পরিচয় ঢাকা ছিল। আবার যেন একটা বিষাক্ত ছোবল খেয়ে ওর চিন্তাটাই অসাড় হয়ে এল।

বাতি জ্বালবে নাকি হিমাংশু? এত অন্ধকার! যেন একরাশ অশরীরী প্রেতস্পর্শ ওকে ঘিরে রয়েছে। একটু আলো আসুক। হিমাংশু অস্থিরভাবে অন্ধকারে হাত বাড়ায়। হঠাৎ চমকে উঠে হাত সরিয়ে নেয়। না, না, অন্ধকারই ভালো। আলো নয়। আলো এসে হিমাংশুকে প্রকাশ করে দেবে, নিজেকেই নিজে সে দেখতে পাবে, স্পর্শ করতে পারবে। কুৎসিত একটা গলিত কুষ্ঠকে কি স্পর্শ করা যায়—না, প্রকাশ করা যায়! ঘিনঘিন করে ওঠে হিমাংশুর গা, মন, হাত পা। থাক, অন্ধকারেই থাক। আর যেন আলো না ফোটে। হা ঈশ্বর!

পলে পলে পলাতক সময় এসে রাত চুরি করে নিয়ে যায়। কখন যেন হিমাংশুর খেয়াল হয় তার চোখ, মুখ, মাথা সব পুড়ে যাচ্ছে। অসহ্য যন্ত্রণা, জ্বালা। একরাশ ছুঁচ ফুটে চলেছে মাথায়। কোথায় যেন কোথায় যেন? হিমাংশু শক্ত মুঠিতে চুল চেপে ধরে টানে। টানে। আঃ! কি আরাম।

জলের জন্য আকুলি বিকুলি করছে প্রত্যেকটি শিরা, প্রতিটি স্নায়ু। একটু জল।

হিমাংশু কেমন করে যেন বারান্দার দিকের দরজাটা খুলে বেরিয়ে

আসে। হুট করে ছুটে পালায় বেড়ালটা। ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া এসে গায়ে মাথায় চেটে দিয়ে যায়। আরো একটু সংবিত ফিরে পায় হিমাংশু। বুক টেনে টেনে নিশ্বাস নেয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একবার আকাশ দেখে, কয়েকটা তারা। তারপর টুক করে বাথরুমের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে যায়। আবার একটু মৃদু শব্দ। ভেতর থেকে ছিটকিনি তুলে দেয় হিমাংশু।

বাথরুমে এসে দাঁড়াতেই হিমাংশুর খেয়াল হয়—কাঁচের উঁচু জানালা দিয়ে একটু ফরসা এসে ঢুকছে। পা পা করে এগিয়ে যায় ও; জল নয়, আয়নার দিকে। আয়নায় অস্পষ্ট, খুব অস্পষ্টভাবে মুখ দেখা যাচ্ছে তার। একেবারে কাছটিতে এসে দাঁড়ায় হিমাংশু। আয়নার বুকে একটা জল ধোওয়া শ্লেট-রঙের ছবি ফুটেছে। তীক্ষ্ন চোখে তাকিয়ে হিমাংশু সেই ছবির মধ্যে কা'কে বুঝি খুঁজছে।

গালে হাত তুলতেই ছবির মধ্যে থেকে সেই ছায়াকৃতি লোকটাও নড়ে ওঠে—হিমাংশু যে নয়, কারণ হিমাংশু পিতা, কিন্তু ও অন্য লোক, যে পিতা নয়, পশু। যার দৃষ্টি সুস্থ মানুষের নয়, জানোয়ারের।

হিমাংশুরই অসম্ভব ঘৃণা হয় তার ওপর—। শুধু ঘৃণাই নয়, তাকে ধিক্কার দেয় হিমাংশু, ইচ্ছে হয় ওর টুঁটি চেপে ধরে, ওর রক্তের পঙ্কিল গন্ধে······

আশ্চর্য, আরো কি ফরসা হয়েছে আকাশ—নাকি একটু আলো আসছে কোথা থেকে। আয়নার ছবিটি আরো স্পষ্ট, আয়নার নীচের একটি সরু ব্র্যাকেটে সাজানো দাড়ি কামানোর সাবান, ডেটল, ক্ষুর, সেই রবারের হ্যাণ্ডেল, ব্রাশ সব ফুটে উঠেছে।

জানোয়ারটার চোখে চোখ রাখতেই আর ইচ্ছে হচ্ছে না হিমাংশুর। ওর রক্তের পঙ্কিল গন্ধ যেন ভেসে আসছে। বিকৃত মুখভঙ্গি করে হিমাংশু ব্র্যাকেটের ওপর থেকে ক্ষুরটা তুলে নেয়।

রক্তের স্বাদ আছে, কিন্তু গন্ধ আছে নাকি? নেই? কিন্তু ভ্যাপসা পচা ঘা'র মতন গন্ধ আসছে কোথা থেকে? পঙ্কিল রক্তের, কলুষ নিশ্বাসেরও হতে পারে। হতে পারে ওই পশুটার।

হিমাংশু আর সহ্য করতে পারছে না। ঘিনঘিনে গন্ধটা তার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে গেছে। এমন কি বুঝি রক্ততেও মিশে গেছে।

মণিবন্ধের একটি শিরায় ক্ষুরটা জোর করে চেপে ধরল হিমাংশু। তারপর ছোট্ট একটু টান। ছত্রিশ বছরের অমিত তাপে তপ্ত একটি যৌবনের উষ্ণ শোণিত ফিনকি দিয়ে ছুটে এল। আঃ, কি টনটনে আরাম! কি আরাম,

কি শান্তি ! যেন হু হু করে জ্বর ছেড়ে যাচ্ছে । আরো একটু দ্রুত মুক্তি চাই, দ্রুত । এবার ডান হাতের মণিবন্ধে গভীরভাবে ক্ষুরটা টেনে দেয় হিমাংশু ।

টুপ টুপ···জল কি পড়ছে নাকি ? সিরসির করছে নাকি গা ? ঘুম কি আসছে এতক্ষণে ? হয়ত কিছুই না, সব ভুল—সব ভুল । তবু এ আশ্চর্য আরাম । যেন অনেক কলুষ রক্ত বিশুদ্ধ হাওয়ায় এসে শুদ্ধ হচ্ছে, তারই আরাম ; একটা পুঁজ রক্ত ভরা ফোঁড়া থেকে আশ্চর্য যাদুবলে যেন সব কষ্ট কেউ শুষে নিচ্ছে, তারই স্বস্তি ।

আরো একটু আলো এসেছে না ঘরে ! হিমাংশু চমকে চায় । ইস্, এ যে অনেক রক্ত । কোথাও তো কালো রঙ নেই, সেই কুৎসিত কালো, যাতে পাপের বীজ লুকিয়ে থাকে ! নেই, নেই — ? হিমাংশু তবু খোঁজে, সতর্ক চোখে । যদিও কেমন যেন আচ্ছন্নতা আসছে । এবং কান্নাও ।

তবে কি নিষ্ঠুর সত্যটাও ফাঁকি দিয়ে গেল ? হিমাংশুর দুর্বল শরীরটা আর একবার যেন মরিয়া হয়ে ওঠে । আর এবার ক্ষুরের আগা দিয়ে শিথিল, কম্পিত, স্খলিত হাতে গলার একটা শিরায় টান দেয় ।

ধীরে ধীরে এতক্ষণে গভীর তন্দ্রা নেমেছে হিমাংশুর মনে, একটা অব্যক্ত যন্ত্রণাও ছড়িয়ে পড়েছে, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, তৃষ্ণাটা তালুর কাছে এসে ঠেলে ওঠে ।

বেসিনের কাছে হাত বাড়াবার চেষ্টা করে হিমাংশু, পারে না । মাথা ঢুলে আসে, মেঝেতেই লুটিয়ে পড়ে ।

অব্যক্ত একটা যন্ত্রণা পুরু ভারী লেপের মতন পা-মাথা সব ঢেকে ফেলেছে । বুক চুইয়ে যেন একটি প্রশ্বাস আসে, একটি নিশ্বাস যায় । অদ্ভুত একটা আবেগ গলার কাছে পুঁটলির মত পাকিয়ে গেছে ।—আর ঘুম —গভীর, গভীরতর আচ্ছন্নতা । এই আচ্ছন্নতার মধ্যেই আকাশ যেন দেখতে পেল হিমাংশু, খানিকটা আকাশ এবং ক্রিমসন রঙের একটি মেঘ ।—মেঘ—মেঘ । না মেঘ নয় ; মেয়ে । হিমাংশুর মেয়ে, যার নাম পুতুল, বয়স পনরো বছর নয়, পনরো দিন । অসহায়, উলঙ্গ, নির্বোধ একটি রক্তপিণ্ড । কে ? মেয়ে ।·· পনরোটি পাপড়ি যেন আরো খুলে যায়, একে একে একটি একটি করে—আর এক একটি পাপড়িতে একটি করে বছর বিকশিত হয়ে ওঠে । পুতুল শুধু তিলে তিলে গড়ে উঠছে—হিমাংশুর হাতে হাতে । কল্পনায়, বাস্তবে । যা শুধু শীর্ণ শাখা, তাকে শাখায় শাখায় প্রসারিত করে, পত্রপল্লবে সাজিয়ে, পুষ্পসম্ভারে ছেয়ে দিতে—হিমাংশু তার জীবনের সমস্ত সুষমা,

প্রেম, স্নেহ অকৃপণভাবে ব্যয় করে চলেছে। কেন? এ কে? তার মেয়ে? এ কি ভিন্ন? হ্যাঁ, দেহ থেকে ভিন্ন। কিন্তু তবু ভিন্ন নয়, রক্তের সেই আশ্চর্য লীলার কাছে ওরা এক, সেই আত্মায় ওরা অভিন্ন। ওর আত্মায় এর জন্ম, এর জীবন, এর লীলা। আর হিমাংশু জানে এই অভিন্নতাকেও একদিন ভিন্ন করতে হবে, এই আত্মাকেও। কী নিষ্ঠুর! গ্রন্থিমোচনের আশঙ্কায় হিমাংশু ভয় পায়। ভয় পায় কেন? পাবে না—? পাবে বইকি, কারণ পুতুলও শেষে একদিন যূথিকা হয়েই সংসারে ফুটে উঠবে—ষোল বছরে যার জীবন যৌবন, প্রেম, উদ্দীপনা, আনন্দ—সব অন্ধকার করে নেমে আসবে একটি চিরাচরিত অভ্যাস—যা কুটিল, জটিল, সতত সন্ত্রস্ত। আর তখন? তখন হিমাংশু শূন্য; যেমন আজ, জীবনের সেই ছেলেবেলার সুখ, স্বপ্ন, মুক্তি সমস্ত থেকে সে শূন্য—যেমন বিতাড়িত যূথিকার উত্তপ্ত অনুরাগ থেকে।···হিমাংশুর হৃৎপিণ্ডে এতক্ষণে একটা সাহস এল, ভাসমান মনে একটি আশ্রয়। না, তবে এই ত কারণ, যা পনরো বছরের পুতুলকে ছোট দেখেছে, ছোটই ভেবেছে। প্রার্থনা করেছে নিঃশব্দে, নিত্যদিন: পুতুল, আমার পুতুল, আমার কাছে ছোটটি থাক চিরকাল—ঈশ্বর, তুমি ওর যৌবন দিয়ো না, প্রজাপতির রঙ ছুঁড়ো না ওর মনে। ও যে আমার সেই ছেলেবেলা, আমার সেই সুখ, সেই মন আর আনন্দ। সেই আত্মা, একটি শুধু অক্ষয় স্মৃতি। পনরো বছরের যূথিকাকে নিয়ে আমি যা হারিয়েছি, যূথিকা যা হারিয়েছে, তার স্পর্শ কেন দেবে নিষ্ঠুরের মতন ওকেও?

হিমাংশু শেষ ঘুমের ঢেউয়ে ভেসে যাবার আগে চেষ্টা করল উঠে দাঁড়াবার, বাথরুমের দরজা ভেঙে ছুটে গিয়ে পুতুলকে বুকে জড়িয়ে ধরবার। কিন্তু তাই কি সে পারে? পারে না—। মন দিয়ে স্মৃতিকে জীবন্ত করা যায়, আত্মাকেও, কিন্তু দেহকে?

হিমাংশু একবার চোখের পাতা খুলেছিল একটু, আর সেই একটু জুড়ে বাইরের ফরসার মধ্যে একটি বিনুনি ঝোলানো ক্রিমসন রঙের মুখ ছিল, একটি মুখ, যা হিমাংশুর আত্মার। যে-ছবি ও নিজেই দেখেছে, আর কেউ নয়। কেউ না।

আমি, আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া

রমাপদ চৌধুরী

আমার একেবারেই ইচ্ছে ছিলো না। বড় জা জোর করে ঠেলে পাঠালো। বললে, 'নতুন, অত লজ্জা দেখাসনি ঐ লজ্জা করে করেই আমরা সব হারিয়েছি, এখন তোদের দেখলে শুধু হিংসেয় জবলে-পুরে মরি।' বড় জা আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। তাই বিয়ের পর যেদিন প্রথম আলাপ হলো, আমি বয়সের এবং সম্পর্কের মান রাখবার জন্য প্রণাম করলাম, সেদিন থেকেই বড় জা আমাকে 'তুই' বলতে শুরু করেছিলো। আর যেহেতু আমি ওর ছোট দেওরের বউ অর্থাৎ বাড়ির একেবারে আনকোরা নতুন বউ, সেই হেতু আমার নাম হলো, 'নতুন'। তা বড় জা বললে, 'দেখ্ নতুন, যা কিছু ফুর্তিটুর্তি এখন করে নে, এর পর তো সারাটা জীবন আমাদের মতো হাঁড়ি ঠেলতে হবে।' আমার তখন সবে বিয়ে হয়েছে, অনভ্যাসের ঘোমটা টানতেও কেমন হাসি হাসি পায়। তাই বড় জা-র খোলাখুলি কথাগুলো শুনে কেমন লজ্জা-লজ্জা করতো। কিন্তু বড় জা দমবার পাত্র নয়। তার দেওরটিকে বললে, 'ছোট্ ঠাকুরপো, নতুনকে নিয়ে পুরী কি দার্জিলিঙ কোথাও বেড়িয়ে এসো দিন কয়েকের জন্যে। ওই যে হনিমুন না কি বলে, আমরা কি ছাই জানি আজকালকার রীতিনীতি।' তা শুনে এমনভাবে হাসলো গৌতম, তাকালো আমার দিকে যে, বেশ বুঝতে পারলাম অমন একটা ইচ্ছে ওরও যে না হচ্ছে তা নয়। গৌতমের গোপন ইচ্ছেটা বুঝতে পেরে—না, আজকালকার মেয়েদের মতো ওকে নাম ধরে ডাকতে আমি পারি না, পুরোনো দিনের বউদের মতোই আড়েঠারে বুঝিয়ে দিই, তবু সত্যি কথা বলতে কি, মনে মনে ওর নাম ধরে ডাকতে, নামটা মুখের মধ্যে লোফালুফি করতে বেশ লাগতো। কিন্তু বড় জা-র সামনে তো আর নাম বলতে পারি না, তাই বললাম, 'ওর ইচ্ছে হয় যাক্ আমি যাবো না।' বড় জা রাগ দেখিয়ে বললে, 'ওরে আমার

লজ্জাবতী লতা, যাবার ইচ্ছে নেই। যা বলছি শোন নতুন, দুটিতে দিন কয়েক কোথাও গিয়ে···'

ঠেলেঠুলেই একরকম পাঠিয়ে দিলে। আমি আর গৌতম এসে উঠলাম পুরীর একটা হোটেলে। একেবারে সমুদ্রের গা ঘেঁষে। সমুদ্র আমি আগে তো কখনো দেখিনি। দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। অভিভূত হয়ে গেলাম। সমুদ্র এত সুন্দর! সমুদ্র এমন বিশাল! মনে হলো, কোথায় ছিলাম আমি এতদিন! এমন একটা রূপের পৃথিবী আছে আমি জানতামই না! আমার বুকের মধ্যেও যেন খুশির ঢেউগুলো গুরগুর করতে করতে ফুর্তিতে ফেটে পড়তে লাগলো। ছেলেমানুষের মতো আমার নাচতে, গাইতে, ছুটে যেতে ইচ্ছে হলো ঢেউগুলোর কাছে। কিন্তু তা না করে আমি গৌতমের উপর খুশী হয়ে উঠলাম, ঠায় ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি-মিষ্টি হাসি হাসতে লাগলাম। আর ওর সুন্দর চোখ জোড়ার দিকে, চোখের তারা দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার কেমন ভাবতে ভালো লাগলো, ওর চোখ দুটো যেন সমুদ্রের মতো নীল, সমুদ্রের মতো গভীর, সমুদ্রের মতো বিশাল। আনন্দে আহ্লাদে ওর চোখের দুটি সমুদ্রে ডুবে যেতে ইচ্ছে হলো, হারিয়ে যেতে ইচ্ছে হলো।

ও বললে, 'কি দেখছো অমন করে?' ওর বোধ হয় একটু অস্বস্তি লাগছিলো। লাগবারই কথা! কেউ একজন হাতে চিবুক রেখে ঠায় মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে অস্বস্তি লাগবে না?

কিন্তু আমি কি করবো। আমাকে তখন দুষ্টুমিতে পেয়েছে। বললাম, 'সমুন্দুর দেখছি।'

ও কেমন অপ্রতিভ হলো, হাসলো। বললে, 'আমি কি সমুদ্র নাকি?'

আমি আরো দুষ্টুমি করে সুর দিয়ে গেয়ে উঠলাম, 'তুমি হও গহীন গাঙ, আমি ডুইব্যা মরি!'

ও তিনটে আঙুলের হালকা থাপ্পড় দিলে আমার গালে। আমি খিলখিল করে হেসে উঠেই ছুটে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। বালির ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে গিয়ে দাঁড়ালাম একেবারে সমুদ্রের ধারে, বালির ওপর যেখানটাতে ঢেউগুলো ফেটে ফেটে ফেনা হয়ে পড়ছে, সেখানে।

না, ঠিক অত দূর নয়। ঢেউয়ের অত কাছে যেতে আমার কেমন ভয়-ভয় করলো। আমি তো তার আগে সমুদ্র দেখিনি। তাই অমন সুন্দর ঢেউগুলোকে যেমন ভালোও লাগলো, তেমনি কাছে যেতেও কেমন একটা আতঙ্ক বোধ করলাম। অচেনা মানুষের কাছে যেতে হলে যেমন ভয়-ভয়

করে, তেমনি। ঠিক কেমন, বলবো? ফুলশয্যার রাতটার মতো। ভালোও লাগছে, মনের মধ্যে বেশ একটা খুশির গুনগুন, আবার অচেনা মানুষ গৌতমের এত কাছে যেতে হবে ভেবে কেমন এক ভয়-ভয় ভাব।

হঠাৎ চমকে উঠে ফিরে তাকিয়ে দেখি কি গৌতমও এসে দাঁড়িয়েছে একেবারে আমার পাশটিতে, গা ঘেঁষে। আর আমারই মতো তাকিয়ে আছে সমুদ্রের দিকে।

ছোট ছোট এক-একটা দল পাড় ঘেঁষে হেঁটে যাচ্ছিলো। মেয়ে পুরুষ, ছোট ছোট বাচ্চা ছেলেমেয়ে। যেই ঢেউ এসে পড়ছে, দু-একজন ছুটে যাচ্ছে সাদা ফেনায় পা ডোবাতে। ওদিকে জেলেদের ডিঙির সারি পড়ে আছে বালির ওপর, আর বালির ওপর বসে বসে বড় বড় জালগুলো মেরামত করছে জেলেরা।

—এই, ওরা কি কুড়োচ্ছে, কি? আমি জিগ্যেস করলাম।

ও বললে, ঝিনুক।

ও মা, তাই নাকি! আমিও ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম, ছোট বড় নানারকমের, সাদা আর রঙিন ঝিনুকের রাশি এসে পড়ছে ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে। ঢেউ সরে গেলেই সেগুলো চিকচিক করছে বালির ওপর। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দেখলাম। কুড়োতে কেমন লজ্জা হলো। আমার বয়েসী অনেক মেয়েই ঝিনুক কুড়োতে কুড়োতে এগিয়ে যাচ্ছিলো। আমি কেমন লজ্জা পাচ্ছিলাম। কারণ যারা সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলো, তারা ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিলো আমার দিকে। মেয়েরাও। আমি দেখতে খুব সুন্দর, আমার চোখ দুটো টানা-টানা, আমার ঘাড়টা কি চমৎকার, আমার ফরসা সুডোল হাত দেখলে নাকি হাত বোলাতে ইচ্ছে করে, এমনি সব কথা বলে ইস্কুলের বন্ধুরাও আমাকে খেপাতো, কলেজের মেয়েরা প্রশংসা করতো। কিন্তু সমুদ্রের পাড় দিয়ে যেতে যেতে ওরা যখন বারবার ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিলো, তখন বেশ বুঝতে পারছিলাম রূপ দেখছিলো না ওরা। বয়স-হওয়া দুটি মহিলার হাসি দেখেই বুঝলাম ব্যাপারটা। আসলে ওরা বুঝতে পারছিলো আমাদের সবে বিয়ে হয়েছে। ও ঠিক বোঝা যায়, আমি নিজেও তো কত মেয়েকে দেখেই ধরে ফেলতাম। বিয়ের পর চেহারাটাই কেমন অন্যরকম লাগে। তা ছাড়া সিঁথিতে সিঁদুরও বোধ হয় একটু বেশী দিয়ে ফেলতাম তখন। একটু বেশী দূর অবধি।

ওরা তাকাচ্ছিলো বলে লজ্জা নয়, সবে বিয়ে হয়েছে বলে লজ্জা নয়, বরং মজাই লাগছিলো। তবে লজ্জা হচ্ছিলো ঝিনুক কুড়োতে, ওদের সামনে

ওদের মতো ঝিনুক কুড়োতে। কিন্তু সে আর কতক্ষণ। এক সময় দেখলাম নিজেরই অজান্তে কখন হাসতে হাসতে আমিও ঝিনুক কুড়োতে শুরু করেছি, ঢেউয়ের ফেনায় পা ডুবিয়ে হাঁটছি। আর ঢেউ লেগে কাপড় ভিজে যাবে বলে কাপড়টা এক বিঘত তুলে ধরেছি। লজ্জা দূর হয়ে গেছে, ভয় ভেঙে গেছে তখন।

হাঁটতে হাঁটতে একটু অনুভবেই বুঝতে পারছিলাম যে, গৌতম পিছন পিছন আসতে আসতে আমার ফরসা পা—পায়ের উন্মুক্ত অংশটুকুর দিকে তাকাচ্ছে।

এক বিঘত পা উন্মুক্ত করে হাঁটা এক জিনিস, আর সমুদ্রে স্নান করা অন্য। স্বামী বলেই তো বেশী অস্বস্তি। তা ছাড়া অত লোকের সামনে! না বাবা, আমি সমুদ্রে স্নান করবো না।

পরের দিন সকাল থেকেই নুলিয়াটা পিছনে লাগলো।—সমুন্দরে নাহাবে না দিদি?

ও বলে উঠলো, না, না, নুলিয়া লাগবে না। আমি কি নতুন নাকি এখানে! আরো কতবার এসেছি।

সত্যি, গৌতমের ওপর এত হিংসে হচ্ছিলো। ও কতবার এসেছে, অথচ আমি কিনা এই প্রথম! এমন চমৎকার জায়গা ছেড়ে কোথায় ছিলাম এতদিন? যাক, এসেছি যখন চোখ ভরে দেখে নিই, প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিই।

যেখানটায় সকলে স্নান করছিলো সেইখানটায় এসে বালির ওপর বসলাম দুজনে। স্নান করতে করতে সবাই হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। ঢেউ লেগে বালিতে লুটোপুটি খাচ্ছে মেয়েরা, দু-একজন পুরুষ ঢেউয়ের মাথায় লাফাতে লাফাতে অনেক অনেক দূর অবধি চলে যাচ্ছে। আর তারও ওদিকে, অনেক দূরের অথই জলে কালো-কালো ক্ষুদে-ক্ষুদে কয়েকটা ডিঙিতে করে মাছ ধরছে নুলিয়ারা। পাড় থেকে কেউ বা ডিঙি ভাসাবার চেষ্টা করছে, বারবার ফিরে আসছে ঢেউ লেগে।

ও বললে, কি, সমুদ্রে স্নান করবে না?

আমি আতঙ্কে হাত নেড়ে বলে উঠলাম, না বাবা, অত শখ নেই আমার।

—আরে দূর, ভয়ের কিছু নেই। আমি নিয়ে যাবো তোমাকে, দেখো। গৌতম বললে—এমনভাবে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, যেন উনিও একজন নুলিয়া, সমুদ্রের সঙ্গে এত চেনা-শোনা।

আমি মনে মনে বললাম, তোমাকেও আমি নুলিয়া না নিয়ে একা নামতে দেবো কিনা। বিয়ের পর বউয়ের কাছে সবাই অমন শিভালরি দেখাতে চায় গৌতমবাবু, আমি তা জানি।

মনে মনে এ কথা ভাবতে ভাবতে আমি হঠাৎ ঠাট্টার সুরে ডাকলাম, ও গৌতমবাবু!

ও ফিরে তাকালো।

বললাম, কি দেখছেন স্যার?

--সমুদ্র।

বললাম, উঁহু। আমি জানি।

—কি?

হেসে উঠে বললাম, বলবো না।

সত্যি, মেয়েরা যে কি করে স্নান করছিলো আমার নিজেরই অবাক লাগছিলো। কখনো বালিতে গড়িয়ে পড়ছে, কাউকে স্রোতের টানে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কারো কাপড়চোপড়—

একজনের অবস্থা দেখে তো আমি আর গৌতম হেসে লুটিয়ে পড়লাম। বেচারা শাড়িখানা হাতে নিয়েই টুপ করে বসে পড়লো গলা অবধি জলে ডুবিয়ে। কি করবে, জলের তোড়ে লাজলজ্জা রাখা দায়। আর কাপড়-জামা নামেই আছে, জলে ভিজে এমন অবস্থা, শরীরের কিছুই চাপা-ঢাকা থাকে না। পুরুষগুলোও কেমন ক্যাটক্যাট করে তাকিয়ে আছে দেখো।

আমি ইয়ারকির ছলে গৌতমের চোখের দিকে তাকালাম। -এই। কি দেখছো মশাই অমন ড্যাবড্যাব করে?

ও হাসলো। আর আমি ভাবলাম ওদের মতো ওভাবে সমুদ্রের জলে নামতে পারবো না আমি এত লোকের সামনে। গৌতমের সামনে।

কিন্তু ইচ্ছেও যে না হচ্ছিলো তা নয়। এক একবার ভাবছিলাম, মন্দ হয় না। বেশ তো জলে লুটোপুটি খাওয়া যায়। বিয়ের আগে এই তো সেদিনও ঝমঝম বৃষ্টি পড়ছে, আমরা দু বোন ছাদে গিয়ে ভিজলাম। তবে হ্যাঁ, নুলিয়া না নিয়ে নামতে পারবো না। ওদের মতো নুলিয়াটাকে হাত ধরতে দেবো না অবশ্য। মেয়েগুলো অমনভাবে নুলিয়াদের হাত ধরেই বা যাচ্ছে কেন ঢেউ কেটে কেটে! টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যাবে, ভেসে যাবে, এই ভয়ে? তা একটু দূরেই নয় থাকবে নুলিয়াটা। না, এত দূর এসে সমুদ্রে স্নান না করে গেলে মনে খুঁতখুঁতুনি থেকে যাবে। বড় জা হয়তো জিগ্যেস করবে, হ্যাঁ রে নতুন, সমুদ্রে নেয়েছিস তো রোজ? তারপরও

অবশ্য ইয়ারকি-ঠাট্টা করবে তা জানি। বড় জা অবশ্য বলেছিলো, আগে নাকি এসেছিলো একবার রথের সময়। ননদরাও। এবার ওরা যদি সবাই আসতো ভালো হতো। সবাই মিলে সমুদ্রে স্নান করা যেতো। বড় জা বেশ ভালো মানুষ। সত্যি, আমি কত সুখী, কত সুখী। কারো জীবনে যে এত সুখ থাকে বিয়ের আগে কল্পনাও করতে পারিনি।

গৌতম হঠাৎ হেসে উঠলো হো-হো করে। তন্ময়তা ভেঙে গেল। সামনে তাকাতেই আমিও হেসে উঠলাম। ভীষণ মোটা একটা লোক সমুদ্রে নামছিলো, প্রথম ঢেউ লেগেই কাত। ফুটবলের মতো গড়াতে গড়াতে ফিরে এলো বালির ওপর হুমড়ি খেয়ে।

আরে, এর মধ্যে এত চড়া রোদ উঠে গেছে? বালি তেতে উঠেছে।

—কি, নামবে না? গৌতম জিগ্যেস করলো।

আমি সায়ও দিলাম না, অমতও করলাম না। ভেতরে ভেতরে যে একটু ইচ্ছে না হচ্ছিলো তা নয়। গৌতম বললে, চলো, তা হলে তেল তোয়ালে নিয়ে আসি, কাপড়টা বদলে আসি।

উঠে পড়লাম। হোটেলের নুলিয়াটা আবার সেলাম করলে।—নাহাতে যাবে না দিদি?

বললাম, যাবো, দাঁড়াও।

গৌতম বলে উঠলো, না না, নুলিয়া লাগবে না। আমি একাই পারবো তোমাকে সামলাতে।

আমার অবশ্য নিজের জন্যে তত ভয় হচ্ছিলো না, ভয় হচ্ছিলো ওর জন্যেই। বললাম, থাক না একজন সঙ্গে। সবাই তো নুলিয়া নিয়েই নামছে।

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলো গৌতম, আমার কথাটাকে কোনো আমলই দিলো না। হেসে বললে, তুমি দেখছি সাজুন্তির চেয়েও ভীতু!

আমি কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম, থেমে গেলাম। কারণ আমাদের দোতলার ঘরটির পাশের সিঁড়ি বেয়ে তেতলার সেই বউটি, যার সাজগোজের ঘটা দেখে আমরা 'সাজুন্তি' নাম দিয়েছিলাম, তাকে নেমে আসতে দেখলাম। পিছনে তার স্বামী।

চোখাচোখি হতেই বউটি হেসে বললে, যাবেন না সমুদ্রে স্নান করতে?

কি আশ্চর্য, ওই বউটা—যে কাপড় ভিজে যাবে এই ভয়ে ঝিনুক কুড়োবার সময়েও ঢেউয়ের কাছে যেতো না, সেও চলেছে সমুদ্রে স্নান করতে? একটা সাদাসিধে শাড়ি পরেছে, গোলাপী রঙের টার্কিশ তোয়ালেটা বাঁ কাঁধ থেকে

ডান কাঁধ অবধি ছড়িয়ে দিয়েছে সুছন্দ বুকের ওপর দিয়ে, এক রাশ ফাঁপানো চুলে ঢেকে গেছে সারা পিঠ।

নিজের অজ্ঞাতেই আমি গৌতমের দিকে তাকালাম। চোখ সরিয়ে নিজে ও, আর বউটির প্রশ্নের জবাবে, হেসে বললে, তখন থেকে তো ভয় ভাঙাবার চেষ্টা করছি।

আমি হাসলাম বটে, কিন্তু মনে মনে চটে গেলাম গৌতমের ওপর। আমি সমুদ্রকে ভয় পাই এ কথাটা বউটিকে না শোনালেই কি চলতো না? আর গৌতম বউটির দিকে অমন মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিলোই বা কেন? না-হয় আমার চেয়ে একটু সাজগোজ বেশীই করে, দেখতে কি আমার চেয়ে সুন্দর?

বউটি এবং তার স্বামী হাসতে হাসতে নেমে গেল। আমি চুল খুলে কাপড় বদলে নেমে পড়লাম একটাও কথা না বলে। গৌতম পিছনে পিছনে:

নুলিয়াটা আবার ধরলো বেরুবার মুখে।

গৌতম বললে, না, না, লাগবে না।

আসলে ওর মনে প্রথম থেকেই একটা বাহাদুরি দেখাবার নেশা ঢুকেছিলো বেশ বুঝতে পেরেছিলাম। ও যেন সব জানে, সব বোঝে, সব পারে। প্রথম প্রথম ওর এই ভাবটা আমার বেশ ভালোই লাগছিলো। বেশ একটা নির্ভর করবার মতো মানুষ যেন। কিন্তু যেখানে সত্যিই ভয় আছে সেখানে এই বাহাদুরির কি দরকার। দু আনা পয়সা তো, তার বেশী আশাও করে না নুলিয়াটা। কিন্তু পয়সার জন্যে তো নয়, বরং পয়সা খরচ করতে পেলেই যেন খুশী হয় গৌতম। আসলে ওই অকারণ টাকা খরচ করার মধ্যেও যেন কি একটা বাহাদুরি লুকিয়ে আছে। বেশ বুঝতে পারতাম, ও যেন আমার চোখে—তার নবপরিণীতা স্ত্রীর চোখে নিজেকে বড় করে তোলবার ফিকির খুঁজছে। কখনো অপ্রয়োজনে টাকা খরচ করে, কখনো সমুদ্রকে তুচ্ছ করে, কখনো বা হোটেলের ঠাকুর-চাকরকে ধমক দিয়েও বোধ হয় আমার কাছে ওর মূল্য বাড়াবার চেষ্টা করছিলো।

নুলিয়াটা কিন্তু নাছোড়বান্দা। ফিরে তাকিয়ে দেখলাম সে এসে দাঁড়িয়ে আছে একটু দূরে।

গৌতম যখন ওকে তুচ্ছ করে আমার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যেতে গেল, নুলিয়াটা তখন শুধু বললে, কারেন্ট আছে বাবু।

কিন্তু কে শোনে তার কথা। গৌতম টানতে টানতে আমাকে তখন জলে নামিয়ে নিয়ে গেছে। ওর হাত ধরে ধরেই ঢেউয়ের ঘা খেতে খেতে ভয়ে

ভয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কিছুটা গিয়ে আর সাহস হলো না। ও যত এগিয়ে যেতে চায় আমি তত বাধা দিই। শেষে হাল ছেড়ে দিলে ও, বললে, বেশ, তবে তুমি উঠে যাও, আমি একটু পরে উঠবো।

তখন ওর কথা আর কে ভাবে, নিজে পালিয়ে বাঁচতে পারলে হয়।

পাড়ে উঠে এসে চীৎকার করে বললাম, এই! বেশী দূরে যেয়ো না।

কিন্তু বললেই কি আর শোনে। ঐ যে বললাম, ওর মনে তখন বাহাদুরি দেখানোর নেশা ঢুকেছে। বিয়ের পর তখন একটা মাসও কাটেনি, এ সময়ে নতুন বউটির চোখে নিজেকে নেপোলিয়ান বানানোর ইচ্ছা কোন স্বামীর না হয়। ও তাই আমার কথায় কান দিলো না।

আমার অবশ্য যেমন ভয়ও করছিলো, তেমনি ভালোও লাগছিলো। সাজুন্তি ইতিমধ্যে স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে এসে দাঁড়িয়েছে আমার পাশে, আর তার স্বামীটি স্নান করছে তখনো, কিন্তু নুলিয়ার হাত ধরে। তাকে দেখে আমি হেসেই ফেললাম। মেয়েমানুষেরও অধম, কি ভীতু রে বাবা ভদ্রলোকটা। মনে মনে ভয় পেলে কি হবে, গর্বও হচ্ছিলো গৌতমের জন্যে; ও একা-একাই কত দূর এগিয়ে যাচ্ছে দেখো!

একটার পর একটা ঢেউয়ের মাথায় লাফ দিয়ে, কখনো ঢেউ ভেঙে পড়ার মুহূর্তে টুপ করে ডুব দিয়ে ও তখন অনেক দূরে চলে গেছে। আমি চীৎকার করে ডাকলাম একবার, বোধ হয় শুনতে পেলো না।

এ কি, এত দূরে চলে যাচ্ছে কেন ও? এত দূর চলে গেছে তখন গৌতম, যেখানে আশেপাশে আর একটিও লোক নেই।

সাজুন্তির স্বামী ততক্ষণে উঠে এসেছেন, আর বউটি গৌতমের দিকে আঙুল দেখিয়ে তার স্বামীকে বললে, দেখো, দেখো, উনি কত দূর গেছেন।

বউটির চোখের দৃষ্টিতে, গলার সুরে সপ্রশংস ভাবটুকু দেখে গর্বে বুক ফুলে উঠলো আমার। সত্যি, গৌতম যেন মুহূর্তের জন্যে নেপোলিয়ানের মতো বীর হয়ে উঠলো আমার চোখে।

কিন্তু সাজুন্তি আর তার স্বামী হোটেলের দিকে চলে যেতেই আমার বুকের ওপর একটা আতঙ্কের পাথর চেপে বসলো।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই আমার মনে হলো, গৌতম যেন নিজে ইচ্ছে করে এগিয়ে যাচ্ছে না, গৌতম বুঝি বা স্রোতের টানে তাল রাখতে না পেরে ভেসে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তাই। হাত তুলে বারবার যেন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে। যেন হাত তুলে চীৎকার করে বলছে, আমাকে বাঁচাও।

অত দূর থেকে তার চীৎকার এসে পৌঁছানোর কথা নয়। কিন্তু সমস্ত

শরীর যেন মুহূর্তে থরথর করে কেঁপে উঠলো আতঙ্কে, ভয়ে। মনে হলো, গৌতম ভেসে যাচ্ছে, স্থির মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

বিভ্রান্তের মতো আমি এদিক-ওদিক তাকালাম, কি করবো ঠিক করে উঠতে পারলাম না, নুলিয়াটাকে খুঁজলাম।

লোকটা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে তখনো। অন্যমনস্কভাবে কি যেন দেখছে।

সমস্ত শরীর শিউরে উঠলো আমার, চোখ ঠেলে কান্না এলো। পাগলের মতো হয়ে গেলাম আমি। ছুটে গেলাম নুলিয়াটার কাছে। তারপর মুহূর্তের মধ্যে আমার দু হাতের দুটো বালা খুলে তার হাতে গুঁজে দিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে অনুরোধ করলাম, ওকে বাঁচাও তুমি, বাঁচাও। ঐ দেখো ভেসে যাচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে ·····

ঠিক কি বলেছিলাম, কিভাবে বলেছিলাম, নিজেও জানি না। সেই মুহূর্তে আমার মাথার ঠিক ছিলো না।

কিন্তু নুলিয়াটার মাথার ঠিক ছিলো। সে বালা দুটো আমার হাতেই গুঁজে দিয়ে একবার তাকালো গৌতমের দিকে। বিড়বিড় করে কি যেন বললে, তারপর সমুদ্রের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

উঃ, সে যে কি উৎকণ্ঠায় এক ঘণ্টা কেটেছে, আজ ভাবলেও সারা শরীর ঘামে ভিজে যায়, ঘুম আসে না কোনো কোনো দিন।

নুলিয়াটা' একটু একটু করে এগিয়ে চলেছে, একটার পর একটা ঢেউ পার হচ্ছে, আর আমার মনে হচ্ছে যেন কত সময় পার হয়ে যাচ্ছে। বালির ওপর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি নিষ্ফল ছোটাছুটি, নিজেরই অজ্ঞাতে কখন আমিও জলের কাছে এগিয়ে এসেছি···

একটার পর একটা ঢেউ পার হচ্ছে নুলিয়াটা, আর আমার মন বলছে, পারবে না, পৌঁছতে পারবে না নুলিয়াটা, গৌতমকে বাঁচানো যাবে না।

এক নিমেষের জন্যে গৌতমের শরীরের কালো বিন্দুটুকু একটা মাতাল ঢেউয়ের মাথায় উঠেই অদৃশ্য হয়ে গেল। আর আমার পা দুটো থরথর করে কেঁপে উঠলো, মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠলো, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হলো, চোখের দৃষ্টি হঠাৎ ঝাপসা হতে হতে সামনের সব কিছু অন্ধকার হয়ে গেল, সমুদ্রের গর্জন আর স্নানার্থীদের চীৎকার কোলাহল একটু একটু করে স্তব্ধ হয়ে গেল···আমি কি অন্ধ হয়ে যাচ্ছি, আমি কি কানে শুনতে পাবো না আর ?···বীভৎস একটা আতঙ্কে চীৎকার করে কেঁদে উঠতে চেষ্টা করলাম আমি, তারপর বোধ হয় বসে পড়লাম বালির ওপর, কিংবা পড়ে গেলাম কিংবা···

কি যে হয়েছিলো আমি জানি না।

একটু একটু করে যখন জ্ঞান ফিরে এলো, দেখলাম একরাশ লোক আমাকে ঘিরে আছে। মুখের সামনে ঝুঁকে পড়ে অচেনা এক ভদ্রমহিলা বাতাস করছেন আমাকে, আর নুলিয়াটা চোখের পাতা খুলতে দেখে একমুখ হাসি নিয়ে বলছে, বাবুকে জান বাঁচায়ে দিয়েছি দিদি, বাবু বাঁচ গেছে।

ধীরে ধীরে আমি উঠে বসলাম। দেখলাম, পাশে বসে ক্লান্তিতে অবসন্নতায় গৌতম তখনও ধুঁকছে।

ক্লান্ত অবসন্ন শরীর টানতে টানতে, নুলিয়াটার কাঁধে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে হোটেলে ফিরে এলাম। ফিরে এসে বিছানায় লুটিয়ে পড়লাম। ঘুম, ঘুম, পরম তৃপ্তির ঘুম।

বিকেলের দিকে যখন হোটেলের সামনের বারান্দাটায় দুখানা চেয়ার টেনে নিয়ে এসে আমরা বসলাম, তখন আমার শরীরের ক্লান্তি দূর হয়েছে, কিন্তু গৌতমের সারা দেহে তখনো ব্যথা, অসহ্য ব্যথা। দৈত্যের মতো শক্তিশালী অবিশ্রান্ত ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে পরাজিত সৈনিকের মতো ক্লান্ত আর লজ্জিত সে। মুখ তুলে তাকাতেও লজ্জা।

ইতিমধ্যে গুজবটা রটে গিয়েছিলো সারা হোটেলে। সকলেই একবার করে এসে সমবেদনা জানিয়ে যাচ্ছিলো, খোঁজ নিয়ে যাচ্ছিলো গৌতম কেমন আছে, আর লজ্জায় অস্বস্তিতে আমি মাটিতে মিশে যেতে চাইছিলাম। মনে হচ্ছিলো, এই সমুদ্র ছেড়ে, এই হোটেল ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারলে যেন বাঁচি

একসময় সাজন্তি আর তার স্বামী এসে দাঁড়ালো পিছনে।—কেমন আছেন?

গৌতম অপ্রতিভ হাসি হেসে তাকালো, বললে, ভালো। তারপর মাথা নিচু করলে।

আর ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে আমার মনে পড়ে গেল তাঁকে নুলিয়ার হাত ধরে স্নান করতে দেখে আমরা হেসেছিলাম। পাশাপাশি দুজনকে তুলনা করে গৌতমের দুঃসাহসের জন্যে গর্ববোধ করেছিলাম।

ওরা চলে গেল। আমাদের চোখের সামনে দিয়েই সমুদ্রের পাড়ে গিয়ে দাঁড়ালো।

আর তখনই চোখাচোখি হলো নুলিয়াটার সঙ্গে। সামনের রাস্তাটা দিয়ে যেতে যেতে সে ফিরে তাকালো আমার দিকে, হাসলো, সেলাম করলো। তারপর চলে গেল নিজের কাজে। আর আমার সমস্ত মন কৃতজ্ঞতায় নুয়ে

পড়লো। ও না থাকলে আজ কি যে হতো। গৌতম বাঁচতো না, আমি বাঁচতাম না। হ্যাঁ, মৃত্যুই তো বলব তাকে। বিয়ের পর একটা মাসও যেতে না-যেতে যদি আমার বাইশ বছরের যৌবন থমকে থেমে যেতো তা হলে তাকে মৃত্যু ছাড়া আর কি বলবো!

নিজেরই অজান্তে কখন যে হাতের তিন ভরি সোনার বালা দুটোয় হাত দিয়েছি টের পাইনি।

সচেতন হতেই একটা খুশির দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। ভাবলাম, লোকটাকে এখনই ডেকে বালা দুটো দিয়ে দিলে হতো। ও আমার জন্যে যা করেছে, যা দিয়েছে, তার কাছে এটুকু দান কত তুচ্ছ!

কিন্তু লোকটা তখন অনেক দূর চলে গেছে। তাই ভাবলাম, থাক, এত তাড়া কিসের, লোকটা তো আর চলে যাচ্ছে না, কাল সকালে যখন আবার আসবে তখনই দিয়ে দেবো।

পরের দিন সকালে গৌতম আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলো। গত কালের সেই লজ্জা আর অস্বস্তি যেন ঝেড়ে ফেলেছে।

বললে, চলো, বেড়াতে যাবে না?

বললাম, চলো।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম সমুদ্রের পাড়ে, যেখানে অবিশ্রান্ত ঢেউ ফেটে পড়ছে তীরের ওপর, তা থেকে একটু দূরে। আগেকার মতো কাছে যেতে ইচ্ছে হলো না। না, ভয় নয়, কেমন একটা বিতৃষ্ণা।

হঠাৎ দেখলাম নুলিয়াটা আর এক জনের সঙ্গে কাঁধে একটা লাঠিতে বিরাট জাল ঝুলিয়ে যাচ্ছে আমাদের পাশ দিয়ে। চোখাচোখি হলো। ও হাসলো। আমিও।

ভাবলাম, এখনই দিয়ে দেবো বালা দুটো? কিন্তু এই বালা দুটো নিয়ে কিই বা করবে ও? ওর কাছে এ বালা দুটো যা, দুগাছি চুড়িও তাই। নিয়ে ওর বউকে পরতে দেবে হয়তো, বিক্রি তো করবে না। আর চুড়ি দুটোর দামই বা কম কি? দুটোয় এক ভরি সোনা তো আছেই। তা ছাড়া, কৃতজ্ঞতার দাম তো সোনা দিয়ে যাচাই হয় না। আর বালা দুটো ওকে দিয়ে দিলে মা বকবে না তো! বড় জা? বলবে হয়তো, 'দু দিনের জন্যে গেলি নতুন, গিয়েই বালা জোড়া খুইয়ে এলি?' বলবে নিশ্চয়ই কারণ বালার প্যাটার্ণটা বড় জা-র খুব পছন্দ হয়েছিলো। তার চেয়ে এক জোড়া চুড়িই বরং দেওয়া যাবে নুলিয়াটাকে, ওর বউকে পরাতে বলবো।

কিন্তু এ জায়গাটা ছেড়ে পালাতে না পারলে যেন শান্তি নেই। আমরা

দুজনে এই সমুদ্রের পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছি, অন্য সকলের মতো সমুদ্র দেখছি, কিংবা কিছুই দেখছি না। অথচ ঝিনুক কুড়োতে কুড়োতে যারাই যাচ্ছে ফিরে তাকাচ্ছে আমাদের দিকে, আমার দিকে। আর তাদের সেই তীব্র দৃষ্টিতে আমি যেন উপহাস দেখতে পেলাম। যেন সকলেই হাসছে আমাদের দেখে। যেন বলাবলি করছে, যেমন বীরত্ব দেখাতে গিয়েছিলো, উচিত শাস্তি হয়েছে।

সাজুন্তির চোখেও যেন এমনি এক উপহাস লুকিয়ে ছিলো। সেই দুটি টানা-টানা কৌতুকে চঞ্চল চোখ, যে চোখ প্রশংসায় বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে বলে উঠেছিলো, 'দেখো, দেখো, উনি কত দূর গেছেন।' সেই চোখ জোড়া এখন যেন উপহাসে তীক্ষ্ন।

আমি গৌতমকে বললাম, চলো, কাল সকালেই চলে যাই। আমার আর ভালো লাগছে না।

গৌতম সায় দিলো, তাই চলো।

কিন্তু যাওয়া হলো না। স্টেশন থেকে ফিরে এসে গৌতম বললে, বার্থ পাওয়া গেল না। তিন দিন পরে একটা ব্যবস্থা হবে।

পরের পরের দিন সকালে নিত্যদিনের মতোই সাজুন্তি আর তার স্বামী নেমে গেল আমার চোখের সামনে দিয়ে। তেমনি বুকের ওপর গোলাপী তোয়ালেটা বিছিয়ে, এক-পিঠ এলো চুলে একটা অকারণ ঝাঁকুনি দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে আমাদের ঘরের সামনে বউটি থমকে দাঁড়ালো, কিন্তু স্নান করতে যাবো কি না, সে প্রশ্ন না করেই নেমে গেল। অর্থাৎ ওরা লক্ষ্য করেছে যে আমরা ঐ দুর্ঘটনার পর আর সমুদ্রে স্নান করতে যাইনি। শুধু কি লক্ষ্য করেছে? হয়তো বলাবলি করেছে নিজেদের মধ্যে, হাসাহাসিও।

বউটির ওপর অকারণেই চটে গেলাম আমি। থামলোই যদি আমার চোখের সামনে তা হলে একটাও কথা বললো না কেন? ভাবলাম, আমিও আর কথা বলবো না ওর সঙ্গে, উত্তর দেবো না কোনো প্রশ্নের।

কিন্তু ওরা যখন স্নান সেরে ফিরছে, মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল সিঁড়ির বাঁকে। আর হঠাৎ কথার ফোয়ারা হয়ে উঠলো বউটি।—শুনেছেন আজ আবার একজন ডুবে যাচ্ছিলো, একটা বুড়ো। নুলিয়ারা গিয়ে বাঁচালো তাকে।···কেউ ডুবে গেলে বাঁচানোর কাজ ওদের, নুলিয়াদের। শুনলাম গরমেণ্ট নাকি টাকা দেয় সেইজন্যে। সত্যি? নুলিয়ারা না থাকলে কি যে হতো।···আর আজ কি সাংঘাতিক জোয়ার ছিলো, দেখলেন না তো!

অনর্গল কথা, অনেক কথা বলে গেল বউটি। আমি শুধু ম্লান হাসলাম একটু। আর বউটি চলে যেতেই আমি গৌতমকে বললাম, এই! নুলিয়ারা নাকি টাকা পায় গরমেণ্টের কাছে, কেউ ডুবে গেলে বাঁচাবে বলে?

—কই, শুনিনি তো! গৌতম বললে।

আমি বললাম, হ্যাঁ, ওপরতলার বউটি যে বললে। ওই সাজুদি।

দুপুরে শুয়ে শুয়ে আমি ঐ কথাই ভাবছিলাম, আর আনমনে চুড়ি দুটো নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম। চুড়ির প্যাটার্নটা দিদি পছন্দ করেছিলো। দিদি! দিদির কথা মনে পড়লেই আমার এত ভালো লাগে। দিদির মতো আমাকে বোধ হয় আর কেউই ভালোবাসে না। গৌতমও নয়। বিয়ের যত ঝামেলা তো দিদিই মাথায় করে নিয়েছিলো। বাজার করা, ডেকোরেটর ডাকা, শ্বশুরবাড়ির লোকদের আদর-আপ্যায়ণ। বাবা বুড়ো মানুষ, কত দিক আর সামলাবেন? দাদাটা তো আড্ডা আর হকি-ক্রিকেট নিয়েই আছে।

দিদি বিয়ের পর একটা উপদেশ শুধু দিয়েছিলো। বলেছিলো, দেখ নমি, গায়ের গয়নাগুলো—বাবা মা দিয়েছেন তোকে-আমাকে, এগুলো লোক দেখাবার জন্যে নয়, সাজগোজের জন্যে নয় এগুলোই আমাদের ব্যাংক, আমাদের ভবিষ্যৎ। খেয়ালের বশে যেন এগুলো বিক্রি করিস না, হাজার অভাব-অনটন হলেও না।

আচ্ছা, অভাব-অনটন হলেও যা বিক্রি করতে নিষেধ করেছিলো দিদি, তা যদি নুলিয়াটাকে দিয়ে দিই তা হলে কি দিদি রাগ করবে? দিয়ে অবশ্য দেবো না। দিতে আমার নিজেরই তেমন ইচ্ছে এখন আর হচ্ছে না। কেন দেবো, সাজুদি যে বললে, ওরা গরমেণ্টের কাছ থেকে টাকা পায়। ডুবন্ত মানুষ দেখলে তাকে বাঁচানো তো ওদের কাজ। তা ছাড়া ডিঙি করে কত মাছ ধরে আনে ওরা, বিক্রি করে। নেহাত গরিবও ওরা নয়। এক-একজনকে স্নান করিয়ে দিতে দু আনা করে নেয়, তাতে কম টাকা রোজগার হয় নাকি ওদের! আমি অবশ্য অকৃতজ্ঞ নই। নুলিয়াটা সত্যিই তো গৌতমকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। ও না থাকলে, আজ কি দশা হতো আমার? কোন মুখ নিয়ে বাড়ি ফিরতাম? তা ছাড়া, সারা জীবনটাই তো নষ্ট হয়ে যেতো, এই বাইশ বছর বয়সে—। না, নুলিয়াটাকে কিছু একটা দিতেই হবে। আংটিটা দিলে কেমন হয়। আমার তো অনেকগুলো আংটি। চেনা-অচেনা অনেকেই তো আংটি দিয়েছে। মুক্তো-বসানো যেটা, সেটা অবশ্য দেবো না। আর জামাইবাবু যেটা দিয়েছে সেটা খুব সুন্দর

দেখতে ! ওটা রেখে দেবো। না রাখলে জামাইবাবু কি ভাববে ? যদি কোনো দিন পরতে বলে। ওটা দিয়েছি শুনলে জামাইবাবু খুব দুঃখ পাবে। জামাইবাবু সত্যি খুব ভালোবাসে আমাকে, খুব। এক-একসময় মনে হয় দিদিকেও যেন অত ভালোবাসে না। তা অবশ্য সত্যি নয়। বউয়ের চেয়ে কেউ কি আর শালীকে বেশী ভালোবাসতে পারে ? মোটেই না। জামাইবাবুটা ভারি ফাজিল, আর ভারি দুষ্টু। ও ইচ্ছে করেই এমন ভাব করে। আমি কি আর বুঝি না ! দিদিকে রাগাবার জন্যেই অমনি করে। রাগলে দিদিকে খুব সুন্দর দেখায় কিনা।

রাগলে দিদিকে যে খুব সুন্দর দেখায়, আমি কিন্তু কোনো দিন লক্ষ্য করিনি। গৌতমই প্রথম বলেছিলো। সেই যে দিদির বাড়ি গিয়ে সব মিষ্টিগুলো খেতে পারেনি গৌতম আর দিদি তাই রেগে গিয়েছিলো—তার পরই বলেছিলো ও, তোমার দিদি রেগে গেলে খুব সুন্দর দেখায় কিন্তু ওঁকে।

গৌতম রেগে গেলে আমার মোটেই ভালো লাগে না। তাই দু দিন পরে, যাবার আগের দিন বিকেলে ও যখন রুক্ষ গলায় বললে, জিনিসপত্তর গোছগাছ করছি না কেন, তখন আমার খারাপ লেগেছিলো। কই, বিয়ের পর থেকে একটা দিনও তো অমনভাবে কথা বলেনি ও। হঠাৎ এমন রাগ-রাগ ভাব কেন ? আসলে ও বোধ হয় ভেবেছিলো আমার ফিরে যেতে ইচ্ছে নেই। আর ও তখন পালাবার জন্যে অধীর ! প্রতি মুহূর্তে বেচারার মনে অদ্ভুত এক লজ্জা। কি না, সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছিলো লোকটা ! ভাবলে আমার নিজের হাসি পায়। সত্যি, কি কাণ্ডটাই না করলো গৌতম। বড় জা বলেছিলো হনিমুন করে আসতে। ভালো হনিমুনই হলো বটে !

কিন্তু সারাটা বিকেল, সারাটা সন্ধ্যে কেমন গম্ভীর-গম্ভীর ভাব, সারা মুখ যেন থমথম করছে গৌতমের। অপ্রয়োজনে একটা কথাও যেন বলতে নারাজ। ওর এই মুখের ভাব দেখে কথাটা বলতে সাহস হলো না, অথচ ওকে না বলে তো আংটিটা দেওয়া যায় না।

ভাবলাম, থাক, কাল সকালে নিশ্চয় মনটা ভালো থাকবে ওর, তখনই বলবো। আর নুলিয়াটাও তো কাল সকালেই আসবে, তখনই দেওয়া যাবে গৌতমকে জিগ্যেস করে।

গৌতমকে জিগ্যেস করে আংটিটা দিতাম ঠিকই। আর গৌতম নিশ্চয়ই আপত্তি করতো না, কিন্তু পরের দিন সকালে যে এত তাড়াহুড়ো হবে আমি কি ছাই জানতাম।

সকালে ঘুম থেকে উঠতে এমনিতেই দেরি হয়ে গেল। অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিলাম টাইমপীসে, কিন্তু অ্যালার্মের দম দিয়ে রাখতেই ভুলে গিয়েছিলাম। তাই সেটাও বাজেনি, ঘুমও ভাঙেনি। যখন ঘুম ভাঙলো তখন আর এক ঘণ্টাও সময় নেই।

গৌতম চা খেয়ে চলে গেল হোটেলের হিসাব মেটাতে। ফিরে এসে বিছানাপত্তর গোছগাছ করতে লেগে গেলাম দুজনে। সংসার ছড়িয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে ছিলাম এ কদিন। টুকিটাকি জিনিসপত্তরগুলি তো নেহাত কম ছিলো না। আগের দিন কিছু কিছু বাঁধাছাঁদা হয়েই ছিলো, কিন্তু চিরুনি, টুথব্রাশ, পাউডার, দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম সব গুছিয়ে নিতে সময় লাগলো।

আর এসব করতে গিয়ে নুলিয়াটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।

বাক্স-বেডিং সব রিকশায় তুলে সবে রিকশাওয়ালা প্যাডেলে পা দিয়েছে অমনি দেখি কি নুলিয়াটা আসছে সামনে রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে।

রিকশা চলতে শুরু করেছে তখন। আমাদের দেখতে পেয়ে একমুখ খুশির হাসি হাসলো নুলিয়াটা, সেলাম করলে! সেলাম করলো বোধ হয় বকশিশের লোভেই।

ছি ছি. একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম ওর কথা। এত খারাপ লাগলো আমার। রিকশাওয়ালাকে থামতে বললাম।

গৌতমকে বললাম, এই, দেখো তো তোমার ব্যাগটা, ওর বকশিশটা দেওয়া হয়নি। গৌতম বললে, টাকা তো তোমার বটুয়াতে।

তাই তো। খেয়ালই ছিলো না। আমার হাতেই তো বটুয়াটা। লাল ভেলভেটের ওপর সুন্দর নকশা-করা বটুয়াটা এখানেই কিনেছি—মন্দিরে যেদিন গিয়েছিলাম সেই পাণ্ডার ছড়িদারটার সঙ্গে, সেদিন।

বটুয়া খুলে দেখলাম, দশ টাকার নোটই চার-পাঁচখানা, খুচরো মাত্র দুটি টাকা আর কয়েক আনা পয়সা।

কি করি, স্টেশনে পেঁছেই তো রিকশার ভাড়া দিতে হবে। কুলির পয়সা দিতে হবে। সব খুচরোগুলো তো দিয়ে দেওয়া যায় না।

তাই একটা এক টাকার নোট বের করে নুলিয়াটার হাতে তুলে দিলাম। ও খুশি হয়ে সেলাম করলো। হাসলো। বললে, ফির আসবেন বাবু, সেলাম দিদি, সেলাম।

সেলাম জানিয়ে চলে গেল লোকটা। আর আমার এত ভালো লাগলো তাকে। এত ভালো।

ফিরে এসেই বড় জাকে বললাম, জানেন দিদি, নুলিয়াগুলো এত ভালোমানুষ, এমন চমৎকার !

বড় জা হাসলো। বললে, দেখিস নতুন, এত ভালো ভালো বলিস না, ঠাকুরপোর আবার হিংসে হবে।

আমি হেসে ফেললাম। তারপর বললাম, ও মা—আসল কাণ্ডটার কথাই তো বলিনি, রীতিমতো একটা কাণ্ড।

—কি কাণ্ড ? চোখ কপালে তুললো বড় জা।

আমি বললাম. আপনার ঠাকুরপো আর একটু হলেই তো ডুবে যেতো। একটা নুলিয়া দেখতে পেয়েই সাঁতরে গিয়ে বাঁচালো। লোকটা নিজেই দেখতে পেয়েছিলো। ওরা তো সমুদ্রে চান করাতে দু আনা করে নেয়, আমি আসবার সময় কিন্তু একটা টাকাই বকশিশ দিয়ে এসেছি।

বলতে বলতে হঠাৎ কেন জানি না একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, সেদিনের সেই আতঙ্কের দৃশ্যটুকু চোখের সামনে ভেসে উঠেছিলো। বড় জা কি যেন বললে, আর আমার তন্ময়তা ভেঙে গেল। ভাবলাম, সত্যিই কি বালা দুটো দেবো বলেছিলাম নুলিয়াটাকে ? বোধ হয় না। সে সময় আমার কি মাথার ঠিক ছিলো ? কি বলেছি, কি করেছি তা কি আর আমিই জানি ! না, বালা-টালার কথা নিশ্চয়ই বলিনি। তা ছাড়া আমার বলা-কওয়ার জন্যে কি অপেক্ষা করে ছিলো নাকি নুলিয়াটা ? কখনো না। আমি বলার আগেই হয়তো নুলিয়াটা দেখতে পেয়েছিলো। দেখতে পেয়েই সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। কেউ ডুবে গেলে তাকে বাচানো তো ওদের কাজ।

আদাব

সমরেশ বসু

রাত্রির নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে দিয়ে, মিলিটারি টহলদার গাড়িটা একবার ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশ দিয়ে একটা পাক খেয়ে গেল।

শহরে ১৪৪ ধারা আর কারফিউ অর্ডার জারী হয়েছে। দাঙ্গা বেধেছে হিন্দু আর মুসলমানে। মুখোমুখি লড়াই দা, সড়কি, ছুরি, লাঠি নিয়ে। তা ছাড়া চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে গুপ্তঘাতকের দল—চোরাগোপ্তা হানছে অন্ধকারকে আশ্রয় করে।

লুঠেরা-রা বেরিয়েছে তাদের অভিযানে। মৃত্যু-বিভীষিকাময় এই অন্ধকার রাত্রি তাদের উল্লাসকে তীব্রতর করে তুলছে। বস্তিতে জ্বলছে আগুন। মৃত্যুকাতর নারী-শিশুর চিৎকার স্থানে স্থানে আবহাওয়াকে বীভৎস করে তুলছে। তার উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে সৈন্যবাহী-গাড়ি। তারা গুলি ছুড়ছে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে।

দুদিক থেকে দুটো গলি এসে মিশেছে এ জায়গায়। ডাস্টবিনটা উল্টে এসে পড়েছে গলি দুটোর মাঝখানে খানিকটা ভাঙাচোরা অবস্থায়। সেটাকে আড়াল করে গলির ভিতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল একটি লোক। মাথা তুলতে সাহস হল না, নির্জীবের মত পড়ে রইল খানিকক্ষণ। কান পেতে রইল দূরের অপরিস্ফুট কলরবের দিকে। কিছুই বোঝা যায় না।— 'আল্লাহু আকবর' কি 'বন্দেমাতরম'।

হঠাৎ ডাস্টবিনটা একটু নড়ে উঠল। আচম্বিতে শিরশিরিয়ে উঠল দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরা। দাঁতে দাঁত চেপে হাত পা-গুলোকে কঠিন করে লোকটা প্রতীক্ষা করে রইল একটা ভীষণ কিছুর জন্যে। কয়েকটা মুহূর্ত কাটে। ……নিশ্চল নিস্তব্ধ চারিদিক।

বোধ হয় কুকুর। তাড়া দেওয়ার জন্যে লোকটা ডাস্টবিনটাকে ঠেলে দিল একটু। খানিকক্ষণ চুপচাপ। আবার নড়ে উঠল ডাস্টবিনটা, ভয়ের সঙ্গে এবার একটু কৌতূহল হল। আস্তে আস্তে মাথা তুলল লোকটা······ ওপাশ থেকেও উঠে এল ঠিক তেমনি একটি মাথা। মানুষ! ডাস্টবিনের দুই পাশে দুটি প্রাণী, নিস্পন্দ নিশ্চল। হৃদয়ের স্পন্দন তালহারা—ধীর। স্থির চারটে চোখের দৃষ্টি ভয়ে সন্দেহে উত্তেজনায় তীব্র হয়ে উঠেছে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। উভয়ে উভয়কে ভাবছে খুনী। চোখে চোখ রেখে উভয়েই একটা আক্রমণের প্রতীক্ষা করতে থাকে, কিন্তু খানিকক্ষণ অপেক্ষা করেও কোন পক্ষ থেকেই আক্রমণ এল না। এবার দুজনের মনেই একটা প্রশ্ন জাগল—হিন্দু না মুসলমান? এ প্রশ্নের উত্তর পেলেই হয়তো মারাত্মক পরিণতিটা দেখা দেবে। তাই সাহস করছে না কেউ কাউকে সে কথা জিজ্ঞেস করতে। প্রাণভীত দুটি প্রাণী পালাতেও পারছে না—ছুরি হাতে আততায়ীর ঝাঁপিযে পড়ার ভয়ে।

অনেকক্ষণ এই সন্দিহান ও অস্বস্তিকর অবস্থায় দুজনেই অধৈর্য হয়ে পড়ে। একজন শেষ অবধি প্রশ্ন করে ফেলে—হিন্দু, না মুসলমান?

আগে তুমি কও। অপর লোকটি জবাব দেয়।

পরিচয়কে স্বীকার করতে উভয়েই নারাজ। সন্দেহের দোলায় তাদের মন দুলছে।······প্রথম প্রশ্নটা চাপা পড়ে, অন্য কথা আসে। একজন জিজ্ঞেস করে, বাড়ি কোন্‌খানে?

বুড়িগঙ্গার হেই পারে—সুবইডায়। তোমার?

চাষাড়া—নারাইণগঞ্জের কাছে।···কি কাম কর?

নাও আছে আমার, নায়ের মাঝি।···তুমি?

নারাইণগঞ্জের সুতাকলে কাম করি।

আবার চুপচাপ। অলক্ষ্যে অন্ধকারের মধ্যে দুজন দুজনের চেহারাটা দেখবার চেষ্টা করে। চেষ্টা করে উভয়ের পোশাক-পরিচ্ছদটা খুঁটিয়ে দেখতে। অন্ধকার আর ডাস্টবিনটার আড়াল সেদিক থেকে অসুবিধা ঘটিয়েছে।······ হঠাৎ কাছাকাছি কোথায় একটা শোরগোল ওঠে। শোনা যায় দু পক্ষেরই উন্মত্ত কণ্ঠের ধ্বনি। সুতাকলের মজুর আর নাওয়ের মাঝি দুজনেই সন্ত্রস্ত হয়ে একটু নড়েচড়ে ওঠে।

ধারে-কাছেই য্যান লাগছে। সুতা-মজুরের কণ্ঠে আতঙ্ক ফুটে উঠল।

হ, চল, এইখান থেইক্যা উইঠা যাই। মাঝিও বলে উঠল অনুরূপ কণ্ঠে।

সুতা-মজুর বাধা দিল, আরে না না—উইঠো না। জানটারে দিবা নাকি ?

মাঝির মন আবার সন্দেহে দুলে উঠল। লোকটার কোন বদ্ অভিপ্রায় নেই তো! সুতা-মজুরের চোখের দিকে তাকাল সে। সুতা-মজুরও তাকিয়ে ছিল, চোখে চোখ পড়তেই বলল—বইয়ো। যেমুন বইয়া রইছ—সেই রকমই থাক।

মাঝির মনটা ছাঁৎ করে উঠল সুতা-মজুরের কথায়। লোকটা কি তাহলে তাকে যেতে দেবে না নাকি। তার সারা চোখে সন্দেহ আবার ঘনিয়ে এল। জিজ্ঞেস করল, ক্যান্ ?

ক্যান্ ? সুতা-মজুরের চাপা গলায় বেজে উঠল, ক্যান্ কি, মরতে যাইবা নাকি তুমি ?

কথা বলার ভঙ্গিটা মাঝির ভাল ঠেকল না। সম্ভব-অসম্ভব নানা রকম ভেবে সে মনে মনে দৃঢ় হয়ে উঠল। —যামু না তো কি এই আন্দাইরা গলির ভিতর পইরা থাকুম নাকি ?

লোকটার জেদ দেখে সুতা-মজুরের গলায়ও ফুটে উঠল সন্দেহ। বলল, তোমার মতলবডা তো ভাল মনে হইতেছে না। কোন্ জাতির লোক তুমি কইলা না, শেষে তোমাগো দলবল যদি ডাইকা লইয়া আহ আমারে মারণের লেইগা ?

এইটা কেমুন কথা কও তুমি ? স্থান-কাল ভুলে রাগে-দুঃখে মাঝি প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে।

ভাল কথাই কইছি ভাই ; বইয়ো, মানুষের মন বোঝ না ?

সুতা-মজুরের গলায় যেন কি ছিল, মাঝি একটু আশ্বস্ত হল শুনে।

তুমি চইলা গেলে আমি একলা থাকুম নাকি ?

শোরগোলটা মিলিয়ে গেল দূরে। আবার মৃত্যুর মত নিস্তব্ধ হয়ে আসে সব—মুহূর্তগুলিও কাটে যেন মৃত্যুর প্রতীক্ষার মত। অন্ধকারে গলির মধ্যে ডাস্টবিনের দুই পাশে দুটি প্রাণী ভাবে নিজেদের বিপদের কথা, ঘরের কথা, মা-বউ-ছেলেমেয়েদের কথা···তাদের কাছে কি আর তারা প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারবে, না তারাই থাকবে বেঁচে····· কথা নেই, বার্তা নেই, হঠাৎ কোত্থেকে বজ্রপাতের মত নেমে এল দাঙ্গা। এই হাটে-বাজারে-দোকানে এত হাসাহাসি, কথা কওয়াকওয়ি—আবার মুহূর্ত পরেই মারামারি, কাটাকাটি—একেবারে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিল সব। এমনভাবে মানুষ নির্মম নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে কি করে ? কি অভিশপ্ত জাত! সুতা-মজুর একটা দীর্ঘনিশ্বাস

ফেলে। দেখাদেখি মাঝিরও একটা নিশ্বাস পড়ে।

বিরি খাইবা? সুতো-মজুর পকেট থেকে একটি বিড়ি বের করে বাড়িয়ে দিল মাঝির দিকে। মাঝি বিড়িটা নিয়ে অভ্যাসমত দু-একবার টিপে, কানের কাছে বারকয়েক ঘুরিয়ে চেপে ধরল ঠোঁটের ফাঁকে। সুতো-মজুর তখন দেশলাই জ্বালবার চেষ্টা করছে। আগে লক্ষ্য করে নি জামাটা কখন ভিজে গেছে। দেশলাইটাও গেছে সেঁতিয়ে। বারুদ-ঝরা কাঠিটা ফেলে দিল বিরক্ত হয়ে।

হালার ম্যাচবাতিও গেছে সেঁতাইয়া। আর একটা কাঠি বের করল সে।

মাঝি যেন খানিকটা অসবুর হয়েই উঠে এল সুতো-মজুরের পাশে।

আরে জ্বলব জ্বলব, দেও দেহিনি— আমার কাছে দেও। সুতো-মজুরের হাত থেকে দেশলাইটা সে প্রায় ছিনিয়েই নিল। দু-একবার খস্‌খস্‌ করে সত্যিই সে জ্বালিয়ে ফেলল একটা কাঠি।

সোহান্‌ আল্লা! নেও নেও – ধরাও তাড়াতাড়ি।

ভূত দেখার মত চমকে উঠল সুতো-মজুর। টেপা ঠোঁটের ফাঁক থেকে পড়ে গেল বিড়িটা। তুমি··· ?

একটা হালকা বাতাস এসে যেন ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল কাঠিটা। অন্ধকারের মধ্যে দু জোড়া চোখ অবিশ্বাসে উত্তেজনায় আবার বড় বড় হয়ে উঠল। কয়েকটা নিস্তব্ধ পল কাটে।

মাঝি চট্‌ করে উঠে দাঁড়াল। বলল, হ আমি মোছলমান। কি হইছে?

সুতো-মজুর ভয়ে ভয়ে জবাব দিল, কিছু হয় নাই, কিন্তু···মাঝির বগলের পুঁটুলিটা দেখিয়ে বলল, ওইটার মধ্যে কি আছে?

পোলা-মাইয়ার লেইগা দুইডা জামা আর একখান শাড়ি। কাইল আমাগো ঈদের পরব জানো?

আর কিছু নাই তো! সুতো-মজুরের অবিশ্বাস দূর হতে চায় না।

মিথ্যা কথা কইতেছি নাকি? বিশ্বাস না হয় দেখ। পুঁটুলিটা বাড়িয়ে দিল সে সুতো-মজুরের দিকে।

আরে না না ভাই, দেখুম আর কি। তবে দিনকালটা দেখছ তো? বিশ্বাস করন যায়—তুমিই কও?

হেই তো হক্‌ কথাই। ভাই—তুমি কিছু রাখ-টাখ নাই তো?

ভগবানের কিরা কইরা কইতে পারি একটা সুঁইও নাই। পরানডা লইয়া অখন ঘরের পোলা ঘরে ফিরা যাইতে পারলে হয়। সুতো-মজুর তার জামা-কাপড় নেড়েচেড়ে দেখায়।

আবার দুজনে বসল পাশাপাশি। বিড়ি ধরিয়ে নীরবে বেশ মনোযোগ সহকারে দুজনে ধূমপান করল খানিকক্ষণ।

আইচ্ছা…মাঝি এমনভাবে কথা বলে যেন সে তার কোন আত্মীয়বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছে।—আইচ্ছা কইতে পার নি—এই মাই'র-দই'র কাটাকুটি কিয়ের লেইগ'?

সুতামজুর খবরের কাগজের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে, খবরাখবর সে জানে কিছু। বেশ একটু উষ্মকণ্ঠেই জবাব দিল সে, দোষ তো তোমাগো ওই লীগওয়ালাগোই। তারাই তো লাগাইছে হেই কিয়ের সংগ্রামের নাম কইরা।

মাঝি একটু কটুক্তি করে উঠল, হেই সব আমি বুঝি না। আমি জিগাই মারামারি কইরা হইব কি? তোমাগো দু'গা লোক মরব, আমাগো দু'গা মরব। তাতে দ্যাশের কি উপকারটা হইব?

আরে আমিও তো হেই কথাই কই। হইব আর কি, হইব আমার এই কলাডা—হাতের বুড়ো আঙুল দেখায় সে।—তুমি মরবা, আমি মরুম, আর আমাগো পোলামাইয়াগুলি ভিক্ষা কইরা বেরাইব। এই গেল-সনের 'রায়টে' আমার ভগ্নিপতিরে কাইটা চাইর টুকরা কইরা মারল। ফলে বইন হইল বিধবা আর তার পোলামাইয়ারা আইয়া পরল আমার ঘারের উপুর। কই কি আর সাধে, ন্যাতারা হেই সাততলার উপুর পায়ের উপুর পা দিয়া হুকুমজারী কইরা বইয়া রইল আর হালার মরতে মরলাম আমরাই।

মানুষ না, আমরা য্যান্ কুত্তার বাচ্চা হইয়া গেছি; নাইলে এমুন কামরা-কামরিটা লাগে কেম্‌বায়? নিষ্ফল ক্রোধে মাঝি দু হাত দিয়ে হাঁটু দুটোকে জড়িয়ে ধরে।

হ।

আমাগো কথা ভাবে কেডা? এই যে দাঙ্গা বাধল—অখন দানা জুটাইব কোন্ সুমুন্দি; নাওটারে কি আর ফিরা পামু? বাদামতলির ঘাটে কোন্ অতলে ডুবাইয়া দিছে তারে—তার ঠিক কি! জমিদার রূপবাবুর বাড়ির নায়েবমশয় পিত্যেক মাসে একবার কইরা আমার নায়ে যাইত নইরার চরে কাছারি করতে। বাবুর হাত য্যান্ হজরতের হাত, বখশিশ্ দিত পাঁচ, নায়ের কেরায়া দিত পাঁচ, একুনে দশটা টাকা। তাই আমার মাসের খোরাকি জুটাইত হেই বাবু। আর কি হিন্দুবাবু আইব আমার নায়ে—

সুতা-মজুর কি বলতে গিয়ে থেমে গেল। একসঙ্গে অনেকগুলি ভারি

বুটের শব্দ শোনা যায়। শব্দটা যে বড় রাস্তা থেকে গলির অন্দরের দিকেই এগিয়ে আসছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। শঙ্কিত জিজ্ঞাসা নিয়ে উভয়ে চোখাচোখি করে।

কি করবা? মাঝি তাড়াতাড়ি পুঁটলিটাকে বগলদাবা করে।

চল পলাই। কিন্তুক যামু কোন্ দিকে? শহরের রাস্তাঘাট তো ভাল চিনি না।

মাঝি বলল, চল যেদিকে হউক। মিছামিছি পুলিশের মাইর খামু না;—ওই ড্যামনাগো বিশ্বাস নাই।

হ। ঠিক কথাই কইছ। কোন্ দিকে যাইবা কও—আইয়া তো পরল।

এই দিকে।—গলিটার যে মুখটা দক্ষিণ দিকে চলে গেছে সেদিকে পথনির্দেশ করল মাঝি। বলল, চল, কোন গতিকে একবার যদি বাদামতলি ঘাটে গিয়া উঠতে পারি—তাইলে আর ডর নাই।

মাথা নিচু করে মোড়টা পেরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে তারা ছুটল, সোজা এসে উঠল একেবারে পাটুয়াটুলি রোডে। নিস্তব্ধ রাস্তা ইলেকট্রিকের আলোয় ফুটফুট করছে। দুজনেই একবার থম্‌কে দাঁড়াল—ঘাপটি মেরে নেই তো কেউ? কিন্তু দেরি করারও উপায় নেই। রাস্তার এমোড়-ওমোড় একবার দেখে নিয়ে ছুটল সোজা পশ্চিম দিকে। খানিকটা এগিয়ে—এমন সময় তাদের পিছনে শব্দ উঠল ঘোড়ার খুরের। তাকিয়ে দেখল—অনেকটা দূরে একজন অশ্বারোহী এদিকেই আসছে। ভাববার সময় নেই। বাঁ-পাশে মেথর যাতায়াতের সরু গলির মধ্যে আত্মগোপন করল তারা। একটু পরেই ইংরেজ অশ্বারোহী রিভলবার হাতে তীব্র বেগে বেরিয়ে গেল তাদের বুকের মধ্যে অশ্ব-খুরধ্বনি তুলে দিয়ে। শব্দ যখন চলে গেল অনেক দূরে, উঁকি-ঝুঁকি মারতে মারতে আবার তারা বেরুল।

কিনারে কিনারে চল। সুতা-মজুর বলে।

রাস্তার ধার ঘেঁষে সন্ত্রস্ত দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে তারা।

খারাও। মাঝি চাপা-গলায় বলে। সুতা-মজুর চমকে থমকে দাঁড়ায়।

কি হইল?

এদিকে আইয়ো—সুতা-মজুরের হাত ধরে মাঝি তাকে একটা পানবিড়ির দোকানের আড়ালে নিয়ে গেল।

হেদিকে দেখ।

মাঝির সংকেত মত সামনের দিকে তাকিয়ে সুতা-মজুর দেখল প্রায় একশো গজ দূরে একটা ঘরে আলো জ্বলছে। ঘরের সংলগ্ন উঁচু বারান্দায় দশ-বারোজন বন্দুকধারী পুলিশ স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে আছে, আর তাদের সামনে ইংরেজ অফিসার কি যেন বলছে অনর্গল পাইপের ধোঁয়ার মধ্যে হাত মুখ নেড়ে। বারান্দার নিচে ঘোড়ার জিন্ ধরে দাঁড়িয়ে আছে আর একটি পুলিশ। অশান্ত চঞ্চল ঘোড়া কেবলই পা ঠুকছে মাটিতে।

মাঝি বলে, ওইটা ইসলামপুর ফাঁড়ি। আর ইকটু আগাইয়া গেলে ফাঁড়ির কাছেই বাঁয়ের দিকে যে গলি গেছে হেই পথে যাইতে হইব আমাগো বাদামতলির ঘাট।

সুতা-মজুরের সমস্ত মুখ আতঙ্কে ভরে উঠল।—তবে?

তাই কইতাছি তুমি থাক, ঘাটে গিয়া তোমার বিশেষ কাম হইব না। মাঝি বলে, এইটা হিন্দুগো আস্তানা আর ইসলামপুর হইল মুসলমানগো। কাইল সকালে উইঠা বারিত্ যাইবা গা।

আর তুমি?

আমি যাইগা। মাঝির গলা উদ্বেগে আর আশঙ্কায় ভেঙে পড়ে, আমি পারুম না ভাই থাকতে। আইজ আটদিন ঘরের খবর জানি না। কি হইল না হইল আল্লাই জানে। কোন রকম কইরা গলিতে ঢুকতে পারলেই হইল। নৌকা না পাই সাঁতরাইয়া পার হমু বুরিগঙ্গা।

আরে না না মিয়া কর কি? উৎকণ্ঠায় সুতা-মজুর মাঝির কামিজ চেপে ধরে।—কেমনে যাইবা তুমি, আঁ? আবেগ উত্তেজনায় মাঝির গলা কাঁপে।

ধইরো না, ভাই, ছাইরা দেও। বোঝ না তুমি কাইল ঈদ, পোলামাইয়ারা সব আইজ চান্দ্ দেখছে কত আশা কইরা রইছে তারা নতুন জামা পিন্‌ব, বাপজানের কোলে চরব। বিবি চোখের জলে বুক ভাসাইতেছে। পারুম না ভাই—পারুম না—মনটা কেমন করতাছে। মাঝির গলা ধরে আসে।

সুতা-মজুরের বুকের মধ্যে টন্‌টন্ করে ওঠে। কামিজ ধরা হাতটা শিথিল হয়ে আসে।—যদি তোমায় ধইরা ফেলায়? ভয়ে আর অনুকম্পায় তার গলা ভরে ওঠে।

পারব না ধরতে, ডরাইও না। এইখান থাইকা য্যান্ উইঠো না। যাই···ভুলুম না ভাই এই রাত্রের কথা। নসিবে থাকলে আবার তোমার লগে মোলাকাত হইব। —আদাব।

আমিও ভুলুম না ভাই—আদাব।

মাঝি চলে গেল পা টিপে টিপে।

সুতা-মজুর বুকভরা উদ্বেগ নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বুকের ধুক্‌ধুকুনি তার কিছুতে বন্ধ হতে চায় না। উৎকর্ণ হয়ে রইল সে, হে ভগমান্ মাজি য্যান্ বিপদে না পড়ে।

মুহূর্তগুলি কাটে রুদ্ধ-নিশ্বাসে। অনেকক্ষণ তো হল, মাঝি বোধ হয় এতক্ষণে চলে গেছে। আহা পোলামাইয়ার কত আশা নতুন জামা পরবে আনন্দ করে পরবে। বেচারা 'বাপজানের' পরান তো। সুতা-মজুর একটা নিশ্বাস ফেলে। সোহাগে আর কান্নায় বিবি ভেঙে পড়বে মিয়াসাহেবের বুকে।

'মরণের মুখ থেইকা তুমি বাঁইচা আইছ?' সুতা-মজুরের ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটে উঠল, আর মাঝি তখন কি করবে? মাঝি তখন—

হলট্‌……

ধুক্ করে উঠল সুতা-মজুরের বুক। বুট পায়ে কারা যেন ছুটোছুটি করছে। কি যেন বলাবলি করছে চিৎকার করে।

ডাকু ভাগ্‌তা হ্যায়!

সুতা-মজুর গলা বাড়িয়ে দেখল পুলিশ অফিসার রিভলবার হাতে রাস্তার উপর লাফিয়ে পড়ল। সমস্ত অঞ্চলটার নৈশ নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে দুবার গর্জে উঠল অফিসারের আগ্নেয়াস্ত্র।

গুড়ুম্, গুড়ুম্। দুটো নীল্‌চে আগুনের ঝিলিক। উত্তেজনায় সুতা-মজুর হাতের একটা আঙুল কামড়ে ধরে। লাফ দিয়ে ঘোড়ায় উঠে অফিসার ছুটে গেল গলির ভিতর। ডাকুটার মরণ আর্তনাদ সে শুনতে পেয়েছে।

সুতা-মজুরের বিহ্বল চোখে ভেসে উঠল মাঝির বুকের রক্তে তার পোলা-মাইয়া, তার বিবির জামা শাড়ি রাঙা হয়ে উঠেছে। মাঝি বলছে—পারলাম না ভাই। আমার ছাওয়ালরা আর বিবি চোখের পানিতে ভাসব পরবের দিনে। দুশমনরা আমারে যাইতে দিল না তাগো কাছে।

স্তনদায়িনী

মহাশ্বেতা দেবী

মাসিপিসি বনগাঁ-বাসী বনের মধ্যে ঘর।
কথনো মাসি বলল না যে, খই মোয়াটা ধর।

যশোদার মাসি কখনো আদর করত, না অনাদর, তা যশোদার মনে পড়ে না। জন্ম থেকেই সে যেন কাঙালীচরণের বউ, হাতে গুণে জেয়ন্তে-মরন্তে কুড়িটা ছেলেমেয়ের মা। মনেই পড়ে না যশোদার, কবে তার গর্ভে সন্তান ছিল না, মাথা ঘুরত না সকালে, কাঙালীর শরীর কুপি-জ্বলা আঁধারে তার শরীরকে ভূ-তাত্ত্বিকের মতো ড্রিল করত না। মাতৃত্ব সে সইতে পারে, কি পারে না, সে-হিসেব কোনোদিন খতিয়ে দেখতে সময় পায়নি যশোদা। নিরন্তর মাতৃত্বই ছিল তার বাঁচবার ও অসংখ্য জীবের সংসারকে বাঁচাবার উপায়। যশোদা পেশায় জননী, প্রফেশ্যনাল মাদার। বাবুদের বাড়ির বউ-ঝির মতো অ্যামেচার মা ছিল না যশোদা। এ জীবন পেশাদারদের একচেটিয়া। অ্যামেচার ভিখিরি-পকেটমার-গণিকা এ শহরে পাত পায় না, এ রাজ্যে। এমন কি ফুটপাথ ও পথের নেড়িকুত্তা, ডাস্টবিনলোভী কাক—তারাও নবাগত অ্যামেচারদের ঠাঁই দেয় না। যশোদা মাতৃত্বকে পেশা হিসেবে নিয়েছিল।

সে জন্যে দায়ী হালদারবাবুদের 'নতুন জামাইয়ের স্টুডিবেকার গাড়ি এবং বাবু-বাড়ির ছোট ছেলের ভরদুপুরে চালক হবার আকাঙ্ক্ষা। আকাঙ্ক্ষাটি ছেলেটির মনে হঠাৎ জেগেছিল। হঠাৎ-হঠাৎ ছেলেটির মনে ও শরীরে যেসব বাতিক চাগাত, তা তৎক্ষণাৎ পরিতৃপ্ত করতে না পারলে ছেলেটি ক্ষান্ত হতো না। হঠাৎ-হঠাৎ বাতিকগুলি ওর দুপুরের নৈঃসঙ্গ্যেই চাগাত এবং বোগদাদের খলিফার মতো ওকে বান্দা খাটাত। এ পর্যন্ত সেকারণে সে যা-যা করেছে, তাতে করে যশোদাকে মাতৃত্বের পেশা নিতে হয়নি।

এক দুপুরে হঠাৎ কামের তাড়নায় ছেলেটি তাদের রাঁধুনিকে আক্রমণ করে ও রাঁধুনিটির পেটে তখন ভরা ভাত, চোরাই মুড়ো ও কচুশাকের ভার ছিল বলে, আলস্যে শরীর মন্থর ছিল বলে, রাঁধুনিটি, 'লঃ, কি করুবি কর্'—বলে চিতিয়ে পড়ে থাকে। অতঃপর ছেলেটির ঘাড় থেকে বোগদাদী ভূত নামে এবং সে—'ক্যারেও কইও না মাসি' বলে সানুশোচনা অশ্রু ফেলে। রাঁধুনিটি তাকে, 'ইয়াতে আর কওন-বলনের আছে কি?'—বলে সত্বর ঘুমোতে যায়। সে কোনোদিনই কিছু বলে দিত না। কেন না তার শরীর ছেলেটিকে আকর্ষণ করেছে জেনে সে যথেষ্ট গর্বিত হয়েছিল। কিন্তু চোরের মন বোঁচকার দিকে। ছেলেটি পাতে অসংগত সংখ্যায় মাছ ও ভাজা দেখে মনে-মনে প্রমাদ গণে। মনে করে, রাঁধুনি তাকে ফাঁসালে সে কেচ্ছায় পড়বে। অতএব আরেক দুপুরে সে বোগদাদী জিহনের তাড়সে মায়ের আংটি চুরি করে, সেটি রাঁধুনির বালিশের ওয়াড়ে ঢোকায় এবং শোর তুলে রাঁধুনিকে তাড়িয়ে ছাড়ে। আরেক দুপুরে সে বাবার ঘর থেকে রেডিও তুলে নিয়ে বেচে দিয়েছিল। দুপুরের সঙ্গে ছেলেটির এহেন আচরণের সংগতি খুঁজে পাওয়া তার মা-বাপের পক্ষেও মুশকিল, কেন না তার পিতা পঞ্জিকা দেখে হরিসালের হালদারদের ঐতিহ্যমতে সন্তানদের গভীর নিশীথে সৃষ্টি করেছিলেন। বস্তুত এ বাড়িতে ফটক পেরোলেই ষোড়শ শতক। পঞ্জিকা ও স্ত্রী-গ্রহণ এ বাড়িতে আজো আচরিত। কিন্তু এসব কথা বাই-লেন মাত্র। এ সকল দুপুরে-বাতিকের জন্যে যশোদার মাতৃত্ব পেশা হয়নি।

কোনো এক দুপুরে কাঙালীচরণ দোকানের মালিককে দোকানে বসিয়ে কোঁচার আড়ালে চারটি চোরাই সিঙাড়া জিলিপি নিয়ে ঘরে ফিরছিল। প্রত্যহই ফেরে। যশোদা ও সে ভাত খায়। ছানাপোনা তিনটি বিকেলে বাসি সিঙাড়া ও জিলিপি খায়। কাঙালীচরণ ময়রার দোকানে তাড়ু নাড়ে ও সিংহবাহিনীর মন্দিরের যাত্রীদের মধ্যে যারা 'হারায়ে মারায়ে কাশ্যপ গোত্র' হয়নি, সে সকল জাত্যভিমানী বামুনদের 'সদ্‌ব্রাহ্মণের প্রস্তুত লুচি তরকারি' খাওয়ার লুচি ভেজে। প্রত্যহই সে ময়দাটা আশটা সরায় ও সংসারে সুসার করে। দুপুর নাগাদ পেটে ভাত পড়লে যশোদার প্রতি তার বাৎসল্য ভাব জাগে এবং যশোদার স্ফীত স্তন নিয়ে নাড়াচাড়া করে সে ঘুমিয়ে পড়ে। দুপুর নাগাদ ঘরে ফিরতে ফিরতে কাঙালীচরণ অদুর সুখের কথা ভাবছিল এবং স্ত্রীর সুবর্তুল স্তনের কথা ভেবে সে স্বর্গসুখ পাচ্ছিল। কাঁচা মেয়ে বিয়ে করে তাকে কম খাটিয়ে প্রচুর খাওয়ালে আখেরে

দুপুরে সুখ মেলে একথা চিন্তা করে তার নিজেকে দূরদর্শী পুরুষবাচ্চা মনে হচ্ছিল। এহেন সময়ে বাবুদের ছেলে স্টুডিবেকার-সমেত ঘ্যাঁক করে কাঙালীচরণকে বাঁচিয়ে তার পাতা ও গোড়ালির ওপরের গোছ দুটি চাপা দিল।

নিমেষে লোক জমল। নেহাত বাড়ির সামনে দুর্ঘটনা, নইলে 'রক্তদর্শন করে ছেড়ে দিতুম' বলে নবীন পাণ্ডা চেঁচাতে লাগল। শক্তি স্বরূপিণী মায়ের পাণ্ডা সে, দুপুরে রৌদ্ররসে তেতে থাকে। নবীনের গর্জনে হালদাররা যে-যে বাড়িতে ছিল, সবাই বেরুল। হালদারকর্তা সগর্জনে, 'হালা আবুইদ্দা ষাঁড়, তুমি ব্রহ্মহত্যা করবায় ?' বলে ছেলেকে পেটাতে থাকলেন। ছোট জামাই তখন স্বীয় স্টুডিবেকার সামান্য আহত দেখে স্বস্তিতে হাঁপ ছাড়লেন এবং এই পয়সায়-ধনী, কালচারে-পাঁঠা শ্বশুরগোষ্ঠীর চেয়ে তিনি যে শ্রেষ্ঠতর মানুষ, তা প্রমাণের জন্য মিহিন আদ্দির পাঞ্জাবির মতো ফিনফিনে গলায় বললেন, 'লোকটা কি মারা যাবে ? হাসপাতালে নিতে হবে না ?'—কাঙালীর মনিবও ভিড়ের মধ্যে ছিল এবং পথে বিক্ষিপ্ত সিঙাড়া জিলিপি দেখে, সে বলতে গিয়েছিল, 'ছিঃ ঠাকুর ! তোমার এই কাজ ?'—এখন সে জিভ আগলাল এবং বলল, 'তাই করুন স্যার।'—ছোট জামাই ও হালদারকর্তা কাঙালীচরণকে সত্বর হাসপাতালে নিলেন। কর্তার মনে আন্তরিক দুঃখ হল। দ্বিতীয় যুদ্ধের সময়ে, যখন তিনি ছাঁট লোহা বেচে-কিনে মিত্রশক্তির ফ্যাসি-বিরোধী সংগ্রামে সহায়তা করছেন—তখন কাঙালীচরণ কিশোর মাত্র। বামুন বলে তাঁর ভক্তিশ্রদ্ধা রক্তের পোকা ও সেই কারণে ভোরে চাটুজ্জেবাবুকে না পেলে ছেলের বয়সী কাঙালীকে প্রণাম করে তার ফাটা পায়ের ধুলো জিভে ঠেকাতেন। কাঙালী ও যশোদা তাঁর বাড়িতে পালেপার্বণে যায়-আসে এবং বউমারা পোয়াতি হলে যশোদাকে কাপড়-সিঁদুর পাঠানো হয়। এখন তিনি কাঙালীকে বললেন, 'কাঙালী ! ডাইর না বাপ ! আমি থাকতে তোমার কষ্ট অইব না।'—এখন তাঁর মনে হল, কাঙালীর পায়ের পাতা দুটি কিমা হয়ে গেছে, ঠেকা পড়লে আর পায়ের ধুলো নিতে পারবেন না। ভেবে বড় দুঃখ হল তাঁর, এবং 'কি করল হারামজাদায়' বলে তিনি কেঁদে ফেললেন। হাসপাতালের ডাক্তারকে বললেন, 'সবকিছু করেন ! টাকার লিগ্যা ভাইবেন না।'

কিন্তু ডাক্তারেরা পায়ের পাতা ফিরে দিতে পারলেন না। খুঁতো বামুন হয়ে কাঙালী ফিরে এল। ক্র্যাচ দুটি হালদারকর্তা করিয়ে দিলেন। ক্র্যাচ বগলে কাঙালী যেদিন ঘরে ফিরল, সেদিনই সে জানল, হালদার-বাড়ি

থেকে প্রত্যহ যশোদার জন্য সিধা এসেছে। নবীন পাণ্ডা পাণ্ডা-কুলে সেজো। মায়ের ভোগের আড়াই আনার অংশীদার এবং সেই দুঃখে সে নিনু হয়ে থাকত! সিনেমায় রামকৃষ্ণকে কয়েকবার দেখার পর সে অনুপ্রাণিত হয়ে সেইমতে দেবীকে 'তুই, বেটি, পাগলী' বলে ও শাক্ত-মতে কারণবারি দ্বারা চেতনা নিষিক্ত করে রাখে। সে কাঙালীকে বলল, 'তোর জন্যে বেটির পায়ে ফুল চড়িয়েছিলুম।' খেপী বললে, 'কাঙালীর ঘরে আমার অংশ আছে, তার বরাতে ও বেঁচে উঠবে।' কাঙালী একথা যশোদাকে বলতে গিয়ে বলল, 'অ্যাঁ? আমি যখন ছিলাম না, তুই ওই নবনেটার সঙ্গে লটর-খটর কচ্ছিলি?' যশোদা তখনি পৃথিবীর দুই গোলার্ধের মাঝে কাঙালীর সন্দেহী মাথাটি চেপে ধরল ও বলল, 'রোজ বাবুদের দুটো ঝি এখেনে শুত আমাকে পাহারা দিতে। নবনেকে আমি আমল দিই! আমি না তোমার সতী স্ত্রী?'

বস্তুত হালদার-বাড়িতে গিয়েও কাঙালী তার স্ত্রীর প্রজ্বলন্ত সতীত্বমহিমার বহু কথা শুনল। যশোদা মায়ের মন্দিরে হত্যা দিয়েছে, সুবচনীর ব্রত করেছে, চেওলা গিয়ে সিদ্ধবাবার চরণ ধরেছে। অবশেষে সিংহবাহিনী স্বপ্নে ধাইয়ের বেশে বগলে ব্যাগ নিয়ে এসে তাকে বলেছেন, 'ভাবিসনি। তোর সোয়ামি ফিরে আসবে।' কাঙালী একথা শুনে বিশেষ অভিভূত হল। হালদারকর্তা বললেন, 'বুঝলা কাঙালী! হালার অবিশ্বাসীরা কয়, মায়ে স্বপ্ন দিব, তা ধাই সাইজ্জা ক্যান্? আমি কই, তিনি সৃষ্টি করে মা অইয়া, ধাত্রী অইয়া পালন করে!'

এরপর কাঙালী বলল, 'বাবু! ময়রার দোকানে কাজ করব কি করে আর? ক্রেচ নিয়ে তো বসে তাড়ু নাড়তে পারব না। আপনি ভগবান। কত লোককে কতভাবে অন্ন দিচ্ছেন! আমি ভিক্ষে চাইনি। এট্টা কাজের ব্যবস্থা করে দিন।'

হালদারবাবু বললেন, 'হ কাঙালী! তোমার লিগ্যা জায়গা দেইখ্যা থুইছি। আমার বারিন্দায় ছাউনি দিয়া এট্টা দোকান কইরা দিমু। সামনে সিংহবাহিনী। যাত্রী আসে, যাত্রী যায়। তুমি মুড়ি মুড়খি, চিড়া-বাতাসার দোকান দাও। অহন বারিতে বিয়া লাগছে। আমার সপ্তম পুত্র, হেই আবাইগার বিয়া। যদ্দিন না দোকান অয়, তদ্দিন সিধা যাইবে।'

একথা শুনে কাঙালীর মন বর্ষা সমাগমে বাদলে পোকার মতো উড্ডীন হল ও ফিরে এসে সে যশোদাকে বলল, 'সেই যে কালিদাসের শোলোক আছে,

নেই তাই খাচ্ছে, থাকলে কোথায় পেতে ?—আমার কপালে তাই হল রে ! বাবু বলছে, ছেলের বিয়ে মিটলে রকে দোকান করে দেবে। যদ্দিন না দিচ্ছে, তদ্দিন সিধে পাঠাবে। ঠ্যাং থাকলে কি এরকমটা হতো ? সবই মায়ের ইচ্ছে রে !'

ক্রাচ খটখটিয়ে কাঙালী সুসংবাদটি আপামরকে বিতরণ করল। ফলে তার প্রাক্তন মনিব নবীন পাণ্ডা, ফুলদোকানের কেষ্ট মহান্তি, মায়ের বাঁধা ঢাকী উল্লাস, সকলে বলল, 'আহা ! কলি বললে তো হয় না ! মায়ের তল্লাটে পাপের পতন, পুণ্যের জয়, এ হতেই হচ্ছে। নইলে কাঙালীর পা খোয়া যাবে কেন ? আর হালদারকর্তা বা বামুনের মানার ভয়ে এত কথা স্বীকার যাবে কেন ? সবচে বড় কথা, যশোদাকেই বা মা ধাই বেশে দেখা দেবে কেন ? সবই মায়ের ইচ্ছে।'

এ ঘোর কলিতে পাঁচের দশকে কাঙালীচরণ পতিতুণ্ডকে ঘিরে দেড়শো বছর আগে স্বপ্নাদেশে প্রাপ্তা দেবী সিংহবাহিনীর ইচ্ছাসকল এভাবে পাক খাচ্ছে, তা দেখে সকলে যথোচিত বিস্মিত হয়। হালদারকর্তার হৃদ-পরিবর্তন, সেও মায়েরই ইচ্ছে। হালদারকর্তা পাত্র না দেখে দয়া করেন না। তিনি স্বাধীন ভারতের বাসিন্দা, যে ভারত মানুষে-মানুষে, রাজ্যে-রাজ্যে, ভাষায়-ভাষায়, রাঢ়ী-বারেন্দ্র-বৈদিকে, উত্তররাঢ়ী, কায়স্থ ও দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থে কাপ-কুলীনে প্রভেদ করে না। কিন্তু তিনি পয়সা করেছেন বৃটিশ আমলে, যখন ডিভাইড অ্যান্ড রুল ছিল পলিসি। হালদারকর্তার মানসিকতা তখনই গঠিত হয়ে গেছে ! ফলে তিনি পাঞ্জাবি-উড়িয়া-বিহারি-গুজরাটি-মারাঠি-মুসলমান, কারুকে বিশ্বাস করেন না এবং দুর্গত বিহারি শিশু বা অনাহারে কাতর উড়িয়া ভিখারি দেখলে তাঁর বিয়াল্লিশ ইঞ্চি গোপাল গেঞ্জির নিচে অবস্থিত, চর্বিতে সুরক্ষিত হৃৎপিণ্ডে করুণার ঘামাচি আদপে চুলকোয় না। তিনি হরিসালের সুসন্তান। ফলে পশ্চিমবঙ্গের মাছি দেখলেও তিনি 'আঃ ! দ্যাশের মাছি আছিল রিষ্টপুষ্ট—ঘটির দ্যাশে হকলডি চিমড়া-চামসা' বলে থাকেন। সেই হালদারকর্তা গাঙ্গেয় কাঙালীচরণকে কেন্দ্র করে করুণাঘন হচ্ছেন, এ দেখে মন্দিরের চারিদিকে সকলেই বিস্মিত হয় এবং কিছুদিন ধরে লোকের মুখে মুখে এই কথাই ফেরে। হালদারকর্তা এমন ঘোর দেশপ্রেমী যে নাতি, ভাইপো, ভাগেরা দেশনেতাদের জীবনী পাঠ্যপুস্তকে পড়লে কর্মচারীদের বলেন, 'হঃ ! ঢাকার পোলা, মইমনসিংহের পোলা, যশুইরা পোলা, ইয়াগর জীবনী পড়ায় ক্যান্ ? হরিসাইলা অইল দধীচির হাড়ে তৈয়ার। ব্যাদ উপনিষদ হরি-

সাইলার লিখা, এ্যাও একদিন প্রকাশ পাইব।' তাঁর কর্মচারীরা তাঁকে এখন বলে, 'আপনার চেইন্‌জ অফ হার্ট হইত্যাছে, ঘটির লিগ্যা আপনার এই দয়া, ইয়ার পাছে দ্যাখবেন ঈশ্বরের কুন্‌ বা পার্পাস আছে।' কর্তা একথায় হ্লাদিত হন এবং 'ব্রাহ্মণের কি ঘটি-বাঙাল অয় ? গলায় উপবীত থাকলে হ্যায় পাইখানায় বইয়া রইলেও মাইন্য দিতে অইব' বলে উচ্চ হাস্য করেন।

চতুর্দিকে এভাবে মায়ের ইচ্ছার প্রভাবে করুণা-মায়ামমতা-দয়ার সুবাতাস বইতে থাকে এবং নবীন পান্ডা কয়েকদিন ধরে সিংহবাহিনীর কথা যতবারই ভাবতে যায়, যশোদার উত্তুঙ্গস্তনা, গুরুনিতম্বা শরীর তার চোখে ভাসে এবং মা যশোদাকে যেমন ধাই সেজে স্বপ্ন দিলেন, তাকে যশোদা সেজে স্বপ্ন দিচ্ছেন কিনা সেকথা ভেবে তার শরীরে মন্দ উত্তেজনা জাগে। আট-আনার পান্ডা তাকে বলে, 'মেয়েছেলের এ রোগ হলে বলে প্যাঁদ রোগ, বেটাছেলের হলে বলে ম্যাদ রোগ। তুই পেচ্ছাপ করার সময়ে কানে শ্বেত অপরাজিতার শেকড় বাঁদ্‌।'

একথা নবীনের মনে নেয় না। একদিন সে কাঙালীকে বলে, 'মায়ের ছেলে শাক্ত নিয়ে র‍্যালা করব না। তবে একটা বুদ্ধি মাথায় এয়েচে। বোস্টম ভাব নিয়ে র‍্যালা করতে বাধা নেই। তোকে বলি, স্বপ্নে গোপাল পা একখানা। আমার পিসি শ্রীকেত্তর থেকে গোপাল এনেছিল পাতরের। সেটা তোকে দিই। স্বপ্নে পেইছিস বলে প্রচার দে। দেকবি দুদিনে রমরমা হবে, ঝমঝমিয়ে পয়সা পড়বে। পয়সার জন্যে শুরু কর্‌, পরে মনে গোপাল-ভাব আসবে।'

কাঙালী বলে, 'ছি দাদা! ঠাকুর-দেবতা নিয়ে তামাশা করতে আছে?'

নবীন তাকে, 'তবে মর্‌গা যা!' বলে তাড়া দেয়। পরে দেখা যায়, নবীনের কথা শুনলে কাঙালী ভাল করত। কেন না, হালদারকর্তা হঠাৎ একদিন হার্টফেল করে মরে যান। কাঙালী ও যশোদার মাথায় শেক্ষপীরের ওয়েলকিন ভেঙে পড়ে।

॥ ২ ॥

কাঙালীকে পথে বসিয়ে যান হালদারকর্তা। কাঙালীকে ঘিরে ভায়া-মিডিয়া হালদারকর্তা, সিংহবাহিনীর যেসব ইচ্ছা প্রকাশ পাচ্ছিল, তা প্রাক্‌-ভোট রাজনীতিক দল-প্রদত্ত প্রজ্বলন্ত প্রতিশ্রুতির মতো শূন্যে মিলায় ও নিরুদ্দেশ-যাত্রার নায়িকার মতো রহস্যজালের মায়ায় অদেখা হয়। কাঙালী ও যশোদার

রঙিন স্বপ্নফানুসটিতে য়ুরোপীয় ডাইনির বিজ্ঞাপন ফুটকে যায় এবং স্বামী-স্ত্রী আতান্তরে পড়ে। ঘরে গোপাল, নেপাল ও রাধারাণী খাবার তরে আখুখুটে বায়না ধরে ও মায়ের মুখ খায়। শিশুদের এই 'ওদনের তরে' কান্নাকাটি খুবই স্বাভাবিক। কাঙালীচরণের চরণ খোয়া যাবার পর থেকে ওরা প্রত্যহ হালদার-বাড়ির সিধায় ভালমন্দ খেয়েছে। কাঙালীও ভাতের তরে কাতর হয় এবং মনে গোপাল-ভাব জাগিয়ে যশোদার বুকে মুখ খুঁজতে গিয়ে ধমক খায়। যশোদা একেবারে ভারতীয় রমণী, যে-রমণীর যুক্তি-বুদ্ধি-বিচারহীন স্বামীভক্তি ও সন্তানপ্রেমের কথা, অস্বাভাবিক ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা, সতী-সাবিত্রী-সীতা থেকে শুরু করে নিরুপা রায় ও চাঁদ-ওসমানি পর্যন্ত সকল ভারতীয় নারী জনমানসে জাগিয়ে রেখেছেন। এহেন স্ত্রীলোককে দেখেই সংসারের ন্যালা-মাকড়ারা বোঝে, ভারতের সেই ঐতিহ্য প্রবহমান—বোঝে এদের কথা মনে রেখেই এই সর্ব আপ্তবাক্য রচিত হয়েছে—

'স্ত্রীলোকের জান যেন কচ্ছপের প্রায়'—

'বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না'—

'পুড়বে নারী উড়বে ছাই
তবে নারীর গুণ গাই'—

বস্তুত, বর্তমান দুরবস্থার জন্য যশোদার একবারও স্বামীকে দুষতে ইচ্ছে যায় না। শিশুদের তরে যেমন, কাঙালীর তরেও তেমনি মমতা তার বুকে উছলে ওঠে। পৃথিবী হয়ে গিয়ে ফলে-শস্যে অক্ষম স্বামী ও নাবালক সন্তানদের ক্ষুধা মিটাতে ইচ্ছা যায়। যশোদার এই স্বামীর প্রতি বৎসল ভাবটির কথা জ্ঞানী-মুনিরা লিখে যাননি। তাঁরা প্রকৃতি ও পুরুষ এইভাবে নারী-পুরুষকে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু সে তাঁরা করেছেন আদ্য যুগে—যখন অন্য দেশ থেকে তাঁরা এই পেনিনসুলায় প্রবেশ করলেন। ভারতের মাটির গুণ এমনি, যে এখানে রমণীরা সবাই জননী হয়ে যায় এবং পুরুষেরা সবাই গোপাল-ভাবে আপ্লুত থাকে। সকল পুরুষই গোপাল ও সকল রমণী নন্দরাণী, এ ভাবটি যাঁরা অস্বীকার করে নানারূপে 'ইটার্নাল শী'—'মোনা লিসা'—'লা পাসিওনারিয়া'—'সিমন দ্য ব্যোভোআর'—ইত্যাদি পছন্দমতো কারেণ্ট পোস্টার পুরনো পোস্টারের ওপরে সাঁটাতে চান ও মেয়েদের সেভাবে দেখতে চান, তাঁরাও এ ভারতের ছানাপোনা। তাই দেখা যায় শিক্ষিত বাবুদের এ সকল অভীপ্সা বাইরের মেয়েছেলেদের জন্যে। ঘরে ঢুকলে তাঁরা বিপ্লবিনীদের মুখে ও ব্যবহারে নন্দরাণীকেই চান। প্রসঙ্গটি খুবই জটিল। এটি বুঝেছিলেন বলে শরৎচন্দ্রের নায়িকারা নায়কদের সতত

চারটি বেশি করে ভাত খাইয়ে দিতেন। শরৎচন্দ্রের এবং অন্যান্য অনুরূপ লেখকদের লেখার আপাতসরলতা আসলে খুব জটিল এবং সন্ধ্যেবেলা শান্ত মনে বেলের পানা খেয়ে চিন্তা করার কথা। পশ্চিমবঙ্গে যাঁরাই লেখাপড়া ও চিন্তাশীলতার কারবার করেন, তাঁদের জীবনে আমাশার প্রভাব অত্যন্ত বেশি এবং সে কারণে বেল ফলটিতে তাঁদের সমধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত। বেলফল-থানকুনি-বাসক-পাতাকে সমধিক গুরুত্ব দিই না বলে আমরা যে কত কি হারাচ্ছি তা নিজেরা বুঝি না।

যা হোক, যশোদার জীবনকথা বলতে বসে বারংবার বাই-লেনে ঢোকার অভ্যাস ঠিক নয়। পাঠকের ধৈর্য কিছু কলকাতার পথঘাটের ফাটল নয় যে দশকে-দশকে বেড়ে চলবে। আসল কথা হল, যশোদা সমধিক ফাঁপরে পড়ল। কর্তার শ্রাদ্ধ চলার কালে তারা লুসেপুসে খেল বটে, কিন্তু সব চুকেবুকে গেলে যশোদা রাধারাণীকে বুকে ধরে ও-বাড়িতে গেল। বাসনা, গিন্নিকে বলে-কয়ে তাঁর নিরামিষ হেঁসেলের রান্নার কাজ চেয়ে নেবে।

গিন্নির বুকে কর্তার শোক বেজেছিল খুব। কিন্তু উকিলবাবু জানিয়ে গেছেন, কর্তা এই বাড়ির মালিকানা, চালের আড়তের স্বত্ব তাঁকেই দিয়ে গেছেন। তিনি সেই বলে বুক বেঁধে আবার সংসার-সাম্রাজ্যের হাল ধরেছেন। মাছটা-মুড়োটা বাদ বলে বড় কষ্ট হয়েছিল। এখন দেখছেন উৎকৃষ্ট গাওয়া ঘি, গাঙ্গুরামের দই-সন্দেশ, ঘন ক্ষীর ও মর্তমান কলা খেয়েও কোনোমতে শরীরটা টিকিয়ে রাখা চলে। গিন্নি জলচৌকি আলো করে বসে আছেন। কোলে এক ছ-মেসে ছেলে, গিন্নির নাতি। এ পর্যন্ত ছয় ছেলের বিয়ে হয়েছে ও পঞ্জিকায় যেহেতু প্রায় মাসেই স্ত্রী-গ্রহণ অনুমোদিত, সেহেতু গিন্নির বাড়িতে একতলায় সার-সার আঁতুড়ঘর প্রায়শ ফাঁক যায় না। লেডি ডাক্তার ও সরলা ধাই এ বাড়ি ছাড়া হয় না। গিন্নির মেয়ে ছয়টি। তারাও দেড় বছরে পোয়াতি। তাই কাঁথা-কানি-ঝিনুক-বোতল-রবারক্লথ-বেবিজনসন্‌পাউডার-স্নানের গামলার এপিডেমিক লেগেই থাকে।

গিন্নি নাতিকে দুধ খাওয়াবার চেষ্টায় জেরবার হচ্ছেন ও যশোদাকে দেখে স্বস্তি পেয়ে যেন বললেন, 'মা আমার ভগবান হইয়া আসছ! এ্যারে দুধ দাও মা, পা ধরি। মায়ের অসুখ—তা এমুন পোলা যে বুতল মুখে ধরে না।' যশোদা তখনি ছেলেকে দুধ দিয়ে শান্ত করল। গিন্নির সনির্বন্ধ অনুরোধে যশোদা রাত ন-টা অবধি ওবাড়িতে থাকল এবং গিন্নির নাতিকে দফায় দফায় দুধ দিল। তার সংসারের জন্যে রাঁধুনি বামনী ভাত-তরকারি গামলা ভরে দিয়ে এল। ছেলেকে দুধ দিতেই যশোদা বলল, 'মা! কর্তা

তো কত কথাই বলিছিলেন। তিনি নেই, তাই সেকথা আর ভাবি না। কিন্তু মা! তোমার বামুন-ছেলের পা দুখানা নেই। আমার জন্য ভাবি না। কিন্তু সোয়ামি-ছেলের কথা ভেবে বলছি, যা হয় এট্টা কাজ দাও। নয় তোমার সোমসারে রান্না কাজ দিলে?'

'দেখি মা! চিন্তা কইরা দেখি।' গিন্নি কর্তার মতো বামুন-ভক্তা নন। তাঁর ছেলের দুপুরে বাই চাগানো দোষে কাঙালীর পা গেছে একথা তিনি পুরো মানেন না। নিয়তি কাঙালীরও, নইলে খটখটে রোদে ফিকফিক করে হেসে-হেসে পথ ধরে সে যাচ্ছিল কেন? তিনি মুগ্ধ ঈর্ষায় যশোদার ম্যামাল প্রোজেকশান দেখেন ও বলেন, 'কামধেনু কইরা তোমায় পাঠাইছিল বিধাতা। বাঁট টানলেই দুধ! আমার ঘরে যেগুলো আনছি, তাদের এ্যার সিকিভাগ দুধ-অ বুঠার নাই!'

যশোদা বলে, 'সে আর বলতে মা! গোপাল ছেড়ে দিল. বয়স হল তিন বছর। এটা তখনো পেটে আসেনি। তাতেও দুধ যেন বান ডাকত। কোত্থেকে আসে মা? খাওয়া নেই, মাথা নেই!'

একথা নিয়ে রাতে মেয়ে মহলে প্রচুর কথা হয় এবং রাতে ব্যাটাছেলেরাও একথা শোনেন। মেজ ছেলে, যাঁর স্ত্রী অসুস্থ এবং যাঁর ছেলে যশোদার দুধ খেল, তিনি সবিশেষ স্ত্রৈণ। অন্য ভায়েদের সঙ্গে তাঁর তফাত হল, ভাইরা পাঁজি দেখে সুদিন পেলেই সপ্রেম বা অপ্রেমে বা বিরক্ত মনে বা কারবারে গুণ-চটের কথা ভাবতে ভাবতে সন্তান সৃজন করেন। মেজ ছেলে একই ফ্রিকোয়েন্সিতে স্ত্রীকে গর্ভবতী করেন, কিন্তু তার পেছনে থাকে সুগভীর প্রেম। স্ত্রী বারবার গর্ভবতী হন, সে ভগবানের হাত! কিন্তু সেই সঙ্গে স্ত্রী যাতে সুন্দরী থাকেন, সেজন্যেও মেজ ছেলে আগ্রহী। ক্রমান্বয়ে গর্ভাধান ও সৌন্দর্যের কম্বিনেশন কি ভাবে করা যায়. একথা তিনি অনেক ভেবে থাকেন, কিন্তু কূল পান না। মেজ ছেলে আজ স্ত্রীর মুখে যশোদার সারপ্লাস দুধের কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ বলেন, 'পাইছি পথ!'

'কিয়ের পথ?'

'এই. তোমার কষ্ট বাচাইবার পথ।'

'কেমতে? আমার কষ্ট যাইব চিতায় উঠলে। বছর-বিয়ানীর আর শরীল সারে?'

'সারব, সারব. ভগবানের কল হাতে পাইছি যে! বছর বিয়াইবা, দ্যাহও থাকব।'

স্বামী-স্ত্রী পরামর্শ হল। স্বামী সকালে গিয়ে মায়ের ঘরে ঢুকলেন ও ঘুরে-

ঘুচুর করে কথা কইলেন। গিন্নি প্রথমটা গাঁইগুঁই করতে লাগলেন, কিন্তু তারপর স্বগতচিন্তা করতে করতে বুঝলেন প্রস্তাবটি লাখ টাকার। বউরা এসেছে, বউরা মা হবে। মা হলে ছেলেকে দুধ খাওয়াবে। যেহেতু যতদিন সম্ভব, ততদিনই মা হবে—সেহেতু ক্রমান্বয়ে দুধ খাওয়ালে চেহারা ঝটকাবে। তখন যদি ছেলেরা বারমুখো হয়, বা বাড়ির ঝিদের ওপর উৎপাত করে, গিন্নি কিছু বলতে পারবেন না। ঘরে পাচ্ছে না বলে বাইরে যাচ্ছে—হক কথা। তাই যশোদা যদি কাঁচ কাঁচাদের দুধ-মা হয়, তাহলে নিত্য সিধা, পুজোয় পার্বনে কাপড়, মাসান্তে কিছু টাকা দিলেই কাজ হয়। গিন্নির বাড়িতে আজ চাপড়াষষ্ঠী, কাল সুবচনী, পরশু মঙ্গলচণ্ডী ব্রত লেগেই থাকে। তাতেও যশোদাকে বামুন-এয়ো করা চলবে। তাঁর ছেলের কারণে যশোদার এত খোয়াব, পাপও ক্ষালন হবে।

যশোদা তাঁর প্রস্তাবে হাতে মন্ত্রিত্ব পেল। নিজের স্তন দুটিকে বড় মহার্ঘ মনে হল তার। রাতে কাঙালীচরণ খুনসুড়ি করতে এলে সে বলল, 'দেখ! এখন এর জোরে সংসার টানব। বুঝে শুনে ব্যবহার করবে।' কাঙালীচরণ সে রাতে গাঁই-গুঁই করল বটে, কিন্তু সিধাতে চাল-ডাল-তেল-আনাজের বহর দেখে তার মন থেকে গোপাল-ভাবটি নিমেষে চলে গেল। ব্রহ্মা-ভাবে সে উদ্দীপিত হল এবং যশোদাকে বুঝিয়ে বলল, 'পেটে সন্তান থাকলে তবে তো তোর বুকে দুধ আসবে। এখন সেকথা ভেবেই তোকে কষ্ট করতে হবে। তুই সতীলক্ষ্মী। নিজেও পোয়াতি হবি, পেটে ছেলে ধরবি, বুকে পালন করবি, এ তো জেনেই মা তোকে দ্বাইবেশে দেখা দিইছিল।'

যশোদা এ কথার যাথার্থ্য বুঝল ও সাশ্রুচোখে বলল, 'তুমি স্বামী, তুমি গুরু। যদি বিস্মরণ হয়ে না-না করি, তুমি সোজা করে দিও। কষ্ট আর কি বল? গিন্নিমা কি তেরটা বিয়োয়নি? গাছের কি ফল ধরতে কষ্ট হয়?'

অতএব সেই নিয়মই বহাল রইল। কাঙালীচরণ পেশাদারী পিতা হল। যশোদা হল প্রফেশনাল মা। বস্তুত যশোদাকে দেখলে এখন সেই সাধকমার্গের গানটির গভীরতা অবিশ্বাসীরও মনে জাগে। গানটি হল—

মা হওয়া কি মুখের কথা?

শুধু প্রসব করলে হয় না মাতা।

হালদার-বাড়ির একতলায় চক্‌মেলানো উঠোনের চারধারে বড়-বড় ঘরে বারোচোদ্দটি সুলক্ষণা গাভী হামেশা হামেহাল বজায় থাকে। দুজন ভোজপুরী গোমাতা জ্ঞানে তাদের পরিচর্যা করে। খোল-ভুসি-খড়-ঘাস-গুড় পাহাড়-পাহাড় আসে। হালদারগিন্নি বিশ্বাস করেন, গরু খাবে যত,

দুধ দেবে তত। যশোদার জায়গা এ বাড়িতে এখন গো-মাতাদের ওপরে। গিন্নির ছেলেরা ব্রহ্মাবতার হয়ে প্রজাদের সৃষ্টি করে। যশোদা প্রজা প্রপালিকা। তার দুগ্ধসঞ্চয় যাতে অব্যাহত থাকে সেদিকে হালদারগিন্নি কড়া নজর রাখলেন। কাঙালীচরণকে ডেকে বললেন, 'হ্যাঁ বামুন ছেলে? দোকানে ত তাড়ু নাড়তা, ঘরে পাকসাকের ভারটা নিয়া অরে আরাম দেও। নিজের দুটো, এখানে তিনটা, পাঁচটারে দুধ দিয়া ঘরে গিয়া পাকসাক করতে পারে?'

কাঙালীচরণের জ্ঞাননেত্র এভাবে খুলে গেল এবং নিচে এসে ভোজপুরীজয় তাকে খৈনি দিয়ে বলল, 'মা জী তো ঠিকহি বলেছে। হামরা গো মাতার ইতনা সেবা করি—তা তুর বহু তো জগৎমাতা আছে।'

এরপর থেকে কাঙালীচরণ বাড়ির রান্নার ভার তুলে নিল হাতে। ছেলেমেয়েদের করে তুলল কাজের সাগরেদ। ক্রমে সে থোড়ঘণ্ট, কলাই ডাল, মাছের অম্বল রাঁধতে বড়ই সেয়ানা হল এবং সিংহবাহিনীর প্রসাদী পাঁঠার মাথার মুড়িঘণ্ট রেঁধে নবীনকে খাইয়ে-খাইয়ে সেই দুর্দান্ত গেঁজেল মাতালকে নিজের বশীভূত করে ফেলল। ফলে নবীন কাঙালীকে নকুলেশ্বর শিবের মন্দিরে ঢুকিয়ে দিল। যশোদা প্রত্যহ রাঁধা ভাতব্যঞ্জন খেয়ে পি. ডব্লু. অফিসারের ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউণ্টের মতো ফুলে ফেঁপে উঠল। তার ওপর গিন্নিমা তাকে দুধ-উঠনো করে দিলেন। পোয়াতি হলে তার জন্যে আচার-ঝালনাড়ু-মোরব্বা পাঠাতে থাকলেন।

এই ভাবে অবিশ্বাসীদেরও প্রত্যয় জন্মাল, যশোদাকে সিংহবাহিনী এই কারণেই বগলে ব্যাগ নিয়ে ধাই হয়ে দেখা দিয়েছিলেন। নইলে নিরন্তর গর্ভধারণ, সন্তানপ্রসব, অপরের ছানাপোনাকে গাভীর মতো অকাতরে দুগ্ধদান কে কবে শুনেছে বা দেখেছে? নবীনের মন থেকেও মন্দ ভাব চলে গেল। পাঁঠার মাথা, কারণবারি, গাঁজা, এহেন উগ্র জিনিস খেয়েও তার শরীর আর তাতল না। মনে আপনা হতেই ভক্তিভাব এল। যশোদাকে সে দেখা হতেই 'মা! মা! মাগো!' বলে ডাকতে থাকল। চতুর্দিকে সিংহবাহিনীর মাহাত্ম্য বিষয়ে বিশ্বাস পুনর্জাগ্রত হল এবং অঞ্চলটির বাতাসে দেবীমাহাত্ম্যের ইলেক্ট্রিফাইং প্রভাব বইতে থাকল।

যশোদা-বিষয়ে সকলের ভক্তিভাব এমন প্রখর হল যে, বিয়ে-সাধ-অন্নপ্রাশন-পইতেয় সকলে তাকে ডেকে প্রধানা এয়োর সম্মান দিতে থাকল। যশোদার ছেলে বলে নেপাল-গোপাল-নেনো-বোঁচা-পটল ইত্যাদিকে সবাই সেই চোখে দেখতে থাকল, এবং যে যেমনটি বড় হল, পইতে নিয়ে মন্দিরে যাত্রী ধরে

আনতে থাকল। রাধারাণী, আলতারাণী, পদ্মরাণী, ইত্যাদি মেয়েদের জন্যে কাঙালীকে বর খুঁজতে হল না। নবীন আশ্চর্য তৎপরতায় মেয়েদের বর জুটিয়ে দিল ও সতী মায়ের সতী কন্যারা যে যার শিবের ঘর করতে গেল।

হালদার-বাড়িতে যশোদার আদর বেড়ে গেল। স্বামীরা খুশি, কেন না এখন আর তাদের পাঁজি উলটোতে দেখলে বউদের হাঁটুতে ঠকঠকি লাগে না। তাঁদের গোপালরা যশোদার স্তন্যে লালিত হচ্ছে বলে তাঁরা যথেচ্ছ গোপাল হতে পারেন বিছানায়। বউদের 'না' বলবার মুখ রইল না। বউরা খুশি। কেন না দেহের ডৌলটি ভাল থাকল। তারা যথেচ্ছ মেম কাটের জামা ও বডিস্ পরতে পারল। হোলনাইট সিনেমা দেখে শিবরাত্তির করার সময়ে ছেলেকে দুধ দিতে হল না। এ সবই সম্ভব হল যশোদার জন্যে। ফলে যশোদার মুখ খুলল এবং শিশুদের নিরন্তর স্তন দিতে দিতে গিন্নির ঘরে বসে সে ফুট কাটতে থাকল, 'মেয়েছেলে বিয়োবে, তার জন্যে ওষুধ রে, ব্লাডপেসার দেখা রে, ডাক্তার দেখানো রে। আদিখ্যেতা! এই তো আমি! বছর-বিউনি হইছি। তাতে কি শরীর চস্‌কাচ্ছে, না দুধ কমছে? কি ঘেন্না মা! শুনছি না কি ইঞ্জিশান দিয়ে সব দুধ শুকিয়ে ফেলছে। এমন কথাও শুনিনি কখনো!'

হালদারবাড়ির ছেলেদের মধ্যে যারা কিশোর, তাদের বাপ-জ্যেঠা-কাকারা গোঁফ গজাতেই ঝিদের আওয়াজ দিত। দুধ-মার দুধে তারাও মানুষ, তাই দুধ-মার বন্ধু ঝি-রাঁধুনিকে তারা এখন মাতৃভাবে দেখতে থাকল এবং মেয়ে-ইস্কুলের চারপাশে হাঁটাহাঁটি শুরু করল! ঝিয়েরা বলল, 'যশি! ভগবতী হয়ে এইছিলি তুই! তো' হতে বাড়ির হাওয়া পালটাল।'

ছোট ছেলে যখন একদিন উবু হয়ে যশোদার দুগ্ধদান দেখছে, তখন যশোদা বলল, 'তুমি বাছা, আমার নক্ষ্মী! বামুনের ঠ্যাং খুঁতো করিছিলে বলে তো এতসব হল। বল দেখি কার ইচ্ছেয় হল?'

ছোট হালদার বলল, 'সিংহবাহিনীর ইচ্ছে!'

তার জানতে ইচ্ছে হয়েছিল, ঠ্যাং নেই, তবু কাঙালীচরণ ব্রহ্মা হয় কি উপায়ে? কথাটা ঠাকুরদেবতার দিকে চলে গেল বলে, সেও প্রশ্নটি ভুলে গেল।

সবই সিংহবাহিনীর ইচ্ছে!

॥ ৩ ॥

পঞ্চাশের দশকে কাঙালীর ঠ্যাং কাটা যায়, আমাদের কাহিনী এই সময়ে পেঁছেছে। পঁচিশ বছরে, থুড়ি তিরিশ বছরে, যশোদা কুড়ি বার আঁতুড়ে ঢুকেছে। শেষের দিকের মাতৃত্বগুলো বেফয়দা যায়, কেন না, কেমন করে যেন হালদার-বাড়িতে নতুন হাওয়া ঢুকে পড়ল। ওই পঁচিশ না তিরিশ বছরের গণ্ডগোলটুকু সেরে নিই। কাহিনী যখন শুরু হয় তখনি যশোদা তিন ছেলের মা ছিল। তারপর তার সতেরো বার সন্তান-সম্ভাবনা হয়। হালদার গিন্নিও মরে গেলেন। তাঁর বড় ইচ্ছে ছিল, তাঁর শাশুড়ির যেমনটি হয়েছিল, তেমনটি বউদের কারো হোক। কুড়িটি সন্তান হলে আবার স্বামী-স্ত্রীর বিয়ে হবার নিয়ম ছিল বংশে। কিন্তু বউমারা বারো-তেরো-চোদ্দতে ক্ষান্ত দিল। দুর্বুদ্ধিবশত তারা স্বামীদের বোঝাতে সক্ষম হল এবং হাসপাতালে গিয়ে ব্যবস্থা করে এল। এ সবই নতুন হাওয়ার কুফলে ঘটল। কোনো যুগেই জ্ঞানী পুরুষ বাড়িতে নতুন হাওয়া ঢুকতে দেন না। দিদিমার কাছে শুনেছি জনৈক ভদ্রলোক তাঁর বাড়িতে এসে 'শনিবারের চিঠি' পড়ে যেতেন। কদাচ ঘরে বইটি ঢোকাতেন না। বলতেন, 'বউ-মা-বোন যে ওই কাগজ পড়বে, সেই বলবে আমি নারী! মা নই, বোন নই, বউ নই।' ফলে কি ঘটবে, তা জিগ্যেস করলে বলতেন, 'চটি পরে ভাত রাঁধবে।' নতুন হাওয়ার প্রকোপে অন্দরে অশান্তি হয়, এ চিরকালের নিয়ম।

হালদার-বাড়িতে চিরকাল ষোড়শ শতক চলছিল। কিন্তু সহসা বাড়িতে মেম্বর সংখ্যা অগণিত হল বলে ছেলেরা যে-যার মতো নতুন বাড়ি বানিয়ে সটকে পড়তে থাকল। সবচেয়ে আপত্তির কথা, মাতৃত্ব বিষয়ে গিন্নির নাতবৌরা একেবারে উলটো হাওয়া খেয়ে ঘরে ঢুকল। বৃথাই গিন্নি বললেন, চালের অভাব, টাকার অভাব নেই। কর্তার বড় সাধ ছিল হালদারদের দিয়ে অর্ধেক কলকাতা ভরে ফেলেন। নাতবৌরা নারাজ। তারা বুড়ির দাবিদাওয়া অগ্রাহ্য করে স্বামীদের নিয়ে কর্মস্থলে ছুটল। এরই মধ্যে সিংহবাহিনীর মন্দিরের পাণ্ডাদের মধ্যে বিষম কলহ হওয়াতে কে বা কাহারা যেন দেবীর মূর্তি ঘুরিয়ে দিল। মা মুখ ফিরিয়েছেন একথা শুনে গিন্নির বুক ভেঙে গেল এবং মনোদুঃখে ভরা জ্যৈষ্ঠে অসংগত পরিমাণে কাঁঠাল খেয়ে দাস্তবমি হয়ে তিনি মরে গেলেন।

॥ ৪ ॥

গিন্নি মরেই খালাস পেলেন, কিন্তু জ্যান্ত থাকার জ্বালা মরণ হতে বেশি। গিন্নির মৃত্যুতে যশোদার আন্তরিক দুঃখ হল। বয়স্ক মানুষ পাড়ায় মরলে বাসিনীর মতো সুবিন্যাসে কেউ কাঁদতে পারে না, বাসিনী এ বাড়ির পুরনো ঝি। কিন্তু যশোদার ভাতের থালাটি গিন্নির সঙ্গে বিসর্জন গেল, তাই যশোদা আরো সুবিন্যাসে কেঁদে সকলকে অবাক করে দিল।

বাসিনী কাঁদল, 'অ ভাগ্যিমানী মা! মাথার চুড়োটি খসতে কত্তা হয়ে সকলেরে যে আগলে রেকেছিলে মা! কার পাপে চলে গেলে মা গো! ওগো, আমি যে বন্নু. অত ক্যাঁটাল খেওনি, তা মোর কতা যে মোটে নিলে না গো মা!'

যশোদা বাসিনীকে দম নিতে সুযোগ দিল ও সেই বিরতিতে কেঁদে উঠল, 'কেন রইবে মাগো! ভাগ্যিমানী তুমি, পাপের সংসারে রইবে কেন বল গো মা! সিংহাসন পাতা ছিল তা যে তুলে ফেললে গো বউদিরা! গাচ যখন বলে ফল ধরবনি, সে যে পাপ গো! অত পাপ কি তুমি সইতে পার মাগো! তা বাদে সিংহবাহিনী যে মুক ফেরালে গো মা! বুঝিছিলে পুণ্যের পুরী পাপের পুরী হয়ে গেল, এ পুরীতে কি তুমি বাস কত্তে পার? কত্তা চলে যেতে তোমারো যে মন চলে গিইছিল গো মা! শরীলটা সংসারের দিকে চেয়ে ধরে রেখেছিলে বই তো নয়। অ বউদিরা! আলতা দিয়ে পায়ের ছাপ উঠিয়ে রাখ গো! ও পায়ের ছাপ ঘরে রইলে লক্ষ্মী বাঁদা থাকবে গো! সকালে উঠে ওতে মাতা ঠেকালে ঘরে রোগ দুঃখ ঢুকবে না গো!'

শবদেহের পেছন-পেছন যশোদা কেঁদে-কেঁদে শ্মশানে গেল ও ফিরে এসে বলল, 'স্বচক্ষে দেখনু সগ্‌গ থেকে রথ নেমে এসে চিতার বুক থেকে গিন্নিমাকে নিয়ে ওপরপানে চলে গেল।'

গিন্নির শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেলে বড় বউ যশোদাকে বললেন, 'বামুন দিদি! সংসারে তো ভাঙন ধরল। মেজ সেজ বেলেঘাটার বাড়িতে উইঠা যাইত্যাছে। রাঙা আর নতুন যাইত্যাছে মানিকতলা-বাগমারী। ছোট যাইব গিয়া আমাগো দক্ষিণেশ্বরের বাড়ি।'

'এখেনে কে থাকবে?'

'আমিই থাকুম। তবে গিয়া নিচতলা ভাড়া দিব হ্যায়। অহন সংসার গুটাইতে অইব। তোমার দুঃখে সবারে পালছ, নিত্য সিধা গেছে। হ্যায়

সন্তান দুধে ছারছে, তবুও আট বছর মা সিধা পাঠাইছে। উনি যা মন লয় তাই করছে। পোলারা কথা কয় নাই। কিন্তু অহন তো আর পারতাম না।'

'আমার কি হবে বড়বউদি?'

'তুমি যদি আমার সংসারে পাক-সাক কর, তোমার প্যাট চলব। কিন্তু ঘরের হকলডির কি করবা?'

'কি করব?'

'তুমিই কও। জেয়ন্তে তুমি বারো সন্তানের মা! মাইয়াগুলান্ বিয়া অইয়া গিছে। পুলারা ত শুনি যাত্রী ডাকে, মন্দিরে ভোগ খায়, চাতালে পইড়া থাকে। বামুনও ত শুনি নকুলেশ্বর মন্দির ভালই জমাইছে। তোমার অভাব কিসের?'

যশোদা চোখ মুছে বলল, 'দেখি! বামুনকে বলি।'

কাঙালীচরণের মন্দিরে এখন খুবই রমরমা। কাঙালী বলল, 'আমার মন্দিরে তুই কি করবি?'

'নরেনের বোনঝি কি করে?'

'সে মন্দিরের সোম্‌সার দেখে, রাঁধে-বাড়ে। তুই ঘরেই রাঁধিস না ক'দিন, মন্দিরের উঠ্‌নো তুই ঠেলতে পারিস?'

'ওবাড়ির সিধে উঠে গেল। সে কতা মাথায় ঢুকল ড্যাকরার? খাবে কি?'

নবীন বলল, 'সে তোকে ভাবতে হবে না।'

'এ্যাদ্দিন ভাবিয়েছিলে কেন? মন্দিরে খুব দু'পয়সা হচ্ছে, তাই না? সব জমিয়েছ আর আমার গতরজল করা ভাত খেয়েছ বসে বসে।'

'বসে বসে রাঁধত কে?'

যশোদা হাত নেড়ে বলল, 'বেটাছেলে এনে দেয়, মেয়েছেলে রাঁধে-বাড়ে আমার কপালে সকলই উলটো হইছিল। আমার ভাত খেয়েছ যখন, তখন আমাকে ভাত দেবে এখন। ন্যায্য কথা।'

কাঙালী ফস্ করে বলল, 'কোত্থেকে ভাত যোগাড় করলি? হালদার-বাড়ি তোর কপালে জুটত? আমার ঠ্যাং কাটা গেল বলেই না তোর কপালে ওবাড়ির দোর খুলল? কত্তা তো আমাকেই সব দেবেথোবে বলেছিল। সব ভুলে বসে আছিস মাগী?'

'তুমি মাগী না আমি মাগী? বউয়ের গতরে খায়, সে আবার বেটাছেলে!'

একথা থেকে দুজনের তুমুল কলহ বেধে গেল। দুজনে দুজনকে শাপশাপান্ত করল। অবশেষে কাঙালী বলল, 'তোর মুখ আর দেখব না, যাঃ!'

'না দেখলে না দেখবে।'

যশোদাও রেগে ঘর ছেড়ে বেরলো। ইতিমধ্যে পান্ডাদের শরিকে-শরিকে সট হয়েছে, ঠাকুরের মুখ ফেরাতে হবে, নইলে সমূহ সর্বনাশ! সে জন্যে মন্দিরে মহা ধুমধামে প্রায়শ্চিত্ত পুজো হচ্ছে। যশোদা সেখানে হত্যা দিতে গেল। দুঃখে তার প্রৌঢ়, দুগ্ধহীন, স্থূল বুক দুটি ফেটে যাচ্ছে। সিংহবাহিনী তার দুঃখ বুঝে পথ বাতলে দিন।

তিনদিন যশোদা চাতালে পড়ে থাকল। নতুন হাওয়া সম্ভবত সিংহ-বাহিনীও খেয়েছেন। তিনি মোটেই স্বপ্নে দেখা দিলেন না। উপরন্তু তিনদিন উপোসী থেকে কাঁপতে-কাঁপতে উঠে যশোদা যখন ঘরে গেল, ছোট ছেলে বলে গেল, 'বাপ মন্দিরে থাকবে। আমাকে আর নবাকে বলেছে তোরা ঘণ্টা বাজাবি, রোজ পেসাদ পাবি, পয়সা পাবি।'

'বটে! তা বাপ কোথা!'

'শুয়ে আছে। গোলাপী মাসি বাবার পিঠের খামাচি গেলে দিচ্চে। বলল, তোরা পয়সা দিয়ে ল্যাবেঞ্চুস খেগে যা! আমরা তাই তোকে বলতে এনু।'

যশোদা বুঝল, হালদার-বাড়িই নয়, কাঙালীর কাছেও তার দরকার ফুরিয়েছে। জলবাতাসা খেয়ে সে নবীনকে নালিশ করতে গেল। নবীনই সিংহবাহিনীর প্রতিমা হিঁচকে বিমুখ করেছিল ও অন্য পান্ডাদের সঙ্গে বাসন্তী পুজো, জগদ্ধাত্রী পুজা ও শারদ দুর্গাপুজার বিশেষ রোজগার বিষয়ে ফয়সালা হবার পর পুনর্বার প্রতিমাকে হিঁচড়ে মুখ ফিরিয়ে সে ব্যথিত নড়ায় পাকি মদ মালিশ করে গাঁজা টেনে বসেছিল এবং স্থানীয় ভোটের ক্যান্ডিডেটের উদ্দেশে বলছিল, 'পুজো দিলি নে তো? মায়ের মাহাত্ম্য আবার ফিরেছে। এবার দেখে নোব কেমন করে জিতিস!'

মন্দিরের আওতায় থাকলে এ দশকেও কি কি অলৌকিক ঘটনা ঘটে, নবীনই তার প্রমাণ। দেবীর মুখ সে নিজেই ফিরিয়েছিল এবং নিজেই বিশ্বাস করেছিল পান্ডারা ভোট-চাই দল সকলের মতো জোট বাঁধছে না বলে মা বিমুখ হয়েছেন। এখন মার মুখ ফেরাবার পর তার আবার ধারণা জন্মাল, মা নিজে ফিরেছেন।

যশোদা বলল, 'কি বকছ?'

নবীন বলল, 'মায়ের মাহাত্ম্যের কথা কইছি।'

যশোদা বলল, 'নিজে ঠাকুরের মুখ ঘুরিয়েছিলে তা জানি না ভেবেছ?'

নবীন বলল, 'চুপ কর যশি। ঠাকুর শক্তি দিলে, বুদ্ধি দিলে, তবে না আমা হতে কাজটা হল?'

'তোমাদের হাতে পড়ে মায়ের মাহাত্ম্যি গেল।'

'মাহাত্ম্যি গেল! গেলে পরে পাখা ঘুরছে, পাখার নিচে বসে আছিস, তা হল কি করে? চাতালের ছাতে ইলেট্রির পাখা এর আগে ঘুরেছে?'

'তা তো হল। এখন আমার কপাল পোড়ালে কেন, তাই কও দিখি? আমি তোমার কি করিছি?'

'কেন? ক্যাঙালী তো মরেনি?'

'মরবে কেন? মরার বাড়া হয়েছে।'

'কি হল?'

যশোদা চোখ মুছে ভারি গলায় বলল, 'এতগুলো পেটে ধরিছি, সেই বলে বাবুদের বাড়ি বাঁদাধরা দুধ-মা ছিলাম। জান তো সবই। কোনোদিন কুপথে হাঁটিনি।'

'আই ব্বাস্! তুই হলি গে মায়ের অংশ।'

'মা তো ভোগেরাগে রইল। অংশ যে অন্ন বিনে মরতে বসেছে। হালদারবাড়ি তো হাত ওঠালে।'

'তুই বা ক্যাঙালীর সঙ্গে ঝগড়া করতে গেলি কেন? বেটাছেলে ভাতের খোঁটা সয়?'

'তুমি বা তোমার বোনঝিকে হোথা গছালে কেন?'

'সে ঠাকুরের লীলে হয়ে গেল। গোলাপী যেয়ে মন্দিরে ধন্না দিত। তা ক্রেমে-ক্রেমে ক্যাঙালী বুঝল ও হচ্চে ঠাকুরের ভৈরব আর গোলাপী ওর ভৈরবী।'

'ভৈরবী! খ্যাংরা মেরে ওর হাত হতে সোয়ামী ছাড়িয়ে আনতে পারি এখনি।'

নবীন বলল, 'নাঃ! সে আর হতে হচ্চে না। ক্যাঙালী পুরুষ ছেলে, ওর আর তোতে মন ওঠে? তা বাদে গোলাপীর ভাইটে সাক্ষাৎ গুণ্ডা, সে হোথা যেয়ে পওরা দিচ্ছে। আমাকেই গেট আউট করে দিলে। আমি যদি দশ ছিলিম টানি, সে টানে বিশ ছিলিম। ক্যাঁকালে লাথি মেরে দিলে। যেয়েছিলাম তোর কথা বলতে। ক্যাঙালী বললে, ওর কতা আমায় বল না।

ভাতার চেনে না, বাবু-বাড়ি চেনে। বাবু-বাড়ি ওর ইষ্টদেবতা, সেথা যাক গা!'

'তাই যাব!'

বলে সংসারের অবিচারে পাগল-পাগল যশোদা ঘরে ফিরল। কিন্তু শূন্য ঘরে মন টেকে না। দুধ থাক না থাক, কোলের কাছে একটা ছেলে না থাকলে ঘুম আসে না। মা হওয়া বড় ভীষণ নেশা। সে নেশা দুধ শুকোলেও কাটে না। অগত্যা মান খুইয়ে যশোদা হালদারনীর কাছে গেল। বলল, 'রাঁধব বাড়ব, মাইনে দেবে দিও, না দেবে না দিও। হেথা থাকতে দিতে হবে। মিনসে নিজের মন্দিরে থাকতেছে। ছেলেগুলো কি বেইমান মা! সেথা গিয়ে জুটেছে। কার তরে ঘর আটকে রাখব মা?'

'তা থাকো। তুমি ছেলেদের দুধ দিছ, তায় বামুন। তা থাক। কিন্তু দিদি, থাকতে তোমার কষ্ট হইব। ওই বাসিনীদের লগে এক ঘরে থাকবা। ক্যারো, লগে ঝগড়াবিবাদ কইর না। বাবুর মাথা গরম। তায় সেজ পুলা বুম্বে গিয়া সেই দেশী মেয়ে বিয়া বসছে বইলা ম্যাজাজ মন্দ। ক্যাচাকেচি হইলে তাই চটব।'

সন্তান হবার ক্ষমতাই যশোদার লক্ষ্মী ছিল। সেটি খতম হতেই তার কপালে এত-এত দুর্গতি ঘটল। পাড়ার মায়ের ভক্তবাড়িগুলির শ্রদ্ধেয়া দুগ্ধবতী সতীসাধ্বী যশোদার এখন পড়তির সময়। মানুষের স্বভাবধর্ম হল উঠতির কালে অসংগত অহমিকা হয় এবং পড়তির কালে 'অবস্থা বুঝে নিনু হয়ে থাকি'—এ সারেন্ডার আসে না মনে। ফলে মানুষ তুচ্ছ জিনিস নিয়ে আগের দাপে দামড়াতে যায় ও ব্যাঙের লাথি খায়।

যশোদার কপালেও তাই হল। বাসিনীরা তার পা ধোয়া জল খেত। এখন বাসিনী অক্লেশে বলল, 'তুমি তোমার বাসন মেজে নেবে। তুমি কি মনিব, যে তোমার এঁটো বাসন মাজব? তুমিও মনিবের চাকর, আমিও।'

'জানিস আমি কে?'—বলে গর্জে উঠতে যশোদা বড় বউয়ের মুখ শুনল, 'এই লিগাই আমার ডর ছিল খুব। মায়ে অরে মাথায় উঠাইয়া দিয়া গেছে। দেখ বামুন দিদি! ডাইকা আনি নাই, সাইধা আসছ, অশান্তি কইর না।'

যশোদা বুঝল, এখন আর তার টুঁ কথাটিও কেউ শুনবে না। মুখ বুজে সে রাঁধল বাড়ল এবং বিকেলে মন্দিরের চাতালে গিয়ে কাঁদতে বসল। মন খুলে কাঁদতেও পারল না। নকুলেশ্বর মন্দির থেকে আরতির বাজনা শুনে ও চোখ মুছে উঠে এল। মনে মনে বলল, 'এবার দয়া কর মা! শেষে

কি টিনের বাটি হাতে পতে বসতে হবে? তাই চাও?'

হালদার-বাড়ি ভাত রেঁধে আর মায়ের কাছে মনোদুঃখ নিবেদন করে দিন কাটাতে পারত। কিন্তু যশোদার কপালে তা সইল না। যশোদার দেহ যেন এলে পড়ল। কেন কিছুতে ভাল লাগে না, যশোদা বোঝে না। মাথার ভেতর বিভ্রম সব। রাঁধতে বসলে মনে হয় সে এ বাড়ির দুধ-মা। কস্তাপেড়ে শাড়ি পরে সে সিধে নিয়ে ঘরে যাচ্ছে। স্তন দুটি বড় শূন্য লাগে, যেন বরবাদ। স্তনবৃন্তে শিশুর মুখ নেই, এ তার জীবনে ঘটবে বলে ভাবেনি।

খুব অন্যমনস্ক হয়ে গেল যশি। ভাত তরকারি প্রায় সবই বেড়ে দেয়, নিজে খেতে ভুলে যায়। মাঝে মাঝে নকুলেশ্বর শিবের উদ্দেশে বলে, 'মা না পারে, তুমিই আমায় সরিয়ে নাও। আর পারি না।'

শেষে বড় বউয়ের ছেলেরাই বলল, 'মা! দুধ-মার শরীর কি অসুস্থ? কেমন যেন হইয়া গেছে?'

বড় বউ বলল, 'দেখি!'

বড়বাবু বলল, 'দেখ! বামুনের মাইয়া, কিছু অইলে আমাগো পাপ অইব।'

বড় বউ জিগোস করতে গেল। ভাত চড়িয়ে যশোদা রান্নাঘরেই আঁচল পেতে শুয়েছিল। বড় বউ তার আদুড় গা দেখে বলল, 'বামুন দিদি! তোমার বাঁও মাইয়ের উপরটা লাল মতো দেখায় ক্যান? ইশ! দগদগা লাল!'

'কি জানি। ভেতরে যেন পাতর ঠেলে উঠেচে। বড় শক্ত, তিল পারা।'

'কি অইল?'

'কি জানি? এতগুলোকে দুধ দিইছি, তাতেই হয়ত অমন ধারা হল!'

'খুর! ঠুনকা হয়, মাইঠোস হয় দুগ্ধ থাকলে। তোমার তো কুলেরটা দশ বছইরা।'

'সেটা নেই গো! তার উপরেরটা আছে। সেটা তো আঁতুড়ে গেছে। গেছে, ভাল গেছে। পাপের সংসার!'

'রও কাল ডাক্তার আইব নাতিরে দেখতে। তারে জিগামু। আমি য্যান্ ভাল দেখি না।'

যশোদা চোখ বুজে বলল, 'যেন পাতরের মাই গো, পাতর পোরা। আগে শক্ত গুলিটা সরত নড়ত, এখন আর নড়ে না, সরে না।'

'ডাক্তাররে দেখামু।'

'না বউদিদি, বেটাছেলে ডাক্তারের কাছে আমি গা আদ্দুড় করতে পারব না।'

রাতে ডাক্তার আসতে ছেলেকে সামনে রেখে বড় বউ জিগ্যেস করল। বলল, 'ব্যথা নাই, জ্বালা নাই, কিন্তু হ্যায় জানি আলাইয়া পড়ত্যাছে।'

ডাক্তার বললেন, 'জেনে আসুন দিকি, কুঁচকে গেছে না কি নিপ্‌ল, বগলের নিচটা বিচিকোলা মতো কি না।'

'বিচিকোলা' শুনে বড় বউয়ের মনে হল ছিঃ! কি অসভ্য! তারপর সরজমিনে তদন্ত সেরে এসে বললেন, 'কয়, অনেকদিন থইরাই আপনে যা যা বললেন, তা হইছে।'

'বয়স কত?'

'বড় ছেলের বয়স ধল্লে পরে পঞ্চান্ন হবে।'

ডাক্তার বললেন, 'ওষুধ দেব।'

বেরিয়ে গিয়ে বড়বাবুকে বললেন, 'আপনার কুকের ব্রেস্টে কি হয়েছে শুনলাম। আমার মনে হয় ক্যানসার-হাসপাতালে নিয়ে দেখানো ভাল। চোখে দেখিনি। তবে যা শুনলাম, তাতে ম্যামারি গ্ল্যান্ডে ক্যানসার হতে পারে।'

বড়বাবু ষোড়শ শতকে সেদিন অব্দি ছিলেন। অতি ইদানীং তিনি বিংশ শতকে এসেছেন। তেরটি সন্তানের মধ্যে মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন এবং ছেলেরা যে যার পথে মতে বড় হচ্ছে, বড় হয়েছে। কিন্তু এখনো তাঁর মগজের বুদ্ধিকোষ অষ্টাদশ এবং প্রাক্-রেনেসাঁস উনিশ শতকীয় অজ্ঞানের অন্ধকারে ঢাকা। আজও তিনি বসন্তের টিকা নেন না ও বলেন, 'বসন্ত হয় ছুডলোকের। আমার টিকা লইতে লাগত না। উচ্চ বংশ, দেবদ্বিজে ভক্তিমান বংশে ও রোগ হয় না।'

'ক্যানসার' শুনে তিনি উড়িয়ে দিলেন ও বললেন, 'হঃ! হইলেই হইল ক্যানসার! অতই সোজা! কি শুনতে কি শুনছেন, যান, মলম দিলেই সারব। আপনের কথায় আমি বামুনের মাইয়ারে হাসপাতালে পাঠাইতে পারব না।'

যশোদাও শুনেমেলে বলল, 'হাসপাতালে যেতে পারবনি বাপু। তার চে আমায় মত্তে বল। ছেলে বিয়োতে হাসপাতালে গেলাম না, এখন যাব? হাসপাতালে গেছল বলে তো মীড়পোড়া ঠ্যাং দুটো খুঁতো করে ফিরে এল!'

বড় বউ বলল, 'সিদ্ধমলম আইনা দেই লাগাও। সিদ্ধমলমে ঠিক আরাম

হইব। গুপ্ত ফোড়া মুখ লইয়া যাইব।'

সিম্বমলমে কোনোই কাজ হল না এবং ক্রমে যশোদা খাওয়াদাওয়া ছেড়ে হীনবল হল। বাঁ দিকে আঁচল রাখতে পারে না। কখনো মনে হয় জ্বালা, কখনো মনে হয় ব্যথা। অবশেষে চামড়া ফেটে ফেটে ঘা দেখা দিল। যশোদা বিছানা নিল।

ভাবগতিক দেখে বড়বাবুর ভয় হল, বুঝি তার ভিটেতে বামুন মরে। যশোদার ছেলেদের ডেকে সে ধমকে বলল, 'যা হয়, এতদিন খাওয়াইছে, এখন হ্যায় যে অসুখে মরে। তোরা নিয়া যা! হকলাড থাকতে হ্যায় কায়েতের ভিটায় মরব?'

কাঙালী একথা শুনে বড়ই কাঁদল ও যশোদার প্রায়ান্ধকার ঘরে এসে বলল, 'বউ! তুই সতীলক্ষ্মী! তোকে হেনস্তা করার পর দু বছরের মধ্যে মন্দিরের বাসন চুরি হল, আমার পিঠে ফোড়া হয়ে ভুগলাম, গোলাপী হারামজাদী ন্যাপলাটাকে ভুলিয়ে বাক্স ভেঙে সর্বস্ব নিয়ে তারকেশ্বরে দোকান দিলে। চ, তোরে আমি মাথায় করে রাখব।'

যশোদা বলল, 'বাতিটা জ্বাল।'

কাঙালী বাতি জ্বালল।

যশোদা অনাবৃত ও ঘা-বিজবিজে বামস্তন দেখিয়ে বলল, 'ঘা দেখেছ? ঘায়ের গন্ধ কেমন জান? এখন নিয়ে যেয়ে কি করবে? নিতে বা এলে কেন?'

'বাবু ডাকলে।'

'বাবু তবে রাখতে চাইছে না।'—যশোদা নিশ্বাস ফেলল, ও বলল, আমারে দিয়ে কোনো সুসার হবেনি জান? নিয়ে যেয়ে করবে বা কি?'

'তা হোক, কাল নে যাব। আজ ঘর পস্কের করে রাখি! কাল নিঘ্যাস নে যাব।'

'ছেলেরা ভাল আচে? মাঝে মধ্যে নবলে আর গৌরটা আসত, তাও আসে না।'

'সব বেটা সাথপর। আমার ইয়েতে জন্ম তো? আমার মতোই অমানুষ।'

'কাল আসবে?'

'আসব—আসব—আসব।'

যশোদা সহসা হাসল। সে হাসি বড়ই বুকে দাগা-দেওয়া ও প্রাচীন স্মৃতির কথা মনে-পড়ানো।

যশোদা বলল, 'হ্যাঁ গো মনে আছে ?'

'কি মনে থাকবে বউ ?'

'এই মাই নিয়ে তুমি কত সোহাগ কত্তে ? নইলে তোমার ঘুম হত্তো না ? কোল খালি হতো না, এটা বোঁটা ছাড়ে তো ওটা ধরে, তায় বাবুর বাড়ির ছেলেগুলো ! কি করে পাত্তাম, তাই ভাবি !'

'সব মনে আছে বউ !'

কাঙালীর এ কথাটি এ মুহূর্তে সত্য। যশোদার ক্লিষ্ট, শীর্ণ, কাতর চেহারা দেখে কাঙালীর স্বার্থপর দেহ ও প্রবৃত্তি এবং উদরসর্বস্ব চেতনাও অতীত স্মরণে মনঃকাতর হল। সে যশোদার হাতটি ধরল ও বলল, 'তোর জ্বর ?'

'জ্বর তো হয়ই। আমি ভাবি ঘায়ের তাড়সে ?'

'এমন পচা গন্ধ কোত্থেকে আসছে ?'

'এই ঘা হতে।' যশোদা চোখ বুজে বলল।

তারপর বলল, 'তুমি বরং সন্নিসী ডাক্তারকে দেখিও। তিনি হোমোপাথি দিয়ে গোপালের টাইফয়েড সারিয়েছিল।'

'ডাকব। কালই নে যাব তোকে।'

কাঙালী চলে গেল। সে যে বেরিয়ে গেল, ক্রাচের খটখট শব্দ যশোদা শুনতে পেল না। চোখ বুজে, কাঙালী ঘরে আছে জ্ঞানে নিস্তেজে বলল, 'দুধ দিলে মা হয়, স—ব মিছে কতা ! না নেপাল-গোপালরা দেখে, না বাবুর ছেলেরা উঁকি মেরে এট্টা কতা শুধোয়।'

ঘা-গুলি শত মুখে, শত চোখে যশোদাকে ব্যঙ্গ করতে থাকল। যশোদা চোখ মেলে বলল, 'শুনচ ?'

তারপরই সে বুঝল কাঙালী চলে গেছে।

রাতেই সে বাসিনীকে দিয়ে লাইফবয় সাবান আনাল ও ভোর হতে সাবান নিয়ে নাইতে গেল। গন্ধ, কি দুর্গন্ধ ! বেড়াল-কুকুর ডাস্টবিনে পচলে এমন গন্ধ হয়। যশোদা চিরকাল, বাবুদের ছেলেরা স্তনবৃন্ত মুখে দেবে বলে কত যত্নে তেলে-সাবানে স্তন দুটি মার্জনা করেছে। সেই স্তন তার এমন বেইমানি করল কেন ? সাবানের ঝাঁঝে চামড়া জ্বলে ওঠে। যশোদা তবু সাবান দিয়ে স্নান করে এল। মাথা ঝিমঝিম করে, সব যেন আঁধার আঁধার। যশোদার শরীরে আগুন, মাথায় আগুন। কালো মেঝেটি বড় ঠাণ্ডা। যশোদা আচল বিছিয়ে শুল। স্তনের ভার সে দাঁড়িয়ে সইতে পারছিল না।

সেই যে শুল যশোদা, জ্বরে অজ্ঞান ও বিবশ। কাঙালী ঠিক সময়েই

এল ; কিন্তু যশোদাকে দেখে সে বুদ্ধি হারিয়ে ফেলল। অবশেষে নবীন এসে ধমকে বলল, 'এরা কি মানুষ? সবগুলো ছেলেকে দুধ দিয়া বাঁচাল তা এট্টা ডাক্তার ডাকে না? হরি ডাক্তারকে ডেকে আনছি।'

হরি ডাক্তার দেখেই বললেন, 'হাসপাতাল।'

এমন রুগী হাসপাতালে নেয় না। কিন্তু বড়বাবুর চেষ্টায় ও সুপারিশে যশোদা হাসপাতালে ভর্তি হল।

'কি হয়েচে? অ ডাক্তারবাবু, কি হয়েচে'—কাঙালী বালকের মতো কেঁদে জিগ্যেস করল।

'ক্যানসার।'

'মাইয়ে ক্যানসার হয়?'

'নইলে হল কি করে?'

'নিজের কুড়িটা, বাবুদের বাড়ির তিরিশটা ছেলে—খুব দুধ ছিল ডাক্তারবাবু—'

'কি বললে? কতজনকে ফীড করেছে?'

'তা পঞ্চাশ জনা তো হবে।'

'প—ঞ্চা—শ—জ—ন?'

'হ্যাঁ বাবু।'

'ওর কুড়িটা সন্তান হয়েছে?'

'হ্যাঁ বাবু।'

'গড্!'

'বাবু!'

'কি?'

'এত মাই খাওয়াত বলেই কি—?'

'তা বলা যায় না ক্যানসার কেন হয়, তা বলা যায় না। তবে বুকের দুধ যারা অতিরিক্ত খাওয়ায়—আগে বোঝনি? একদিনে তো এমনটা হয়নি?'

'আমার কাছে ছিল না বাবু। ঝগড়া করে—'

'বুঝেছি।'

'কেমন দেখছেন? ভাল হবে তো?'

'ভাল হবে। কদিন থাকে সেই দেখ। এনেছ তো শেষ অবস্থায়। এ অবস্থা থেকে কেউ বাঁচে না।'

কাঙালী কাঁদতে কাঁদতে চলে এল। বিকেলে, কাঙালীর কান্নাকাটিতে

বিপর্যস্ত হয়ে বড়বাবুর মেজছেলে ডাক্তারের কাছে গেল। যশোদার জন্যে তার সামান্যই উৎকণ্ঠা ছিল, কিন্তু বাবা হুড়কো দিলেন—সে বাবার টাকার ওপর নির্ভর করে।

ডাক্তার তাকে সব বুঝিয়ে বললেন। একদিনে হয়নি, বহুদিন ধরে হয়েছে। কেন হয়েছে? তা কেউই বলতে পারে না। বুকের ক্যানসার কি ভাবে বোঝা যাবে? স্তনের ওপর দিকে ভেতরে শক্ত গুলি, সেটা সরানো চলে। তারপর ক্রমে ভেতরের গুলি শক্ত ও বড় ও জমাট চাপের মতো হল। চামড়া কমলারঙা হওয়া প্রত্যাশিত, যেমন প্রত্যাশিত স্তনবৃন্তের সংকোচন। বগলের নিচে গ্ল্যান্ডটি আওরে উঠতে পারে। আলসারেশন, অর্থাৎ ঘা যখন হল, তখন বলা চলে শেষ অবস্থা। জ্বর? সেটা দ্বিতীয় বা তৃতীয় পর্যায়ে পড়বে গুরুত্বের দিক থেকে। শরীরে বা জাতীয় কিছু থাকলে জ্বর হতেই পারে। সেটা সেকেন্ডারি।

এতগুলি বিশেষজ্ঞ-কথা শুনে মেজছেলের মাথা গুলিয়ে গেল। সে বলল, 'বাঁচব?'

'না।'

'কদ্দিন কষ্ট পাইব?'

'মনে হয় না বেশি দিন।'

'কিছুই যখন করার নাই, কি চিকিৎসা করবেন?'

'পেইনকিলার, সেডেটিভ, জ্বরের জন্যে অ্যান্টিবায়োটিক। শরীরও তো ডাউন খুব, খুবই।'

'খাওয়া ছাইরা দিছিল।'

'কোনো ডাক্তার দেখান নি?'

'দেখাছিল।'

'বলেন নি?'

'বলছিল।'

'কি বলেছিলেন?'

'ক্যানসার অইতে পারে। আসপাতালে লইতে বলছিল। হ্যায় যাইতে চায় নাই।'

'চাইবে কেন? মরবে যে!'

মেজছেলে বাড়ি ফিরে এসে বলল, 'তখন যে অরুণ ডাক্তার কইল ক্যানসার হইছে, তখন লইলেও বাঁচত বুঝি!'

তার মা বলল, 'অতই যদি বুঝিস তবে লইস নাই ক্যান? আমি কি

বাধা দিছিলাম ?'

মেজছেলে ও তার মার মনের কোথাও অজানা পাপবোধ ও অনুশোচনা পচা ও আবদ্ধ জলে বুদ্বুদের মতো জাগছিল ও নিমেষে লয় পাচ্ছিল।

পাপবোধ বলছিল—আমাদের কাছেই আছিল, কুনদিন দেখি নাই উঁকি মাইরা, কবে বা হইছিল রোগ, গুরুত্ব দেই নাই। হ্যায় তো আবুইদা মানুষ, আমাদের এত জনরে পালছিল, দেখি নাই অরে। অহন হকলে রইতে আসপাতালে গিয়া মরতাছে, পুলা এতগুলা, স্বামী আছে, আমাদের আকড়াইয়া ধরছিল যহন, তহন আমাদেরই—' এইও তাজা শরীর আছিল, দুধ বাইরাইত ঠিকরু দিয়া, কুনদিন ভাবি নাই হেয়ার এই রোগ অইব।

পাপবোধের লয় বলছিল—নিয়তি কে খণ্ডাইতে পারে ? হেয়ার কপালে আছে ক্যানসারে মরণ—ঠেকাইবা কাডা ? আমাদের এহানে মরলে দোষ অইত—হেয়ার স্বামীপুত্র কইত কি কইরা মরল ? অহন হেই দোষ হইতে বাচছি। কেও কিছু বলতে পারত না।

বড়বাবু ওদের আশ্বস্ত করে বলল, 'অহন অবুধ ডাক্তার কইতাছে ক্যানসার হইলে কেও বাচে না। বামুন দিদির যেই ক্যানসার হইছে তা অইলে মাই কাইটা ফালায়, জরায়ু বাদ দেয়, হেয়ার পরও মাইনষে ক্যানসারে মরে। দেহ, বাবায় বামুন বইলা বড় ভক্তি দিয়া গিছে—বাবার দয়ায় আমরা বাইচা আছি। ভিটায় বামুনদিদি মরলে প্রায়শ্চিত্ত করতে অইত।'

যশোদার চেয়ে কম আক্রান্ত রোগী কত আগে মরে, যশোদা ডাক্তারদের আশ্চর্য করে প্রায় এক মাস টিকে রইল হাসপাতালে। প্রথম প্রথম কাঙালী, নবীন, ছেলেরা যাতায়াত করেছিল বটে, কিন্তু যশোদা একই রকম আছে, কোমাটিক, জ্বরে ভাজা-ভাজা, আচ্ছন্ন। স্তনের ক্ষতগুলি ক্রমেই বড় বড় হাঁ করছে এবং স্তনটির চেহারা এখন এক নগ্ন ক্ষতসদৃশ। অ্যাণ্টিসেপটিক লোশন নিষিক্ত পাতলা গজ কাপড়ে সেটি আবৃত, কিন্তু গলিত মাংসের তীব্র গন্ধ ঘরের বাতাসে ধূপের ধোঁয়ার মতো নীরবে ও চক্রাকারে ছড়াচ্ছে সর্বদা। তা দেখে কাঙালীদের উৎসাহে ভাটা পড়ল ও ডাক্তারও বললেন, 'সাড়া দিচ্ছে না ? না দিলেই তো ভাল। অজ্ঞানেই সওয়া যায় না, সজ্ঞানে কেউ ঐ যমযন্ত্রণা সইতে পারে ?'

'কিছু জানছে, আমরা আসি যাই বলে ?'

'বলা কঠিন।'

'খাচ্ছে কিছু ?'

'নল দিয়ে।'

'তাতে মানুষ বাঁচে?'

'এখন যে খুব—'

ডাক্তার বুঝলেন, যশোদার এ অবস্থার জন্য তাঁর মনে অহেতুক রাগ হচ্ছে। যশোদার ওপর, কাঙালীর ওপর, যেসব মেয়েরা ব্রেস্ট-ক্যানসারের লক্ষণকে যথেষ্ট সিরিয়াসলি নেয় না, এবং আখেরে বীভৎস নরক যন্ত্রণায় মরে, তাদের ওপর। ক্যানসার, রোগী ও ডাক্তারকে নিয়ত পরাজিত করে। একটি রোগীর ক্যানসার মানে রোগীর মৃত্যু এবং বিজ্ঞানের পরাজয়, ডাক্তারের তো বটেই। সেকেণ্ডারি সিম্পটমের ওষুধ দেওয়া যায়, খাওয়া বন্ধ হলে ড্রিপ দিয়ে শরীরকে গ্লুকোজ খাওয়ানো চলে, শ্বাস নিতে ফুসফুস অপারগ হলে অক্সিজেন—কিন্তু ক্যানসারের অগ্রগমন, প্রসারণ, ব্যাপ্তি, হত্যা, অব্যাহত থাকে। ক্যানসার শব্দটি এক সাধারণ সংজ্ঞা, এ সংজ্ঞা দ্বারা শরীরের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ম্যালিগন্যাণ্ট গ্রোথ বোঝায়। 'দি গ্রোথ ইজ পার্পাসলেস, প্যারাসাইটিক অ্যান্ড ফ্লারিশেস অ্যাট্ দি এক্সপেন্স অফ দি হিউম্যান হোস্ট।' এর চারিত্রবৈশিষ্ট্য হল, সংক্রমিত শরীরাংশকে ধ্বংসকরণ, মেটাস্টাসিয়া দ্বারা ব্যাপ্তি, রিমুভালের পর প্রত্যাবর্তন, টক্সিমিয়া সংঘটন।

কাঙালী তার প্রশ্নের সদুত্তর না পেয়ে বেরিয়ে এল। মন্দিরে এসে সে নবীন ও ছেলেদের বলল, 'আর যেয়ে লাভ নেই। চিনতে প্যারে না, চোখ খোলে না, জানতে পারে না। ডাক্তার যা পারে কত্তেছে।'

নবীন বলল, 'যদি মরে যায়?'

'বড়বাবুর টেলিফোন নম্বর আচে, বলবে।'

'ধর যদি তোমারে দেকতে চায়। সতীলক্ষ্মী বউ তোমার ক্যাঙালী! কে বলবে এতগুনোর মা! শরীর দেকলে—তা কোনো দিকে হেলেনি, চায়নি।

বলতে বলতে নবীন গুম মেরে গেল। বস্তুত, অচৈতন্য যশোদার ক্ষতাক্রান্ত স্তন দেখার পর তার গাঁজা-চরস-মদ জারিত ঘোলাটে মাথায় বহু দার্শনিক চিন্তা ও দেহতত্ত্বের কথা মিথুনমত্ত ঢোঁড়া সাপের মতো মন্থর খেলা করে। যেমন,—ওর জন্যেই এত আকুলি-ব্যাকুলি ছিল?—সেই মনমাতানো বুকের এই পরিণাম? হোঃ! মানবদেহ কিস্সু নয়। তার তরে পাগল হয় যে, সেও পাগল।

কাঙালীর এত কথা ভাল লাগল না। যশোদার প্রতি তার মন থেকেই রিজেকশান এসে গিয়েছিল। সেদিন হালদার-বাড়ি যশোদাকে দেখে মন

সত্যিই কাতর হয় ও হাসপাতালে নেবার পরও ব্যাকুলতা থাকে। কিন্তু সে অনুভূতি ঠাণ্ডা মেরে আসছে এখন। ডাক্তার যখনি বলেছে যশোদা বাঁচবে না, সে মন থেকে যশোদাকে প্রায় অকষ্টে বাদ দিয়েছে। তার ছেলেরাও তারই ছেলে। তা-ছাড়া মা তাদের কাছে অনেকদিনই দূরের মানুষ হয়ে গেছে। মা মানে চুড়ো করে বাঁধা চুল, থপথপে কাপড়, প্রবল ব্যক্তিত্ব। হাসপাতালে যে শুয়ে আছে, সে অন্য কেউ, মা নয়।

স্তনের ক্যানসারে ব্রেন কোমাটোজ হয়, যশোদার বেলা সেটি মুশকিল-আসান হল।

সে যে হাসপাতালে এসেছে, হাসপাতালে আছে, তা বুঝল যশোদা এবং এও বুঝল, এই যে বিবশকারী ঘুম, এ ওষুধের ঘুম। তাতে খুব স্বস্তি হল তার। এবং দুর্বল ও আক্রান্ত, আচ্ছন্ন মস্তিষ্কে মনে হল, হালদার-বাড়ির কোনো ছেলেটা কি ডাক্তার হয়েছে? নিশ্চয় তার দুধ খেয়েছে বলে এখন দুধের ঋণ শুধছে। কিন্তু ওবাড়ির ছেলেরা তো স্কুল না পেরোতে কারবারে ঢোকে! যেই হোক, যারা এত করছে তারা বুকের দুর্গন্ধময় উপস্থিতিটা থেকে তাকে মুক্তি দেয় না কেন? কি দুর্গন্ধ, কি বেইমানি? এই স্তনকে সে ভাতের যোগানদার জেনে নিয়ত গর্ভ ধরে দুধে ভরে রাখত। স্তনের কাজই দুধ ধরা! কত গন্ধসাবানে স্তন মেজে পরিষ্কার রাখত, বড্ড ভারী ছিল বলে জামা পরেনি যৌবনেও।

সেডেশান কমে এলেই যশোদা চেঁচিয়ে ওঠে 'আঃ! আঃ! আঃ'— এবং ব্যাকুল ঘোলাটে চোখে নার্স ও ডাক্তারকে চায়। ডাক্তার এলে সাভিমানে বিড়বিড় করে বলে, 'দুধ খেয়ে এত বড়টা হলে, এখন এমন কষ্ট দিচ্ছ?'

ডাক্তার বলে, 'বিশ্বসংসারে দুধ-ছেলে দেখছে।'

আবার ইঞ্জেকশন ও আবার নিদ্রাচ্ছন্ন অসাড়তা। যন্ত্রণা, ভীষণ যন্ত্রণা, 'অ্যাট দি এক্সপেন্স অফ দি হিউম্যান হোস্ট' ক্যানসার সংক্রমিত হচ্ছে। ক্রমে যশোদার বাম স্তন ফেটে আগ্নেয়গিরির ক্রেটার-সদৃশ হল। পূতিগন্ধে কাছে যেতে কষ্ট হয়।

শেষে এক রাতে, যশোদা বুঝল তার পা ও হাত ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। ও বুঝল এবার মৃত্যু আসছে। চোখ খুলতে পারল না যশোদা, কিন্তু বুঝল, কেউ কেউ তার হাত দেখছে। সূচ বিঁধল বাহুতে। ভেতরে শ্বাসের কষ্ট। হতেই হবে। কারা দেখছে? তারা কি তার আপন কেউ? যাদের পেটে ধরেছিল বলে দুধ দেয়, ভাতের জন্যে যাদের দুধ দেয়, যশোদার

মনে হল সে তো বিশ্বসংসারকে দুধ দিয়েছে, তবে সে কি একা একা মরতে পারে? যে ডাক্তার রোজ দেখছে সে, যে ওর মুখে চাদর টেনে দেবে সে, যে ওকে ট্রলিতে তুলবে সে, যে ওকে শ্মশানে নমাবে সে, যে ওকে চুল্লিতে দেবে সে-ডোম, সবাই তার দুধ-ছেলে। বিশ্বসংসারকে দুধে পালতে যশোদা হতে হয়। নির্বান্ধবে একলা মরতে হয়, মুখে জল দিতে কেউ থাকে না। অথচ শেষ সময়টা কারো থাকার কথা ছিল। সে কে? কে সে? সে কে?

যশোদা মারা গেল রাত এগারোটায়।

বড়বাবুর বাড়ি ফোন গেল। বাজল না। রাতে ওঁদের ফোন ডিস্কানেক্ট করা থাকে।

হাসপাতালের মর্গে যথাবিধি পড়ে থেকে যশোদা দেবী, হিন্দু ফিমেল, যথা-সময়ে গাড়িতে শ্মশানে গেল ও দাহ হল। ডোমই তাকে দাহ করল। যশোদা যা-যা ভেবেছিল, ঠিক তাই-তাই হল। যশোদা ঈশ্বরস্বরূপিণী, সে যা ভাবে, অন্যেরা ঠিক তাই করে, তাই করল। যশোদার মৃত্যুও ঈশ্বরের মৃত্যু। এ সংসারে মানুষ ঈশ্বর সেজে বসলে তাকে সকলে ত্যাগ করে এবং তাকে সতত একলা মরতে হয়।

বজরা

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

পঞ্চাশ বছর আগে হলে দেখা যেত এই বজরাখানারই গমক কত। ঝাড় লণ্ঠনের নীচে ফরাস বিছিয়ে সারেঙ্গীর উপর ছড় টানতো বড়ে মিঞা। হারমোনিয়মের বেলো ছেড়ে দিয়ে ফাঁক বুঝে আতর মাখা পান তুলে নিত রূপলাল। রূপোর থালা সামনে মেলে ধরে রূপসী বাঈজীর বাতাস মাতাল করা গান শুনতে শুনতে মেজকর্তা চেঁচিয়ে উঠতেন—কেয়াবাত্ কেয়াবাত্। ফুলবাঈ মেরি জান্। হাঁ হে ওস্তাদ, অমন মিইয়ে পড়ছ কেন? সরাব টরাব ছোঁও না, শেষটায় বেলাইন পাঁকড়ে বসলে—আঁ? তারপর টুকরো টুকরো হয়ে ভেসে যেত হাসির লহরা।... কোমরে কানি গোঁজা ক্ষুদে ক্ষুদে জানোয়ারগুলি গেমো বনের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত—মেজকর্তা চলেছেন।

সেই মেজকর্তাও নেই, বজরাখানার ঠাটঠমকও ঘুচে এসেছে। গলুইয়ের সামনে পেতলের কাজ করা সিংহ মূর্তিটা চটা উঠে উঠে তেকোনা বল্লমের ফলার মতো আজও উঁচিয়ে আছে। কাঠের গায়ে সোনার জলের কাজ করা নগ্ন নারী-চিত্রগুলিকে আজ আর বলে না দিলে চিনবার উপায় নেই। বজরাখানার সর্বাঙ্গ ছেয়ে আছে অজস্র এবড়ো-খেবড়ো চল্টায়। রুগ্নদুষ্ট কোন রুগীর মতো যেন।

আনন্দ চাটুয্যে বললেন, "কত আর শুনবে। বলতে বলতে এক রামায়ণ মহাভারত হয়ে যায়। কি ছিলো আর কি হলো। বাঈজী আর সরাব, সরাব আর বাঈজী। আট নম্বর ঘোড়ার ঠিক মুখটায় কতবার যে লাস টেনে বার করল পুলিশ কে অত লিখে জুখে রাখে। পড়ে-পাওয়া বাপের সম্পত্তিতে মেজকর্তা ফুর্তি করেই কাটিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু লছমী বিবির বিষচক্করে

ফেঁসে গেলেন শেষটায়। সেইটাই হলো তার কাল। তিন তিনটে খুনখারাবি করে লটকে গেলেন পুলিশের জালে। শুনতে পাই একা টমাস দারোগাই পঞ্চাশ হাজার রুপোর চাকতি খেয়েছিল। রাঘব বোয়াল থেকে কৈ-খলসে সবাইকে আক্কেল সেলামী দিয়ে জাল ছিঁড়ে মেজকর্তা বেরুলেন। কিন্তু সেই বেরুনোই তার শেষ বেরুনো। কেউ কেউ বলে মেজকর্তা সন্ন্যাস নিয়েছে, কেউ বলে সোনা দলুইয়ের বল্লমের খোঁচায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

সোনা দলুই কে?

বজরাখানা দুলে দুলে চলছিল। ভারী গমকী চালে। হারিকেন উস্কে দিয়ে আনন্দ চাটুয্যে হাঁক দিলেন 'ও বিপিন তেল ভরিসনি হারিকেনে। নবাব চৌকিদার হয়েছিস দেখছি। হারামজাদা তেল ভরে দে।'

দরজা ঠেলে ঠেলে ভেতরে ঢুকল বিপিন চৌকিদার।

হ্যাঁ, সোনা দলুই? আরে মাস্টার ও অনেক কথা। সোনা দলুইয়ের বাপ ছিল এ তল্লাটের জবরদস্ত লেঠেল। লুটের মাল বেচে আটশ টাকা নগদ ঢেলে সোনার কালীমূর্তি বানিয়েছিল। কে বানিয়েছিল জানো তো— বৌবাজারের হীরেন কর্মকার। অনেক দিনের কথা। কেউ কেউ বলে প্রথম পুজোয় নাকি নরবলি দিয়েছিলো লোকটা। অত না হোক লোকটার ক্ষমতা ছিল। সারা তল্লাটখানা কাঁপত ওর ভয়ে। আটটি রাখনি পুষে কলকাতার ব্র্যান্ডী হুইস্কী আনিয়ে লোকটার শেষ দিনগুলো ভালোভাবেই কাটছিলো, কিন্তু বুড়ো হাড়ে কি যে নেশা লাগল, নজর পড়ল মেজকর্তার বাঈজী লছমী বিবির ওপর।

বাঘের খাঁচায় হাত ঢুকিয়ে বাঘের মুখ থেকে খাবার টেনে আনা সইবে কেন? বুড়ো গুম্ হলো। সাত দিন পরে লাস যখন ভাসল, তখন আর কেউ না চিনুক সোনা দলুই চিনে ছিলো ঠিক। বাপ্‌কা বেটা।

বুকের পাটা ছিলো একখানা।

বিপিন চৌকিদার আলো দিয়ে গেল। তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে রুপো বাঁধানো সাবেকী কালের গড়গড়ায় গুড়ুক গুড়ুক করে কয়েকটা টান দিলেন আনন্দ চাটুয্যে।

বাইরে আলকাতরার মতো গাঢ় অন্ধকার। ভূতে পাওয়া স্তব্ধ দু' পাশের গেমো বনগুলি। নদীর জল বজরার গা চাটতে চাটতে চলেছে। আকাশের তারার মতো জোনাকীগুলো চিকমিক করে জ্বলছে আর নিভছে। কত রাত? ঘড়িতে তাকিয়ে দেখলাম সবে সাতটা।

'কিছু দিনের মধ্যেই মেজকর্তার বড় ছেলে বিলেত থেকে ফিরলেন।' আনন্দ চাটুয্যে আবার টানলেন গল্পটা। 'আশ্চর্য'! বরানগরের বাগান বাড়িতে ফুলের জলসা বসল না। বজরা ভাসিয়ে বাঈজী নিয়ে গোলাপ জলের হোলি খেলল না শ্রীমান চঞ্চল বসুরায়। রায় ফ্যামিলীর হীরের টুকরো ছেলে। চঞ্চল বললে কেউ চিনবে না ওঁকে। সবাই ওঁকে ডাকত বড় সাহেব। বিলিতি বিলিতি গন্ধ থাকত এই ডাকটায়।

লঞ্চ সিন্ডিকেট তখন সবে হয়েছে। তিনটে স্পীড বোট কিনে ফেললেন বড় সাহেব। মাছ ধরার তদারকে লাগিয়ে দিলেন ও-সব। নিজে এসে খান কাটার দু' চার মাস এই আবাদে পড়ে থাকতেন। দু' হাতে টাকা ছড়িয়ে প্রজারঞ্জন করতেন। সরাব ছুঁতে কেউ আমরা দেখিনি ওঁকে। কিন্তু— গড়গড়ায় আবার দুটো টান দিলেন আনন্দ চাটুয্যে। আগুন চলকে উঠল কলকের। হালের ঘর্ষণে মিহি সুরে শব্দ উঠছে একটা। আর সাথে সাথে চারটে দাঁড়ের ভারী ভারী শব্দ ঝপ ঝপ, ঝপ ঝপ। তাকিয়ে দেখলাম আনন্দ চাটুয্যে এখন আর শুধু ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট নন, এ আনন্দ চাটুয্যের রূপ আলাদা।

পঞ্চাশ বছর আগেও এমনি করে শব্দ হতো দাঁড়ের। আজও সেই একই শব্দ। বিরামহীন সময়ের তালে তাল দিয়ে চলেছে। বোধ হয় এই শব্দটার সাথেই তাল রাখতে পারেননি মেজকর্তা। হার স্বীকার করে পালিয়ে গেছেন বড়সাহেব। পালিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে বসুরায় ফ্যামিলীর সম্রাটকুল। জমা আছে, জমি আছে, কি নেই তবে? বুঝে উঠতে পারেনি কেউ। আজ এসেছে পি ইউ বি আনন্দ চাটুয্যের মরসুম। কিছু কিছু আমি আগেই শুনেছিলাম। শুনেছিলাম বলেই গল্পটা আমার কাছে অসত্য মনে হচ্ছিল না।

কি হে মাস্টার, অমন গুম্ মেরে গেলে কেন? ভাল লাগছে না বুঝি? ওরে বনশী, রাত ভোর করবি নাকি? জোরে জোরে টান।

না না বেশ লাগছে তারপর বলুন।

বেশ লাগবেই। আবাদের ইতিহাস কেউ যদি লিখত নাম করে ফেলত। যাক শোনো। বড় সাহেবের কীর্তিটাই শোনো। ভালোই গুছিয়ে গাছিয়ে বসেছিলেন বড় সাহেব। দুটো টিউবওয়েল বসালেন। ঢেড়া পিটিয়ে লোভ দেখিয়ে হাট খোলাটাও বসালেন। লেখালেখি করে লঞ্চ আনালেন কুমীরখালির রাস্তায়। এ রাস্তায় না হলে লঞ্চ আসে? ঘাটা দিয়ে দিয়ে লঞ্চ কোম্পানী পাততাড়ি গোটাতো কবে, কিন্তু বড় সাহেবের নজরানাই

টিঁকিয়ে রাখল শেষতক্।

সেই বড় সাহেবও সাপের লেজে পা দিয়ে বসলেন একদিন। হীরা প্রধানের বউটার দিকে নজর ফেললেন। বউটাও ছিল অপরূপ। প্রধানের ঘরে কি করে যে অমন গোলাপ ফুল ফুটেছিল কে জানে। সাবান তেল গায়ে পড়লে না জানি কি হতো! বউটাকে ছিনিয়ে এনে কাছারী বাড়িতে তুললেন বড় সাহেব।

তারপর দিন দুই পেরুতে না পেরুতে রক্তারক্তি কাণ্ড। বোষ্টমপাড়ার পুব দিকের চকে ঘোড়া নিয়ে বড় সাহেব বৈকালিক ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। ঘোড়া সমেত উলটে পড়লেন, মই না দেওয়া মাটির ডেলায়।

কিন্তু কি জানো মাস্টার, ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ার ছেলে বড় সাহেব ছিলেন না। এ-সবই হীরা প্রধানের কারবার। লোকটা তলে তলে গ্রামটাকে উস্কে রেখেছিল।

বড় সাহেবের বুড়ো মা রাণীবিবি খবর পেয়ে ছুটে এলেন। বড় সাহেবকে নিয়ে গেলেন কলকাতায়। তারপর থেকে কলকাতার সিংহাসনে বসে রাজকার্যের ভার নিলেন রাণীবিবি। লেঠেল নিয়ে নায়েব গোমস্তাই দেখাশুনা করতে লাগলো জমিদারি।

আর এই জানোয়ারগুলিরও গোঁ বলিহারি। যা ভাববে তা করবেই। তবে আমার কাছে, বুঝলে মাস্টার, ঢিট্ হয়ে গেছে ব্যাটারা। সকাল বেলা বিষ্টু নাপিতের কাণ্ডখানা দেখলে তো। এক মুঠো ধান চুরির দায়ে কি মারটাই না খেল বিপিনের হাতে। আমি ছিলাম্ সামনে, ব্যাটা চুপ। যাবার বেলা পায়ের ধুলো জিভে ছোঁয়াতেও ভুলল না। মার খেয়ে খেয়ে এখন ওদের শুয়োরের গোঁ কমেছে। দু' দিন থাকো সব দেখবে মাস্টার, সব দেখাবো।

কথায় কথায় কখন যেন নিজের প্রসঙ্গে এসে পড়েছিলেন আনন্দ চাটুয্যে। সামলে নিয়ে হেসে উঠলেন। হাসিতেই তাঁর ব্যক্ত হয়ে উঠল আর এক অধ্যায়। ইচ্ছে হল জিজ্ঞেস করি, তারপর?

তার আগেই আনন্দ চাটুয্যে শুরু করলেন, 'হ্যাঁ যা বলছিলাম।' বলতে বলতে আবার তিনি থামলেন। রুপোর পাতমোড়া নলে টান দিয়ে বুঝলেন আগুন নিবে গেছে কলকেয়। ইতিহাসের স্তূপীকৃত জঞ্জালের মধ্যে হারিয়েই গিয়েছিলেন আনন্দ চাটুয্যে। চীৎকার করে উঠলেন 'এই শালা শুয়োর বিপিন, তামাক দিয়ে যা।'

বিপিন ভেতরে ঢুকল।

টং হয়ে ঘুমুচ্ছিলি বুঝি? সামলে না চলতে পারিস গিলিস কেন অতো? শুয়োর কোথাকার।

আমি বললাম, বজরার কি হলো বলুন?

হ্যাঁ বজরা। কি বলব মাস্টার, এই যে জানোয়ারগুলি দেখছ—। বিপিন তার পোকায় খাওয়া দাঁতগুলি বের করে আত্মতৃপ্তির হাসি হাসল। এগুলির স্বভাবই হয়ে গেছে বিটকেলে ধরনের। কেবল ছুঁক ছুঁক কোথায় মদের আড্ডা কোথায় খানকির বাড়ি। আর বলো না মাস্টার, মেজাজ খিচড়ে দিয়ে যায়।

বজরাখানা কাঁকিয়ে কাঁকিয়ে চলেছে।

পি ইউ বি আনন্দ চাটুয্যে আবার শুরু করলেন, হ্যাঁ বজরাখানার আদর বড়সাহেবও কম করেননি। ইয়ার বন্ধুদের সাথে বন্দুক নাচাতে নাচাতে বজরা চলত সুন্দরবনের দিকে। বজরাতেই রান্না হতো, কলকাতার খানসামার হাতে রান্না, মানিকজোড়ের তুলতুলে মাংস, পোলাও। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। বড় সাহেব কলকাতার মিস্ত্রি এনে বার দু তিন সারাইও করলেন বজরাটা। বছর বছর গাব খাওয়ালেন। বাপের সখের বজরা, ছেলে তার অসম্মান করেনি কোন দিন।

তারপর?

হয়ত আনন্দ চাটুয্যে আরও অনেক কথাই বলতেন। এই একখানা বজরাকে কেন্দ্র করে কয়েক পুরুষের চটকদার ইতিবৃত্ত। কিন্তু একটা ঝাঁকি দিয়ে বজরাটা থেমে গেল।

'কোথায় এলাম রে বিপিন?'

অন্ধকারের মধ্যে ভাল করে নজরে আসে না। বড় নদী ছাড়িয়ে একটা খালের মুখে এসে দাঁড়িয়েছি বোধ হয়।

বিপিন বলল, 'বউকাটার মুখে।'

'বউকাটা খাল' নামটা শুনলেই বইয়ে পড়া উপন্যাসের মতো মনে হয়। জমাট বাঁধা অন্ধকারের মধ্যে এই খালটা ভাল করে নজরে আসে না। দু' পাড়ে বসতি, কিছু কিছু জঙ্গল আর ক্ষেত—শাকআলু তরমুজ, মুলো-কপির হবে হয়ত।

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল বিপিন। 'বউ-কাটার মুখে এলাম বড়বাবু।'

'তা থামালি কেন?' বড়বাবু অর্থাৎ আনন্দ চাটুয্যে উত্তর করলেন আমিরী চালে। 'এসেছে বুঝি শুয়োরটা।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ দেখা করতে চায়।'

'দেখা করে কি করবে? না না ভাগিয়ে দে হারামজাদাকে। যত সব ন্যাকা চৈতন।'

'বজরায় উঠে পড়েছে বড়বাবু।'

'উঠে পড়েছে, তবে আর কি নাচি। আচ্ছা ডাক শালাকে।'

বিপিন চলে গেল। আনন্দ চাটুয্যে বললেন, লোকটাকে দেখে রেখো মাস্টার।'

পাথুরে কয়লার মতো কালো বিরাট লোকটা বজরার মধ্যে ঢুকল। তারপর টান টান হয়ে বড়বাবুর পায়ে হাত ছুঁইয়ে গড় করল।

চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে বয়সের। শ্লথ শিরাগুলো যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে লোকটাকে। গায়ে একটা আধ ময়লা ফতুয়া। পরনে দেশী তাঁতিদের হাতে বোনা ধুতি। কিন্তু চোখ দুটো দেখলে চমকে উঠতে হয়; অস্বাভাবিক! কাচের গুলির মতো টকটকে লাল রংয়ের। গন্ধটাও পাচ্ছিলাম।

লোকটা বাদী না আসামী বোঝা দায়।

'কি চাস বল?' আনন্দ চাটুয্যে কথার ঝাঁজে বিরক্তি প্রকাশ করলেন।

'আপনি মা বাপ বড়বাবু। চিরকাল ছেলের দিকে তাকিয়েছেন, আজ আমার'—বলতে বলতে লোকটা পাকা অভিনেতার মতো কেঁদেই ফেলল।

বাইরে অন্ধকারের মধ্যে তাকিয়ে রইলাম।

'কান্নাকাটি ছেড়ে নথিপত্র কি এনেছিস দেখা। এক একটা কাণ্ড করে কাঁদবি আর মাপও চাইবি সাতখুনের। আবাদে আর টিকতে দিবি না দেখছি। বুঝলে মাস্টার পি ইউ বি হয়ে এক দিকদারিতেই পড়েছি।

দিকদারিটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলেন না আনন্দ চাটুয্যে। লোকটা ড্যাব-ড্যাবে চোখ তুলে তাকাল আমার দিকে। বড় অস্বস্তিকর সেই চাউনি।

আবাদ পত্তনের ইতিহাস ক'দিনেরই বা হবে। ষাট-সত্তর বড়জোর একশ-দেড়শ। বসুরায়ের আবাদ একশর ওপারে যায়নি। দানা বাঁধা উপনিবেশ তারও কম। পঞ্চাশ ষাট কি আর কিছু বেশী। অর্থাৎ পুরুষ দুই কেটে গেছে মাত্র। কিন্তু কি বিস্ময় এই আবাদের মাটিতে। এক হাতে নদীকে দাবিয়ে রেখেছে আবাদের মানুষ, আর একহাতে কচলে চলেছে খুন-রাহাজানি, জমিজমার দাঙ্গা, মদ মেয়েমানুষ। অন্ধকারের মধ্যে তাকিয়ে থেকে বার বার আমার সে কথাই মনে হচ্ছিল। এই আবাদে মেজকর্তা

টিকলেন না, বড় সাহেব পালিয়ে গেলেন, দুর্ভেদ্য লোহার প্রাচীর গড়েও রাণীবিবির হয়রানির একশেষ। নায়েব গোমস্তা, লেঠেল, থানা পুলিস অনেক হল, পি ইউ বি হলো, তবু যেন কি হচ্ছে না।

আমি চমকে উঠেছিলাম প্রায়। বজরাখানা ভারিক্কি চালে দুলে দুলে চলছিল আবার। বউকাটা খালের জল ক্লান্তিতে যেন নীরব হয়ে ঘুমুচ্ছিল। নাকের ডগায় চশমা তুলে বড় সাহেব খুঁটে খুঁটে দেখছিলেন লোকটার কাগজপত্রগুলি। লোকটার দু চোখ জোড়া আকূতি।

এমন সময় ভূত দেখার মতো আমি চমকে উঠলাম। খালের পাড়ে বড় বড় চার পাঁচটা ঝোঁপ-বাঁধা তেঁতুল গাছের ফাঁকে দুটো নিশ্চল মূর্তি যেন এ দিকেই তাকিয়ে আছে। বোধ হয় দেখছে, 'পি ইউ বি চলেছেন।' এই বজরায় বাঈজীর আসর দেখে ওরা বুঝত মেজকর্তা চলেছেন, এলো-পাথারী বন্দুকের ফুটফাট শব্দ শুনে ওরা বুঝত 'বড় সাহেবের বজরা'। বজরাটা ওদের কাছে যেন চিরকালের বিস্ময়।

কিন্তু লোক দুটো অমন চুপ চুপ করে চলেছে কেন? গা ঢেকে ঢেকে। বজরাটাকে লক্ষ্য করে করে।

'কি হে মাস্টার, অতো কি খুঁজছে, অন্ধকারের মধ্যে, কাউকে দেখেছ নাকি?' যেন আনন্দ চাটুয্যে জানতেন কেউ এখন বজরা লক্ষ্য করতে করতে এগোবে সাথে সাথে!

আমি বললাম, হ্যাঁ, দুজন লোক মনে হচ্ছে, বুঝতে পারছি না তো?

হেঁ হেঁ হেঁ। রাশভারী আমিরী হাসি হাসতে হাসতে বড়বাবু বললেন, কি নাম রে হরিশ?

হরিশ অর্থাৎ সেই বুড়ো লোকটা বললো, বাতাসী আর বুনো।

হ্যাঁ বুনো সর্দার আর বাতাসী। এই কেসটায় বাদী।

বাদী? বাদী কেন অমন আত্মগোপন করে চলেছে! অবাক লাগল ঘটনাটা। বড় সাহেব বললেন, যাও না ছাদের উপর বসে লক্ষ্য করগে অনেক কিছুই আরো দেখতে পারো। আমি এই কাজটা সেরে ফেলি। রিপোর্টটা ভেবেচিন্তে করতে হবে। বড় গোলমেলে হে মাস্টার। ফিরবার পথে সব বলব।

হাঁপ ছেড়ে বজরার বাইরে এসে দাঁড়ালাম। আঃ ভারী মিষ্টি বাতাস।

আট দাঁড়ের বজরা। চার দাঁড়ে টানছে। পাটাতনের উপর পা ছড়িয়ে বসে কালো কালো মূর্তিগুলো তালে তালে দাঁড় ফেলছে জলে। আর

সাথে সাথে শব্দ বেরুচ্ছে হাপুস হাপুস।

বিপিন চৌকিদার বজরার ছাদের উপর বসে বিড়ি ফুঁকছিল আয়েসে। আমাকে সতরঞ্চি পেতে বসতে দিলো। 'বসুন মাস্টার বাবু।'

উঠে বসলাম।

বউকাটা খালের যে ইতিহাস বিপিন বললো, তাতে চমকে উঠতে হয়। খালটা কেটেছিল সোনা দলুই। বাপের মতন রাখুনি পোষেনি সোনা। বে' করেছিল একটাই। বাঁজা বউ। বাপের কুকীর্তির প্রায়শ্চিত্ত হলো যেন বউটা! মানসিক করল সোনা, পুজো দিল, কলকাতার ব্যান্ডপার্টি এনে, পঁচিশ হাত লম্বা কালী গড়ে সাতরাত উপোস করে জব্বর পুজো। পুজোর শেষে আদেশ পেল সোনা। এক ছেলের মায়ের, না না এয়োতি, লক্ষ্মীমন্ত বউ হওয়া চাই, এক ছেলের মায়ের রক্ত মাটিতে ছুঁইয়ে দশ মাইল লম্বা পঁচিশ হাত চওড়া খাল কাটা চাই। তাই করল সোনা। পুলিস বলল, খুনখারাবি হয়নি। লোকে বলে, বউকাটা খাল। খালটা আজ ছড়িয়ে গেছে পঞ্চাশ হাত। অপুত্রক বউরা আজো এর মাটি ছুঁয়ে আকুলি-বিকুলি হয়ে কাঁদে। ঝাঁপিয়ে পড়ে খালের জলে অবগাহন করে। বউকাটা খালের মিষ্টি জলে একটু একটু করে নোনা জল মেশে।

হাল টানছিল বিশ্বম্ভর। বলল, 'সোনা দলুই এখানে তার অঢেল সম্পত্তি ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলেছিল। এখনো এই খালের নিচে মাটি খাবলালে সোনার ঘড়া পাওয়া যায়।'

বনশী দাঁড় থামিয়ে বলল, 'সোনার সিন্দুক উঠেছিল একবার। থানার বড় দারোগা সিন্দুকটাকে কোলকাতা চালান করেন। তাছাড়া হাতাখুন্তি কড়াই নজর রাখলেই পাওয়া যায়। তবে কেউ ওসব ছোঁয় না।

লোক দুটোকে আবার দেখা গেল। গর্জন গাছের ফাঁকে টুক করে আবার দুটো ক্ষুদে দৈত্য গা ঢাকা দিল।'

বিপিন বলল, 'ওরাই বাদী।'

'বাদী, তবে পালিয়ে বেড়াচ্ছে কেন?'

'পালানো নয় মাস্টার বাবু তক্কে তক্কে আছে। হরিশ উঠেছে বজরায়। কি জানি কেসটা কি হয়ে যায়। তাই ভয়।

—তা, ওরাই তো দেখা করতে পারতো আগে।

—হে হে মাস্টার বাবু নেড়ে ন্যাংটার বুদ্ধি। চাষাভুষো লোক, মাটিই চেনে। আটঘাট জানবে কোত্থেকে। কেস করতে হয় দিল করে, এখন বুঝছে তার ঠেলা।

—ভাগ চাষের খামার নিয়ে কেস নয়। কেস ভিটে উচ্ছেদের।

জিজ্ঞেস করলাম, 'হরিশ লোকটা কে হে?'

'হরিশ?' বিপিন আর একটা বিড়ি ধরাবার জন্য দেশলাই খুঁজতে লাগলো। বিশ্বম্ভর ট্যাঁক থেকে দেশলাইটা ছুঁড়ে দিয়ে বললো, একটা টান দিয়ো বিপিনদা। তুমি সেই থেকে তিনটে ফুঁকলে।

বিপিন বললো 'চল্ না হরিশের বাড়ি সিগ্রেট ফুঁকবো আজ। হরিশ আজ সিগ্রেট ছড়াবে। হ্যাঁ হরিশ কে জানেন মাস্টারবাবু, এই কেসের আসামী। টাকার কুমীর। ওর বাড়িটা দেখলেই তা বুঝবেন। চৌহদ্দির চারদিকে খামার। গোলা আছে অগুনতি। ছোটয়-বড়োয় অনেকগুলি। গোয়াল আছে পর পর তিন সার। তা ছাড়া আম কাঁঠাল তেঁতুল অজস্র। এক একটা গাছে হেসে খেলে খান কয়েক চিতা সাজিয়ে ফেলা যায়। লেখালেখি করে হরিশ হালে বন্দুক পর্যন্ত আনিয়েছে। টিউব-কল পুঁতেছে গোটা কয়েক। আত্মীয় কুটুম্বও কম নেই হরিশের। এবেলা ওবেলা মিলে শ' আড়াই পাত পড়ে। কলকেয় তামুক পোড়ে দু' দশ সের তো বটেই'।

এত ধনী!

'অথচ লেখাপড়া না শিখেও কলমবাজি করেই খেয়ে যাচ্ছে হরিশ।'

'সে কি হে, মুখ্যুর আবার কলমবাজি?'

এঁজ্ঞে, বি এ পাশ মুহুরী আছে ওর। উকিল আছে আলিপুরে। হরিশকে দেখলে সবার কাজ ফেলে দিয়ে বলে, 'হরিশ যে, আবার কি হল?'

হরিশের কাজই করে সবার প্রথম।

বিপিন আরো বলতে যাচ্ছিল। বিশ্বম্ভর বললো, 'এই মোড়টা পেরুলেই হরিশের ঘাট।

চকিতে আবার সেই লোক দুটো। বিদ্যুতের মতো আর একবার ঝিলিক দিয়ে মিলিয়ে গেল ঘন জঙ্গলের মধ্যে।

জমাটবাঁধা অন্ধকার ভেদ করে কয়েকটা লণ্ঠন এসে জমা হল ঘাটে। আর সেই সাথে বেশ কিছু লোকের গলার স্বর।

দাঁড়ের ফেসোগুলি খুলে ফেলতে লাগল মাঝিরা।

তর তর করে জল কেটে তবু এগিয়ে চলেছে বজরাখানা। হাল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঠিক ঘাটের গায়ে এনে হাঁক দিল বিশ্বম্ভর 'ঘাট ধর, ঘাট ধর'।

ঘাট ধরল বনশী। বজরার গতি আটকাবার চেষ্টা করল দু বাহুর জোরে। যেন মাহুত তার বিরাট হাতীকে হাঁটু গেড়ে বসবার আদেশ করছে। তাজ নামাও, সম্রাট নামবেন।

সম্রাট আনন্দ চাটুয্যের ভারী গামবুট শোনা গেল। পাটাতনের উপর শব্দ হলো বিশ্রী রকমের।

আগে আগে বেরুল হরিশ। সাবেকী কালের ফরাসখানা বিছিয়ে দিলো পাটাতনের উপর। ভেতর থেকে তাকিয়া দুটো এনে তার উপর পেতে দিল লম্বা। বিপিন ব্রস্ত হয়ে কেবল ভেতর বার করছে। কোথাও কোন ত্রুটি হয়ে যাচ্ছে কি না কে জানে। তাকিয়ে দেখলাম অদূরেই সেই দুর্গের মতো বাড়িখানা। হরিশের বাড়ি। লম্বায় চওড়ায় এত বড় বাড়ি এ অঞ্চলে আর দেখেছি বলে মনে পড়ে না। মেটে দেওয়ালে নানা রংয়ের চিত্রবিচিত্র। এত দূরে থেকে ভালো নজরে আসে না। তবু বুঝতে কষ্ট হয় না ওগুলো নিশ্চয়ই ফুল লতাপাতারই হবে। মামলাবাজ হরিশের বুকের মধ্যে ফুলপাতারও একটু স্থান আছে ভাবতে বেশ লাগে।

বিরাট উঠোনের ঠিক মাঝখানে তুলসী মঞ্চ। তারই একপাশে খড় বেরিয়ে পড়া মকর মূর্তিখানা। বুঝতে কষ্ট হয় না এটা হরিশের বাইরের বাড়ি।

আনন্দ চাটুয্যে বজরার ভেতর থেকে বাইরে এলেন। তারপর হাঁক দিলেন, 'কি হে মাস্টার এস। বস এখেনে।' তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসলেন উনি। আমিও বসলাম সংকুচিত হয়ে ওরই পাশে। লোকগুলো বড় বড় চোখ তুলে তাকিয়ে আছে আমারই দিকে বোধ হয়।

ঘাট থেকে কেউ কেউ উঠে এল বজরায়। তারপর কথার জঞ্জালের মধ্যে কোনটা সত্য কোনটা অসত্য খোঁজাখুঁজি চলতে লাগলো।

আমি খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম সেই তক্কে থাকা লোক দুটোকে।

কিছুক্ষণের জন্য হরিশ উধাও হয়ে গিয়েছিল। ফিরে এসে আনন্দ চাটুয্যের পা ছুঁয়ে বলল, 'বড়বাবু আমার মেয়ের অনেক দিনের সাধ—'

বাকীটা যেন বুঝিয়ে দিতে হয় না। বড়বাবু—অর্থাৎ আনন্দ চাটুয্যে বললেন, 'কোথায়? নিয়ে আয়।'

অল্প বয়স। মাথায় ঘোমটা টেনে কাঁপতে কাঁপতে এলো। হরিশের মেয়ে। হরিশ নাম বলল, কুমুদিনী। শ্বশুর ঘর থেকে ফিরেছে, মাসখানেক থাকবে।

কুমুদিনী পা ছুঁয়ে প্রণাম করল আনন্দ চাটুয্যের।

'কল্যাণ হোক।'

দুথালা ভাত শাকআলু আর কাটা ফল এলো। এলো কাচের গেলাসে চা।

হরিশ বলল, 'কুমুদিনী কিছু প্রণামী দিতে চায় বড়বাবু।'

'না, না প্রণামী কি হবে।' আনন্দ চাটুয্যে তাকালেন আমার দিকে। আমি সেই তক্কে তক্কে থাকা লোক দুটোকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। নাঃ, ধারে কাছে নেই ওরা। কোথায় যেন অন্ধকারের ভিড়ের মধ্যে হারিয়েই গিয়েছে। হুইস্কির বোতলটা আঁচলের ভাঁজ থেকে ধীরে ধীরে বার করল কুমুদিনী। ঘোমটাটা খোঁপায় এসে আটকে পড়েছে ওর। ফাঁপা নাকের পাটায় নথটা হারিকেনের আলোয় চিকচিক করে উঠল। মনে হল যেন একটা তক্ষক ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে সামনে। সুডোল হাত মেলে বোতলটা এগিয়ে দিতে গিয়েছিল কুমুদিনী :

আনন্দ চাটুয্যে আমার দিকে তাকিয়ে একটু ম্লান হেসে বললেন, 'দেখলে তো মাস্টার। শালারা ভাবছে আমিও বুঝি পুলিশ দারোগার মতই মদ খাই। ওষুধ হিসেবে কবে একটু খেতে দেখেছে। ও হরিশ, রাত বাড়ছে, ফিরতে দিবি না বুঝি ?

'এজ্ঞে।' হাত কচলাতে কচলাতে হরিশ বলে, 'এস গো কুমুদ। বাবুর রাত বাড়িয়ো না।'

হারিকেন নাচাতে নাচাতে কুমুদিনী বজরা থেকে ঘাটে নামল। ঘাট থেকে পাড়ে। তারপর মেঠো পথ ধরে সটান দুর্গটার দিকে।

আবার বজরা ছাড়ল। গুন টেনে এগিয়ে নিয়ে চলল বজরাকে আরো কয়েক শ' গজ ভিতরে।

এখানে ঘাট নেই। গ্রামের শেষ প্রান্ত। বড়বাবু জিজ্ঞেস করলেন 'বাদীর কি নাম যেন হরিশ।' কিছুতেই মনে থাকে না।

হরিশ বললো—বুনো সর্দার আর বাতাসী।

বুনো আর বাতাসীকে এবার দেখলাম। নিজের ভিটের উপর দাঁড়িয়ে ; ছোট্ট গোল পাতার ছাউনী দেওয়া ঘরটা ভেঙে তছনছ হয়ে আছে একপাশে।

মনে হ'ল বর্বরতার চূড়ান্ত সাক্ষ্য।

আমরা পেঁছুতেই বজরায় লাফিয়ে উঠল মেয়ে মরদে। —এ জমি আমার বাবা। ওদের দিস নি বাবা। কোথায় দাঁড়াব গো—বাবা—। হরিশের হাতে একটা হারিকেন দুলছিল বজরার দুলুনিতে। দৈত্যের মতো ওর বিরাট ছায়াটা কাঁপতে লাগল বউ-কাটা খালের জলে।

জরিপ করা হোল চৌহদ্দি। খাতায় অনেক কিছু নোট টোকা হলো। সব কাজ চুকিয়ে বজরা ছাড়তে ছাড়তে রাতও হলো অনেক। হাতঘড়িতে তাকিয়ে দেখলাম—রাত দশটা।

বজরা ছাড়ল।

আনন্দ চাটুয্যে বললেন, 'ভিতরে গিয়ে কাজ নেই, এখানেই বসি। কি বল মাস্টার।' গড়গড়ায় গুড়ুড়ু গুড়ুক করে টান দিতে লাগলেন।

আচ্ছা, কি বুঝলে বল তো? দেখলে তো আসামীর চোট কতটা। এদেশে সব হয়। মেজকত্তাই বল, আর বড় সাহেবই বল কিংবা তোমার রাণীবিবিই হোক না কারো ক্ষমতা নেই এদেশে সুবিচার করার। এই হরিশকে দেখলে তো কেমন জাল দলিল তৈরি করে সামলে নিচ্ছে, ভাব দেখি।

সে কি? আপনি বাদীকেই শাস্তি দেবেন? দলিল-পরচা নকল করা আসামীকে ঝুলিয়ে দিন।

দিয়ে লাভ? তোমাদের মাথায় অত ঢুকবে না মাস্টার। তোমরা এ লাইনে নেহাৎ ছেলেমানুষ। আমি না হয় বাদীকে জিতিয়ে দিলাম আমার ইউনিয়ন বোর্ডের কোর্টে। কিন্তু হরিশ আমায় কলা দেখিয়ে উপরে যাবে। লাভ কিচ্ছু নেই।

'তা হলে অত খেলাবারই বা কী দরকার ছিলো?'

'হরিশের কথা বলছ? বড় মাছ না খেলালে ওঠে না।' আনন্দ চাটুয্যে আড়চোখে আমায় দেখলেন।

বজরাখানা এগিয়ে চলেছে বড়নদীর দিকে। দাঁড়ের ভারী ভারী শব্দে বাতাস ঘুলিয়ে উঠছে। হঠাৎ আমার নজরে পড়ল রসালো আঙুরের ছবি-আঁকা লেবেলের সেই মদের বোতলটা পাটাতনের উপর বজরার দুলুনির সাথে অস্থির হয়ে দুলছে।

আজ পঞ্চাশ বছর পরেও বজরার গমক যেন একটুও কমে নি।

ভালবাসা ও ডাউন ট্রেন

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

প্লাটফরমে তিনটে বাতি ছিল। তিনটে বাতিই দমকা হাওয়ায় নিবে গেল। আমরা তিনটে লোক স্টেশনে। তিনটি চমক এল সঙ্গে সঙ্গে। তারপর স্টেশনবাবু জানালাটা বন্ধ করে দিলেন। এতক্ষণ বাইরে একটা ক্রুদ্ধ সজারু দেখছিলাম। তার ধারাল কাঁটাগুলি খাড়া হয়ে কাঁপছিল। আমি ও তৃপ্তি হঠাৎ নিক্ষিপ্ত হয়েছি সেই কাঁটাগুলির উপর। স্টেশনবাবু বেঁচে গেলেন। আমি ও তৃপ্তি হঠাৎ পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলাম। আমরা ভয় পাচ্ছিলাম। যন্ত্রণার ভয় কিংবা ভয়ের যন্ত্রণা।

তেলতেলে আলোগুলো আর নেই। আমাদের চারপাশে চাপচাপ অন্ধকার। কালো কুচ্ছিত ওল্টানো ড্রামের মতো আকাশ। কে যেন ধাক্কা মেরে আমাদের ফেলে দিয়েছে। ঢেকে রেখেছে ড্রামটা উপুড় করে। আর বেরুতে পারব না কোনদিনও। দমকা হাওয়ায় গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টি। বৃষ্টির ছাঁটে আমার পা দুটো ভিজে যাচ্ছে। তেলের মতো তরল চটচটে এক অদ্ভুত শৈত্যে যেন পা দুটো ডুবে রয়েছে। যেন নীচে কোন মাটি নেই। এবং যদি কথা বলি ড্রামের ছাদে গমগম করে বাজবে। আমার—আমাদের তাই চুপচাপ থাকার ইচ্ছে।

বারান্দার একটিমাত্র বেঞ্চে আমরা। আর কোন লোক নেই। কোন লোক নেই জেনে এবং অন্ধকারে এবং ভয়ে তৃপ্তি আমার জানুতে মাথা রাখল। লম্বালম্বি শুয়ে পড়ল তৃপ্তি বেঞ্চ বরাবর। অন্ধকারের কোন খোঁদলে তৃপ্তি যেন ঢুকে যাচ্ছিল। তাকে হাতড়ে কিছু খোঁজার মতো করে তার মুখ খুঁজলাম। আর, তটে ঠোঁট-ঘষা শ্যাওলা রঙ মাছের মতো তৃপ্তি আমার দুজানুতে ক্রমান্বয়ে মাথা ঘষছিল। আমরা দুমাইল পথ হেঁটেছি। বৃষ্টির মাঠ জলজঙ্গল পেরিয়ে। হাওয়া ও পাঁকে-কাদায় শরীর ডুবিয়ে।

তৃপ্তি আমার ডান হাতটা শক্ত করে ধরেছিল। তৃপ্তি বারকয় বলেছিল, 'পালিয়ে যেওনা, আমি মরে যাবো।' ওর এই সংশয় আমাকে বিরক্ত করছিল। তবু আমি কোন কথা বলিনি। আমি বারবার পেছন ফিরে দেখছিলাম। কোন আততায়ী আলো ও ধাবমান লোকজন। কেউ ছিল না তবু আমি দেখছিলাম হঠাৎ-হঠাৎ থেমে। তৃপ্তি কিছু দেখেনি। ওর চোখ ছিল সমুখে। অনেক দূরে স্টেশনের পাশে উঁচু থামে লাল আলোটায় ওর চোখ ছিল। এবং একটু জিরোবার জন্যেই যখন সোনামুখীর পোলে দাঁড়িয়েছিলাম তৃপ্তি বলে ফেলল, 'কেউ আসবে না। ওরা এতক্ষণ…' ওরা এতক্ষণ কোথায় চলে যাচ্ছে, ওরা কী নিয়ে ব্যস্ত আমি জানতাম। ওরা এতক্ষণ শবযাত্রী। পীরালির বাঁকে কোন গাছের নীচে একটা মৃতদেহ রেখে ওরা চিতা জ্বালাতে প্রস্তুত হচ্ছে। সেই মৃতদেহটা…সেই প্রিয়তম শরীর…আর আমি ভাবি নি। আমি ভাববো না। আমি কিছু ভাববো না। আমি সোনামুখীর পোলে হিজলগাছের নীচে বাইশটি বছরকে পুঁতে রাখলাম। ডুবিয়ে দিলাম আমার রুগ্না মা ও বিপন্ন ছোট ছোট ভাইবোনদের। আমার সবটুকু স্মৃতিকে বিদ্ধ করে রেখে এলাম। পোলে দাঁড়িয়ে তৃপ্তিকে একাই চুমু খেলাম। তৃপ্তি শুধু বলল, 'ভালবাসি!'

'ভালবাসা' শব্দের ধ্বনি যেন ছড়িয়ে যাচ্ছিল দূর থেকে দূরে। আমার সারা ভবিষ্যৎ জুড়ে বাজছিল। তারপর 'ভালবাসা'র গুরুতর ধ্বনিটি ধাক্কা মেরে জাগাল আমাকে, যেন দেখলাম পরবর্তী পৃথিবী একটি সোনালী পুতুল। এখন— যেন এখন মস্তো কালোবৃষ্টির অন্ধকারের বুরুশে তাকে পালিশ করা হচ্ছে। এবং এমনি করেই বার বার উত্থানের মুহূর্তেরা এতদিন ধরে আসত। আমাকে নিশ্চিত পতন থেকে রক্ষা করত তারা। 'ভালবাসা'র ধ্বনিরা যেন উজ্জ্বল রেণু—ভেবেছি কোনু মহান ফুল থেকে উড়ে এল তারা। আমার চোখে, তৃপ্তির চোখে ছড়িয়ে থাকল। আমরা নিশ্চিত ভাবে জানলাম অন্যবিধ এক আরাম, ফুরোয় না কোনদিনও, রোদ-জোৎস্না-নির্জনতার অন্তবর্তী।

তবু দ্বিধা পিছুছাড়া ছিল না। ঘরে আমার রুগ্ন বাবা ও মা। বিপন্ন ভাইবোনেরা। আমি কাজ খুঁজে পাচ্ছি নে। ছোট বোন রুণু চটে ও কাপড়ে রঙীন সুতোর নক্সাটা জানে। আমি সেগুলো বাজারে নিয়ে গেছি। কিছু পয়সা পেয়েছি। বেঁচেছি। এবং তৃপ্তিও। তৃপ্তির বর এল না—আর কোনদিন আসবে না, ওর পিসীমা চেঁচাত। ওর পিসীমা তৃপ্তিকে দুবেলা থামচাত ওর বর আসছে না বলে। অথচ তৃপ্তির বিয়েই হয়নি। যারা,

আমার লোভী বাবা ফিসফিস করে বলত 'বুড়ির অনেক টাকা। সব পোঁতা আছে।' আমি তৃপ্তিকে বলেছিলাম কথাটা। তৃপ্তি কুৎসিতভাবে মাথাটা নাড়া দিয়েছিল। আমি জানতাম পুঁইশাক বেচে কতগুলো টাকা জমানো যায়। তৃপ্তির জন্যে আমার দুঃখ হত। কোন কোন সময়ে ক্ষিদের জ্বালায় তৃপ্তিকে বুনো আলু তুলে কামড়ে খেতে দেখতাম। আমার কান্না পেত। এবং একদিন ঘরে যখন কেউ ছিল না, চুপিচুপি রান্নাঘরে ঢুকেছিলাম। হাঁড়ির তলায় ঠেসে-রাখা অল্প কিছু ভাত ছিল। ভাতগুলো কাগজে জড়িয়ে তৃপ্তিকে দিয়ে এসেছিলাম। তৃপ্তি সেগুলো ভয়ংকরভাবে মাথা নেড়ে গিলে ফেলল। একটুও নুন দরকার হয়নি ওর। আমি অবাক। তারপর হঠাৎ আমাদের বাড়ী থেকে প্রচণ্ড কান্নার রোল শুনলাম। পুঁটুর ভাগটুকু বেড়ালে খেয়ে গেছে বলে বাড়িসুদ্ধ কাঁদছিল। আমার মাথা ঘুরে উঠল। লজ্জা ও ঘৃণা যুগপৎ চাবুক মারতে থাকল দীর্ঘ সময় ধরে। সারাটি বেলা বাজারে ও বাজার থেকে মাঠে ঘুরলাম। এবং সন্ধ্যার মুখোমুখি তেলকলের সুমুখের ময়দানে বসে লাল আলো, হাওয়া, আকাশ, ঘাস, প্রজাপতি ও শিশুদের দেখতে দেখতে, আস্তে আস্তে, একটু একটু করে, 'আমি ভালবাসি, ···ভালবাসি' বললাম। আমার হৃদয় আপ্লুত হল আশ্চর্য এক সুখে।

'ভালবাসা' এমনি করে বাঁচিয়েছে আমাকে। ভেবেছি যদি আমরা—আমি ও তৃপ্তি পরস্পরকে ভালবাসি! ভালবাসা একমাত্র নিশ্চিত উদ্ধার। আমরা জ্বলন্ত পৃথিবী থেকে উড়ে পালাতে পারি: অন্য কোন গ্রহে। কোন মহতী উজ্জ্বল ব্যাপকতায়। রোদ-জোৎস্না-নির্জনতার আরামে। এবং আমাকে সাহস যোগাল 'ভালবাসা'। সেদিন সন্ধ্যায় তৃপ্তিদের বাড়ি গেলাম আবার। ওর পিসী উঠোনে বসে চেঁচাচ্ছিল। অকারণ চেঁচাত বুড়ি। আমি কিছু সংকোচ দ্বিধা না করে সোজাসুজি বলে ফেললাম, 'তৃপ্তিকে আমি বিয়ে করতে চাই।' বুড়ি ক'মুহূর্ত থেমে থাকল। সমস্ত পৃথিবী, আকাশ থমথম করছিল। গাঢ় নিঃশব্দ উত্তেজনা চারপাশে। তারপর —হঠাৎ তারপর দারুণ তীক্ষ্ম আওয়াজে কান হিম হয়ে গেল আমার। বুড়ি রাক্ষুসীর মতো হাউমাউ করে তেড়ে এল। 'হাভেতে, অকম্মা, ভিখিরী···' তারপর হঠাৎ তারপর বুড়ি হি হি করে হেসে উঠল। আঙুল তুলে দেখাল আমাকে। কাছে একটা রোগা কুকুর দাঁড়িয়ে ছিল। আমি কুকুরটার মতো লেজ গুটিয়ে পালাচ্ছি। কিন্তু কুকুরটাও তীব্রভাবে চেঁচিয়ে বিদ্রূপ করছিল। লজ্জা ও ঘৃণা এমনি করে বারবার ছুরি মেরেছে আমাকে।

অথচ 'ভালবাসা' ছিল।

'ভালবাসা' ছিল, তাই আশা ছিল। আমি পাগল হয়ে কাজ খুঁজতে থাকলাম। কাজ খুঁজতে গিয়ে আরো অনেক মানুষ দেখলাম। তারা আমার মতোই। তাদেরও বাঁচার প্রয়োজন ছিল—'ভালবাসা'র জন্যে—হয়তো অন্য, অন্য অনেক 'ভালবাসা'। হয়তো প্রত্যেকের সমুখে পাশে একটি করে 'তৃপ্তি' ছিল, না-পাওয়া, ভিন্নতর কোন কোন 'তৃপ্তি'। 'তৃপ্তিটা'কে পাওয়ার টিকিট কিনতে চায় প্রত্যেকে! প্রত্যেকে, আমরা প্রত্যেকে পরস্পর মুখ দেখে ব্যথিত। ব্যথিত—তবু ঈর্ষান্বিত। আমরা লাইনে দাঁড়িয়ে ঝগড়া করলাম। আমরা কেউ কেউ পড়ে গেলাম কারুর কারুর ক্ষিপ্ত আঘাতে। আমরা কেউ কেউ ফিরে এলাম শূন্য হাতে। আমি জানতাম, এই ফিরে আসা লোকগুলি এবং আমি, এরপর কোন রাতে ঘুমোতে পারব না। প্রতিটি সকালে একটি সংবাদ পাবার আশায় জেগে থাকবো। সংবাদটি কোনদিনই এল না। আর, সবসময়ই মনে হত হঠাৎ একটা কিছু এসে যাবে। আসবেই! না, না, এ অসম্ভব। এ হতে পারে না। এভাবে বাঁচার অবস্থা কিছুতেই টিকতে পারে না! একটা কিছু ঘটবেই প্রত্যেকের জন্যে। পোষ্টাফিসের বারান্দায় আমার উত্তেজিত সকালগুলো কেটে যাচ্ছিল এমনি করে। না, কোন খবর আসে নি। কোন টিকিট।

তবু আমি অপেক্ষা করতে পারতাম। সারা জীবন ধরে প্রতীক্ষায় থাকতাম। তৃপ্তি বলল সে হয় না। আমরা চলে যাবো।

'কোথায় তৃপ্তি?'

'কোন দেশে। কোন বড়ো শহরে।'

'কলকাতা?'

'কী জানি। আমার মনে হয়। খুব বড় শহর আছে কোথাও।' তৃপ্তি নাক চুলকে বলল, 'সেখানে লোকগুলো খুব ভালো। সেখানে…'

'পাগল!' আমি ওকে থামিয়ে দিয়েছিলাম। 'ঘরে আমার রুগ্ন বাবা-মা, ভাইবোন। তাদের কে দেখবে?'

তৃপ্তি আমার চোখে চোখ রেখে না কেঁপে মৃদুস্বরে বলল, 'ঈশ্বর।' আমি অবাক হয়ে ওকে দেখছিলাম। ওর উচ্চারিত—নির্বিঘ্নে কথিত, শান্ত সহজ শব্দটা আমায় ভাবাচ্ছিল। আমার মনের বালিতে কে যেন আঁক কেটে আঁক কেটে লিখছিল 'ঈশ্বর ঈশ্বর ঈশ্বর!' মুছে দিচ্ছিল। আবার লিখছিল।

ওর কথিত শব্দটা তৃপ্তিকেও সম্ভবত শক্তি যোগাল ক্রমান্বয়ে। তৃপ্তি আমাকে নিবিড় ভাবে, মোহ আর মোহ দিয়ে টানল ঘন থেকে ঘনতর।

আমাকে মাতাল করল 'ভালবাসা' আর 'ঈশ্বর'। 'ভালবাসা' বলল, 'চলো'। 'ঈশ্বর' বলল 'যাও'। আমি এলাম। আমি ওকে নিয়ে বৃষ্টিঝরা হাওয়া-কাঁপা অন্ধকার রাতের মাঠ পেরোলাম। সিগন্যালের লাল আলো আমাকে প্রলুব্ধ করছিল। তারপর আলোটা নীল হল। আমরা দৌড়চ্ছি। বারোটা পঞ্চান্নর গাড়ি অন্ধকার গিলতে গিলতে ধাবিত হচ্ছিল। স্টেশনে থামল। আমরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছি। ঘণ্টা বাজল। ট্রেনটা চলে গেল। চেনা যাত্রীদের মুখোমুখি পড়ার ভয়ে আমরা পথ থেকে নেমে ঝোপে লুকিয়ে ছিলাম। তারপর নির্জন স্টেশনে এসে পেঁছিলাম। আমরা ভারী ক্লান্ত এতক্ষণে। আমরা ভীত। পরবর্তী কোন ট্রেন, যে-কোন ট্রেন, আপ কিংবা ডাউন, আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। গন্তব্যস্থানের কথা আর ভাবছি না। আমাদের শুধু বিশ্বাস, যেদিকে যাই, আমাদের জন্যে একটি সোনালী পুতুল পৃথিবী, একটি সুখী, বৃহত্তর শহর অপেক্ষা করে আছে। যেহেতু আমাদের 'ভালবাসা' বলেছে, 'চলো'; ঈশ্বর বলেছে 'যাও।'……

তিনটে বাতিই নিবে গেছে দমকা হাওয়ায়। আমার জানুতে তৃপ্তির মাথা। পরবর্তী ট্রেনের খবর জানবার জন্যে আমি অস্থির হলাম একসময়।

তৃপ্তির মাথাটা নামিয়ে দিতেই তৃপ্তি ধড়মড় করে উঠল। আমার হাত চেপে ধরল। ফিসফিস করে বলল, 'বিজুদা, আমি ঘুমোই নি।'

'পালাচ্ছিনে। তোমায় ফেলে পালাবো না।' ওর কাঁধে মৃদু নাড়া দিলাম। 'ট্রেনের সময়টা জেনে আসি।'

'না, না।'

'ছিঃ, একথা এখনো ভাবতে পারো তৃপ্তি?' আমি ক্ষুব্ধ।

'আমার ভয় হচ্ছে।'

কেন?'

'যদি ওরা কেউ আসে?' তৃপ্তি আস্তে আস্তে বলল। তুমি হয়তো··

'ওরা কেউ আসবে না।' অন্ধকার মাঠটা দেখে নিয়ে বললাম। 'ওরা এখন অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত।' শিশুর ভঙ্গীতে হাসলাম। অথচ একথা আমারও মনে হচ্ছিল। 'আমার বাবা' প্রিয়তম একটি শরীর। এখন ওদের শরীরের ওপর নিশ্চলভাবে গুরুভার। ওরা সেটি বহন করছে। আমার কথা ভাবছে। আমার ছোটভাই নিশ্চিত ওদের সঙ্গী। মুখে আগুন দেবে বলে ওরা তাকে কোলে করে নিয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টিতে আমার ছোটভাই, বাবা ও লোকজনের শরীর ভিজছে। হিম হাওয়ায় শীত বোধ হচ্ছে ওদের। আমার

শিশুভাইয়ের কান্না শুনতে পাচ্ছি যেন। শিশুর কান্নাটা ডুবিয়ে দিতে আমি এক অতিকায়, অতিশয় শিশুর মতো ক্রমাগত ফিক্ ফিক্ করে হাসতে থাকলাম।

তৃপ্তি আমাকে ঝাঁকুনি দিল। 'এই, কী হচ্ছে? হেসো না।'

'কেন?'

'হাসতে নেই।'

'কেন?'

'ওরা কাঁদছে। তোমার মা।' তৃপ্তি চুপ করে গেল। ও জানে কেন হাসতে নেই। ও জানে মা আমার নাম ধরে কাঁদছেন। ওর পিসীমা, পিসীমাও কাঁদছে নিষ্ঠুর বৃষ্টি ও অন্ধকারে। তৃপ্তি কিছু বলতে পারছে না। জবাব নেই কোন। ওর 'ভালবাসা' ঐ সমবেত শোকের জলে ডুবে যাচ্ছে। ফলে তৃপ্তিও কেঁদে উঠল। আমার বুকে মাথা রেখে কেঁপে কেঁপে কাঁদতে থাকল।

'কেঁদোনা তৃপ্তি, কান্না না।'

তীব্র মত্ত হাওয়ার মতো, বৃষ্টির মত, ঠিক মনে হল, অতিদূর পীরালির শ্মশানের চিতা থেকে উত্থিত অভিশাপ, স্টেশনের দেওয়ালে শব্দ তুলছিল! আমি ধারাবাহিক উচ্চারণ করলাম, 'কান্না না, কিছু না আমাদের অন্য কিছু থাকতে নেই।

তৃপ্তি মুখ তুলে বলল, 'তোমার বাবার জন্যে দুঃখ করো না।'

আমি হাসছিলাম।

'স্বর্গে উনি সুখী হবেন আমাদের জন্যে।'

'সব পাপ ভালবাসার জলে ধুয়ে যায়।'

তবু আমি হাসছিলাম। ওর কথাগুলো উদ্ভট শোনাচ্ছিল। 'বাবা' 'স্বর্গ' ও 'পাপ'। তারপর আমরা দুজনে উঠে দাঁড়ালাম। টিকিট ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বললাম, 'পরের ট্রেন ক'টায় বলতে পারেন?'

'পারি।' টেবিলে শুয়ে শুয়ে মুখ না তুলে স্টেশনবাবু বললেন। 'দুটো পাঁচ।' স্টেশনবাবু পাছে উঠে দাঁড়ান, তৃপ্তিকে ঠেলে সরিয়ে দিলাম। তৃপ্তি দরজার পাশ থেকে তবু আমাকে ছুঁয়ে থাকল। বিরক্ত হয়ে সরে এলাম আবার বেঞ্চে। চুপচাপ বসাই ভালো। আমি কিছুই ভাববো না। শুধু ভাববো বৃষ্টি, অন্ধকার ও হাওয়া। কিচ্ছুনা, কিচ্ছুনা।

তবুও ঘুরেফিরে পালিয়ে আসার দৃশ্যটা আমার চোখে ভাসছিল। মৃত্যুশয্যা, মা, লোকজন এবং লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে আসা তৃপ্তির পিসী।

তৃপ্তির পিসী বাবার জন্যে সমবেত শোকসঙ্গীতে যোগ দিতে আসছিল। আমি কান্নার রোল থেকে দূরে সরে যেতে যেতে হঠাৎ চমকে উঠেছিলাম। তৃপ্তি আমাকে আকর্ষণ করছিল। 'এই সুযোগ, এই সুযোগ।'

স্টেশনের ঘড়িতে শব্দ বাজল। বললাম 'এখনো প'য়ত্রিশ মিনিট আপ-ট্রেনটা আসতে।'

তৃপ্তি প্রশ্ন করল, 'কোথায় যাবে?'

চমকে উঠলাম, 'যেখানে খুশি।'

তৃপ্তি আচমকা হেসে উঠল, 'নরকেও?'

'নরক শব্দটায় ভয় পেলাম। ভেজা চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠল। নিশ্বাস ফেলে বললাম, 'বরং কলকাতা যাওয়াই ভালো।'

'অত টাকা কোথায় পাবে?'

'আছে।' গম্ভীর হয়ে বললাম।

'দেখি।' তৃপ্তি আমার পকেট খুঁজতে থাকল। আমি বাধা দিলাম না। আমার পকেট শূন্য ছিল। আমি কিছুই ভাবিনি। তৃপ্তি কিছু খুঁজে না পেয়ে বলল, 'বড্ড বোকা একেবারে। পুরুষমানুষ এত বোকা ভালো নয়।'

আমার রাগ হচ্ছিল। যেন দায় আমারই। গজ গজ করে বললাম, 'তুমিই তো আনলে আমাকে!'

'আমি?' তৃপ্তি তবু হাসছিল। 'গরজ?' তৃপ্তি তার হাতের মুঠোয় কিছু আমার পকেটে রাখছিল। আমি অবাক। 'টাকা? কোথায় পেলে?'

'অনেকদিন থেকে জমিয়েছি। এই সুদিনের জন্যে।' মিষ্টি করে বলল তৃপ্তি। 'কিন্তু—না জমালে কী করে যাওয়া হত?'

মুখ ফিরিয়ে বললাম, 'এসেছি যখন যেতামই। টিকিট না কেটে।'

তৃপ্তি দুলে দুলে হাসল। আমার বুকে জড়িয়ে গেল ওর মাথা। খোলা বৃষ্টিভেজা চুল। চুলে অচেনা গন্ধ। আমার ভাল লাগল। এই চুলগুলো যেন বা ভালবাসার, তৃপ্তির অস্তিত্বের ছড়ানো রেশমী শিকড়গুচ্ছ। বিহ্বল আমার শরীরে, বৃষ্টিহিম কাতর ক্লান্ত মাংসে ভিন্নতর ক্ষুধা জাগাচ্ছিল। তৃপ্তি বলল, 'গাড়ি থেকে যদি কোন চেনা লোক নামে?'

চেনা লোকের কথায় সচেতন হলাম মুহূর্তে। 'চল, দূরে কোথাও বসি।'

'কিন্তু বৃষ্টি যে;' তৃপ্তি বলল। নামুক চেনা লোক। কাকেও

ভয় করিনে আর।' তারপর জুতোর শব্দ শুনলাম। স্টেশনবাবু বের হচ্ছিলেন অন্ধকারের খোঁদল থেকে। তাঁর হাতে ভুতুড়ে একচোখো আলো। তৃপ্তি সরে গেল তফাতে। আমিও কাঠকঠোর। সম্ভাবিত কোন আক্রমণকে রুখতে তৎপর। এবং স্টেশনবাবু তার অদ্ভুত আলোর চোখে আমাদের কিছুক্ষণ ধরে দেখলেন। তারপরই শ্লেষ্মাজড়ানো কণ্ঠস্বর এল। 'কোথায় যাওয়া হবে?'

উত্তর স্পষ্ট ছিল। 'কলকাতা।'

'কোত্থেকে আসা হচ্ছে?'

'বিনোদিয়া।' স্পষ্টতর বললাম।

'ওটি কে?'

উত্তর স্পষ্টতর হল। 'বউ।'

'এত রাতে কেন?'

'আমাদের ইচ্ছে।' আমি বললাম বিড়বিড় করে। এবং আমাকে অবাক করে স্তব্ধ করিয়ে দিয়ে 'আমাদের ইচ্ছে' তৃপ্তিও বলে ফেলল হঠাৎ।

'ও।' স্টেশনমাস্টার একটু চুপ করে থাকলেন।

আমার কিন্তু আলাপ করতে ইচ্ছে করছিল। পকেটে একটিমাত্র সিগারেট ছিল, অবশ্য সেটি অন্যত্র সংগৃহীত, দেবার ইচ্ছেয় পকেটে হাত ভরলাম। সিগারেটটা ভিজে গিয়েছিল। তাই একটু হাসলাম ক্ষুব্ধ হ'য়ে।

স্টেশনমাস্টার আমার গায়ে গায়ে বসলেন। আমার শরীর কাঁপল অমনি। তৃপ্তি আরও একটু তফাতে সরে গেল। স্টেশনমাস্টার বললেন. 'যাচ্ছেতাই বিষ্টি কিন্তু।'

আমি খুশী হয়ে বললাম, 'হ্যাঁ।'

এরপর ও'র গল্পগুলো শুনলাম। এর আগে যে-সব স্টেশনে ছিলেন সেখানের কথা। বাজারদর আর ও'র বয়স, বিবাহ, সন্তানাদির কথা। কোন স্টেশনই ও'র মনের মতো নয় সে-কথাও শোনালেন। উনি সব-সময় শুধু বদলী হওয়ার কথা ভেবে থাকেন বললেন। 'কোথাও সুখ নেই— কোথাও।'

তারপর বললেন, 'ট্রেনগুলো যখন আসে যায়, চাকায় নাকি অদ্ভুত সব কথা বাজে।'

আমি খুশী হয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই যে, 'টিকিটবাবুর কত টাকা, টিকিটবাবুর···'

স্টেশনমাস্টার হাসলেন। যে যা শোনে, ওই এক মজা কিন্তু। ইচ্ছেমতো কথা বাজায় ট্রেন।' আরো অনেকগুলো জানা শব্দ স্মরণ করছিলাম। কিন্তু স্টেশনমাস্টার বলতে থাকলেন, 'আমি বাপু ওসব কিস্সু শুনিনে। বুঝতেই পারিনে কিছু। শুনে শুনে সবই বাজে মনে হয়। প্রথম-প্রথম অবশ্য···কাটোয়ায় এক পাগলা ট্রেন চলে গেলে চেঁচাত : শালারা, কান পেতে শোন্রে, রেলগাড়ির চাকায় বলছে, নরকে নরকে নরক থেকে নরকে, নরক থেকে···স্টেশনমাস্টার যেন কাঁদবার ভঙ্গীতে হাসলেন! 'নরক থেকে নরকে···নরক থেকে···'

'একবার আমি ইলেমগঞ্জে বদলি হয়েছিলাম! স্টেশনের পেছনে নদী। তখন এমনি বর্ষাকাল।'

স্টেশনমাস্টার একটু থামলেন। কী যেন ভাবলেন।

আমি বললাম, 'তারপর?'

'এক বর্ষার রাতে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে···'

আমি বললাম, 'তারপর?'

'ট্রেন ফেল করে স্টেশনে সময় কাটাচ্ছিল। পরের ট্রেন ··'

তবু আমি বললাম, 'তারপর?'

টেলিগ্রামের টক্‌টক্ শব্দ বেজে উঠলো এ-সময়। স্টেশনবাবু ভেতরে গেলেন। তৃপ্তি আমার কাছ ঘেঁষে বসলো। ফিসফিস করলো : লোকটা ভালো না।' আমি ওকে আদর করলাম। ক্রমাগত আদর করার ইচ্ছায় ওকে বিশ্রীভাবে টানলাম আরো কাছে। ওকে ভেজা বেড়ালের মতো বোধ হচ্ছিল। এরপর অবশ্যই আমরা পরস্পর চুমু খাচ্ছিলাম। এবং আমাদের ভেজা স্যাঁতসেঁতে মাংস তাপ পাচ্ছিল। আশ্চর্য, এতক্ষণ পরে এই শারীরিক ঘনিষ্ঠতা আমাদের 'ভালবাসা'কে স্পষ্টতর ভূমিকা দিচ্ছিল। স্পষ্টতর ভূমিকায় 'ভালবাসা' সবকিছু কালো রঙে ঢেকে বাতি হয়ে জ্বলতে থাকলো। তৃপ্তি কাঁপতে কাঁপতে বললো, 'তুমি দেখে নিও, আমি শীগগির মরে যাবো।' অলৌকিক বাতিটা কাঁপছিল। তার নীলাভ দ্যুতির নীচে স্খলিত ছাইগুলো স্পষ্টতম হচ্ছিল। তৃপ্তি বিড়বিড় করলো, 'আমি মরতে চাইনে। অথচ মরে যাবো।' ও আবার কাঁদছিল। ওর কান্না দেখে আমারও কান্না পাচ্ছিল। পুরোনো ভয়টা আবার জড়িয়ে ধরছিল। আবার বাতাস এলো ঝাঁপিয়ে। বৃষ্টি এলো ঘোরতর! বৃষ্টি আমাদের ভিজিয়ে দিল! আমরা সরে যাচ্ছি না কোথাও! পরস্পর দৃঢ়ভাবে ধরে রয়েছি। আমার ভয় হচ্ছে আমরা দু'জনে এক অতল খাদে গড়িয়ে পড়ছি।

দৃঢ়তর হচ্ছে শারীরিক বন্ধন। আমরা যেন শেষবারের জন্যে দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করলাম—ভালবাসি, 'ভালবাসি।'

আস্তে আস্তে ডাউন-ট্রেনের সময় নিকটবর্তী। যেন বা স্পষ্টতর হচ্ছিল তার চাকার ধ্বনি দূরে, যেন আমার বোধে স্পন্দিত···'নরকে···নরকে···নরক থেকে নরকে···নরক থেকে···।' আমি ভয় পেলাম, গভীর প্রগাঢ় ভয়, এবং ঘৃণা। ঘৃণা আমার ভালবাসাকে। কেন সবই 'নরকে···নরক থেকে নরকে···? 'আঃ, আমি পালাতে পারছিনে, এবং তৃপ্তি আমাকে জড়িয়ে ধরে থাকলো নিবিড় বাহুতে, জাপটে ধরে রইল আমার ভালবাসা, আমাকে ক্ষিপ্র বিহ্বলতায়···অথচ নিশ্চিত-ভাবেই সব পথই 'নরকে···নরক থেকে নরকে···'

'ভালবাসার জলে পাপ ধুয়ে যাবে না।' আমি বলতে চাচ্ছিলাম। আমার মুখে তৃপ্তির হাত। আমার ভালবাসার হাত। আমার ভালবাসা আমাকে ঢেকে রেখেছে।

স্টেশনবাবুর আলোর লম্বা তরোয়াল আমাদের ঐক্যকে দু'ভাগ করলো এসে। 'সেই গল্পটা—' স্টেশনবাবু গলা ঝেড়ে বলতে থাকলেন। 'ছেলেটি ও মেয়েটি পালিয়ে যাচ্ছিল। পরের ট্রেন রাত তিনটেয়। কিন্তু···' স্টেশনবাবু হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দ করে হেসে উঠলেন, 'ট্রেনটা আমি আর আসতে দিইনি। আগের স্টেশনে আটক রাখলাম।'

চমকানো স্বরে বললাম, 'ওরা তবে যেতে পারল না?'

'না।' স্টেশনবাবুর চোখদুটো জ্বলতে থাকলো। 'আমার ইচ্ছে।' এবং হঠাৎ উনি উঠে গিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেন। ঘণ্টার শব্দ কানে তালা ধরিয়ে দিচ্ছিল। এবং যতক্ষণ না দুটো পাঁচের আপ-ট্রেন স্টেশন ছাড়ল, কোন যাত্রী নামেনি ট্রেন থেকে, আমি ও তৃপ্তি পুতুলের মতো বসে থাকলাম বেঞ্চের দু'প্রান্তে।

বেহুলার ভেলা

মতি নন্দী

অমিয়া বলল, পয়সা কি কামড়াচ্ছিল। কয়লাওলার কাছে এখনো দু'মণের দাম বাকি। তাছাড়া, ওই ক'টা আলুতে কি হবে, ঘরে যা আছে তাও দিতে হবে দেখছি। এরপর সে বললে, টাটকা খুব, চাঁবিও কম দিয়েছে। পুতুল বলল, রোববার কোর্মা রেঁধেছিল তৃপ্তির নতুন বৌদি। খুব বেশি ঘি দিয়েছিল, তাই ক্যাটকাটানি শুরু করেছিল শাশুড়ী। এই নিয়ে সে কি ঝগড়া মায়েতে ছেলেতে। তারপর সে বলল, আমি কিন্তু রাঁধব বলে দিলুম। বাবুদা বলছিল পাঞ্জাবির হোটেলে নাকি দারুণ রাঁধে, আজ আসুক না একবার, দেখিয়ে দোবো'খন।

চাঁদু বলল, আগে জানলে জোলাপ নিয়ে পেটটাকে রবারের করে রাখতুম। খানিকটা কাল সকালের জন্যে তুলে রেখো, চায়ে বাসি রুটি ভিজিয়ে খেতে খেতে তো জিভে চড়া পড়ে গেল। শেষকালে সে বলল, যেই রাঁধো বাবা, জবাফুলের রঙের মতো রঙ হওয়া চাই কিন্তু।

রাধু এখন বাড়ি নেই। পাঁচ বছরের খোকন শুনে শুনে কথা শেখে, সেও প্রমথর হাঁটু জড়িয়ে বলল, বাবা আমি খাব মাংস।

ওরা যাই বলুক প্রমথ লক্ষ্য করছিল চোখগুলো। ঝিকোচ্ছে বরফকুচির মতো। ওরা খুশি হয়েছে। ব্যস, এইটুকুই তো সে চেয়েছিল, তা না হলে মাসের শেষ শনিবার একদম পকেট খালি করে ফেলার মতো বোকামি সে করতে যাবে কেন।

অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথটা আরো ছোট হয়ে যায় শোভাবাজারের মধ্যে দিয়ে গেলে। বিয়ের পর কয়েকটা বছর বাজারের মধ্যে দিয়েই অফিস থেকে ফিরত, সেও প্রায় বাইশ বছর আগের কথা। তারপর বাবা মারা গেলেন,

দাদারা আলাদা হলেন, প্রমথও এখনকার বাড়িটায় উঠে এল। উঠে আসার তারিখটা পাওয়া যাবে ভব শ্রীমানির খাতায়। সেই মাস থেকেই অমিয়া মাসকাবারির সওদা বন্ধ করল, ওতে বেশি বেশি খরচ হয়। তারপর কালেভদ্রে দরকার পড়েছে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার। আজ গরমটা যেন অন্যদিনের থেকে বেশি চড়ে উঠেছে, জুতোর তলায় পিচ আটকে যাচ্ছে, কোনোরকমে বাড়ি ফিরলে বাঁচা যায়।

ডাব বোঝাই একটা ঠেলাগাড়ি পথ জুড়ে মাল খালাস করছে, চারধারে যেন কাটামুন্ডুর ছড়াছড়ি। তার ওপর বাজারের আস্তাকুঁড়টাও জিনিসপত্রের দামের মতো বেড়ে এসেছে গেট পর্যন্ত। পুব দিকের গেট দিয়েই বেরোনো ঠিক করল প্রমথ। দুটো ব্লকের মাঝখানের পথটায় থৈ-থৈ করছে জল। চাপা-কল থেকে জল এনে ধোয়াধুয়ির শুরু করেছে দুটো লোক। ঝাঁটার জল যেন কাপড়ে না লাগে সেই দিকে নজর ছিল।

আর দু পা গেলেই মাছের বাজারটা শেষ হয়, তখুনি আচমকা জল ছুঁড়ল লোকটা। কাপড়ে লাগে নি, কিন্তু লাগতে তো পারত। বিরক্ত হয়েই সে পিছন ফিরেছিল, আর অবাক হল পিছন ফিরে।

বাজারের শেষ মাথায় দাঁড়িয়েছিল প্রমথ, যতদূর দেখা যায় প্রায় শেষ পর্যন্ত এখন চোখ চলে। ফাঁকা, খাঁ-খাঁ করছে; অদ্ভুত লাগল তার কাছে।

সকালে মাছির মতো বিজবিজ করে, তখন বাজারটা হয়ে যায় কাঁঠালের ভূঁত। ঘিন ঘিন করে চলতে ফিরতে। আর এখন, চোখটা শুধু যা টক্কর খেল কচ্ছপের মতো চটমোড়া আনাজের ঢিপিতে। নয় তো সিধে মাছের বাজার থেকে ফলের দোকানগুলো, দোকানে ঝোলানো আপেলগুলো পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আপেল না হয়ে ন্যাসপাতিও হতে পারে কিন্তু লক্ষ্মীপুজোর দিনটায় একবার ওদিক মাড়াতে হয়। ফুল, পাতা ওই দিকটাতেই পাওয়া যায়, আর তখনই চোখে পড়ে ঝোলানো আপেল, সবরি কলার ছড়া, আনারস আর শীতের সময় চুড়োকরা কমলা লেবু। শীতের কথা মনে পড়লেই কপির কথা মনে আসে, আগেকার দিনে সের দরে কপি বিক্রি হত না। নাকের সামনে বাঁধাকপি লোফালুফি করতে করতে সন্নেসীচরণ হাঁক ছাড়ত, খোকাবাবু এই চলল পাঁচ নম্বরী ফুটবল, ছোকা রেঁধে খাও, গোস্টো পালের মতো সটু হবে। সন্নেসীটা যেন কি করে জেনে ফেলেছিল স্কুল টিমে প্রমথ ব্যাকে খেলে, আর গোষ্ঠ পালকে তো সে পুজো করত মনে মনে। আজকাল অনেকেই নাম করেছে, চাঁদুর মুখে কত নতুন নতুন নাম শোনা যায়। ওই

শোনা পর্যন্ত। মাঠে যেতে আর ইচ্ছে করে না। সন্ন্যেসী একদিন ফুটপাথে মরে পড়ে রইল। আজেবাজে জায়গা থেকে রোগ বাধিয়ে শেষকালে বাজারের গেটে বসে ভিক্ষে করত। সন্ন্যেসীর সঙ্গে সঙ্গে কুলদাকে মনে পড়ল প্রমথর, চেহারা কি! যাত্রাদলে বদমাইসের পার্ট করত। বাজারে, শিবরাত্তিরে যাত্রা শুনতে আসার আগে হিসেব করে আসতে হত বাবার কাছ থেকে কতগুলো চড় পাওনা হবে। কুলদার হাতে আড়াইসেরী রুইগুলোকে পুঁটি বলে মনে হত। ওর মতো ছড়া কাটতে এখন আর কেউ পারে না। আজকাল যেন কি হয়েছে, সেদিন আর নেই। গুইরাম মরে গেছে, ওর ছেলে বসে এখন। ছেলেটা বখা। অথচ গুইরামের পানে, পোকা হাজা কিংবা গোছের মধ্যে ছোট পান ঢোকানো থাকত, কেউ বলতে পারত না সে কথা। গুইরামের দোকানের পাশে এখন একটা খোট্টানি বসে পাতি-লেবু নিয়ে। অমিয়ার জন্য রোজ লেবুর দরকার, একদিন ওর কাছ থেকে লেবু কিনেছিল প্রমথ। মাস ছয়েকের একটা বাচ্চা, বয়স দেখে মনে হয় ওইটেই প্রথম, কোলের ওপর হামলা-হামলি করছিল, বুকের কাপড়ের দিকে নজর নেই। ওর কাছ থেকে আর কোনোদিন লেবু কেনেনি সে। দুনিয়াসুদ্ধ মানুষের যেন হজমের গোলমাল শুরু হয়েছে আর লেবুও যেন এতবড়ো বাজারটায় ওই একজায়গাতেই পাওয়া যায়। দিন দিন যেন কি হয়ে উঠেছে। বুড়োধাড়ীদের কথা নয় বাদ দেওয়া গেল, কিন্তু কাচকাঁচারাও তো বাজারে আসে, বাজার পাঁচটা লোকের জায়গা।

প্রমথর বেশ লাগছে এখন বাজারটার দিকে তাকিয়ে থাকতে। ছোটবেলার অনেক কথা টুকটাক মনে পড়ছে। পেচ্ছাপখানার সামনে চুনো মাছ নিয়ে বসে একটা বুড়ী, ওকে দেখলেই আবছা মনে পড়ে মাকে। বোকার মতো হাসে, আর পায়ের আঙুলগুলো বাঁকা। ওখানটায় এখন থৈ-থৈ করছে চাপা-কলের জল। মাকে দাঁড়িয়ে গঙ্গায় চান করেছিল সে, সেই প্রথম গঙ্গায় চান করা। তখন কত ছোট্টই না ছিল, স্টীমারের ভোঁ শুনে জলে নামতে ভয় করেছিল তার। মাসের শেষে বাজারের ওইদিকটায় আর যাওয়া হয় না। আলু, পান আর দু-একটা আনাজ কিনেই বাজার সারতে হয়। চাঁদুটাই শুধু গাঁইগুঁই করে, কেমন যেন বাঙালে স্বভাব ওর, মাছ না পেলেই পাতে ভাত পড়ে থাকে। খিটমিট লাগে তখন অমিয়ার সঙ্গে। চালের সের দশ আনা, পাতে ভাত ফেলা কেই বা সহ্য করতে পারে. পয়সা রোজগার করতে না শিখলে চাঁদুটা আর শোধরাবে না। রাধু একটা টিউশনি পেয়েছে। তবে আই. এ-টা পাস করলে অন্তত গোটাকুড়ি টাকা মাইনে হত। ওর কিংবা

পুতুলের খাওয়ার কোনো ঝামেলা নেই, অমিয়ারও না। পাতে যা পড়ে থাকে অমিয়া পুতুলকে তুলে দেয়, বাড়ের সময় মেয়েদের খিদেটাও বাড়ে। শিগগিরই আর একটা দায় আসবে। পুতুলের বিয়ে। মুখটা মিষ্টি, রঙটা মাজা, খাটতে পারে, দেখেশুনে একটা ভালো ছেলের হাতে দিতে হবে।

হটিয়ে বাবুজী।

এবার এই ধারটা ধোয়া হবে, পিছিয়ে এল প্রমথ। সেই জায়গাটা দেখা যাচ্ছে। একটা বুড়ো বসত ওখানে। পেয়ারা, আমড়া, কদবেল ছোট্ট ঝুড়িতে সাজিয়ে বুড়োটা দুপুরে বসে বসে ঝিমোত। সে কি আজকের কথা! বাবা মারা যাবার অনেক আগে, বড়দার তখন থার্ড ক্লাস, যুদ্ধ তখন পুরোদমে চলছে। সরু চালের দর এগারো টাকা, কাপড়ের জোড়া বোধহয় আট টাকায় উঠেছিল; সে আজ চল্লিশ বছর হয়ে গেল। স্কুলের টিফিনে একটা আধলা নিয়ে তিন-চারজন তারা আসত, পয়সায় আটটা কাঁচা আম। আর এ বছর দশ পয়সা জোড়া দিয়ে একদিন মাত্র সে কাঁচা আম কিনেছে, তাও কুসিকুসি। আহা, সে কি দিন ছিল। প্রমথর ইচ্ছে করে বুড়ো যেখানটায় বসত, সেখানে গিয়ে একবার দাঁড়ায়। ওখানে তখন রক ছিল না, দেয়ালের খানিকটা বালিখসা ছিল। দুটো ইঁটের ফাঁকে গর্তটায় দোক্তা রাখত বুড়োটা! গর্তটা এখনো আছে কিনা দেখতে ইচ্ছে করছে। ইচ্ছেটা খুব ছেলেমানুষের মতো। এত বছর পরেও কি আর গর্তটা থাকতে পারে, ইতিমধ্যে কতই তো ওলট-পালট হয়ে গেছে, ভেঙেছে, বেড়েছে, কমে নি কিছুই। তবু এই দুপুরের বাজারের চেহারাটা একরকমই আছে। ছেলেমানুষ হয়ে যেতে ইচ্ছে করছে, বুকটা টনটন করছে, তবু ঝরঝরে লাগছে গা-হাত পা।

এই যে আসুন বাবু।

প্রমথ পিছন ফিরল; গোড়ার দোকানটা লক্ষ্য করে সে এগিয়ে এল। সদ্য ছাল ছাড়িয়ে ঝুলিয়েছে। পাতলা সিল্কের শাড়িজড়ানো শরীরের মতো পেশীর ভাঁজগুলোকে রাক্ষুসে চোখে তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে।

কত করে দর যাচ্ছে।

তিন টাকা।

ভাবলে অবাক লাগে। চাঁদুর মতো বয়সে ছ-আনা সের মাংস এই বাজার থেকেই সে কিনেছে। তখন প্রায় সবই ছিল মুসলমান কসাই। ছেচল্লিশ সালের পর কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল।

একসের দিই?

উৎসুক হয়ে উঠেছে লোকটার চোখ আর ছুরি। এর মতো মুন্নাও হাসত, তার একটা দাঁত ছিল সোনার, তবে মুন্নাকে কিছু বলার দরকার হত না, গর্দান থেকে আড়াই সের ওজন করে দিত। সেই মুন্না বুড়ো হল, তার ছেলে দোকানে বসল। তখন সংসার আলাদা হয়ে গেছে। দেড় সের নিত তখন প্রমথ। ঘোলাটে চোখে তাকাত বুড়ো মুন্না, চোখাচোখি হলে হাসত, চোখ ঝিকিয়ে উঠত। রায়টের সময় মুন্নাকে কারা যেন মেরে ফেলল।

একসের দিই বাবু?

না তিন পো, গর্দান থেকে দাও।

ওজন দেখল প্রমথ, যেন সোনা ওজন করছে। পাসানটা একবার দেখে নেওয়া উচিত ছিল। থাকগে ওরা লোক চেনে। তিনটে টাকা পকেটে ছিল। বাকি বারো আনা থেকে আলু, পেঁয়াজ কিনতে হবে। মাইনে হতে এখনো ছ-সাত দিন বাকি। ট্রামভাড়ার পয়সাও রাখতে হবে। মাংসের ঠোঙাটা তুলে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল প্রমথ।

মেটুলি দিলে না যে, তিনটাকা দর নিচ্ছ, আমরা কি মাংস কিনি না ভেবেছ।

লোকটা একটুকরো মেটুলি কেটে দিল। অনেকখানি দিয়েছে, অমিয়া দেখে নিশ্চয় খুশি হবে।

রাস্তায় পড়েই প্রমথর আবার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ল। বাবার সঙ্গে ভবর জ্যাঠা হরি শ্রীমানির দোকানে এসেছিল এক সন্ধ্যায়। পাশেই ছিল মাটির খুরি-গেলাসের দোকান। তখন বিয়ের মরশুম, একহাজার খুরি-গেলাস কিনল কারা যেন। একহাজার লোক খাওয়ানোর কথা তো এখন ভাবাই যায় না। স্বদেশ কনফার্মড হবার পর বিয়ে করল। বরযাত্রী হয়েছিল আত্মীয়-স্বজন, অফিসের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন মিলিয়ে তিরিশ। কন্যাপক্ষ মাংস খাইয়েছিল। কায়দা করে রাঁধলে মাছের থেকে সস্তা হয়। স্বদেশের বিয়েও আজ সাতমাস হয়ে গেল। ছেলেও নাকি হবে। তবু তো সে সাতমাস আগে মাংস খেয়েছে। কিন্তু বাড়ির ওরা, অমিয়া, পুতুল! রাধু হন্যে হয়ে চাকরি খুঁজছে, একটা পয়সাও বাজে খরচ করে না। চাঁদু ভালো ফুটবল খেলে, হয়তো বন্ধুরা খাওয়ায়ও! ছেলেটা ভালোমন্দ খেতে ভালোবাসে, আর খেতেও পারে। এইটেই তো খাওয়ার বয়স। অমিয়ার খুড়তুতো বোনের মেয়ে শিলুর বিয়ের কথা শুনে কি লাফালাফিটাই জুড়েছিল। নেমন্তন্নে অবশ্য যাওয়া হয় নি। অন্তত একটা সিঁদুর-

কোটোও তো দিতে হত। চাঁদুটা আজ খুব খুশি হবে, ওরা সকলেই খুশি হবে।

বড় রাস্তার ঠিক মধ্যিখানেই কালীমন্দির। হাতে মাংসের ঠোঙা। চোখ বন্ধ করে মাথা ঝুঁকিয়ে দূর থেকেই প্রণাম জানিয়ে প্রমথ রাস্তা পার হল। পর্দা-ফেলা রিক্‌শা থেকে গলা বার করে দুটি বৌ প্রমথর পাশ দিয়ে চলে গেল।

সিনেমা হলগুলো আজকাল এয়ারকণ্ডিশন করা হয়েছে। প্রমথ ভাবতে শুরু করল, তা না হলে এই অসহ্য দুপুরে পারে কেউ বন্ধ ঘরে বসে থাকতে। তবু শখ যাদের আছে তারা ঠিক যাবেই. অমিয়ার কোনো কিছুতেই যেন শখ নেই আজকাল। অথচ মেজবৌদি. তার আপন মেজদা যিনি ডাক্তার হয়েই আলাদা হয়ে গেছেন. তার বৌ এখনো নাকি এমন সাজে যে. ছেলের জন্যে পাত্রী দেখতে গেলে, মেয়ে-বাড়ির সকলে গা টেপাটেপি শুরু করেছিল। মেয়েকে ফিরে সাজতে হয়েছিল ওর পাশে মানাবার জন্যে। এ-খবর অমিয়াই তাকে দিয়েছিল। ওর শখ এখন এইসব খবর যোগাড় করাতে এসে ঠেকেছে। অথচ সাজলে এখনো হয়তো পুতুলকে হার মানাতে পারে।

গলিটা এবার দেখা যাচ্ছে, ওখানে ছায়া আছে। এইটুকু পথ জোরে পা চালাল প্রমথ।

ভাবনারও একটা মাথামুণ্ডু আছে। অমিয়া যতই সাজগোজ করুক পুতুলের বয়সটা তো আর পাবে না। সতেরো বছরের একটা আলাদা জেল্লা আছে, দেখতে ভালো লাগে। অমিয়ার বিয়ে হয়েছিল সতেরো বছরে, সেও পুতুলের মতো লাজুক আর ছটফটে ছিল।

হাড়গোড়সার ছেলের হাত-পায়ের মতোই ন্যাতানো গলিটা। হাল্‌কা বাতাস পর্যন্ত স্যাঁতসেঁতিয়ে যায়। এ গলিতে ঢুকলে গায়ে চিটচিটে ঘাম হয়। কোঁচাটা পকেটে থাকছে না আলু আর পেঁয়াজের জন্যে। পেটের কাপড়ে গুঁজে দিতে একটুক্ষণ দাঁড়াল প্রমথ। ওপর থেকে উকিলবাবুর বিধবা বোন দেখছে। প্রমথ ঠোঙার দিকে তাকাল। হ্যাঁ, ওপর থেকেও বোঝা যায় এর মধ্যে মাংস আছে। নন্দীবাড়ির সঙ্গে ওর খুব ভাব। ছোট মেয়ের শ্বশুর বুঝি কোন এক উপমন্ত্রীর বন্ধু। তাই নন্দীগিন্নি ধরাকে সরা দেখে, অমিয়া দুচোখে দেখতে পারে না এই মানুষগুলোকে। উকিলবাবুর বোনের দেখা মানেই পাড়ার সব বাড়ির দেখা। খবরটা শুনলে অমিয়া নিশ্চয় খুশি হবে।

বাড়ি ঢোকার মুখে দোতলার মিহিরবাবুর সঙ্গে দেখা হল প্রমথর। এ বাড়িতে অল্পদিন এসেছে। মুখচোরা, বৌয়ের মতোই মেশে না কারুর সঙ্গে। শুধু কবিতা আর রাজনীতির কথায় মুখে খই ফোটে।

দেখেছেন তো আবার স্ট্রাইক কল করেছে, বেক্পতিবার।

শুনেছি বটে, আপিসে বলছিল সবাই, যা মাগ্‌গিগণ্ডার বাজার, আগের বার এগারো সিকে ছিল, এখন তিনটাকা।

ঠোঙা-ধরা হাতটা দোলালো প্রমথ। কিন্তু মিহিরবাবুর নজর তাতে আটকালো না।

এখন তবু তিনটাকা। এক-একটা ফাইভ ইয়ার যাবে আর দেখবেন দামও পাঁচগুণ চড়বে।

অন্য সময় হলে মিহিরবাবুর সঙ্গে একমত হত প্রমথ। কিন্তু সে যা চাইছিল তার ধার দিয়েও গেল না কথাগুলো। রোববার মিহিরবাবুদের মাংস রান্না হয়েছিল। গরম মসলা গুঁড়োবার জন্যে হামানদিস্তেটা নিয়েছিল। এখনো ফেরত দেয় নি। বোধহয় ভেবেছে, ওদের আর কিসে দরকার লাগবে, যখন হোক ফিরিয়ে দিলেই হবে। মিহিরবাবু লোক ভালো। তবু প্রমথর মেজাজ তেতে উঠল ক্রমশ।

আরে মশাই স্ট্রাইক-ফাইক করে হবেটা কি, তাতে পাঁচটাকার জিনিস একটাকায় বিকুবে?

কিছুটা তো কমবে।

আপনাদের ঐ এক কথা।

প্রমথ উঠোনের কোণে রান্নাঘরের সামনের রকে ঠোঙাটা নামিয়ে রাখল। গলার আওয়াজে অমিয়া বেরিয়ে এল। তার পিছনে পুতুল আর চাঁদু। মিহিরবাবু ওপরে উঠে গেলেন। তারপর ওরা কথা বলল। ওদের চোখগুলো বরফ-কুচির মতো ঝিকিয়ে জুড়িয়ে দিল প্রমথকে।

এইটুকুই সে চেয়েছিল। খুশি-হোক অন্তত আজকের দিনটায়। জিনিসের দাম বাড়ছে, স্ট্রাইক হবে, মিছিল বেরোবে, ঘেরাও হবে, পুলিশ আসবে, রক্তগঙ্গা বইবে, এ তো হামেশাই হচ্ছে। মানুষকে যেন কোন কামার তাতিয়ে তাতিয়ে ক্রমাগত পিটিয়ে চলেছে বিরাট একটা হাতুড়ি দিয়ে! সুখ নেই, স্বস্তি নেই, হাসি নেই।

ওসব ভাবনা আজ থাক। খোকনকে কোলে নিয়ে হাসতে শুরু করল প্রমথ ওদের দিকে তাকিয়ে।

রোদের কটকটে জ্বলুনি এখন আর নেই। বেলা গড়িয়ে এল।

অমিয়া তাড়া দিচ্ছে দোকানে যাবার জন্যে। ঘরে আদা নেই। বঁটি সরিয়ে উঠল প্রমথ। এতক্ষণ তার মাংস কোটা দেখছিল খোকন। চাঁদু বিকেলের শুরুতেই বেরিয়েছে। কোথায় ওর ফুটবল ম্যাচ আছে। বাটনা বাটতে বাটতে পুতুল খোঁজ নিচ্ছে চৌবাচ্চার। দেরি হলে বালতিতে শ্যাওলা সুদ্ধু উঠে আসে।

পাড়ার মুদির দোকানে আদা পাওয়া গেল না। তাই দূরে যেতে হল প্রমথকে। ফেরার সময় খোকনকে দেখল রাস্তায় খেলছে। ওর সঙ্গীদের মধ্যে ভুবন গয়লার নাতিকে দেখে ডেকে নেবার ইচ্ছে হল। তারপরই ভাবল, থাক, এখন বাড়ি গিয়েই বা করবে কি। তাছাড়া, ঘুপচি ঘরের মধ্যে আটকা থাকতেই বা চাইবে কেন। খোকনকে ভাল জামা-প্যাণ্ট কিনে দিতে হবে, উকিলবাবুর ছেলেদের কাছাকাছি যাতে আসতে পারে। উকিলবাবুর ছেলেরা বাসে স্কুল যায়, বেশ ইংরিজিও বলতে পারে ওই বাচ্চা বয়সে।

মাংসে বাটা-মসলা মাখাচ্ছিল অমিয়া। প্রমথকে দেখা মাত্রই ঝেঁঝে উঠল।

এত দেরি করে ফিরলে, এখন বাটবে কে।

কেন, পুতুল কোথায় ?

বিকেল হয়েছে, তার কি আর টিকি দেখার জো আছে। সেজেগুজে বিবিটি হয়ে আড্ডা দিতে গেছে।

আচ্ছা আমিই নয় বাটছি।

বঁটি পাতল প্রমথ আদার খোসা ছাড়াবার জন্যে। অনেকখানি শাঁস উঠে এল খোসার সঙ্গে। সাবধানে বঁটির ধার পরীক্ষা করল, ভোঁতা। তাহলে অত পাতলা করে খোসা ছাড়ায় কি করে অমিয়া, অভ্যাসে। অভ্যাস থাকা ভালো, তাহলে সময় কেমন করে যেন কেটে যায়। অবশ্য আলু বা আদার খোসা ছাড়িয়ে কতক্ষণ সময়ই বা কাটে। তবু ঘর-সংসার, রান্নাবান্না, ছেলেপুলে মানুষ করা, এটাও তো একরকমের অভ্যাসেই করে যায় মেয়েরা, নাকি স্বভাবে করে। অমন স্বভাব যদি তার থাকত, প্রমথ ভাবল বাঁচা যায়। জীবনটা যেন ডালভাত হয়ে গেছে। ওঠানামা নেই, স্বাদগন্ধ নেই, কিছু নেই, কিছু নেই, তবু কেটে যাচ্ছে দিনগুলো। আশ্চর্য এই ভোঁতার মতো বেঁচে থাকাটাও একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। বদ অভ্যাস।

থাক, তোমার আর কাজ দেখাতে হবে না।

অমিয়ার হাতে মসলা লেগে, হাত ধুয়ে জলভরা বাটিটা রেখে দিল সে।

শিলের ধারে আদাগুলো ঘষে নিয়ে বাটতে শুরু করল। কত সহজে কাজটা করে ফেলল ও, প্রমথ ভাবল, এটাও এসেছে ওই অভ্যাস থেকে। হাত-ধোয়া জলটুকু অমিয়া তো নর্দমাতেও ফেলতে পারত।

বাড়িতেই বসে থাকবে নাকি, বেরোবে না?

কোন কথা বলল না প্রমথ। অমিয়া মুখ ফিরিয়ে তাকাল তার দিকে।

খোকনের একটা ভালো নাম ঠিক করতে হবে।

করো না।

উকিলবাবুর ছেলেদের নামগুলো বেশ।

ওরা সাহেবি স্কুলে পড়ে শুনেছি, ছোটটা তো খোকনের বয়সী।

হ্যাঁ, বড়োটা শুনেছি ইংরিজিতে কথা বলতে পারে।

রামগতির পাঠশালায় খোকনকে ভর্তি করে দিও, দুপুরে বড় জ্বালায়।

উঠে পড়ল প্রমথ। ভেবেছিল আজ আর বাড়ি থেকে বেরোবে না। মাংস ফুটবে, ছেলেমেয়েরা কাছাকাছি জড়ো হবে, গল্প হবে এটা সেটার, আসন পেতে থালা সাজিয়ে দেবে অমিয়া, একসঙ্গে সকলে খেতে বসবে, গরম ভাত, গরম মাংস। অমিয়া তাকিয়ে আছে : গলায় চটের মতো ঘামাচি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল প্রমথ।

উকিলবাবুর রকে বসে ছিলেন গৌর দত্ত। প্রমথকে দেখে কাছে ডেকে বললেন, দেখেছ কেমন গরম পড়েছে, এবার জোর কলেরা লাগবে।

নড়েচড়ে বসলেন গৌর দত্ত। প্রমথ ওঁর পাশে বসল।

শুধু কলেরা, আবার ইনফ্লুয়েঞ্জাও শুরু হয়েছে।

লক্ষ্য করে দেখলুম জানো—

গৌর দত্ত প্রমথর গা ঘেঁষে ফিসফিসিয়ে প্রায় যে-সুরে অনিল কুণ্ডুকে তার সংসার থেকে বিধবা ভাজকে আলাদা করে দেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন, সেই সুরে বললেন, লক্ষ্য করে দেখলুম জানো বোমাটা ফাটার পরই এই ইনফ্লুয়েঞ্জা শুরু হয়েছে, গরমও পড়েছে, ঠিক কিনা।

হ্যাঁ, গরমটা এবারে তিষ্ঠোতে দিচ্ছে না।

লক্ষ্য করেছ যত বোমা সব জাপানের কাছাকাছি ফাটাচ্ছে। তার মানে কি? ইণ্ডাস্ট্রিতে খুব ফরোয়ার্ড বলেই তো ওদের এত রাগ। আমাদের পুলুর আপিসে একটা জাপানি আসে, ভালো ইংরিজি জানে না, কথা বলতে খুব অসুবিধে হয় পুলুর, ওতো ফার্স্ট ডিভিশনে বি. এ. পাস করা। তা জিজ্ঞেস করেছিল নেতাজীর কথা। ওরা আবার আমাদের

চেয়েও শ্রদ্ধাভক্তি করে। কি উত্তর দিলে জানো? বোসের মতো কেউ থাকলে তোমাদের ফাইভ ইয়ার প্ল্যানগুলোয় চুরি হত না। ব্যাপারটা বুঝতে পারলে!

হ্যাঁ, জিনিসপত্তর যা আক্রা হচ্ছে দিনকে দিন। মাংস তিন টাকায় উঠেছে।

এনেছ বুঝি আজ?

সামনের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলেন গৌর দত্ত। অন্যমনস্কের মতো লাঠিটা ঘোরাতে ঘোরাতে আবার বললেন, কি গরম পড়েছে, টিকে নিয়েছ? খাওয়া-দাওয়া সাবধানে কোরো। ছেলেপুলের সংসার, বলা যায় না কখন কি হয়।

হলে আর কি করা যাবে, সাবধানে থেকেও তো লোকে রোগে পড়ে।

ওই তো ভুল করো। আজ তোমার যদি, ভগবান না করুন, ভালো মন্দ কিছু একটা হয়, তখন সংসারের অবস্থাটা কি হবে ভেবেছ?

অস্বস্তিতে ছটফট করে উঠল প্রমথ। এসব কথা এখন ভালো লাগছে না। বোধহয় সংসারে গৌর দত্তর আর কিছু দেবার বা নেবার নেই। চাগিয়ে তোলা দরকার, আহা বুড়ো মানুষ

একটু চাখবেন নাকি?

কি এনেছ, খাসি? রাঙ না সিনা?

গর্দান।

এ হে, খাসির রাঙ দারুণ জিনিস।

গৌর দত্তর গালে যেন পিঁপড়ে কামড়াল। চুলকোতে চুলকোতে অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।

বুঝলে আগে খুব খেতুম। সামনে জ্যান্ত পাঁঠা বেঁধে রেখেই হাঁড়ি হাঁড়ি ভাত উড়িয়ে দিতে পারতুম। এখন ছেলেরা লায়েক হয়েছে, রোজগার করছে, বৌদের হাতে সংসার। পুলুটাও হয়েছে বৌ-ন্যাওটা, বুড়ো বাপের যত্ন-আত্তির দিকে নজর নেই। তোমার বৌদি বেঁচে থাকলে এ অবস্থাটা হত না।

টিকিট কাটার সঙ্গে সঙ্গে বাস বিকল হলে যাত্রীদের মনের অবস্থার মতো আস্তে আস্তে থেমে গেলেন গৌর দত্ত।

দুঃখ হচ্ছে প্রমথর। বুড়ো মানুষটার নিজের বলতে আর কিছু নেই। এখন কোনোরকমে টেনেটুনে চিতায় ওঠার অপেক্ষা। যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন জীবনটা ধুকপুক করবে, সাধ-ইচ্ছে তৈরি হবে, পূরণ করতে চাইবে,

অথচ পারবে না। এমন বাঁচার থেকে মরা ভালো। আহা বুড়ো মানুষটা মরবেই বা কেন।

চলুন গৌরদা, আজ একটু বেড়িয়ে আসা যাক গঙ্গার ধার থেকে।

সে বড় দূর ভাই, তার চেয়ে পার্কে বরং গোটা কতক চক্কর দিয়ে আসি।

দুজনে উঠে দাঁড়াল। রাধু বাড়ি ফিরছে। প্রমথ তাকিয়ে থাকল তার দিকে। জড়োসড়ো ভঙ্গিতে ওদের পাশ দিয়ে রাধু চলে গেল।

তোমার বড় ছেলেটি ভালো।

হাসল প্রমথ।

হাঁটতে হাঁটতে গৌর দত্ত বললেন, ওরা আবার খুঁজবে হয়তো।

পার্কে ঢুকেও অনেক কথার জের টেনে তিনি বললেন, খুঁজলে আর কি হবে, নিজেরাই গপ্পোটপ্পো করবে। আশুর মেয়েকে নাকি মারধোর করেছে শাশুড়ি, আজ ওর যাবার কথা ছিল, কি ফয়সলা হল কে জানে। আমি তো বলেছিলুম হাতে-পায়ে ধরে মিটিয়ে আসতে। খাট বিছানা টাকা তো এজন্মে দেবার ক্ষমতা হবে না আশুর।

প্রমথর এসব কথায় কান নেই, সে তখন ভাবছে পুতুল এতক্ষণে ফিরেছে ওর বন্ধুর বাড়ি থেকে। উনুন ধরিয়েছে। অমিয়া ওকে দেখিয়ে দিচ্ছে কেমন করে খুন্তি ধরলে মাংস কষাতে সুবিধে হয়। ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমেছে মেয়েটার কপালে, নাকের ডগায়। ঠোঁটদুটো শক্ত করে টিপে ধরেছে। চুড়িগুলো টেনে তুলেছে। দপদপে স্বাস্থ্য, বেশিদূর উঠবে না। পাতলা ভাপ উঠছে হাঁড়ি থেকে। না, এখনই কি উঠবে। এখনো তো জলই বোরোয় নি। আগে তো কখনো রাঁধে নি, নিশ্চয় বুক দুরদুর করছে আর আড়চোখে তাকাচ্ছে অমিয়ার দিকে। অমিয়া কি করছে? গালে হাত দিয়ে পিঁড়িতে বসে দেখছে। কি দেখছে, পুতুলকে? তাই হবে। হয়তো খুব মিষ্টি দেখাচ্ছে ওর কচি মুখটা আর ভাবছে হয়তো যে-কটা গয়না আছে ভেঙে কি কি গড়াবে ওর বিয়ের জন্যে। এতক্ষণে গন্ধে ম-ম করছে বাড়িটা। খোকন নাক কুঁচকে শুঁকছে। ভালো লাগছে গন্ধটা তাই মিটিমিটি হাসছে আর হাঁড়ির কাছে আসার তাল খুঁজছে। পারবে না, অমিয়ার নজর বড় কড়া।

দুচার দিন হয়তো বলাবলি করবে, বলবে গপ্পে লোক ছিল, বেশ জমিয়ে রাখত সন্ধেটা। তারপর একসময় ভুলে যাবে। যেমন নির্মলদা কি নীলুকাকা মরে যাবার পর আর এখন কেউ নামই করে না। তোমরাও তেমনি ভুলে যাবে আমাকে।

দগদগে লাল হয়ে আছে কেষ্টচুড়ো গাছের চিমসে ডালগুলো। ওদের

ফাঁক দিয়ে আকাশটাকে কেমন অন্য রকম লাগে যেন। লাগে চোখ নয় মনটা। রাধু টিউশনিতে যাবার আগে নিশ্চয় দেখেছে। দেখে কিছু বলেছে কি? বড় কম কথা বলে ছেলেটা। তেইশ বছরেই বুড়িয়ে গেছে ওর শরীর-মন। ওকে দেখলে অস্বস্তি হয়। মনে হয় হাসি-খুশি আনন্দ যেন কিছুই নয়। জীবনটা শুধু দুঃখ, দুঃখ আর দুঃখ কাটানোর চেষ্টাতেই ভরা। অথচ ওর বয়স তেইশ। ওর বয়সটা যেন চিমসে-কাঠি ডালে ফুল ফোটাব মতো। বয়সের ফাঁকফোকর দিয়ে যৌবনটাকে কেমন বুড়োটে দেখায়।

রকে বসে থাকলে এতক্ষণে আরো পাঁচজন জুটে যেত। তখন শুধু আমাকে নয় চক্ষুলজ্জার খাতিরে ওদেরও বলতে হত। তার চেয়ে এই বরং ভালো হয়েছে, বেমালুম খিদেটাও বেশ চনচনে হল।

কি তখন থেকে ভ্যাজর ভ্যাজর করছে বুড়োটা। বয়স বাড়লে হ্যাংলামোও বাড়ে। আঃ, কি হুড়োচাপ্লি শুরু করেছে ছেলেগুলো, মানুষ দেখে ছুটবে তো। লাগল হয়তো বুড়ো মানুষটার। আহা ছেলেবোরা যত্ন করে না। ফাঁসির আসামীও তো শেষ ইচ্ছা পূরণের সুযোগ পায়, অথচ মুখ ফুটে ওর ইচ্ছের কথা বলতে পারবে না কাউকে। গুমরে গুমরে মনের মধ্যে গুমোট তৈরি করবে। এবারের গরমটা অসহ্য, তবু নাকি বেতিয়াফেরত মানুষগুলো হাওড়া-ময়দানে ভাজাভাজা হচ্ছে। বাইরে-ভেতরে সবখানেই অসহ্য হয়ে উঠেছে মানুষ। এই যে সকলে পার্কে বেড়াতে এসেছে, সেও তো গুমোট কাটাতেই। অমিয়াও আসতে পারে। কি এমন কাজ তার, ওইটুকু তো সংসার। না, এখন সংসারের কথা থাক, তার চেয়ে বরং ওই গাছটার দিকে তাকানো যাক। রাধাচুড়ো। একটাও ফুল নেই গাছে। থাকা উচিত ছিল। কেননা কেষ্টচুড়োয় ফুল ধরেছে। এই হয়, একটা আছে তো আর একটা নেই, সুখে জোড় বাধে না কোনো কিছুই। এখন তার খুশি থাকতে ইচ্ছে করছে। অথচ অমিয়া, কি জানি এখন হয়তো পুতুলকে বকছে দু'পলা তেল বেশি দিয়ে ফেলেছে বলে।

চলুন গৌরদা, এবার ফেরা যাক।

এর মধ্যে? রান্না হয়ে গেছে কি!

রান্নার দেরি আছে। আপনাকে নয় বাড়িতে পাঠিয়ে দেবো চাঁদুকে দিয়ে।

তাই দিও, আমি বরং একটু ঘুরি, আর শোনো, চাঁদুকে বোলো আমার হাতে ছাড়া কাউকে যেন না দেয়, কেমন।

প্রমথ কাঁদুনে গ্যাসের শেল ফাটতে দেখেছে এই সেদিন, অনেকের সঙ্গে

সেও রুদ্ধশ্বাসে ছুটেছে, ঘোড়সোয়ার পুলিশের নাগাল ছাড়িয়েও ছুটেছে। তাই সে বোঝে অমিয়ার অবস্থাটা যখন উনুনে আগুন পড়ে। কোথায় পালাবে সে ওইটুকু বাড়ির চৌহদ্দি ছাড়িয়ে? যেখানেই যাক না, ধোঁয়া তাকে খেতে হবেই, ওই সময়টায় সকলেই উনুন ধরায়। ছাদে যে উঠবে তারও ফুরসত নেই। ঘরে বিকেলে কেউ থাকে না। ভাড়াটে বাড়ির একতলা সদর দরজা সব সময় হাট করা, মুহূর্তের জন্যেও ঘর ছাড়ার উপায় নেই।

আজও সেই রোজকার অবস্থা, তবু রক্ষে উনুন প্রায় ধরে গেছে। নিজের মনে গজগজ করছে অমিয়া আর হাওয়া দিচ্ছে। সাহায্য করতে গেল প্রমথ। তিড়বিড়িয়ে জ্বলে উঠল অমিয়া।

থাক, আর আদিখ্যেতা করতে হবে না।

অমিয়া চুল বেঁধেছে, গা ধুয়েছে, শাড়িটাও পরিষ্কার। প্রমথ বলল, তুমি পুতুলকে ডেকে আনো, ততক্ষণ আমি হাওয়া দিচ্ছি।

পাখাটা নামিয়ে দম কাটা স্প্রিঙের মতো উঠে দাঁড়াল অমিয়া।

দাঁড়াও, মেয়ের আড্ডা শেষ হোক তবে তো ঘরের কথা মনে পড়বে। আসুক আজ, ওর আড্ডা ঘোচাচ্ছি।

তরতর করে ছাদে উঠে গেল অমিয়া। সেখান থেকে একটু গলা তুলে ডাকলে তৃপ্তিদের বাড়ি থেকে শোনা যায়। ছাদ থেকে অমিয়া নামল আর সদর ঠেলে পুতুলও বাড়ি ঢুকল প্রায় একই সঙ্গে। একটুও আভাস না দিয়ে অমিয়া এলোপাথাড়ি কতগুলো চড় বসিয়ে দিল পুতুলের গালে, মাথায়, পিঠে।

পই পই করে বলি সন্ধে হলেই বাড়ি ফিরবি, সেকথা গ্রাহ্যই হয় না মেয়ের। কি এত কথা ফিসফিস, গুজগুজ, তৃপ্তির মাস্টারের সঙ্গে হাসাহাসি, কেউ যেন আর দেখতে পায় না, না?

বারে, আমি হাসাহাসি করেছি নাকি?

যেই করুক, তুই ওখানে থাকিস কেন, ঘরে আমি একা, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে সে খেয়াল থাকে না কেন? হাঁড়িটা উনুনে বসা।

অমিয়া ঘরে চলে গেল। উঠোনে গোঁজ হয়ে আঁচলটা মুঠোয় পাকাতে থাকল পুতুল। খামোকা মার খেল মেয়েটা। এইটুকু তো বয়েস, খাঁচার মতো ঘরে কতক্ষণ আর আটকা থাকতে মন চায়। উঠে এল প্রমথ রান্নাঘর থেকে।

মা যা বলল তাই কর।

ওর পিঠে হাত রেখে আস্তে ঠেলে দিল প্রমথ। পিঠটা বেঁকিয়ে ঠেলাটা

ফিরিয়ে দিল পুতুল। গঙ্গাজলের ছড়া দিতে দিতে ওদের দেখে গেল অমিয়া।

রাগ করতে হবে না আর, কি এমন অন্যায় বলেছে? আজ বাদে কাল বিয়ে হবে, হাসাহাসি না করলেই তো হয়।

আমি মোটেই হাসাহাসি করিনি, তবু মিছিমিছি—

ওর পিঠে হাতটা রেখে দিয়েছিল প্রমথ, তাই আঙুল বেয়ে উঠে এল বাকি কথাগুলো। থরথরিয়ে পুতুল কাঁপছে।

বিয়ের পর যত পারিস হাসিস, কেউ বারণ করবে না। বড় হয়েছিস, বুদ্ধি হয়েছে তোর, তৃপ্তিদের যা মানায় আমাদের কি তা সাজে?

শাঁখ বাজাচ্ছে অমিয়া। পুতুলের কাঁপুনি যেন বেড়ে গেল। বিশ্রী শাঁখের আওয়াজটা। শুভকাজে শঙ্খধ্বনি দেওয়া হয়, অথচ এখন মনে হচ্ছে মাটি টলছে ভূমিকম্পে, তাই মেয়েটা কাঁপছে। মৃদু ঠেলা দিল প্রমথ। এক-পা এগিয়ে তারপর ঘরে ছুটে গেল পুতুল।

দাও আরো আদর। দিন-দিন যেন বাঁদরী তৈরি হচ্ছে। অনেক দুঃখ্যু আছে ওর কপালে, বলে রাখলুম।

হাঁড়ি নিয়ে রান্নাঘরে যাচ্ছে অমিয়া, প্রমথ নরম সুরে বলল, আজকে না বকলেই হত।

কেন, আজ রথ না দোল যে বকব না।

শোবার ঘরে এল প্রমথ। পুতুল ফোঁপাচ্ছে স্তূপ করা বিছানায় মুখ গুঁজে। শব্দটা সর্দি ঝাড়ার মতো শোনাচ্ছে। তার ওপর প্যাচপেচে গরম।

লক্ষ্মী মা আমার ওঠ, যা রান্নাটা শিখে নে। আরে বোকা শ্বশুর-বাড়ীতে যখন রাঁধতে বলবে তখন যে লজ্জায় পড়বি, আমাদেরও নিন্দে হবে।

পুতুলের ফোঁপানি থামল। একটা চোখ বার করে, স্বরটাকে নামিয়ে বলল, বিয়ে করলে তো।

হেসে উঠল প্রমথ, পুতুল মুখ লুকোল।

তোর মাও বিয়ের আগে ঠিক অমন কথা বলত।

পুতুল আবার মুখ তুলল। চোখের কাজল ধ্যাবড়া হয়ে গেছে। আহা, মেয়েটা কেঁদেছে।

তুমি কি করে জানলে, মা বুঝি বলেছিল?

একই সঙ্গে দুজনে দরজার দিকে তাকাল। না অমিয়া নয়, খোকন এল। চোখাচোখি হল পুতুল আর প্রমথর, হাসল দুজনেই। মেয়েটা দারুণ

ভীতু হয়েছে। ওর মাও অমন ছিল, খালি দরজার দিকে তাকাত। রাত্রে ছাতে উঠত, তাও কত ভয়ে ভয়ে।

বলো না, মা বুঝি সেসব গপ্পো করেছিল?

হেসে খোকনের চুলে বিলি কাটল প্রমথ। সেসব গল্প কবে করেছিল অমিয়া, তা কি এখনো মনে আছে। চেষ্টা করলে টুকরো টুকরো হয়তো মনে পড়বে। কিন্তু সেকথা কি মেয়েকে বলা যায়। একদিন গলি দিয়ে গিয়েছিল একটা বেলফুলওয়ালা, কত কাণ্ড করে মালা কেনা হয়েছিল। আর-একদিন, ছাদের উত্তর-পূব কোণায় তুলসীগাছের টবটার পাশে একটা ছোট্ট পৈঠে ছিল, একজন মাত্র বসতে পারে। পাছে বাবার ঘুম ভেঙে যায় তাই চুড়িগুলোকে হাতে চেপে বসিয়ে, পা টিপেটিপে সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ছুট দিয়েছিল অমিয়া রকটা লক্ষ্য করে। আচারের শিশি বিকেলে তুলে রাখতে ভুলে গিয়েছিল, ছাদের মাধ্যখানেই পড়ে ছিল সেগুলো। তারপর সে কি কেলেঙ্কারি। বড়বৌদি ছাদে উঠে এসেছিল, আর অমিয়া পাঁচিল ঘেঁষে বসে পড়েছিল দুহাতে মুখ লুকিয়ে।

হাসছ কেন!

এমনি। একটা কথা মনে পড়ল তাই।

অমন করে হাসলে কিন্তু তোমায় কেমন কেমন যেন দেখায়। বেশ লাগে দেখতে।

চোখ নামিয়ে হাসল প্রমথ। খোকন চলে গেল রান্নাঘরে। খুন্তি নাড়ার শব্দ আসছে, গন্ধও আসছে কষা মাংসের, রান্নাঘরে অমিয়ার কাছে এখন কেউ নেই। ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমছে গালে, কপালে, নাকের ডগায়। বার বার কাঁধে গাল ঘষার জন্যে ঘোমটা খুলে গেছে। দুহাত সকড়ি, ঘোমটা তুলে দেবার কেউ নেই কাছে।

বসেই থাকবি, নাকি রান্নাঘরে যাবি

না আমি শিখব না।

তোর মার কাছে শেখার জন্যে পাড়ার মেয়েরা আসত, বাটি বাটি মাংস যেত এবাড়ি ওবাড়ি।

অবস্থা ভালো ছিল তাই মা শিখতে পেরেছিল, আমি তো কোনোদিন রাঁধলামই না।

ওর বয়সেই মেয়েরা বিয়ের কথা ভাবে। অমিয়া বলেছিল, সেও ভাবত, আর ভাবে বলেই একতলার ঘুপচি ঘরে জীবনটা সহনীয় হতে পারে। স্বচ্ছল ঘরে পুতুলকে দেওয়া যাবে না, টাকা কোথায়! মেয়েটা সেকথা ভেবেও

হয়তো ভয় পায়। আসলে ভয় তো সকলেই পাচ্ছে, পুরুষ মেয়ে সকলে। নতুন বৌ অমিয়ার সময় মাংসের সের ছিল ছ আনা আট আনা, পুতুলের সময় তিন টাকা। জিনিস-পত্তরের দাম বাড়ার জন্যে স্ট্রাইক হবে, হোক। মিহিরবাবু কবিতা লিখলেও বাজে কথা বলে না। খুন্তির শব্দ আসছে, কষা-মাংসের গন্ধ আসছে, মেয়েটার মুখ শুকনো। অসহ্য লাগছে এই ঘরটা।

পুতুল আর প্রমথকে দেখে গম্ভীর হয়ে মুখ ঘুরিয়ে বসল অমিয়া। আলুর খোলা নিয়ে খেলা করছিল খোকন। পুতুল তাড়াতাড়ি কেড়ে নিয়ে কুটনোর ঝুড়িতে রেখে দিল, খোসা-চচ্চড়ি হবে।

গন্ধ উঠছে। এমন গন্ধ অমিয়ার হাতেই খোলে। ফুসফুস ভরিয়ে ফেলল প্রমথ। অমিয়ার গা ঘেঁষে পুতুল বলল, দাও না আমাকে।

উত্তর না দিয়ে অমিয়া শুধু খুন্তিটা নাকের কাছে ধরল। গনগনে আঁচ। একটুক্ষণ খুন্তি-নাড়া থামলেই তলা ধরে যাবে। পুতুলের কথায় কান দেবার ফুরসত নেই। পুতুল করুণ চোখে তাকাল প্রমথের দিকে।

দাও না ওকে, যখন রাঁধতে চাইছেই।

সবই যখন করলুম তখন বাকিটুকুও করতে পারব। খোকনের ঘুম পেয়েছে শুইয়ে দে।

সত্যিই তো। এখন আর করার আছে কি। জলভরা কাঁসিটা হাঁড়ির মুখে চাপা দেওয়া ছাড়া। মাংসের জল বেরোলে, কাঁসির উষ্ণ জলটা ঢেলে দেওয়া, সে তো একটা আনাড়িতেও পারে। তারপর সেদ্ধ হলে আলু, নুন আর ঘিয়ে রসুন ভেজে সাঁতলানো, ব্যস। হতাশ হয়ে তাকাল প্রমথ। হনুর গড়নের জন্যে এমনিতেই পুতুলের গালদুটো ফুলো দেখায়, এখন যেন আরো ঢেবো দেখাচ্ছে। ভাঙা ভাঙা স্বরে সে বলল, তৃপ্তিকে ওর বৌদি নিজে থেকে রান্না শিখিয়েছে, গোটা ইলিশ কাটা শিখিয়েছে, এবার ওদের মাংস এলে তৃপ্তি রাধবে সেদিন আমায় খাওয়াবে বলেছে।

তাহলে তো তোকেও একদিন খাওয়াতে হয়।

হয়ই তো, আজকেই তো ওকে বললুম আমাদের মাংস এসেছে, মা বলেছে আমি রাঁধব।

অমিয়ার দিকে চোখ রেখে এরপর পুতুল কিন্তু কিন্তু করে বলল, ওকে আমার রান্না খাওয়াব বলেছি।

গৌরদাও আজ বলল, দিওহে বৌমার হাতের রান্না। অনেক দিন খাই নি। কোত্থেকে শুনল কে জানে, বললুম দেব পাঠিয়ে। আহা বুড়ো

মানুষটার যা কষ্ট, ছেলেবৌরা তো একটুও যত্ন করে না।

হ্যাঁ, পুলুদার বৌ কি ভীষণ চালবাজ, একদিন গেছলুম, সে কি কথাবার্তা, যেন কত বি. এ. এম. এ পাস। কারুর আর জানতে বাকি নেই দু-দুবার আই. এ ফেল, তবু বলে বেড়ায় পাস করেছে। আর রাস্তা দিয়ে হাঁটে যখন, তুমি দেখেছ বাবা যেন সুচিত্রা সেন চলেছে।

বোকার মতো হেসে প্রমথ বলল, কে বললে তোকে।

তৃপ্তি। ও তো ভীষণ বায়স্কোপ দ্যাখে, তবে হিন্দী বই দ্যাখে না, খুব অসভ্য নাকি, মাস্টারমশাইও দ্যাখে না।

এমনি শুনে শুনেই মেয়েটা বায়স্কোপের খবর নেয়। মনে পড়ছে না কোনো দিন বায়স্কোপে যাব বলে বায়না ধরেছে। বাপের অবস্থা বুঝে সাধ-আহ্লাদগুলো চেপে রাখে, বাবা-মাকে লজ্জায় ফেলে না। এ একমাত্র মেয়েরাই পারে, পুতুলের মতো মেয়েরা। চাঁদুটা সামান্য হুজুগ উঠলেই পয়সা পয়সা করে ছিঁড়ে খেত, এখন আর পয়সা চায় না। টাকা নিয়ে এখানে ওখানে খেলে খেলে বেড়ায়। ভাড়া খাটলে মান-ইজ্জত থাকে না, কিন্তু কি করবে, উনিশ-কুড়ি বছরের ছেলে কখনো ফাঁকা পকেটে থাকতে পারে? রাধুর মতো ছেলে আর কটা হয়, পানটুকু পর্যন্ত খায় না। ভালো, ওরা সবাই ভালো, আহা বেঁচেবর্তে থেকে মানুষ হোক!

একদিন তোর মাকে নিয়ে যাস না বায়স্কোপে!

খোকনকে কোলে নিয়ে উঠোনে বেরিয়ে এসে গলা চেপে পুতুল বলল, হ্যাঁ, মা আবার যাবে। বলে, কতদিন সাধলুম চলো চলো, সকলেই তো যায়। তা নয়, মার সব তাতেই বাড়াবাড়ি! একমিনিট বাড়ি না থাকলে সে কি ডাকাডাকি যেন পালিয়ে গেছি, এমন বিচ্ছিরি লাগে, সবাই হাসাহাসি করে। বাবুদার সামনেও মা অমন করে।

ঘরে আইবুড়ো মেয়ে থাকলে অমন ডাকাডাকি সবাই করে, তোর মেয়ে থাকলে তুইও করতিস।

প্রমথ হাসল। তিতকুটে গলায় পুতুল বলল, তা বলে দিনরাত ঘরে বসে থাকব? বেরোতে ইচ্ছে করে না আমার? ঘরকন্নার কাজ সব সময় ভালো লাগে? তুমি হলে পারতে?

শেষ দিকে সপসপ করে উঠল পুতুলের গলা। খোকনকে নিয়ে সে ঘরে চলে গেল। রকে পা ঝুলিয়ে বসল প্রমথ। একতলাটা শান্ত। দোতলায় সামান্য খুটখাট, তিনতলায় ছাদ, বলা যায় বাড়িটা চুপচাপ। শুধু গোলমাল করছে পাশের বাড়ির স্কুল ফাইনাল ফেলকরা ছেলেটা।

ঘরে থাকতে ভালো লাগে না মেয়ের, বাইরেই বা যাবে কোথায়, গিয়ে করবেই বা কি। এবাড়ি ওবাড়ি যাওয়া আর আজে-বাজে কথা বলা—এতে লাভ কি? দেয়ালে ঠেস দিয়ে প্রমথ ঘাড়ের জাড় ভাঙার জন্যে মাথা পিছনে হেলাল। ক্ষতিই বা কি, এমনি করেই তো বাকি জীবনটা কেটে যাবে। মেঘের নামগন্ধ নেই, শুধু ঝকঝক করছে গুচ্ছেরখানেক তারা। অসহ্য গরম, অসহ্য।

হঠাৎ একদমক হাওয়া পেরেকে ঝোলানো বাসনমোছা ন্যাতাটা ফেলে দিল। হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে গা এলিয়ে দিল প্রমথ। ছটফটে গরমের মধ্যে একটুখানি হাওয়া বড় মিষ্টি লাগে। খোশবাই গন্ধ আসছে, হাঁড়ির ঢাকনাটা বোধহয় খুলল অমিয়া।

ঝিমুনি এসেছিল প্রমথর, ভেঙে গেল সদর দরজা খোলার শব্দে। চাঁদু এল। অমিয়ার সঙ্গে কথা হচ্ছে ওর, রাত্রে কিছু খাবে না বলছে। উঠে এল প্রমথ।

খাবি না কেন?

খাইয়ে দিল ওরা রেস্টুরেন্টে, সেমিফাইনালের দিনও খাওয়াবে। দুটো গোল হয়েছে, দুটোই আমার সেণ্টার থেকে!

ভালোই হল, কাল তো বাজার আসবে না।

অমিয়া কালকের জন্যে চাঁদুর ভাগটুকু সরিয়ে রাখল। আড্ডা দিতে বেরুচ্ছিল চাঁদু, ডেকে ফেরাল প্রমথ।

তোর গৌর জ্যাঠাকে খানিকটা দিয়ে আয়।

কেন?

বিরক্তি, তাচ্ছিল্য আর প্রশ্ন, একসঙ্গে তিনটিকে অমিয়ার মুখে ফুটতে দেখে দমে গেল প্রমথ।

ওকে যে বলেছি, পাঠিয়ে দেব।

দেব বললেই কি দেওয়া যায়, অমন কথা মানুষ দিনে হাজারবার দেয়। এইটুকু তো মাংস! একে তাকে খয়রাত করলে থাকবে কি, কাল বাজার হবে না, খাবে কি কাল?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেবার দরকার কি, বলে দিও নয় ভুলে গেছলুম।

অমিয়া আর চাঁদুর মুখের দিকে তাকাল প্রমথ। একরকমের হয়ে গেছে ওদের মুখদুটো! ওরা খুশি হয় নি।

কিন্তু বুড়ো মানুষটা যে আশা করে বসে থাকবে।

থাকে থাকবে।

কথাটা বলে চাঁদু দাঁড়াল না। অমিয়া চুপ করে আছে। তার মানে, ওইটে তারও জবাব। আবার পা ঝুলিয়ে বসল প্রমথ। আকাশে গুচ্ছেরখানেক তারা। আচমকা তখন হাওয়াটা এসে পড়েছিল, আর আসছে না। পুতুল চুপিচুপি পাশে এসে বলল, দিলে না তো! জানি, দেবে না। তখন মিথ্যে বলেছিলুম, ছাপ্পুকে মোটেই বলি নি যে মাংস খাওয়াব।

বেড়ালের মতো পুতুল ফিরে গেল। হয়তো তাই, বোকামি হয়ে গেছে। বুড়ো মানুষটা বসে থাকবে, বসেই থাকবে। ঝিমুনি আসছে আবার, দেয়ালে ঠেস দিয়ে গা এলিয়ে দিল প্রমথ।

সদর দরজায় আবার শব্দ হতে প্রমথর মনে হল গৌরদা বুঝি। ফিটফাট, ব্যস্ত ভঙ্গিতে বাবু সটান দরজায় এসে চাঁদুর খোঁজ করল, তারপর নাক কুঁচকে গন্ধ টেনে বলল, ফ্লাস্‌ক্লাস গন্ধ বেরোচ্ছে কাকিমা!

আঁচল দিয়ে শরীরটাকে মুড়ে পুতুল যেন ভেসে এল।

চেখে যাবেন কিন্তু।

তারপরই তাকাল অমিয়ার দিকে ভয়ে ভয়ে।

বাবারে বাবা, মেয়ের যেন তর সইছে না। খালি বলছে, বাবুদা কখন আসবে, ওকে দিয়ে চাখাব। নিজে রেঁধেছে কিনা।

যে কেউ এখন দেখলে বলবে, অমিয়া হাসছে। কিন্তু প্রমথর মনে হচ্ছে ও হাসছে না। হাসলে অত কুচ্ছিত দেখায় কাউকে? নাকি তার নিজের দেখার ভুল! প্রমথ তাকাল বাবুর দিকে। চৌকো করে কামানো ঘাড়, চুড়ো করে সাজানো রুক্ষ চুল। বুক, কোমর, পাছা সমান। চোঙার মতো আঁটসাঁট প্যাণ্ট, উলটে দিলেই গুলতির বাঁট হয়ে যাবে চেহারাটা, ভাবলে হাসি পায়। কিন্তু হাসল না প্রমথ, ছেলেটা শ-দেড়েক টাকার মতো চাকরি করে।

মুখে আঁচল চেপে হাসছে পুতুল। অমিয়া জিজ্ঞাসা করল, কেমন হয়েছে।

ফুড়ুত করে হাড়ের মজ্জা টেনে বাবু বলল, গন্ধ শুঁকেই তো বলেছিলুম, ফাস্‌ক্লাস!

অমিয়া ওর খাওয়া দেখতে দেখতে জিজ্ঞাসা করল, চাঁদুর সেই কাজের কি হল?

বাবুর জিভ বাটিতে আটকে রইল কিছুক্ষণ, তারপরই তাড়াতাড়ি বলে উঠল, সে আর মনে করিয়ে দিতে হবে না। তবে বুঝলেন তো, স্কুল ফাইনালটাও যদি পাস করত তাহলে ভাবনা ছিল না। আজকাল বেয়ারার

চাকরির জন্যে আই. এ পাস ছেলেরাও লাইন লাগায়। তবে আমিও এঁটুলির মতো লেগে আছি সুপারভাইজারের সঙ্গে, রোজ ত্যালাচ্ছি।

চাঁদু না হয়, রাধুর জন্যে দ্যাখো।

না কাকিমা। রাধুটা আজকাল যেন কেমন হয়ে গেছে, চাকরিতে ঢুকে শেষকালে ইউনিয়নে ভিড়ুক আর আমায় নিয়ে টানাটানি শুরু করবে তখন। এর ওপর আবার যা গরম বাজার চলছে।

হ্যাঁ, মিহিরকাকু বলছিলেন বেস্পতিবার নাকি স্ট্রাইক হবে।

আরে ও তো খুচরো স্ট্রাইক। বেশ বড়োসড়ো অল ইণ্ডিয়া স্ট্রাইকের কথাবার্তা হচ্ছে নাকি।

হলে হয় একবার, ব্যাটা সুপারভাইজারটাকে বাগে পেলে আচ্ছাসে ধোলাই দিয়ে দেব। মেজাজ কি ব্যাটার, যেন মাইনে বাড়ানোর কথা বললে ওকে গাঁট থেকে টাকাটা দিতে হবে। পাবলিকের টাকা পাবলিক নেবে, তাতে ক্ষতিটা কি হয়?

খালি বাটিটা নামিয়ে রাখতে যাচ্ছিল বাবু, পুতুল টেনে নিল হাত বাড়িয়ে, জলের গ্লাসটাও এগিয়ে দিল সে। রুমালে ঠোঁট মুছে বাবু জিজ্ঞেস করল, চাঁদুটা গেল কোথায়, একটা কার্ড ছিল একস্ট্রা।

কার্ড কিসের, আপনাদের সেই অফিসের থিয়েটারের?

উহুঁ, যুব উৎসব। বলেছিলুম না আমার এক বন্ধু গল্প-টল্প লেখে, এর মধ্যে আছে, সে-ই যোগাড় করে দিল কার্ডটা। চাঁদু বলেছিল সতীনাথের গানের দিন যাবে, তা সেদিন আর যোগাড় হয়ে উঠল না।

কোন গানটা গাইল? 'সোনার হাতে'টা গেয়েছে?

ওটা, তারপর 'আকাশপ্রদীপ জ্বলে'টাও নাকি গেয়েছে।

আপনাকে তো সেধে-সেধে মুখ ব্যথা হয়ে গেল, তবু গানটা লিখে দিলেন না।

বেশ চলো, এখুনি লিখে দিচ্ছি।

কয়লা দিয়ে উনুনে হাওয়া করছে অমিয়া। পুতুল আর বাবু যেন ভাসতে ভাসতে ঘরে চলে গেল। প্রমথর গা ঘেঁষেই প্রায়।

চটপটে, চালাকচতুর ছেলে। ও কি বিয়ে করবে পুতুলকে? ছেলেমানুষ, বলার সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হয়ে যাবে। তার থেকে ওর বাবাকে গিয়ে ধরতে হবে। মুশকিল বাধবে জাত আর দেনা-পাওনা নিয়ে। বাপের মুখের ওপর ওর কথা বলার সাহস হবে না।

তুমি ওখানে বসে রইলে কেন, ঘরে ওরা একা রয়েছে না?

প্রমথ তাকিয়ে রইল অমিয়ার দিকে। কত সাবধানে আঙুলের ফাঁক দিয়ে চাল-ধোয়া জলটা ফেলছে। অমন করে মনের কুৎসিত সন্দেহগুলোকেও তো ছেঁকে ফেলে দিতে পারে। থাকলই বা ওরা একসঙ্গে একটুক্ষণ, ক্ষতিটা কি তাতে।

ঘরে নয়, ছাদে যাবে বলে উঠে দাঁড়াল প্রমথ। সিঁড়ি পর্যন্ত গিয়ে থামল। ঘরে ওরা হাসাহাসি করছে, ছাদে গেলে অমিয়া রাগ করবে নিশ্চয়। আজ ওকে রাগাতে ইচ্ছে করছে না। রান্নাঘরে গিয়ে গল্প করলে কেমন হয়, আগডুম-বাগডুম যা খুশি। মেজবৌদিকে সেদিন দেখলুম ধর্মতলায় গাড়ি থেকে নামছে, এখনও পেটকাটা জামা পরে; কিংবা, দক্ষিণাবাবু কি সব ওষুধ খাইয়ে বৌকে প্রায় মেরে ফেলার যোগাড় করেছিল। তবে কাজ ঠিকই হাসিল হয়েছে। পেটেরটা বাঁচেনি। কিংবা, একটা দিন দেখে গুরুঠাকুরের কাছে গিয়ে মন্তর নেবার কথাটা পাড়লে হয়, ভাবছিল প্রমথ। পুতুল ঘর থেকে বেরিয়ে তার কাছে এল।

ছোড়দা তো নেই, কার্ডটা নষ্ট হবে, ওর বদলে আমি যাব? বাবুদা বলছে এমন উৎসব নাকি এর আগে হয়নি, না দেখলে জীবনে আর দেখা হবে না। নাচ, গান, সিনেমা, থিয়েটার সব নাকি দেখা যাবে, যাব?

গেলে ফিরবি কখন?

কত আর দেরি হবে, ঘণ্টাখানেক দেখেই চলে আসব।

কাঁচ শশার মতো কবজিটা যেন মুট করে ভেঙে ফেলবে পুতুল আঙুলের চাপে। এইটুকু কথা বলেই ও হাঁপিয়ে পড়েছে।

তোর মাকে একবার বলে যা।

রান্নাঘরের দরজা থেকে কোনোরকমে পুতুল বলল, ছোড়দা তো নেই। তাই আমিই যাচ্ছি তাড়াতাড়ি ফিরব'খন!

একটা কাঁচা কয়লা বিরক্ত করে মারছে। সেটাকে তুলে ফেলে দেওয়ার চেষ্টাতে অমিয়া ব্যস্ত। প্রমথ কৈফিয়ত দেবার সুরে বলল, বাড়ি থেকে বেরোয়-টেরোয় না তো, যাক ঘুরে আসুক।

কে?

সাঁড়াশিতে চেপে ধরে কয়লাটাকে উনুন থেকে বার করে আনতে আনতে অমিয়া বলল, কে, পুতুল?

হ্যাঁ, কি যেন উৎসব হচ্ছে বলল।

চলে গেছে?

না, কেন।

রান্নাঘর থেকে বেরোতে যাচ্ছিল অমিয়া। পথ আটকে দাঁড়াল প্রমথ।

কেন আবার, রাত্তিরে মেয়েকে ছেড়ে দেবে একটা ছেলের সঙ্গে।

দিলেই বা কি দোষ হবে। হাঁপিয়ে ওঠে না ঘরে বসে থাকতে থাকতে? শুধু ছাদ আর গল্প করা। এ ছাড়াও তো অনেক কিছু আছে। মারধোর করলেই কি মেয়ে ভালো হবে।

প্রমথ চুপ করল বুক ভরে বাতাস টেনে। দাঁত চেপে কথা বলতে বেশ কষ্ট হয় কিন্তু উপায়ই বা কি, ওঘরে পুতুল আর বাবু রয়েছে। থমথম করছে অমিয়ার মুখ। ঘাম নামছে থুতনি বেয়ে কিলবিলে পোকার মতো, ফরসা গালে সেঁটে বসা উড়ো চুলকে চীনে মাটির ফাটা দাগের মতো দেখাচ্ছে। সত্যিই ফেটে পড়ল অমিয়া।

আমি যখন পারি, ও পারবে না কেন, কেন পারবে না। শুধু ওর কথাই ভাবছ, কেন ভাবার আর কিছু নেই তোমার? বলে দিচ্ছি ওর যাওয়া হবে না।

চুপ. আস্তে, দোহাই আজ আর চেঁচিও না।

আঙুল বাঁকিয়ে দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল প্রমথ। দপদপ করছে তার রগের পেশী। পিছু হটে এল অমিয়া। প্রমথর নখের ডগাগুলো ভীষণ সরু।

চুপ করব কেন। আমি অন্যায় কথা বলেছি? মেয়েকে কেন তুমি ছেড়ে দিতে চাও একটা ছেলের সঙ্গে, তা কি বুঝি না ভেবেছ।

চোখে চোখ রেখে ওরা তাকাল। অমিয়ার চাউনি কসাইয়ের ছুরির মতো শান দিচ্ছে। মাংসের খোলা হাঁড়িতে চোখ পড়ল প্রমথর, থকথক করছে যেন রক্ত।

কি বুঝেছ তুমি, বলো কি বুঝেছ?

দুহাতে অমিয়ার কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিল প্রমথ। খোঁপাটা খুলে পড়ল, চোখদুটো মরা পাঁঠার মতো ঘোলাটে হয়ে এল, ঠোঁট কাঁপিয়ে অমিয়া বলল, তুমি আমার গায়ে হাত তুললে।

অন্ধকার উঠোনে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে পুতুল আর বাবু। কোনো সাড় নেই যেন ইন্দ্রিয়গুলোর। তবু ছাদে যাবার সময় প্রমথর নাকে চড়াভাবে লাগল পাউডারের গন্ধ। মেয়েটা সেজেগুজে অপেক্ষা করছে, করুক। মাথা নিচু করে প্রমথ ওদের পাশ দিয়েই ছাদে যাবার সিঁড়ি ধরল।

ছাদেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। রাধু ডেকে তুলল প্রমথকে। থালার সামনে বসে আছে অমিয়া। ঠাণ্ডা ভাত আর মাংস। ছেলেমেয়েরা শুয়ে পড়েছে।

পুতুল শুয়ে পড়ল যে এর মধ্যে।

শরীর খারাপ, কিছু খায় নি।

কথা দুটো শুকনো কড়কড়ে। খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত আর কেউ উচ্চবাচ্য করল না। মাংসের সবটুকুই খেল প্রমথ। শুধু মেটুলির টুকরোগুলো ছাড়া। মেটুলি ভীষণ ভালোবাসে অমিয়া, অথচ সবটুকুই সে প্রমথকে দিয়ে দেবে। প্রমথও না খেয়ে বাটিতে রেখে দেবে। তখন মিষ্টি ঝগড়া ভালো লাগত আর মাংসও আসত নিয়মিত। আজকেও প্রমথ মেটুলি রেখে উঠে পড়ল। কলতলায় অনেকক্ষণ ধরে কষের দাঁত থেকে মাংসের আঁশ টেনে বার করল। ভিজে গামছা দিয়ে গা-মুছে যখন সে শুয়ে পড়ল তখনও অমিয়ার রান্নাঘর ধোয়া শেষ হয়নি।

অনেক রাতে উঠোনে বেরিয়ে এল প্রমথ। ঘরের মধ্যে যেন চিতা জ্বলছে। একটুও হাওয়া নেই, ঘুম নেই, মেঘও নেই। পায়চারি শুরু করল সে রকের এমাথা ওমাথা। একটা এরোপ্লেন উড়ে গেল। মুখ তুলে তাকাল প্রমথ। একটুখানি দেখা গেল, লাল আর সাদা আলোটা পালটা-পালটি করে জ্বলছে আর নিভছে। মাত্র কতগুলো তারা দেখা যায় উঠোন থেকে। ছাদে উঠলে আরো দেখা যাবে। দেখেই বা কি হবে। ওরাও তো দেখল আজ মাংস এসেছে অনেকদিন পর, কিন্তু তাতে হল কি। পাতে মেটুলি রেখে সে উঠে পড়ল আর নির্বিকার হয়ে শুধু তাকিয়ে রইল অমিয়া। এখন মনে হচ্ছে অমিয়া যন্ত্রের মতো তাকিয়ে ছিল। কিন্তু সেও তো যন্ত্রের মতোই শুধু অভ্যাস মেনে মেটুলিগুলো পাতে রেখে দিয়েছিল। পায়চারি থামাল প্রমথ। অমিয়াও উঠে এসেছে।

ঘুম আসছে না বুঝি?

না, ভয়ানক গরম লাগছে।

পিঠের কতগুলো ঘামাচি মারল অমিয়া। দু-একটা শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেল প্রমথ।

ছাদে যাবে?

কেন, এই তো বেশ।

বরাবরই তোমার কিন্তু ঘামাচি হয়।

অমিয়া পিঠের উপর কাপড় টেনে দিল।

বসবে?

পাশাপাশি বসল দুজনায়।

পুতুলের জন্যে ছেলে দ্যাখো এবার।

হ্যাঁ, দেখব।

চাঁদুটাকেও একটা যা হোক কাজেকম্মে ঢুকিয়ে দাও, কদ্দিন আর টোটো করে কাটাবে।

হ্যাঁ, চেষ্টা করতে হবে।

রাধু বলছিল আই. এ পরীক্ষাটা দেবে সামনের বছর।

ভালোই তো।

শান্ত রাত্রির মাঝে ওদের আলাপটা, কল থেকে একটানা জল পড়ার মতো শোনাল। ওরা অনেকক্ষণ বসে রইল চুপচাপ, পাশাপাশি। কেউ কারুর দিকে তাকাচ্ছে না। দুজনেরই চোখ সামনের শ্যাওলা-ধরা দেয়ালটাকে লক্ষ্য করছে।

কি দরকার ছিল মাংস আনার!

অমিয়ার স্বরে ক্ষোভ নেই, তাপ নেই, অনুমোদন নেই। শুধু যেন একটু কৌতূহল। তাও ঘামাচি মারার মতো নিস্পৃহ। মুখ না ফিরিয়ে প্রমথ বলল, কি জানি। তখন কেমন ভালো লাগল, অনেক কথা মনে পড়ল, মনটাও খুশি হল। ভাবলুম আজ সবাই মিলে একটু আনন্দ করব।

চুপ করে রইল প্রমথ। মুখ ফিরিয়ে একবার তাকাল। অমিয়াও তার দিকে তাকিয়ে।

আজ পুতুলকে দেখে বারবার তোমার কথা মনে পড়ছিল। কত মিষ্টি ছিলে, চঞ্চল ছিলে, ছটফটে ছিলে। আর ওকে কাঁদিও না।

মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল প্রমথ, তারা জ্বলছে। একটা কামার মানুষকে তাতিয়ে বিরাট এক হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে চলেছে, তারই ফুলকিগুলো ছিটকে উঠেছে আকাশে। ছাদে উঠলে আরো অনেক দেখা যাবে। অমিয়ার পিঠে হাত রাখল প্রমথ। থরথর করে কাঁপছে ওর পিঠটা।

জানো অমি, মনে হচ্ছে আমি আর ভালোবাসি না, বোধহয় তুমিও বাস না। তা না হলে তোমার মনে হবে কেন আমি তোমার গায়ে হাত তুলতে পারি। অথচ সত্যি সত্যি তখন ইচ্ছে হয়েছিল তোমার গলা টিপে ধরি। অমি, এখন একটা মড়া আগলে বসে থাকা ছাড়া আর আমাদের কাজ নেই।

অমিয়ার পিঠে হাত বোলাল প্রমথ। খসখসে চামড়া, মাংসগুলো ঝুলে পড়েছে আলগা হয়ে, মেরুদণ্ডের গিঁটগুলো হাতে আটকাচ্ছে। মুখ তুলল প্রমথ, যে-কটা তারা দেখা যায়, সেদিকে তাকিয়ে শান্ত স্বরে বলল, কেঁদো না, মরে গেলেই মানুষ কাঁদে, আমি কি মরে গেছি।

তারপর ওরা বসে রইল অন্ধকারে কথা না বলে।

নিশিপালক
আনন্দ বাগচী

ঠিকানা এবং তার সঙ্গে আমার বন্ধুর নিজের হাতে আঁকা পথনির্দেশটুকু ছিল। সামান্য কয়েকটা আঁকাবাঁকা রেখা, ড্রিলমাস্টারের নির্দেশের মত। সামনে এগিয়ে, বাঁয়ে ঘুরে, সোজা এগিয়ে, ডান দিকে ফিরে, পেট্রলপাম্প, তিনটি দোকান, ছ'খানা বাড়ি এবং তার পরেই জোড়া শালগাছের তলা দিয়ে সেই চরম গলি-পথটুকু, যার শেষ প্রান্তে আমার বন্ধুর সদ্য বাঁধা নীড়। যাকে পাখির বাসা বলাই সমীচীন। একজোড়া পাখি অনেক দূরের কলকাতা শহর থেকে মফস্বলের এই প্রান্তিক শহরে উড়ে এসেছে। আসার সময় মুখে করে কিছু খড়কুটো এনেছিল, কিছু ছিল। চাকরির ডালটাকে আশ্রয় করে সংসার বাঁধা হয়েছে।

স্টেশনে নেমেই একটা রিকশা নিয়েছিলাম, সাইকেল রিকশা। তবু হাতে ছিল আমার বন্ধুর পাঠানো সেই নকশাটি। তার প্রতিটি রেখায় বন্ধুর অন্তরঙ্গ নিমন্ত্রণ রয়েছে। আমাকে দেখে সে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে চেঁচামেচি করে কি কাণ্ড যে করবে তা এই সামান্য ক'টি রেখার মধ্যে লেখা নেই। কিন্তু আমি জানি। তার ছেলেমানুষি, তার অতি সহজে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা আমার বাল্যকাল থেকে জানা আছে।

বিশেষ করে বিবাহিত ভবতোষের কাছে এই আমার প্রথম যাওয়া। মাত্র কয়েক মাস আগে তার বিবাহ অনুষ্ঠানে হাজির হতে পারিনি, সেই অনুপস্থিতি সুদে আসলে পূরণ করে দিতে চলেছি আজ। সঙ্গে বৃহদাকারের একটি সুটকেস এবং ভংসহ এক সপ্তাহের ঢালাও ছুটি।

কিন্তু ভবতোষের বিয়েতে শারীরিকভাবে উপস্থিত হতে না পারলেও পত্র-মারফত সে ত্রুটি সংশোধন করে নিয়েছি। তার বিবাহ অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি খবর নিজস্ব সংবাদদাতার মতই আমার লেখক বন্ধু ভবতোষ নিজে আমাকে

জানিয়েছিল। এক বিন্দু তথ্যও গোপন রাখেনি। কোন্ রঙের জামা কোন্ ঢঙের জুতো পরে সে বরযাত্রা করেছিল, প্রয়োজন না থাকলেও আমি তা জানি। শুভদৃষ্টি থেকে ফুলশয্যা পর্যন্ত নির্ভুল ধারাবিবরণী পাঠাতেও কার্পণ্য করেনি।

এই একপক্ষেই ফুরোয়নি শেষ পর্যন্ত, কন্যাপক্ষের কথা এবার বলি। ভবতোষের স্ত্রী প্রমীলার সঙ্গেও আমার ক্যামেরা আর লেখালেখির মধ্য দিয়ে পরিচয় হয়েছে। গ্লাসগোর কারখানায় বসে তার ফটো আমি দেখেছি। বেশ রোমাণ্টিক চেহারা, রীতিমত সুন্দরী বউ হয়েছে ভবতোষের। সাঁ-বিচে বসে আমি তার সুন্দর চিঠিগুলো পড়েছি। বেশ স্মার্ট মেয়ে প্রমীলা। প্রমীলা না হয়ে নামটা পত্রলেখা হলে যেন আরও মানানসই হত। ফেরার আগে কাণ্টিনেণ্টাল ট্যুরে বেরিয়ে প্যারিসে পেঁাছে ওর সবশেষ চিঠিখানা পাই। শ্যাম্পেনে চুমুক দিতে দিতে সেইদিনই 'তুমি' হয়ে গেছে প্রমীলা। এত নিকট দূরত্বে এসে গিয়েছে যে, প্রমীলা একটি বিবাহিত মেয়ের নাম সেটা চিঠি লিখতে বসে মনে পড়েনি অনেক সময়।

ঘনকালির দ্রুত ছাঁদের হরফগুলোর মধ্যে তার বক্ষস্পন্দন শুনতে পেয়েছি। সে সব দিনগুলোর কথা এখনও মনে হয়। মেঘলা আকাশের নীচে রেফ্রিজারেটরে রাখা ভিজে শহরের পথে পথে ঘুরে আমি তখন বাংলা-দেশের আকাশের সঙ্গে সানাই থেমে যাওয়া, বেনারসী তুলে রাখা একটি ঘরের মনস্তত্ত্ব অনুমান করার চেষ্টা করতাম।

বিয়ের অনুষ্ঠানটা মন্ত্রে আর মন্ত্রণায় মিলিয়ে একটা রহস্য। যাকে ঠিক বুদ্ধি দিয়ে চেরাই করা যায় না, সমস্ত অনুভূতি দিয়েও ছোঁয়া যায় না। উতরোল শাঁখ আর সানাই আর হুলুরবের মধ্য দিয়ে, চোখ ধাঁধানো আলোর রোশনাইয়ের ভিতর দিয়ে, চেলি বেনারসীতে আচ্ছন্ন হয়ে বসে থাকা, জড়ো-সড়ো, দুরু-দুরু বুক, উপবাস-ক্লিষ্ট মুখ, কান্নাভেজা ফোলা ফোলা চোখ একটি মেয়ের করতল-দুটি শেষ পর্যন্ত নিজের হাতের উত্তাপের মধ্যে চলে আসে। সপ্তপদী-সাতপাক, স্ত্রী-আচার, সিঁড়িভাঙা অঙ্কের মত সব স্তরগুলিই ছুঁয়ে ছুঁয়ে সেই ফরাশ বিছানো রসিকতার চৌহদ্দির মধ্যে বাংলা দেশের সমস্ত বরেরাই পেঁাছে যায় শেষ পর্যন্ত। ভবতোষ গেছে, হয়ত আমিও একদিন যাবো। কিন্তু তার পরেরটুকু সম্পূর্ণ অন্য রকম। সেখানে বাসী বিয়ের গন্ধটুকুও নেই। রবিবার রাত পুইয়ে সোমবারের মত। রোদ উঠুক না উঠুক, ফুল ফুটুক না ফুটুক, আবার অফিস, আবার দিনগত পাপক্ষয়। আবার জল তোলা, চুলো ধরানো, চুল বাঁধা। একলা ঘরে হলে, সাময়িক

এবং অনিবার্য নিঃসঙ্গতা। উপন্যাস পড়ে, সেলাই করে, রেডিও শুনে, নিদেনপক্ষে অবেলায় ঘুমিয়ে কোনোমতে সে প্রহরগুলো কাবার করে আনা।

প্রমীলা এবং ভবতোষের জীবনে সেই অধ্যায় শুরু হয়ে গিয়েছিল। চিঠিপত্রে ঘরগৃহস্থালীর নিত্যনতুন পরিচয়, পাক-প্রণালীর অনায়ত্ত বিভীষিকার সংবাদ পেতাম। ইউনিভার্সিটিতে পড়া বউ ভবতোষের, পাকশালের ডিগ্রীধারী নয়। সংসার বিদ্যেয় ভবতোষও কানাকড়ি। তাই বাস্তবক্ষেত্রে প্রবেশ করে ওরা যেন বাস্তব হাস্যরসেরই খনি আবিষ্কার করে বসেছিল।

একটা কিছু করতে গিয়ে যখন অন্যকিছু ঘটিয়ে বসত, প্রচলিত পাকপ্রণালী যখন হযবরল জাতীয় হয়ে উঠত, তখন ওদের যৌথ হাসি যেন থামতে চাইত না। অন্তত চিঠিপত্রে আমার তাই মনে হয়েছিল প্রথম দিকে, যেন দুজনের গায়ে দুজনে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে।

সদ্য পরিচয়ের মধ্য দিয়ে স্বামী-স্ত্রী এত অল্পকালের মধ্যে এমন বন্ধু-স্থানীয় হয়ে উঠেছে পরস্পরের কাছে, এমন দেখা যায় না। প্রাক্‌ প্রণয় যেখানে পরিণয় ঘটায়নি, সেখানে এমন একজোড়া আন্তরিক মিল সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু আমার বন্ধু ভবতোষের জীবনে তাই ঘটেছিল। ও সে দিক থেকে ভাগ্যবান, গৃহিণী সচিব সখী সকলের ভাগ্যে নয়। আর সত্যি বিচার করে দেখলে ভবতোষের গর্ব করবার মত আছেই বা কি? বিশ্ববিদ্যালয়ের গড়পড়তা ডিগ্রী, গড়পড়তা চেহারা এবং এমন গড়পড়তা গুণপনা, যাতে দশজন পাঁচজন কিংবা সময়ে সময়ে দুজনের মধ্যে থেকেও আলাদা করে নেওয়া যায় না।

কেবলমাত্র ওর অন্তরটা ছাড়া। সেটা ছিল ছেলেমানুষিতে ভরা, উদ্ভট কল্পনায় ঠাসা। ও অনায়াসে আজগুবি লেখক হতে পারতো, অন্তত কবি; চমৎকার মিল দিয়ে দু চারটে প্রেমের কবিতা কি আর না লিখতে পারতো!

তবে ভবতোষের বন্ধুকৃত্য চমৎকার। বন্ধুকে ভালবাসতে, বিশ্বাস করতে এবং কাছে টানতে ও জানে। তা না হলে বিদেশ থেকে ফিরে আসতে না আসতেই ছুটে আসতুম না ওর কাছে; ওদের কাছে। সমুদ্রের নোনা গন্ধ এখনো শরীরে, জামাকাপড়ে জড়িয়ে রয়েছে। এখনও প্রভূত বিয়ারের স্বচ্ছলতা আমার দুটি গাল ভরাট করে রেখেছে। আমার চোখে এখনও শ্রেষ্ঠ নগর বন্দরের কেরামতি লেগে রয়েছে। বিশ্বকর্মার দেশের মানুষ কিভাবে বাঁচতে শিখেছে, কাকে তারা জীবন বলে জানে, আমি দেখে এসেছি।

এদেশে চলতে গিয়ে তাই প্রতিপদে হোঁচট খাচ্ছি আমি। প্রতিপদে আমার রুমালের প্রয়োজন হচ্ছে এই নোংরা দেশে চলতে গিয়ে।

ঠোক্কর খেয়ে খেয়ে যে স্বগতোক্তিগুলো করছি, বলাই বাহুল্য সেগুলো ইংরেজীতে।

কেন না হবে! বলতে গেলে, কপাল তৈরি করেই ফিরে এসেছি আমি। যে বিলিতী কোম্পানী আমাকে সেখানে পাঠিয়েছিল, তারা এবার থেকে আমার সঙ্গে যথাযোগ্য ব্যবহার করবে। সুতরাং এখন আমার জীবনের ভোল কেনই বা বদলে না যাবে। এতদিন কম কষ্ট তো করিনি ছাত্র বয়সে। সস্তার মেসে থেকেছি, ছারপোকা পুষ্যি নিয়ে বিনিদ্র রাত কাটিয়েছি। বিকেলে জলখাবার জোটেনি কোনদিন। সে সব দিনের কথা আজ আমার কাছে সুখের নয়, তাই তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভুলতে চাই।

আজ বাঁচতে শিখেছি আমি। মানুষের মত মাথা তুলে, স্বতন্ত্র হয়ে, বিশিষ্ট হয়ে। সুখ এখন আমার করায়ত্ত. আঙুলের একটি ইশারায় কাছে আসবে। আমার কলমের ডগা দিয়ে যে সই বেরোবে তা রত্নগর্ভা। কিন্তু এইটুকুই আমার সব নয়, কমার্সিয়াল ভ্যালুয়েশনেই আমি ফুরিয়ে যাইনি, আমার অন্যগুণও আছে। যেগুলো একসঙ্গে থাকলে মানুষকে চৌকস বলে। নিজের কথা বড্ড বেশি হয়ে যাচ্ছে, এবার থামি।

মানচিত্রের ইঙ্গিতমত বাড়িটা চিনে নিতে কষ্ট হল না। কয়েক মুহূর্তের জন্য ইতস্তত ভাব এল মনের ভেতর। কল্পনা এবং বাস্তবের শুভদৃষ্টি, কেমন জমবে কে জানে! দীর্ঘকাল পরে দেখলেও একমাত্র বন্ধুকে ভবতোষ ঠিকই চিনবে, চেহারায় যতই চোস্ত হই, অবাক করে দেবার জন্যে আচমকা এসে থাকি, তার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবো না একমুহূর্তও। কিন্তু বন্ধুপত্নী? বা বলা যাক, আমার সমুদ্র-এপারের বান্ধবী, সে আমাকে চিনবে কি? চিনলেও সাক্ষাতে কেমন ভাবে নেবে তার ঠিক কি? চিঠির নৈকট্য এবং ভাষা আর বজায় থাকবে? সেই স্বচ্ছন্দ পরিহাস, সেই স্বনাম সম্বোধন কি আজ শুনতে পাবো নিজের কানে?

কিন্তু এত কথা ভাবার সময় কোথায় তখন? সিংদরোজার চৌকাঠে যখন পা রেখেছি, ভিতরের চৌকাঠও ডিঙোবো বইকি। এক কথায় মন্দ নয়—বাড়িটার মধ্যে ঢুকে পড়লাম শেষ পর্যন্ত! কয়েক প্রস্থ সিঁড়ি ভেঙে একেবারে দোতলায়। বারান্দার ওপরই রান্নাঘর-ফেরত, আগুনের আঁচে হিমসিম খাইয়ে বন্ধুজায়ার সঙ্গেই চক্ষু বিনিময় হল প্রথম। মাথার আঁচলটাকে কোমরে দুরস্ত করে কি কারণে সে তখন এইদিকেই আসছিল, মুখচোখ লালচে। বুঝলাম উনুনের প্রতিক্রিয়া! মনে মনে ফটো এনলার্জ করে দেখলাম, হ্যাঁ, সেই বটে, তবে আরও জীবন্ত, আরও সুন্দর।

আলুথালু চুলের রাশ পল্লবের মত জড়িয়ে ধরেছে মুখখানাকে।

ত্রস্তে একটা নাচের ভঙ্গিতে থমকে গেল প্রমীলা। কোমর থেকে আঁচলটাকে একবার খসাতে চাইল, কিন্তু ঘটনাটা পরিণামে তেমন জমলো না। তার বিব্রত, অর্ধলজ্জিত অবস্থা উপভোগ করতে বেশ ভালোই লাগছিল কিন্তু আচরণটা শোভন হচ্ছিল না বলে শেষ অবধি বলে ফেললাম, 'প্রমীলা, আমাকে চিনতে পারছেন না?'

চোখের পলকে ভাবান্তর ঘটে গেল প্রমীলার, বলতে গেলে রূপান্তর। হইহই করে আমাকে প্রায় ধরে ফেলল সে, 'আরে আমাদের বিলেত ফেরত টাট্‌কা সাহেব যে। কবে ফিরলে দেশে, একটু জানাতে তো হয়?'

'জানাই নি ইচ্ছে করেই', আমি সহাস্যে জানালাম, 'একেবারে সশরীরে অবাক করে দেব বলে। তা একেবারে ব্যর্থ হইনি কি বলেন?'

প্রমীলা সেকেণ্ডখানেক ভ্রূভঙ্গি ক'রে তাকিয়ে থেকে বলল, 'এটার মানে কি?'

আমি সন্দিগ্ধ গলায় বললাম, 'কোন্‌টার?'

'এই আপনি-আজ্ঞে করা সাধুভাষার।' প্রমীলা হতাশার ভঙ্গি করে বললো, 'আমাদের প্যারিস-চুক্তি বেমালুম ভুলে গেলে? নাকি এখন কথায় ডার্কটিকিট লাগছে না তাই!'

'না না তা কেন', আমি সামলে নিলাম অপ্রতিভ ভাবটা, 'প্রথম দর্শনে নারী জাতির সম্মান রক্ষা করছিলাম মাত্র।'

'যাক কথাটা শুনতে ভালোই লাগলো।'

'জানা কথা, মেয়েরা ফ্ল্যাটারি ভালোবাসে। তা হেড অফ দি ফ্যামিলিকে দেখছি না কেন? তোমার ইনভিসিব্‌ল ম্যান কোথায়?'

'গোল্লায়!'

চমকে উঠে বললাম, 'তার মানে?'

'অফিসের গোলামিপারী করছেন এতক্ষণে!'

'বলো কি। আমি যেন বিশ্বাস করতেই পারছি না! এই সাত সকালে যখন মানুষ দ্বিতীয়বার চা খায় তারিয়ে তারিয়ে, তখন সে ব্যাটা অফিসে গিয়ে বসে থাকলো'—

'না, তুমি হাসছো! আমার কিন্তু সত্যিই কান্না পায়'—সত্যিই কাঁদো কাঁদো মুখ করলো প্রমীলা।

আমি হাল্কা সুরে বললাম, 'এই রাখো তোমার মেয়েলী আই মীন, রেডিমেড্ কান্না। কিংবা, আচ্ছা দাঁড়াও—' হাতের সুটকেসটাকে টক করে

মাটিতে নামিয়ে দিয়ে কাঁধে ঝোলানো ক্যামেরা খুলে ফেললাম এক নিমেষে। লেটেস্ট মডেল ঝলসে উঠল আমার হাতের মধ্যে। একচোখ বুজে লক্ষ্য স্থির করে বললাম, 'হ্যাঁ এইবার একখানা সীন ক্রিয়েট করতে পারো'—

'করো কি, করো কি!' দু' হাত তুলে বাধা দিল প্রমীলা, যেন আমি পিচকারী উঁচিয়েছি রঙ দেবার জন্যে, 'এই কি ছবি তোলার পোশাক!—'

ক্যামেরার শাটার টিপে দিয়ে নিজের পোশাকের দিকে তাকিয়ে অজ্ঞতার ভান করলাম, 'কেন, এই পোশাক পরেই তো আমি বরাবর ছবি তুলে এসেছি।'

'তোমার পোশাকের কথা, ওরে!'—হঠাৎ আমার রসিকতা ধরতে পেরে কথা থামিয়ে হেসে উঠল প্রমীলা।

'অবিশ্যি মেক-আপে একটু খুঁত থেকে গেল তোমার—'

'মেক-আপে! কেন?' হাসি থামিয়ে সন্দিগ্ধ হল প্রমীলা।

'আঁচলে একটু সেণ্ট ঢেলে আসা উচিত ছিল, ক্লোজ আপ শট্ নিলাম কিনা'—

দ্বিতীয় দফা হাসতে হাসতে প্রমীলা দমবন্ধ গলায় বলল, 'উফ, তুমি এমন হাসাতেও পারো।'

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, 'শুটিং তো শেষ হল, এইবার?'

'নেগেটিভটা চাই পজিটিভলি, ডকুমেণ্টারী হয়ে থাকতে রাজী নই।'

'তথাস্তু! উইমেন আর অলোয়েজ নেগেটিভ! অতঃপর কি করা যায় বলো'—

'ফলো মি, আমার পশ্চাদগামী হও'—

'পিছু নেব? ছি ছি কি যে বলো।'

চলতে আরম্ভ করেছিল প্রমীলা হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'একটি চড় খাবে।'

সত্যি বলতে কি, ঘাবড়ে গেলাম একটু। কি রহস্যময় রূপান্তর। নীলাক্ষী-দেরও চিনতে এরকম কষ্ট হয়নি আমার।

দোতলার ফ্ল্যাটটি সুন্দর। প্রায় ছবির মত করে সাজিয়েছে প্রমীলা। পর্দায়, ফুলদানিতে, মাটির পুতুল, হাতের কাজের প্রতিটি জিনিস এমনভাবে রাখা যেন আঁকা ছবি, যেন হাত দিয়ে ছুঁতে নেই। ব্যবহার্য জিনিসগুলো পর্যন্ত। মেঝে তক তক করছে, শঙ্খসাদা দেওয়াল। পিছন দিকের ব্যালকনিতে এলাম। আহা! প্রকৃতির বুকের মাঝখানে যেন দূরবীন চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। একখানা ছোটখাটো ভূগোল-বৈচিত্র্য যেন। একটি ব'সে পড়া

হাতীর মত পাহাড়, দূরে দিগন্তের দিকে। নীলবর্ণ। আকাশ আরো নীল। সামনে ক্যাকটাস শিয়ালকাঁটা ছাওয়া প্রান্তরে, একটু এগিয়ে গিয়েই খোয়াই হয়ে গেছে। লাল, ধূমল কাঁকর মাটির ঢেউ, ঢল, ক্যানভাসের সামনে রাখা গোছা গোছা সরু মোটা তুলির মত তালখেজুরের সারি। সব মিলে সাঁওতাল পরগনার রূপ এবং রেখা। আর ঠিক আমার পাশটিতে দাঁড়িয়ে জনপদবধূ।

বললাম, 'অপূর্ব'।'

'কি অপূর্ব ?' নিরীহ জিজ্ঞাসা প্রমীলার।

বললাম, 'এই সিনাসিনারী যা আমার সামনে টাঙিয়ে রেখেছো !'

'ও, শুধু সিনসিনারী !'

'না আরো আছে, সাহস পেলে বলি'—

পৌরাণিক নায়িকার মত মৃগনয়নে তাকালো প্রমীলা, 'সাহস দিলাম তবে।'

'স্থানকাল পাত্রী'—

'মরি মরি !' খিল খিল ক'রে হাসল, 'সত্যি বলতে কি', হাসির ফাঁকে ফাঁকে বলল, 'সত্যি বলতে কি, ফ্ল্যাটার্ড হলাম। ইস—!'

'কি হল ?'

'উনুনে বুঝি এতক্ষণ, এক্সকিউজ মি'—উধাও হয়ে গেল প্রমীলা, যেন ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেল কৌশলে। আমি পকেট থেকে সিগারেট বার ক'রে ঠোঁটে চড়ালাম।

প্রমীলা ফিরে এল একটু পরেই, হাতে এক গ্লাস সরবৎ নিয়ে। ঘরের মধ্যে গিয়ে দুজনে বসলাম মুখোমুখি। বলল, 'এটুকু খেয়ে নাও।' ছাইদান এগিয়ে দিল সিগারেট নামিয়ে রাখার জন্য।

এই প্রথম প্রমীলাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম। সত্যি, তার চেহারার মধ্যে ঐশ্বর্য আছে। ঠোঁটের লোভাতুর হাসি, চোখের রহস্যস্পর্শ, চিবুকের কাছে একটা লাস্যময় মীড়। কয়েক মাস আগে কুমারী ছিল, এখন বধূ। তখন বইখাতা নিয়ে কলেজ যেত, বান্ধবীদের সাথে দলবেঁধে গল্প করতো, আলুকাবলী খেত। আর এখন খাঁচায় ভরা শালিখের মত গৃহিণী।

এটা মেয়েদের জীবনে জয় অথবা পরাজয়, ভাবছিলাম মনে মনে। কিন্তু চোখ সরাতে পারছিলাম না প্রমীলার মুখের ওপর থেকে। অন্য কোনো মেয়ে হ'লে এই প্রায় সদ্য পরিচিত পুরুষের দৃষ্টির সামনে লজ্জিত বোধ করত, অন্তত অস্বস্তি। কিন্তু প্রমীলার সে বালাই নেই। সে আমাকে নিতান্ত

সহজ মনেই গ্রহণ করেছে। দেখলাম, মনোযোগ দিয়ে আমার বুকের দিকে তাকিয়ে আছে।

'ওখানে কি দেখছো?'

'ভয় নেই, হার্ট দেখছি না, তোমার টাই দেখছি, ভারি সুন্দর।'

খুশী হয়ে মনে মনে বললাম, 'হ্যাঁ, দামও তেমনি, তোমার একখানা শাড়ি হয়ে যেত।' প্রকাশ্যে বললাম, 'ভবতোষের জন্যেও একটা টাই এনেছি, এর চেয়ে খারাপ না!'

'টাই?' যেন অবাক হল প্রমীলা, 'তোমার ওই চাষাড়ে বন্ধু টাই দিয়ে কি করবে?'

হয়ত একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছিল কথাটির মধ্যে। কিন্তু তা হলেও চাষাড়ে শব্দটা খুব স্নেহবাচক বা হাস্যরসাত্মক ব'লে বোধ হল না। খট্ ক'রে কানে লাগলো আমার। কিন্তু কথাটা খেয়াল করিনি এমনি ভাবে বললাম, 'কেন ও তো প্যাণ্ট পরে?'

'তা পরে।' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ঠোঁট ওল্টালো প্রমীলা!

মনের অসহ্য ভাবটা গোপন রেখে বললাম, 'নিজের বন্ধু ব'লে বলছি না, ওর মত ভালোমানুষ আমি খুব কমই দেখেছি।'

'তুমি সাহিত্যিকের বন্ধু, তোমার কথায় অত্যুক্তি থাকবেই', একটু ম্লান হাসলো প্রমীলা, 'কিন্তু অত ভালোমানুষ কে চেয়েছিল?'

বললাম, 'শুধুই ভালোমানুষ? অমন মার্জিত সাহিত্যিক—ভালো কথা, আজকাল ও লেখে টেখে, না ছেড়ে দিয়েছে একেবারে?'

আমার শেষ কথাটুকু কানে তুললো না প্রমীলা, প্রথমটুকু নিয়ে পড়লো, 'হ্যাঁ ওই লেখাটাই পলিশ্‌ড, লেখক নয়। উদারতা নেই'—

'অর্থাৎ? কিভাবে বলছো কথাটা?'

'যার বিশ্বাস নেই সেই অনুদার!'

'বিশ্বাস নেই এ তুমি কি বলছ? ভবতোষ তোমাকে যে-রকম ভালোবেসেছে—আর কেউ সে রকম'—

'দোহাই তুলনা করো না!' অধৈর্য গলায় কথা ক'টি বলে একটু দম নিল, পরে বলল, 'ভালোবাসার সংজ্ঞা আমি জানি না, কিন্তু এমন পাকে পাকে জড়িয়ে ধরা ভালোবাসার চাপে আমার যে দম বন্ধ হয়ে এল।'

গলার সুরে সমস্ত পরিবেশটা বিষণ্ণ আর অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছিল। প্রমীলার মনের মধ্যে কোথায় একটা কাঁটা ঢুকেছে। ভবতোষকে সে সম্পূর্ণ মেনে নিতে পারেনি, সবটা মনে ধরেনি, বুঝতে পারছিলাম। ব্যাপারটা

আমার কাছে আকস্মিক হলেও তার কাছে হয়ত এতদিনে এটা বাসি সংবাদ। তবু তাদের দাম্পত্য জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতি গরমিলের কথা আমাকে শোনানো খুবই হঠকারী হয়ে পড়েছে। তবু ঠাট্টা করে সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলাম শেষবারের মত।

'বুঝতে পারছি ভালোবাসায় শ্বাসকষ্ট না হওয়ার মত অক্সিজেন থাকা প্রয়োজন। তবু কিছু মনে করো না, তোমার মত সুন্দরী বউ পেলে আমি বোধ হয় একটা আয়রন সেফ্ কিনতাম।'

ভেবেছিলাম আমার এই রসিকতায় আগের মতই হাসবে প্রমীলা। কিন্তু সে গম্ভীর গলায় বলল, 'পুরুষদের ভালোবাসা এই রকমই. ঠিকই বলেছ। কিন্তু আয়রন সেফেও শেষরক্ষা হয় কি?'

'জানি না। তবে ওই চাবিকাঠিটাই আমার কাছে মিস্টেরিয়াসলি রোমাণ্টিক মনে হয়। বন্ধন এবং মুক্তি একসঙ্গে।'

'আমার এক দাদা বলতেন' প্রমীলা বলল, 'লাইফ ইজ হার্ডার দ্যান ফিলসফি, অ্যাণ্ড ব্রডার দ্যান দ্যাট! আমাদের পরিবারে কিন্তু মেয়েদের স্বাধীনতা ছিল। বাইরে মেলামেশা করায় বাবার কোনোদিন বারণ ছিল না।'

বললাম 'শকিং! খুব দুঃখের কথা' —

'কেন?' 'প্রমীলা ভ্রূ কুঁচকে তাকালো।

'তোমার বাপের বাড়ির কথা বলছি না। ভবতোষ যদি এ রকম করে, তবে সেটা খুব দুঃখের। আমি ওর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলব।'

'অমন কর্মও করতে যেও না' একটু ভীত ভঙ্গী করে বলল. 'তাতে আমার জ্বালা বেড়েই যাবে, তুমি ওকে চেন না!'

কোনো উত্তর যোগালো না আমার মুখে। আমার বন্ধুকে সত্যিই আর আমি চিনি এমন মনে হচ্ছিল না। আমি যাকে জানতাম সে তো এত কন্জারভেটিভ এবং সংকীর্ণমনা ছিল না। আমি না জেনে হয়ত সরল মনে ভবতোষের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা কিংবা তর্ক করতে যেতাম। তার ফলে বেচারী প্রমীলা হয়ত তার স্বামীর দ্বিতীয় দফা সন্দেহের শিকার হত। ভাবছিলাম প্রমীলা আমাকে সাবধান করে দিয়ে ভালোই করেছে! মানুষের মন বড় বিচিত্র, বাইরে থেকে তার কতটুকু খবর আর পাওয়া যায়।

'আসলে বিয়ে করাটাই মেয়েদের পক্ষে সবচেয়ে বড় ভুল।' প্রমীলা আমার চোখে তার গাঢ় চোখ দুটি রেখে বলল।

কিছু একটা বলা দরকার. কী-ই বা বলি! মনে হল এ ঘরের হাওয়া

নষ্ট হয়ে গেছে। আগের মত আর সহজ নিঃশ্বাস ফেলা যাবে না। তবু শেষ পর্যন্ত মুখ খুললাম।

'ম্যারেজ মানেই অ্যাড্জাস্টমেণ্ট। বিবাহ মানেই পরস্পরকে বিশেষরূপে বন্ধন। যা চাই সব কি আমরা পাই? যা পেয়েছি তাকেই মানিয়ে গুছিয়ে নিতে হবে, প্রমীলা।'

'তুমি আজ এ কথা বলছ, কাল বলবে না'—অভিমানের মত শোনালো ওর গলা।

'কেন আজ ব্যাচেলার আছি বলে?' হেসে ওঠার চেষ্টা করলাম, 'যা ফ্যাক্ট তাকে চিরকালই স্বীকার করবো'—

'যাক ওসব কথা এখন থাক!' প্রমীলাই পূর্ণচ্ছেদ টেনে আমাকে বাঁচালো।

প্রমীলার ব্যস্ততার বহর দেখে বললাম, 'আমার জন্য কিন্তু বিশেষ কোনো আয়োজন করতে যেয়ো না। তোমাদের যা হয়েছে তাব অন্তত বখরা দিয়ো, তা হলেই হবে।'

প্রমীলা জবাবে বললে, 'এই পোড়া দেশে পাওয়াই বা যায় কি যে, তোমাকে করে খাওয়াব। পররুচি খানা এখানে।'

'খানাপিনায় আমি up-রুচির পক্ষপাতী নই, অত উচ্চ স্তরে নাইবা উঠলে।'

'হাফ্-রুচি থাকলেই হল' ভবতোষ পিছন থেকে টিপ্পনী কেটে আমাদের দুজনকে চমকে দিয়ে গান ধরল, 'কত কাল যে বসে ছিলাম পথ চেয়ে আর কাল-গুনে, দেখা পেলাম ফাল্গুনে!' গানের কলি শেষ করে পিঠে কিল বসালো, 'আই শ্যাল কিল ইউ।' বলে নিজের রসিকতায় নিজেই ঘর ফাটিয়ে হাসলো।

আমি বললাম, 'তোমার শট্গান তোমার দিকেই ঘুরিয়ে ছুঁড়তুম, নেহাত গলায় গান আসে না তাই! নইলে, ঘড়ি ঘড়ি পথ চেয়ে বসে আছি তো আসলে আমিই'—

'প্রমীলার কোম্পানি এতটা বোরিং জানতাম না'—

'এটা আমাকে অ্যাটাক করা হল, কিন্তু আমি তা বলিনি। আসলে ও হল লিমিটেড কোম্পানি। কথা কি জানিস, ব্রহ্মস্পর্শ না হলে কিছুই আন্লিমিটেড হয় না। আড্ডা জমে না।'

'আমার কিন্তু দোষ নেই ভাই, টেলিগ্রাম পাওয়ামাত্র এসেছি—এই দ্যাখ'—

ভবতোষ প্রমীলা-লিখিত পত্রপাঠ চলে আসার হুকুমনামা দেখালো। তারপর স্ত্রীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'এ রকম ঝাপসা করে আর 'কল' দিও না সুন্দরী। হৃদযন্ত্র বিকল হবার উপক্রম হয়।'

'যাক হার্ট আছে তোমার তাহলে।' প্রমীলা ব্যঙ্গের সুরে বলল।

'আছে, কিন্তু আস্ত কি আর রেখেছ। জানিস্ অলকেশ, আমি ভাবলাম না জানি কি আবার। এদিকে তুই এসে বসে আছিস ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি—পুরুষের গলা শুনেই পা টিপে টিপে উঠেছি;' কথার মাঝখানেই মুচকি হেসে নিল একটু, 'রীতিমত রাইভালের মত জমিয়ে বসে আছিস, প্রথমটা চিনতেই পারিনি।'

প্রমীলা আমার চোখে চোখে, অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো। অর্থাৎ কেমন বলেছিলাম কিনা। পরে তেজী গলায় ভবতোষকে হুকুম করল, 'ওই সব চাষাড়ে রসিকতা রেখে একটু বাজারে যাও দিকি! ভবতোষ আমাকে ছাড়তে নারাজ। সে প্রমীলাকে শুনিয়ে শুনিয়ে গান ধরলো, 'ওগো নিঠুর দরদী, একি কথা বলছ অনুক্ষণ'—

'হ্যাঁ আমি যেন দিনরাত ওই কথাই বলি।' প্রমীলা প্রায় ফোঁস করে উঠল।

'আমার গান গাওয়া একদম টলারেট করতে পার না দেখছি! আসলে এত বেলায় আর কেন'—

আমিও ওকে সমর্থন করলাম, 'নিশ্চয়ই। বাজার করার স্কোপ্ পরেও পাবি। না তাড়ালে আমি এখান থেকে নড়ছি না ব্রাদার।'

'এই তো চাই। গ্রেটমেন থিংক অ্যালাইক, বাট উইমেন ডু নট্।' চেয়ার টেনে বসতে বসতে ভবতোষ সহাস্যে বলল।

'বসো!' বলে শাসিয়ে কিংবা ভরসা দিয়ে প্রমীলা উঠে গেল ঠিক বোঝা গেল না।

ভবতোষ অফিস থেকে সাইকেল করেই ফিরেছে; পোশাক দেখেই বুঝলাম।

'লেগ্ পুলিংয়ের অভ্যেস কবে থেকে হল?'

হাসি তামাশা ভবতোষ আগের মতই সহজে ধরতে পারে। বলল, 'এই মফস্বলে এসে ব্রাদার, কম্মিন জ্যোৎস্না রাত্রে আর্দালীর ছ্যাকরা যন্ত্রে হাঁটুকনুই ছড়িয়ে টিংচার আয়োডিন সহযোগে শিখেছি।'

'দরকার করে না। সংসার সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে খেতে ও একরকম

ম্যানেজ হয়ে যায়। বিয়ে তো আর করলি নে। তোরা হচ্ছিস পয়লা নম্বরের এস্‌কেপিস্ট !’

‘বল, বলে নে।’

ভবতোষের পোশাকের দিকে এবার খুঁটিয়ে নজর দিলাম। ক্রীজ নষ্ট ট্রাউজার্স, পায়ের পাতার ওপরে গোড়ালির ঘেরে দুখানা রুমাল বাঁধা। সাইকেলের প্যাডেল করার সুবিধের জন্যে। গায়ে একটা অদ্ভুত ম্যাড়মেড়ে রঙের ফুলশার্ট। হাত দুটো কনুইয়ের কাছে গুটোনো। সবগুলো বোতাম লাগানো হয়নি, ফলে ভেতরের আধময়লা গেঞ্জির খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে। মাথায় পর্যাপ্ত বন্য চুল। সব মিলিয়ে চেহারায় একটা গ্রাম্যতা এসেছে, একটা শিথিল, বয়স্ক ভাবসাব।

প্রমীলার সঙ্গে আগে আলোচনা হয়ে থাকার দরুনই হয়ত চোখে বেশী করে লাগলো। বললাম, ‘কিরে জামাকাপড়ে এত অনাস্থা কেন ?’

ভবতোষ কথাটা বুঝতে না পেরে, নিজের জামাকাপড়ের দিকে চেয়ে শুধোল, ‘কেন কি হয়েছে ?’

‘হাজার হলেও তুই একজন অফিসার মানুষ, তোর এই পোশাক ! স্যুট নেই তোর ? টাই ছাড়া আজকের দিনে পুরুষমানুষকে যে স্কন্ধ-কাটা মনে হয়।’

প্রাণখোলা হাসি হাসলো ভবতোষ, ‘ও, এই কথা। আমাকে টিপটপ্‌ স্যুটেড-বুটেড দেখতে চাস ? আরে হ্যাঃ, আমার মত পেটি অফিসার-দের কি ওসব বিলাসিতা মানায় ? তুইও যেমন প্রমীলার কথায় কান দিয়েছিস।’

‘আমাকে আবার জড়াচ্ছ কেন এর মধ্যে।’ চায়ের ট্রে হাতে ঘরে প্রবেশ করতে করতে প্রমীলা প্রতিবাদ করল, ‘আমি কাউকে কিছু বলিনি’—

হাতের মুদ্রায় এক জাতীয় অ্যাবস্ট্রাক্ট্‌ আর্ট ফুটিয়ে ভবতোষ আমার অভিযোগ একেবারে হাওয়ায় উড়িয়ে দিল।

নিজের টেরিলিন স্যুটের দিকে ইংগিত করে বললাম, ‘এটাকে বিলাসিতা বলিস ?’

‘বলি, পাত্র ভেদে। তোর পক্ষে ওটা নেসেসিটি, আমার পক্ষে নয়।

‘এই ভেদাভেদের কারণ ?’ আমি ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে জানতে চাই।

আমার অ্যাগ্রোনমিস্ট বন্ধু মৃদু হেসে বলল, ‘অন্যভাবে নিস না

কথাটা। প্রফেশন্যালী আই অ্যাম এ চাষা। আমাকে কি এসব মানায় ? যে দেশের লোক প্রতিদিন থি. কোয়ার্টার নেকেড, সেখানে আমার আকণ্ঠ ড্রেসিং চলে কি রে ভাই ?'

'তুই সেণ্ট পার্সেণ্ট প্যাটিয়ট ভবতোষ! তাই সিক্সটি সিক্স-এ এসেও এ কথা ভাবতে পারিস। আমরা তো ফরটি সেভেনের পর থেকেই ওসব ভুলে গেছি।'

'ওই সব কচকচি রেখে আয় একটু প্রাণ খুলে আড্ডা দিই।'

আমি সোৎসাহে বললাম, 'আরে সেই জন্যেই তো আসা। কতকাল পরে দেখা হল বল দেখি ?'

'সত্যি বিয়েতে তোকে না পেয়ে—সিগ্রেট. প্রমীলা ঘরে সিগ্রেট আছে ?'

'বোঝ ?' আমার দিকে তাকিয়ে প্রমীলা হাসলো, 'সিগারেটও যেন আমার এক্তিয়ার ?'

'নয়ত কি ?' ভবতোষ বলল, 'তোমার হোম ডিপার্টমেণ্টে আবগারীও তো পড়ে। বিয়ের পর থেকে যে ভাবে মাদক কণ্ট্রোল করে চলেছ'—

আমি হাসতে হাসতে স্টেট একস্প্রেস ভর্তি মূল্যবান সিগারেট-কসটা ওর সামনে খুলে ধরে বললাম, 'বিয়ের আগেও কি তাহলে তোমাদের ইয়ে ছিল ?'

কৃত্রিম কোপের সঙ্গে প্রমীলা বলল, 'তোমরা দুজনেই কিন্তু বড্ড ভালগার হয়ে যাচ্ছ।'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'কথায় বলে টোয়াইস এ ভালগার।'

'জীবনে তো কাউকে ভালোবাসলে না, তুমি লভটভের বুঝবে কি ?' প্রমীলাকে ঠাট্টা করে ভবতোষ বলল, 'প্রেম হচ্ছে মহৎ শিল্প, গ্রেট আর্ট। বিয়েটাই সব নয়, স্যার'—

'নিশ্চয়ই। আমি প্রমীলাকে রাগিয়ে দেবার জন্য বললাম, 'ফাস্ট' ক্লাস ইডিয়ট না হলে কেউ দুম করে বিয়ে করে বসে !'

'সত্যি, তোকে দেখলে হিংসে হয় র‍্যা'—কেস থেকে একটা সিগারেট তুলে নিতে নিতে আমাকে চোখ টিপে বলল।

প্রমীলার এবার সত্যিই মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠল, 'তা তোমার ফ্রেণ্ডের মত ওই সব করে বেড়ালেই হত, ইডিয়টের মত বিয়ে করতে যাওয়া হয়েছিল কেন ?'

'তোমার কথা ভেবে'—

'আমার কথায় !' নিজের বুকে সবিস্ময়ে আঙুল ঠেকিয়ে প্রমীলা টেনে

টেনে উচ্চারণ করল, 'বলো কি ?'

'লেট মি এক্সপ্লেন'—আমার হাতের লাইটার থেকে সিগারেট ধরিয়ে পরিতৃপ্তির সঙ্গে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে ভবতোষ বলল, 'দিনের পর দিন তোমার বিয়ের বয়স চলে যাচ্ছে দেখে'—

ভবতোষের কথা শেষ হল না। হাতের পশমের গুটি আর কাঁটা দুটো ভবতোষের বুকের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে দুম দুম করে পাশের ঘরে চলে গেল প্রমীলা।

'অরসিকেষু রস নিবেদনং', শ্লোকের গা ঘেঁষে হাসল ভবতোষ।

দাম্পত্য কলহ ব্যাপারটা আজ যুদ্ধের মতই বাইরের লোকের পক্ষে বেশ লোভনীয় ব্যাপার। কিন্তু তলায় তলায় ব্যাপারটা গুরুতর বলেই শঙ্কা হচ্ছিল।

দুপুরে সস্ত্রীক গোটা দুই গড়াগড়ি দিয়েই ভবতোষ উঠে ধরাচুড়ো পরতে লাগল।

বললাম, 'ব্যাপার কি ? এই মফস্বলেও এত কাজ ? আজকের দিনটা ছুব দিলে হত না ?'

মিটমিট হাসল ভবতোষ, 'সেই ব্যবস্থাই পাকা করাতে যাচ্ছি। শুধু আজ কেন, কালকের দিনটাও ম্যানেজ করে আসবো। কাল শনিবার, একবেলা আছে'—

বললাম, 'ব্রেভো !'

ভবতোষ বেরিয়ে গেল। আমি শুয়ে শুয়ে একটি ইংরেজী সচিত্র সাপ্তাহিকের পাতা ওল্টাচ্ছিলাম। কিছু যে পড়েছিলাম তা নয়, আসলে মনে মনে কিছু ভাবতে হলে একটু মুভমেণ্ট আনা দরকার।

এমন সময় প্রমীলা আমার ঘরে চলে এল, 'ঘুমোচ্ছ নাকি, অলকেশ ?'

'এসো' তাড়াতাড়ি উঠে বসে বললাম, 'কাঠবেড়ালীর মত সেতু বন্ধনের চেষ্টায় ছিলাম, হল না।'

'ওইতো মুশকিল। দিবানিদ্রা যাদের আসে না, একেবারেই আসে না। চলো, বিকেলে কোথাও ঘুরে আসি একটু। এখানে কার বা ভাল লাগে। না আছে কোনো অ্যাসোসিয়েশন না আছে কিছু। তবে দ্যাখো ও আবার রাজী হয় কিনা।'

'ভবতোষকে তুমি বেরসিকের কোঠায় ধরে রেখেছ দেখছি। আমি তো ওর মুড আজকে খুব ভালোই দেখলাম।'

'ছাই দেখেছ। এই তো যাবার আগেও এক রাউণ্ড হয়ে গেল।'

পাছে সকালের আবহাওয়া আবার ফিরে আসে তাই ভয় পেলাম। লঘু ভঙ্গিতে বললাম, 'গুলি না কাঁদুনে গ্যাস ?'

'আমাকে ওরকম ছিঁচকাদুনে মনে হয়েছে বুঝি ? অত ইমোশনাল আমি নই।'

'তাহলে আর ড্রামা জমলো কি করে ?'

'তোমার ফ্রেন্ডকে জিগ্যেস করো, তাঁর টেকনিক তিনিই ভালো জানেন।'

'ভেরি ইন্টারেস্টিং ! তোমাদের অশ্রাব্য ঝগড়া তাহলে একদিন শুনতে হচ্ছে।'

'অশ্রাব্য মানে ! কি বলতে চাও তুমি ?'

'মানে ওই হল যা শ্রবণীয় নয় আর কি ! সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি দেওয়ালের তফাতে থেকেও যা শোনা যায় না'—

'মরি, মরি ! সাধতো কম নয়, তা আড়ি পাতবে নাকি ?'

বললাম, 'তোমার সঙ্গে ? আনাড়ির এতটা সইবে কি ?'

আমার বাহুদেশে সজোরে চপেটাঘাত করল প্রমীলা। বেশ জ্বালা করছিল, তবু মুখে হাসি ফুটিয়ে বললাম, 'এ কিন্তু মশা মারতে কামান দাগা হল।'

'মশা নয়, মশাই তোমাকেই মারা হল এটা। ভালো কথা, আমার জন্যে বিলেত থেকে কি এনেছ শুনি ? খুব যে চিঠিতে লিখেছিলে আমাকে অবাক করে দেবে'—

প্রমীলার স্মার্টনেস দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। যদিও সেই মুহূর্তে আমি সত্যি সত্যিই আড়ি পাতার কথা ভাবছিলাম। মশার চিন্তাটা আর উপহারের প্রশ্ন বিদ্যুৎচমকের মতই আমার ষড়যন্ত্রের উপায় বাতলে দিল। আমার সুটকেসের মধ্যে প্রমীলার জন্যে লুকিয়ে আনা টেপরেকর্ডারের মাউথপিসটা ওদের খাটের মশারির সঙ্গে কিভাবে গোপনে ঝোলাবো—বিদ্যুৎচমকের মতই খেলে গেল সেটা। দু-ঘরের মাঝখান দিয়ে একটা সরু জল যাবার গর্ত আছে দেখেছি, সেখান দিয়ে মাইক্রোফোনের তারটা অতি সহজেই আমার ঘরে নিয়ে আসা যাবে।

'বুঝেছি, মুখে কথা নেই কেন ? দেশে ফেরার সময় আর বান্ধবীর কথা মনে পড়েনি কেমন ?'

'না ঠিক তা নয়। কণ্টিনেণ্টাল ট্যুরে বেরিয়ে হাত খালি হয়ে গেল একদম, সত্যি আমার কি যে খারাপ লাগছে'—

'আমার কিন্তু মোটেই খারাপ লাগছে না, কারণ আমি জানতাম, বন্ধুর চেয়ে বান্ধবী তোমার কাছে বড় হবে না।'

'তুমি রাগ করো না প্রমীলা'—

'যেতে দাও ওসব। আমার রাগে অনুরাগে কার কি এসে যায়। আরে, ওই শোনো!'

'কী?'

'জীপের হর্ন শুনতে পাচ্ছ না?'

'হ্যাঁ, তাতে কি হয়েছে?'

'তোমার ফ্রেন্ড এসে গেছে অফিসের গাড়ি নিয়ে'—

আমি তৈরি হয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এসেই দেখি অপ্রসন্ন মুখে প্রমীলা বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে! মুখের মেক-আপ নেওয়া হয়ে গিয়েছে, খোঁপা সারা, কেবল শাড়ি বদলানো বাকি। এতটা আশাই করিনি, কারণ পক্ষীপাত পর্ব নিয়ে বিকেলের মুখোমুখি আর এক প্রস্থ দাম্পত্য কলহ হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ মুরগী রাঁধা নিয়ে ব্যাপারটা। তাতে করে বিকেলে যে প্রমীলাকে সঙ্গে নিয়ে বেরোতে পারব, বিশ্বাস ছিল না।

'আরে এ কাকে দেখছি।' অকপট বিস্ময় প্রকাশ পেয়েছিল আমার গলায়।

'দেখে যা!' সিগারেটে বেশ মেজাজে একটা টান দিয়ে ভবতোষ বলল, নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত ঘর থেকে ফুসলে বার করে আনতে পারি। যাদু, বুঝেছিস স্রেফ যাদুবলে'—

আমি ধমক দিলাম, 'অ্যাই ভবতোষ!'

'ওহ্ স্যরি।'

একটু পরেই আমাদের জীপ গাড়ি দূরের পাহাড়ের দিকে ছুটে চলল। দু-তিন জায়গায় গাড়ি থামিয়ে আমি ওদের ছবি তুললাম। যেটুকু গুমোট গাড়িতে উঠেও ছিল, তা কেটে যেতে বিলম্ব হল না। বলতে কি প্রমীলা রীতিমত কিশোরীর মত ঝরনার জলে পা ডুবিয়ে কয়েকখানা মারাত্মক ভঙ্গীতে ছবি তোলালো।

পুরুষের এবং ক্যামেরার একচোখোমিতে মেয়েদের প্রাগৈতিহাসিক দুর্বলতা। পৃথিবীর সভ্য সমাজের কোনো নারীকে আমি এর ব্যতিক্রম দেখলাম না।

তারপর পাহাড়ে উঠে একটা অদ্ভুত আকারের পাথরের চাঙড়ের ওপর

বসে কিছুটা রাত পর্যন্ত গান আর গল্প হল। প্রমীলা গান গায় সুন্দর। তার গলা এবং ঢঙটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের আবহাওয়া গড়ে তুলল!

গান শেষ হলে আমি বললাম, 'অপূর্ব'! এমন গলা বাঁধিয়ে রাখবার মত'—

'এবং মালা দিয়ে বেঁধে রাখবার মতও', ভবতোষ আমার রসিকতায় যোগ দিল, 'যা আমি ইতিপূর্বেই করেছি।'

'আমার গলা ভালো তা তো আর বলিনি', অভিমানী প্রমীলা ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলল, 'আমাকে অত করে গাইতে বললে কেন তবে!'

আমি বললাম, 'মেয়েরা রসিকতা বোঝে না, এটা ব্যাজস্তুতি করলাম ধরতে পারলে না।'

ভবতোষ বলল, 'অলকেশ, তুই যদি টেপ রেকর্ডারটা নিয়ে আসতিস তাহলে এ গলা সত্যিই বাঁধিয়ে রাখা যেত রে।'

'আর লজ্জা দিসনে। আনতে পারিনি ঠিকই, তবে আনিয়ে দেব দেখিস।'

এর পর গাড়িতে বসে রাতের আহার সেরে আমরা যখন বাড়ির পথ ধরলাম তখন মহুয়া আর শালের জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে চাঁদ উঁকি দিচ্ছে। সমস্ত পথ রূপকথার দেশ বলে মনে হচ্ছিল, মউলের গন্ধে বাতাস ভারী।

কিন্তু দম্পতির মুখ কেমন যেন থমথমে। সংলাপ নিরুচ্ছল, এবং সংক্ষিপ্ত হয়ে এল। মুখে আর হাসি ফুটল না। ভবতোষের মধ্যেও কেমন যেন একটা পরিবর্তন এসেছে। একটা অস্বাচ্ছন্দ্যের ভাব। কোথা থেকে এই মেঘ নেমে এল, ঠিক ধরতে পারলাম না। তবে বুঝলাম, আজ রাতে একটা খণ্ডপর্ব হতে পারে। সুতরাং সেই দুর্লভ দ্বন্দ্ব রেকর্ড করে ফেলতে পারলে, দাম্পত্য কলহের একটা মধুর উপসংহার টানা যাবে ভেবে মনে মনে উল্লসিতই হলাম।

বাড়ি ফিরে চিরকালের অভ্যেসমত ভবতোষ স্নানঘরে ঢুকলো। প্রমীলা চলে গেল রান্নাঘরে দুধ গরম করতে। সুতরাং এই শুভ মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করতে আমি ভুললাম না।

ভোররাতে ঘুম ভেঙে যেতেই মনে পড়লো কথাটা। টেবিলের ওপরে তখনও রেকর্ডার খোলা পড়ে রয়েছে। শুধু প্লাগ কানেকশন খোলা। কৌতূহলে উঠে বসলাম তাড়াতাড়ি। কাল অনেক রাতে নিঃশব্দে যা এই বিদেশী যন্ত্রটি মুখস্থ করেছে, তা না জানা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছিলাম না। মনে আছে শুতে যাবার মুহূর্তে দুধ খাবার প্রসঙ্গে দুজনের একচোট হয়ে গিয়েছিল।

এবং সেই হয়ে যাওয়ার মধ্যে কোনো লুকোছাপা ছিল না, আমার সামনেই সেই মুক্তাঙ্গন নাটকের মত কলহপর্বের একাঙ্কিকা হয়ে গেল।

স্ত্রী দুমদুম করে মেঝে কাঁপিয়ে খাটে গিয়ে ধপাস হল। স্বামী মুক্ত পুরুষের মত একটা সিগারেট ধরিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর কিছুক্ষণ দার্শনিকের মত আত্মমগ্ন থেকে মনুর শ্লোক আউড়ে বলল, 'তুই বেশ আছিস অলকেশ, খবরদার ভুলেও বিয়ে করিস না।'

বুঝলাম, ভবতোষ আর প্রমীলা পরস্পরকে এক মুহূর্তও সহ্য করতে পারছে না। এই অসহিষ্ণুতা কেবল ভবতোষ আর প্রমীলার মধ্যেই নয়, ছমাস এক বছরের পুরনো বিবাহিত ব্যক্তির মধ্যেই চোখে পড়েছে। বড্ড বেশী ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকার এই ফল।

টেপটা গুটিয়ে নিয়ে মিডিয়াম ভল্যুম-এ সুইচ দিলাম। ধীরে মন্থর গতিতে রীলটা ঘুরে চলল, কিন্তু কোনো কথা নেই। মনে অবশ্য এরকম একটা আশঙ্কাই ছিল। শুতে যাবার আগের মুহূর্তে বাক-যুদ্ধটি না হয়ে গেলে হয়ত একটা আশা ছিল। হঠাৎ চমকে উঠলাম গলা শুনে।

'কী, এখন কেন? ছাড়ো!'

'মিলু রাগ করো না, লক্ষ্মীটি শোনো, অ্যাই শুনছো?'

'থাক, আর আদর দেখাতে হবে না, বাইরের লোকের সামনে জুতো মেরে এখন'—

'যাঃ, যা খুশি বললেই হল? তোমাকে কি আমি ··আরে এদিকে ফেরো না, বাইরের লোক পেলে কোথায় তুমি?'

'কেন তোমার ওই প্রাণের বন্ধু'—

'ওহো, অলকেশের কথা বলছ, সত্যি ওকে আমার মানুষ বলেই একেবারে মনে হয় না! ওটা একটা পাগল! জানো. মিলু. ও হতভাগার একটা বিয়ে দেওয়া দরকার। তোমার বন্ধুটন্ধুদের মধ্যে কেউ যদি ফ্রি থাকে'—

'রক্ষে করো! আমাকে আর এর মধ্যে টেন না'—

'তোমাকে তো টানছি না, তোমার বন্ধুদের কাউকে যদি টানতে পারো দেখো না।'

'ঠোঁটে কিছু আটকায় না!'

'আটকাতে আর দিলে কই, যেরকম ফিউরিয়াস হয়ে মুখ ফিরিয়ে আছো'—

'অসভ্য! নাও হল তো?'

রিল ঘুরে চলেছে। আর কোনো শব্দ নেই। ঘুমিয়ে পড়ল নাকি

দুজনে। সত্যি, অজায়ন্থ, ঋষিগ্রান্ধ আর দাম্পত্য কলহ সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রকার যথার্থই ফোরকাস্ট করে গেছেন। স্বামী-স্ত্রীর মতিগতির কোন ঠিক নেই।

'এই ?' চমকে গিয়েছিলাম আর একটু হলে।

'উঁ ?'

'এরকম চুপ করে থাকলে ভারি লজ্জা করে কিন্তু।'

'কেন বলো তো ?'

'মনে হয় তুমি কি যা-তা ভাবছ !'

'সর্বনাশ। কথায় কাজে এক হয়ে শেষে হাতে হাতে ধরা পড়ি আর কি!'

'সব সময়ে ইয়ে। ইস্'—

'কি হল ?'

'বড্ড শরীর খারাপ হয়ে গেছে'—

'তোমার ?'

'মুণ্ডু। তোমার।'

'কেন বেশ স্লিম হয়েছি বুঝি ?'

'থামো তো। সব ব্যাপারে ঠাট্টা না। এত রোগা আর হাল্কা হয়ে গিয়েছ ইস্! আমারই দোষ, আমি কেন এতদিন লক্ষ্য করিনি'—

'সব স্বামীদেরই এই এক অবস্থা'—

'কি অবস্থা ?'

'বউ-এর কাছে তাদের আর কোনো ওয়েট নেই।'

'কিছুক্ষণ নীরবতার পর। 'তুমি রাগ করবে না, বলো ?'

'বলেই ফেলো'—

'আমাদের মাঝখানে কোনো লোক আসুক আমি চাই না।'

'ইটস্ টু্য লেট ডার্লিং, আরো আগে বলা উচিত ছিল। ওই ছোটলোক ট্রেসপাসারদের কিছু বিশ্বাস নেই।'

'অসভ্য কোথাকার। জংলি ভূত একটা। আমি সেই কথা বলেছি নাকি। আমি তোমার বন্ধুর কথা বলছিলাম। সত্যি, আমার বড্ড ভয় করছে গো।'

'এই মরেছে! কেন, ভয়ের আবার কি হল এর মধ্যে ?'

'তোমাকে চিরকুট পাঠিয়ে আমার যা ভয় করছিল না, তুমি এমন দেরি করছিলে আসতে।'

'পাগলী কোথাকার। আমার ছেলেবেলার বন্ধু ওই অলকেশকে দেখে তোমার ভয়? তুমি সত্যি ডোবালে। সত্যি বলছি, আমি ওকে মানুষ বলেই মনে করি না একেবারে'—

'ঠিকই করো।'

'যাহ্ বাবা? ও কী করলো তোমার?'

'তবে কি আমি মিথ্যে করে লাগাচ্ছি'—

'আহা আমি কি তাই বলছি, এই দ্যাখো'—

'ও কবে যাবে কিছু বলেছে তোমাকে? নড়বার তো কোনো লক্ষণই দেখছি না!'

'আহা যাবে বইকি। এখানে থাকবে বলে তো আর আসেনি, তাছাড়া অফিসপত্র আছে'—

'ছাই আছে। ওর মতলব ভালো মনে হচ্ছে না'—

আমার কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করছিল, মাথা ঘুরছিল, আর শুনতে সাহস হল না। ভবতোষ কিছু বলার আগেই মেশিন বন্ধ করে দিয়ে ঘড়ির দিকে তাকালাম। তারপর এক টুকরো কাগজে 'তোমাদের কথাই রইল' লিখে টেপের রিলটার তলায় চাপা দিয়ে রেখে উঠে পড়লাম।

আমার শূন্যপ্রায় সুটকেস আর ক্যামেরাটা নিয়ে ছুটতে ছুটতে যখন স্টেশনে পৌঁছালাম, তখন সিগন্যাল ডাউন হয়েছে।

মাড়িয়ে যাওয়া
দিব্যেন্দু পালিত

অফিসে বেরুতে আজ বেশ দেরী হয়ে গেল অনিলের। কাজ আছে ভেবে একটু আগেই তৈরী হয়েছিল সে। খেয়ে-দেয়ে জুতোর ফিতে বাঁধছে, এমন সময় কলিং বেল-এর শব্দ। 'দ্যাখো তো, বোধহয় কাগজঅলা।' শীলাকে বলল, 'বলে দাও রোববার আসতে।' বলতে বলতে প্রায়-নতুন শুয়ের ফিতে বাঁধল অনিল, চামড়ার ওপর আলতো বুরুশ বুলিয়ে ধুলো ঝেড়ে নিল।

'কী হলো! কে?'

'সেই জমির দালাল। বলছে নাকি রাজি হয়েছে—'

'ইস্, আর দেখা করার সময় পেল না!' অনিল একটু ভাবল: 'আচ্ছা, বসতে বলো—'

কথাবার্তা চালাতে দেরী হয়ে গেল। অফিসের ভাবনাটা মাথায় ছিল; বিকেলে বা সন্ধ্যায় আসতে বলে লোকটিকে কোনোরকমে বিদায় করল সে। তারপর ছুটে বেরুল ঘর থেকে।

রাস্তায় বেরিয়েই অনিল টের পেল ভিড় বড়ো বেশী। এতো লোকজন, বিশেষত তাড়ার সময়ে, সে একেবারেই পছন্দ করে না। হাঁটছে, ছুটছে, কিন্তু সকলের চলাফেরাতেই কেমন একটা 'দাঁড়িয়ে থাকি' ভাব। এ সময়টা মর্নিং কলেজের মেয়েরা ঢিমে তালে বাড়ি ফেরে, অ্যাডভান্স বুকিংয়ের দীর্ঘ লাইন পড়ে সিনেমা হাউসের সামনে, রক থেকে উঠে-আসা ছেলেরা জামার কলার তুলে জটলা করতে করতে মেয়ে দেখে। ফুটপাতের বাজারে বেচাকেনা তো আছেই। এ-সবই অনিলের চক্ষুশূল। এখন তার ছোটার কথা; কিন্তু এমনই এলোমেলো ভিড় যে, সে দ্রুত হাঁটতে অব্দি পারছে না।

ভিতর থেকে চটপট একটা রাগ উঠে এলো মাথায়। আর পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে বাসে উঠতে না পারলে সময়মতো অফিসে পেঁছুনো অসম্ভব।

ঠিক দশটায় তাদের পাঁচজনের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ঘরে ঢোকার কথা ; হার্ড-শিপ অ্যালাউন্স নিয়ে নয় ; অনিল ভাবছিল, এই প্রথম হয়তো সে এম. ডি'র সঙ্গে কথা বলতে পারবে। মুখচেনা থাকার সুবিধে অনেক। সুযোগ পেলে এরপর সে কি আর একা-একাই দেখা করতে পারবে না!

ইত্যাদি চিন্তায় ব্যস্ত অনিল ভিড় ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ দেখল চাকা ঘষটাতে ঘষটাতে এগিয়ে আসছে পাঁচ নম্বর—একটু জোরে হাঁটলে বাসটা স্টপে পেঁছুনোর সঙ্গে সঙ্গে চট করে উঠে পড়তে পারবে সে। বলতে গেলে এখান থেকেই বাসটা এক্সপ্রেস-এর স্পীডে ছুটবে। আর মিনিট কুড়ি। পেঁছে যাবেই।

হাঁটতে গিয়ে ছুটতে শুরু করিল অনিল। ঠিক এই সময়—বাস ও তার মধ্যে দূরত্ব যখন ন্যূনতম, হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারে বাসের হ্যাণ্ডেল—সেই শিশুকণ্ঠের আর্তনাদ কানে এলো।

'উঃ, বাবা গো!'

'কী হলো। দেখি—'

'ওই লোকটা আমার পা মাড়িয়ে দিল—'

লাফিয়ে উঠতে গিয়েও এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল অনিল। ছ' সাত বছরের একটি শিশু তর্জনী উদ্যত করে আছে তার দিকে। কোমর থেকে ওপরের শরীর হেলে পড়েছে মাটির দিকে, ভাঙাচোরা ক্ষতিগ্রস্ত মুখ ; টলটলে দু'টি চোখ ভরে উঠেছে জলে। শিশুটির পার্শ্ববর্তী ভদ্রলোক প্রায় উবু হয়ে বসে পড়েছে ফুটপাথে। সম্ভবত ওই লোকটিই শিশুটির বাবা।

'ইস্, রক্ত বেরুচ্ছে যে!'

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকের সঙ্গে চোখাচোখি হলো অনিলের। এক কানে এই কথা, অন্য কানে বাসের ঘণ্টি ও হতবুদ্ধি ভিড়ের শব্দ, সুতরাং অনিল আর দাঁড়াল না। এ-বাসটি তার পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান। কোনো-মতেই এটা মিস করা যায় না।

বাসটা সম্ভবত অনিলের জন্যই অপেক্ষা করছিল। ডান পা-টা কোনো-রকমে ফুটবোর্ডে তুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিল।

এক পা ফুটবোর্ডে, এক হাতে হ্যাণ্ডেল ধরা ; অনিল তাকিয়ে থাকল পিছনের দিকে। এইমাত্র একটা ঘটনা ঘটে গেছে সেখানে। অন্তত আরো একটা স্টপ পেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত পিছনের দৃশ্য পরিষ্কার লেগে থাকল তার চোখে। যতদূর বোঝা যায়, সেখানে এখন একটা ছোটোখাটো ভিড় জমে উঠেছে, কারণ আশেপাশের অন্য জায়গাগুলো খালি লাগছে। একটি

শিশুকণ্ঠের অস্পষ্ট কান্নাও কি ভেসে আসছে দূর থেকে! এত শব্দ চারিদিকে, এত ভিড় যে এ-সবের মধ্যে ঠিক বেহালায় ছড় টানার মতো নিঃসঙ্গ কোনো সুর ধরা পড়ছে না। কোন হাত তুলেছিল শিশুটি—বাঁ হাত, না ডান হাত! যে-হাতই হোক, অনিল অনুভব করল, তার বুকের ঠিক মধ্যিখানে শ্বেতীর মতো একটা দাগ ফুটে উঠছে আস্তে আস্তে। বেশ অস্বস্তি বোধ করল অনিল। বাস-ভর্তি মানুষের গায়ের ঘাম ও ব্যস্ততার মিশ্র গন্ধ ছাপিয়ে শিশুরক্তের কাঁচা গন্ধে নাক ভরে গেল তার। পরের স্টপে বাস পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই এক সঙ্গে অনেকগুলি লোক ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর—কী মশাই, সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছেন! অনিল সাধারণত এসব মন্তব্য হজম করে না। আজ চুপ করে থাকল। গা-ঠেসাঠেসি ভিড় ও গুঁতোগুঁতির মধ্যে সেঁধিয়ে যেতে-যেতে সে ঠিক বুঝতে পারল না, এত তাড়াহুড়ো করে অফিসে যাওয়া সত্যিই তার পক্ষে জরুরী ছিল কিনা।

বাঁ পা-টা কিছুক্ষণ থেকেই ভারী লাগছিল। বাস থেকে নেমে হাঁটতে গিয়ে টের পেল ডান পায়ের সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না। জুতোটা প্রায় নতুন হলেও ফোস্কা পড়ার দিন পেরিয়ে এসেছে, এখন আর মশমশ শব্দ হয় না। গোড়ালির ওপরে অনেকটা পর্যন্ত নায়লনের মোজায় ঢাকা। সে-জন্যে নয়। এমনও হতে পারে, সোল-এর নীচে কিছু একটা আটকে গেছে, পাতা-কুটো বা গোবরের চাঙ—এ-রকম প্রায়ই হয়। ফুটপাথের একদিকে সরে গিয়ে ঝুঁকে বাঁ পায়ের জুতোর সোলটা দেখে নিল অনিল। না, কিছু নেই। শুধু সামনের দিকে কতকটা জায়গায় ভিজে গেরিমাটির মতো কিছু লেগে আছে বিক্ষিপ্তভাবে। অনিল এগিয়ে গেল। ঠিক মাটিই তো?

ঠিক দশটায় পাঁচজন যাবে এম-ডির কাছে ডেপুটেশনে। অনিলের দেরী হয়ে গেল।

'একটা দিনও মশাই ঠিক সময়ে আসতে পারেন না!'

কথাটা সত্যি নয়। অনিল প্রায় রোজই ঠিক সময়ে আসে। এ-সব ব্যাপারে সে অত্যন্ত ডিসিপ্লিন্‌ড ও রুটিন-নির্ভর, কাজকর্মে চটপটে ও দায়িত্ববান। সে জানে, দক্ষতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার নিজের স্বার্থ, না হলে চাকরি করে এই বাজারে সে দু'কাঠা জমি কেনার কথা ভাবতে পারত না। হোক না বারুইপুরে—কলকাতা থেকে দূরে, নিজের জমি তো!

গলা শুনেই অনিলের ধারণা হলো ইউনিয়নের সেক্রেটারি জ্যোতি দাশ তাকে সহ্য করতে পারে না। জ্যোতির ইচ্ছে ছিল না অনিলও যায় ডেপুটেশনে। কাজ হাসিল করতে বেশ কায়দা করতে হয়েছে তাকে। অনিল

প্রায়ই লোকটির ওপর প্রতিশোধ নেবার কথা ভাবে। আজ জোর পেল না। সংকুচিতভাবে বলল, 'একটু পার্সোনাল কাজে আটকে পড়েছিলাম—'

'সে তো বুঝতেই পারছি। অতো পার্সোনাল কাজ থাকলে সকলের ইণ্টারেস্ট দেখা যায় না।'

পঞ্চম ব্যক্তি হয়ে এম-ডির ঘরে ঢুকল অনিল, অন্যদের পিছনে পিছনে। বসতে বলে এম-ডি প্রথমেই ঘড়ি দেখলেন। 'স্যরি স্যার', জ্যোতি বলল, 'আমরা একটু দেরী করে ফেলেছি। বলে অনিলের দিকে তাকাল। অনিল তখনই ডুবে গেল—বাঁ পা-টা নিয়ে কিছুক্ষণ ধরেই অস্বস্তিতে ভুগছে সে। যতবার পা রাখছে মাটিতে, ততবারই মনে হচ্ছে কার্পেটটা অসমান। ভুল হলো, তখনই ফুটপাথের কানায় জুতো ঘষে মাটি তুলে ফেলা উচিত ছিল। ওগুলো মাটিই তো! তখন ঠিক দেখেছিল তো! পরবর্তী কী একটা কথায় ম্যানেজিং ডিরেক্টার উষ্মা প্রকাশ করতেই মাথার ভিতর গুলিয়ে গেল সব কিছু। শিশুহাতের একটা তর্জনী উঠে এলো বুকের কাছে—ওই লোকটা আমার পা মাড়িয়ে দিল! আকস্মিক শীতে জমে গেল অনিল। ওই লোকটা মানে কোন লোকটা! শিশু, তুমি কি ঠিক জানো, যার দিকে তর্জনী উদ্যত করেছ, তোমার অভিযোগ ঠিক তার প্রতিই! ওই ভিড় ও ব্যস্ততার মধ্যে অতখানি নির্দিষ্ট হওয়া কি ভালো।

'কাজের মধ্যে শুধু পা ঝাড়া।' বেরিয়ে এসে প্রকাশ্যে বিরক্ত হলো জ্যোতি, এ-সব মীটিংয়ে কেন আসতে চান বলুন তো! এর চেয়ে শিবদাসকে নিলে কাজ হতো। আরগু্য করতে পারে—দু'চারটে কথা বলতে পারে —'

অনিলের হঠাৎ জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলো এম-ডি কি বললেন? অ্যালা-উন্সটা পাওয়া যাচ্ছে তো? তবু চেপে গেল. প্রকাশ্যে খিস্তিও তেমন নাড়াতে পারল না। এ সমস্তই তাকে নিয়ে। বস্তুত, সে কিছুই শোনেনি। তার যাওয়া উচিত হয়নি। এমনও হতে পারে, তার অমন নিশ্চেষ্ট বসে থাকা এম-ডিও ভালো চোখে দেখেননি।

অনিল খুব দমে গেল। যে-জন্যে এতো তাড়াহুড়ো করে আসা. সেটাই ব্যর্থ হলো, মাঝখান থেকে সহকর্মীদের কাছে কিঞ্চিৎ অপ্রিয় হতে হলো তাকে।

এমন হবে ভাবা যায়নি। কথাবার্তা সে বেশ গুছিয়ে বলতে পারে, প্রয়োজনে ইংরিজীতেও। জ্যোতি দাশের আপত্তি সত্ত্বেও তারক, ভবানীরা তাই তার নাম সাজেস্ট করেছিল। গত জানুয়ারীতে স্টোরস সেকসনের

তপেন মুখার্জিকে নিয়ে একটা ঝামেলা হয়—প্রায়ই কামাই করত ছেলেটা, অসুখে ভুগত। ওকে ছাঁটাই করার কথা উঠতেই হই-চই পড়ে গেল অফিসে। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার জিজ্ঞেস করেছিল, 'এতো লোকের অসুখ হয় না, ওরই বা হয় কেন!' প্রশ্নটায় সকলেই হকচকিয়ে যায়। অনিল বলেছিল, 'আপনার যদি হঠাৎ অ্যাক্সিডেন্ট হয়, অন্য লোকেরও কি হবে স্যার! দিস ইজ অ্যাবসার্ড।' অফিসার আর কিছু বলতে পারেনি। দু'মাসের স্পেশাল লিভ নিয়ে তপেনকে ভালোভাবে চিকিৎসা করাতে বলা হলো। তখন থেকেই ওরা অনিলকে সমীহ করতে শুরু করে।

ভাবনাগুলো এলোমেলো হয়ে ঘুরতে থাকল মাথায়। ড্রয়ার থেকে রাফ প্যাড বের করে হিজিবিজি ছবি আঁকতে শুরু করল অনিল। এটা তার অভ্যাস। তবু সহজ হতে পারল না। বস্তুত, তার রাগ হচ্ছিল নিজের পায়ের ওপর—বাঁ পা-টা ক্রমাগত অস্বস্তি সৃষ্টি করে যাচ্ছে। এ-রকম কখনো হয় না। অথচ ব্যাপারটাই এমন যে কাউকে বলা যাবে না, শুধুমাত্র এই কারণেই এম-ডির সামনে সে সুবিধে করতে পারেনি। নিষ্ক্রিয় বসে থাকতে থাকতে সেই একই রকম অনুভূতি ফিরে এলো তার মনে—'ওই লোকটা আমার পা মাড়িয়ে দিল—'

অস্বস্তিতে আশেপাশে তাকাল অনিল। খুশি খুশি মুখগুলি দেখেই বোঝা যাচ্ছে ডেপুটেশন একেবারে ব্যর্থ হয়নি। সেটাই ছিল মূল বিষয়; সম্ভবত সেইজন্যেই তার ব্যর্থতা নিয়ে আপাতত কেউ তেমন মাথা ঘামাবে না। ব্যাপারটা এইরকমভাবেও ভাবা যায়—সে যেখানে ছিল, সেখান থেকে একটু পিছিয়ে পড়েছে, অন্যরা এগিয়ে গেছে একটু। ডেপুটেশনে যাবার মতলব না থাকলে সেও ওদের সঙ্গে এগুতো। আর কিছু না হোক, সে-ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করতে হতো না; হয়তো—হয়তো কেন, নিশ্চিত—শিশুটির পা মাড়িয়ে দেওয়ার দায় থেকে অব্যাহতি পেত সে।

হঠাৎ ভাবনার হাড় পাঁজরায় শীত ঢুকে গেল অনিলের। বাঁ পায়ে জোর দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। মনে হচ্ছে মোজার আড়ালে কুলকুল করে ঘামছে বাঁ পায়ের চেটোটা—চটচটে কী একটা লেগে আছে পায়ের তলায়। অনিল ভাবল, জুতো মোজা খুলে একবার পরীক্ষা করে নেয়। যুৎ পেল না। উল্টোদিকের সারিতে তিন-চারটে সিট বাদ দিয়ে রতন হাজরা বসে, অনিলের সঙ্গে চোখাচোখি হতে হাসল অল্প। রতনের বয়স কম, খেলার জন্যে এ অফিসে চাকরি পেয়েছিল।

পা-টা টেবিলের তলা থেকে টেনে রতনের দিকে এগিয়ে গেল অনিল।

'সিগারেট খাবে নাকি একটা ?'

রতন মাথা নাড়ল।

'জানেন তো, খাই না। আজ আবার খেলা আছে—'

প্যাকেট বের করে অনিল নিজে একটা ধরিয়ে নিল।

'এরিয়ান্সের সঙ্গে, না ?'

'হ্যাঁ।'

ধোঁয়া গিলতে যতোটা সময় লাগে তার মধ্যেই একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুল অনিল। চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

'তুমি তো ফুটবল খেলো। বুট পায়ে যদি কারুর পা মাড়িয়ে দাও, খুব কি লাগে ?'

'খেলতে গেলে একটু-আধটু লাগেই। অতো আর কে ভাবছে !'

'সে-কথা বলছি না।' সোজাসুজি রতনের মুখের দিকে তাকাল অনিল। পরের কথাটা গুছিয়ে নিল। 'ধরো যদি খালি পা হয় ? আমি জুতোসুদ্ধ পায়ের ওয়েট জানতে চাইছি।'

রতন হাসল। ঈষৎ ভুরুও কোঁচকালো।

'কী ব্যাপার বলুন তো ! হঠাৎ এ-সব জানতে চাইছেন ?'

'আস্তে, আস্তে—।' বিব্রত গলায় বলল অনিল, 'এমনিই জানতে চাইছিলাম।'

আর এগুলো না। রতন তখনো তাকিয়ে আছে দেখে মুখে হাসি টেনে অনিল বলল, 'বড়ো টীমের সঙ্গে খেলা থাকলে ব'লো, একদিন তোমার খেলা দেখতে যাব।'

সিটে ফিরে ডান পা দিয়ে বাঁ পা-টা মাড়িয়ে ধরল অনিল। কোনো যন্ত্রণাই টের পেল না। তখন ভাবল, খালি পা হলেই বা এমন আর কি লাগত ! ইনস্ট্যান্ট প্রেসার অনেক সময়েই আঁচড় কাটে না। ছেলেবেলায় সরস্বতী ভাসান দিতে যাবার সময় রিক্সার চাকা গড়িয়ে গিয়েছিল তার পায়ের ওপর দিয়ে—খুব কি লেগেছিল ! একটু চিনচিন করেছিল মাত্র।

আজ সে যখন বাস ধরবার জন্য ছুটতে শুরু করে, তখন সে একা ছিল না—এই সময় কম করে বিশজনকে ডিঙিয়ে যায় সে। এদের কাউকে কাউকে ধাক্কা দিয়েছিল ; এদের কেউই শিশু নয়। একটা বাচ্চা ছেলে সামনে পড়ে গেলে সে নিশ্চয়ই সাবধান হতো, গতি কমাতো বা এমনভাবে এড়িয়ে যেত যাতে বাচ্চাটার চোট না লাগে। ছেলেটিকে সে দেখতে পায় গলার স্বর শুনে এবং পিছনে তাকিয়ে। এমনও হতে পারে, মুখোমুখি দাঁড়ানোর

ফলেই শিশুটির হাত উঠে আসে তার দিকে। আর কেউ তাকালে, যে তাকাত তার দিকেই উঠত। শিশুটি নিশ্চয়ই আগে থেকেই তার প্রতি লক্ষ রাখেনি!

এইভাবে ঘটনাগুলো সাজিয়ে নিল অনিল। নিজেকেও।

একটু আশ্বস্ত হলেও তার পরের অনেকটা সময় সে কোনও কাজ করতে পারল না। কাগজে হিজিবিজি কাটল. নানারকম মুখ আঁকল—শীলার মুখ, আট বছরের ছেলে সেন্টুর হাত ধরে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছে ভিড়ের মধ্য দিয়ে—এ-রকম একটা ছবিও এঁকে ফেলল। চারটে নাগাদ তার মনে হলো জ্বর আসছে; মুখের ভিতর জিভটা জল নিঙড়ানো গরম তুলোর মতো ঘন হয়ে উঠছে ক্রমশ। কিছুক্ষণ শান্তভাবে বসে থেকে ড্রয়ারে চাবি দিয়ে উঠে পড়ল সে। ক্লান্ত ও অস্বস্তিকর পা টেনে টেনে অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে তারকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'উঠবে নাকি? আমি চলে যাচ্ছি—'

'এত তাড়াতাড়ি!'

'শরীরটা ভালো নেই। জ্বর আসছে—'

তারক ওর কব্জিটা ধরে তাপ দেখল। মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, সকালে এমন হলো, এখন আবার জ্বর!'

'যাবে তো' চলো।'

তারক একটু ভাবল। তারপর বড় লেজারটা বন্ধ করতে করতে বলল, 'চলো।'

বেশ কিছুটা চুপচাপ হাঁটল দু'জনে। ছুটির পর সাধারণত তারা বাসে ওঠে। আজ নিজেই ট্রাম স্টপের দিকে এগিয়ে গেল অনিল। অপেক্ষা করতে করতে তারককে বলল, 'সকালে একটা অ্যাক্সিডেন্ট দেখলাম। মনটা বড়োই খারাপ হয়ে গেছে।'

'কী-রকম!'

ঘটনাটা বর্ণনা করার আগে অনিল একটু সময় নিল। শিশুটির তর্জনীর দিকে তাকিয়ে যেমন হয়েছিল, সেইরকম কাঠ-কাঠ হয়ে এলো শরীর।

'বাসে উঠতে গিয়ে একটা লোক একটা বাচ্চার পা মাড়িয়ে দিল। বাচ্চাটার বোধ হয় খুবই লেগেছে। রক্ত বেরিয়ে গিয়েছিল—'

'বলো কী! ইস্! কতো বড় বাচ্চা?'

'কতো আর। পাঁচ ছ' বছরের হবে। লোকটা দাঁড়ায় নি, বোধহয়

বুঝতে পারেনি। বাসে উঠেই চলে গেল।'

এই পর্যন্ত বলে একটা নিঃশ্বাস চাপল অনিল এবং তারক কী বলে শোনার জন্যে স্নায়ুগুলো একাগ্র করে আনল। একটা ট্রাম আসছিল। অনিলের মনে হলো ট্রামটাকে পুরোপুরি দেখতে পাচ্ছে না। ঝাপসা মতো—শুধু চাকার বিচিত্র ধাতব গুরগুরে শব্দটা কানে আসছে। আরো কাছে আসতে সে ট্রামটাকে লাইনচ্যুত হতে দেখল। তারকের হাতটা খপ করে মুঠোয় ধরে ও বলল, 'এটা নয়, পরেরটা—

'সংসারে এমন কিছু বদ লোক থাকে, যাদের প্রাণে মায়াদয়া থাকে না।'

'কার কথা বলছ ?'

'তুমিই তো বললে! লোকটা দাঁড়াল না পর্যন্ত! আচ্ছা হারামজাদা তো!'

মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াল অনিল। এখন তার সতর্ক হওয়া দরকার। তারককে লক্ষ করতে করতে বলল, 'তুমি কি ঠিক বলছ? লোকটা ইচ্ছে করে মাড়ায়নি। এমনও হতে পারে ব্যাপারটা সে বুঝতেই পারেনি। তার দোষ কী!'

'রাখো রাখো। এ-সব লোককে দু' দশ ঘা দিলেই সব বুঝতে পারে।'

অনিল ঘামতে শুরু করল। মনে হলো তার শরীরের ভিতর ক্রমাগত উত্থানপতন চলছে জ্বরের, দপদপ করছে রগের শিরাগুলো এবং বাঁ পা-টা মাটি থেকে অনেক ওপরে ও হাঁটু থেকে বেশ নীচে আলগা হয়ে ঝুলে আছে। ট্রামের জন্যে তারক এগিয়ে গেলে ওর আড়ালে দু'বার পা ঠুকে নিল অনিল।

মূল ব্যাপারটা তারক নিশ্চিত বুঝতে পারেনি। রাস্তার দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক অনিল সেই শিশুটি ও তার বাবার মুখ মনে করার চেষ্টা করল, কিন্তু প্রকৃত কোনো আদল ধরা পড়ল না। এতে সে খানিকটা হাল্কা বোধ করল—যাদের মুখ তার মনে নেই, তাদের সঙ্গে ভবিষ্যতে দেখা হবারও কোনো সম্ভাবনা নেই। তারাও কি অনিলের মুখ মনে রাখবে! অসুবিধে, যে-পাড়ায় সে থাকে এবং যেখান থেকে বাসে ওঠে, সেখানে অনেকেই তাকে চেনে। তারা কি ঘটনাটা লক্ষ করেছিল?

ট্রাম থেকে নেমে পুনরায় ঘটনাস্থল মাড়িয়ে গেল অনিল। এখন ভিড় নেই, জায়গাটা খুব নোংরা হয়ে আছে। ফুটপাথে বিকেল ছড়ানো। দাড়িওলা একটা লোক ধনেশ পাখির বিদঘুটে ঠোঁটের চারিদিকে রকমারি

শিশি সাজিয়ে বসেছে, তার কোলের কাছে হলুদে ছোপ-লাগা মড়ার খুলি। খুব সতর্ক হয়ে জায়গাটার দিকে এগিয়ে গেল অনিল। সিগারেটের দোকানের লোকটির সঙ্গে এই সময় তার চোখাচোখি হলো। পকেটে সিগারেট ছিল, তবু কী ভেবে অনিল একটা সিগারেট চাইল — আগুন ধরাবার ছুতোয় দাঁড়িয়ে থাকল প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময়। তেমন কিছু ঘটে থাকলে এই লোকটি নিশ্চয়ই তার সাক্ষী থাকবে। তারপর আবার হাঁটতে হাঁটতে অনুভব করল, বাঁ পায়ের মতো তার ডান পায়েও কেমন একটা অস্বস্তি শুরু হয়েছে। সম্ভবত জ্বরের কারণে। শরীর অসুস্থ হলে এমনিতেই পায়ের জোর কমে আসে।

বাড়িতে ঢোকার আগে সিগারেটটা ফেলে দিল অনিল। দরজা খুলল ঝি। অনিল তার পিছনে সেন্টুকে দেখল এবং শীলাকে খুঁজল।

'মা রুটি কিনতে গেছে।' গায়ে-গায়ে লেগে এলো সেন্টু, 'তুমি এতো তাড়াতাড়ি এলে কেন?'

'শরীরটা ভালো নেই—'

ঘরে ঢুকে খুব মনস্কভাবে ছেলের দিকে তাকাল অনিল। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল। এখন সে পুরোপুরি জ্বর অনুভব করতে পারছে, উত্তাপ ছড়িয়ে যাচ্ছে কানে, নিঃশ্বাসও গরম। আত্মহত্যা বা খুন করা — দুটোর কোনোটাই এখন তার পক্ষে অসম্ভব নয়।

বিমূঢ়ভাবে কিছুক্ষণ বিছানায় বসে থেকে ছেলেকে কাছে টানল অনিল। কাঁধদুটো ধরল। আড়চোখে সেন্টুর পায়ের দিকে তাকিয়ে জুতোসুদ্ধ পা-টা তুলে দিল ওর নরম আঙুলের ওপর, 'স্কুলে আজ কী কী হলো বলো?' তারপর আস্তে থেকে জোরে চাপ দিতে থাকল।

কথা বলার জন্যে ঠোঁট খুলেছিল সেন্টু। অনিল দেখল প্রথমে হতচকিত, তারপর হঠাৎই শরীর দুমড়ে চিৎকার করে উঠল, 'উ-উ, লাগছে, লাগছে—'

একটুক্ষণ ছেলের বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আর্ত গলায় অনিল বলল, 'খুব লেগেছে বাবা! আমি দেখতে পাইনি—'

যুদ্ধ
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

দ্বারিকপোতার জমি বড় আশ্চর্য। পৌষধান ওঠার পর সেখানটা খা খা করে। লংকা, বরবটি, শিম কোনোটা লাগাবার উপায় নেই। কারণ, কাছাকাছি কোথাও জল নেই। উপরন্তু ছাড়া-গরুর উপদ্রব। বর্ষাকালে আরও কাহিল অবস্থা। কষ্টেসৃষ্টে ধান লাগাবার মাসখানেক পরে বৃষ্টি একটু জোর নামলেই আগাগোড়া ডুবে সমুদ্র হয়ে যাবে। জোর বাতাস উঠলে তখন ঢেউ খেলে বাদায়। হাজরা নস্কর তখন দ্বারিকপোতার লাগোয়া তাদের মিস্ত্রি-পাড়ার উঠোনে বসে ফি-বছরের মত একই ছবি দেখে। বহু খাটা-খাটুনি করে লাগানো ধানচারাগুলো সবে বলকারী হয়ে উঠেছিল। নিড়েনের সময় আসতে না আসতেই জলে ডুবে গেল। যদি এক আঙুলও বেরিয়ে থাকত—তাহলেও ধানচারাগুলো জলের ওপরের আলো খেয়ে খেয়ে বেঁচে যেত। মাসখানেক পরেও জল নামলে বিঘে চারেকের এই ভাগচাষের একটা হিল্লে হয়ে যেত। রোজ রাতে শুয়ে শুয়ে পচা ধচা গোলপাতার ছাউনির ওপর বৃষ্টির একঘেয়ে শব্দ শুনতে শুনতে ভাবে—কাল সকাল থেকে আকাশ যদি জিরেন দেয়—তবে চাইকি ক'দিনের ভেতর জল নেমে গিয়ে চাষটা বাঁচে।

কিন্তু জল নামার কোন লক্ষণই নেই। দ্বারিকপোতা এদিকে সবচেয়ে নীচু জায়গা। চারিদিককার জল এখানে এসেই নামে। তাই ডুবলে সবার আগে ডোবে। আশ্বিন মাসের শেষাশেষি বট অশ্বত্থের মরা ডালেও জল লেগে নতুন পাতা বেরোয়। তখন সারা মাঠে এমন এক আলো বেরোয় যাতে সবার মনেই আশা জাগে। কিন্তু দ্বারিকপোতায় তখনো বেশ জল থাকে।

নিকাশী খাল একটা কেটেছিল সরকার। কিন্তু ঠিকাদারগুলো জালিয়াত।

খাতায় দেখালো কয়েক লাখ মাটি ! কিন্তু আসলে দু'চারলাখের বেশী মাটি কাটালো না। কলকাতায় অফিস কাছারিতে বসে দেনা পাওনা ঠিক হয়ে গেল। হাজরার মত মানুষ মারা পড়ল।

জঙ্গল হাসিল করে এই আবাদ। কে এক দ্বারিকবাবু হাজরার জ্ঞান বয়সের অনেক অনেক আগে এখানে চাষবাসের পত্তন করেন। তাঁর নামেই জায়গার নাম। তাঁদের বংশপরম্পরায় শরিক—তস্য শরিকে ভাগ হয়ে হয়ে হাত বদলের পর এই চার পাঁচশো বিঘের মালিকানা এখন নানান টুকরোয় ছড়ানো। হাজরা জানে, মালিকানা তো পালটাবেই, জমি শুধু তার জায়গাতেই থাকে।

পৌষমাসে অন্য মাঠের চাষীরা যখন ঝুমঝুম মলের আওয়াজ তুলে শুকনো পাকা ধানের বোঝা মাথায় করে আছড়াবে বলে খামারে ফেলে—ঝরে পড়া পুষ্ট ফলধান পরের বর্ষায় বীজ করবে বলে সযত্নে তুলে রাখে—তখন হাজরা নস্কর একবেলাতেই চারবিঘের ন্যাড়ান্যাড়া কয়েক আঁটি খড় কাটতে মাঠে নামে। পোকায় কাটা সামান্য কিছু ধান জোটে। জল নামার পর যে ক'টা গোছ বেঁচে ছিল—তারই সামান্য ফসল। তারও আবার ভাগ আছে !

মালিক জলিল গাজি। তিনি ভাগ দিতে গেলেও নেবেন না। কারণ, ভাগচাষী বোর্ডে প্রমাণ করাতে চান—চাষী হাজরা নস্কর একটি অপদার্থ। চাষে মন নেই। ধান ফলে না। যেটুকু ফলে তার ভাগ দেয় না। এই বলে তিনি হাজরাকে জমি থেকে উচ্ছেদ করতে চান, করে নিজে চাষ করবেন।

হাজরা মিথ্যেবাদী নয়। যা ফলেছে তার ভাগ দিতে চায়। কিন্তু মালিক নেবে না। নতুন আইনে খুব কড়াকড়ি। ভাগের ধান মালিককে বুঝিয়ে দিয়ে যদি একখানা রসিদ পায়—তাহলে সেই রসিদের বলে ভাগচাষী হিসেবে নাম রেকর্ড করাতে পারে। তখন জমি থেকে তাকে কে সরায় ! তাহলে হাজরা নস্কর একরকম পাকাপাকি রায়ত হয়ে যায়। চাইকি কোন-দিন সরকারের ঘরে খাজনা জমা দিয়ে দাখিলা কেটে নেওয়ার অধিকারও তার ওপর বর্তাতে পারে। এমন কিছু আকাশকুসুম নয়। এমন ব্যাপার তো অনেক জায়গাতেই ঘটেছে।

তার কপাল মন্দ তাই হচ্ছেনা। হালের বলদ নেই। একটা এঁড়ে পুষছে। সেটা এখন বেশ বড় হয়েছে। তার লাগদার আরেকটা বলদ হলেই হাল জুড়তে পারে। কিন্তু তা আর হয়ে উঠছে না। হলে কিন্তু

চেয়ে চিন্তে আরও জমি যোগাড় করতে পারত। দু'টো ধান আনত ঘরে।
এভাবে দোরে দোরে জন খেটে সংসার নিয়ে খাবি খেতে হত না।

তার মালিক জলিল গাজির বয়স বেশী নয়। পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ। লোহা সিমেন্টের দোকান আছে বাজারে। রমজানের ঈদে একবার উট জবাই করেছিল। সে সময় কাঁচের প্লেট গ্লাস দপ্তরখানায় বিছিয়ে দিয়ে মেহমানদের দাওয়াত দিয়েছিল। নিজচাষে ছত্রিশ বিঘে জমি আছে। বাড়ির ভেতর একটা টিউবয়েল—বাইরে একটা টিউবয়েল। তিনটে দিঘি ছাড়াও একখানা লরি আছে। সারা বাজারের হয়ে সে-লরি মঙ্গল আর শনিতে শেয়ালদায় গস্ত করতে যায়। মণ প্রতি ভাড়া দু টাকা। নিজে পার্টি করে। ভোট এলে পাড়ায় পাড়ায় মিটিং-এ যায়। খরার সময় ঠিকেদারি নিয়ে দূরে দূরে রাস্তা বানায়। কালভার্ট বানায়।

হাজরা তার দোকানে গিয়ে অনেকক্ষণ বসে থেকে শেষে বলেছে, বাবু, অভাবী মানুষ আমি। পেটের জ্বালায় ধানটা খেয়ে ফেলব। আপনার ভাগ আপনি নিয়ে নিন—আমায় একখানা রসিদ দিন।

জলিল গাজি হাজরার চেয়ে সামান্য কিছু ছোট হবে বয়সে। হেসে বলেছে, ও ধান তুমি রাখো। আরও দু'বস্তা ধান নিয়ে গিয়ে ছেলেপুলে নিয়ে এই বর্ষাটা পেটভরে খাওয়া দাওয়া কর। গায়ে তাগদ করে আমার রাস্তার কাজে লেগে যাও। দিন গেলি চার টাকা কোমরে গুঁজে বাড়ি ফেরবা। ও জমি তুমি ছেড়ে দাও নস্কর। আমার পাম্প আছে। লোক আছে। আমি চাষ করে দু'টো ধান পাই।

হাজরা গলেনি। ভাগের ধানও ভাঙেনি। গাঁয়ের মাতব্বরদের বলেছে। অন্য সব পার্টির দাদাদের বলেছে। তাদের পরামর্শ: বিনে রসিদে ধান দিও না। দরকার হলে আমরা জে. এল. আর. ও. অফিসে যাব। গাজি তোমার জমি ছাড়াতে পারবে না।

খাবার ধান নেই। অথচ ঘরে মালিকের ভাগের ধান। ভাঙা যাবে না।

এক এঁড়েতে হাল চলে না। যতক্ষণ না আরেকটা হচ্ছে, ততক্ষণ ওকে বসিয়ে খাওয়াতে হবে।

হাজরার হাসি পায়। তার অবস্থা ঠিক দ্বারিকপোতার মত। জায়গা আছে, ফলে না। বর্ষায় সমুদ্র। খোরোকালে খটখটে ডাঙা।

এক ভরসা পুকুর ভরতি মাছ। আর খালের মোচা চিংড়ি, আর যেমন ট্যাংরা, ধানোপুঁটি, শোল, শাল, শিঙি, মাগুর, বাইন, ন্যাদোস, তাছাড়া কিছু কাঁকড়া। কখনো সখনো দু'একটা কচ্ছপ। কিন্তু তাও ভাগ্যে

নেই। তার জাল নেই। একগাছি যা আছে—তাতে লোহার কাঠি পরানো দরকার। একসঙ্গে দু'কেজি কাঠির দাম বারো টাকা, পাবে কোথায়? খালে পাটা মেরে যে মাছ ধরবে তারও উপায় নেই। অন্তত তিনখানা পাটা কিনতে একসঙ্গে তিরিশ-বত্রিশ টাকা চাই। তাতে একটা মরা মানুষের চিকিৎসা হয়ে যায়।

টিউবয়েল বসায় ঝোড়ো। তার তেমন কাজ নেই। সে একটা পরামর্শ দিল। ব্যাঙ ধরে আন, আমি কিনে নেব।

এই ফাগুন মাসে ব্যাঙ পাব কোথায়?

দেবতা চমকাবে—তারপর ব্যাঙ ধরবি—সেদিন আর নেই।

ঝোড়ো কিছু শহর ঘেঁষা লোক। রেল স্টেশনের দোকানে বসে চা গেলে। চারদিকে টিউবয়েল বসিয়ে বেড়ায়। এবার তেমন কাজ নেই। ওর কথাটা মনে লাগল। বেশ কিছুকাল এখানকার দু'চার জন ব্যাঙের আড়ত করেছে। সেখানে সকালবেলা জ্যান্ত ব্যাঙের পেছনের দু'খানা পা কেটে রেখে বাকীটা ফেলে দেওয়া হয়। তারপর ধোওয়া-ধুয়ি করে ঠ্যাংগুলো বরফচাপা দিয়ে কলকাতায় চালান যায়।

ঘরে তার মন বসে না। একদিন ভালো উপায় হলে বউ তার পান্তা, গরম, বাসী করে চালের আন্ডিল নষ্ট করবে। অথচ আয় করে পয়সা তো আর অন্য জায়গায় রাখা যায় না। মাঝের থেকে লাভ—দুটো ছেলে একটা মেয়ে মাসের মধ্যে বিশদিন কোনক্রমে একবেলা খেয়ে থাকে। গরিব ঘরে যে বুঝে চলবে তেমন বউ পায়নি হাজরা।

একই উঠোনে আর দুই ভায়ের ঘর। সে বড়। পরের ভাই বজরা কোত্থেকে ভাগিয়ে এনে বিয়ে করেছিল। সে বউ বিষ খেয়ে মরতেই আবার বিয়ে বসেছে। দিনে তাস পেটায়—রাতে তার কাটে। ছোট ভাইটা ভাল। ঘাটির সঙ্গে বিধবা মা থাকে। ঘাটির বয়স বছর ষোল। মাকে গরু দুয়ে দেয়—মা দুধ বেচে। ঘাটি নিজে তিনটে তালগাছ কাটে। তার রস বিক্রি হয়, গুড় হয়। নিজে তাড়ি করে খায়—দাদাদের দেয়। মরসুমে খেজুর-গাছও কাটে। হাজরাও দুটো তালগাছ কাটে। গাঁয়ের মাথায় বর্ষাকালের মেঘ ঝুলে পড়লে সব ভাই ঘরে ফিরে আসে। যে-যার বারান্দায় বসে তখন কথা বলে। সুখ দুঃখের, ঝগড়ার—। কখনো নিন্দের। কদাচিৎ প্রশংসার।

এইভাবে থানা রায়পুর, গ্রাম মিস্ত্রীপাড়া, রেলস্টেশন বন্দীপুর, ব্লক দেকাঠির ৺খগেন নস্করের তিন ছেলের জীবন কেটে যাচ্ছিল। তার ভেতর হাজরা নস্কর নতুন কাজে নেমে জীবনে প্রথম পয়সার মুখ দেখলো। যার

জীবনে কোনদিন হাসি ছিল না — সে এখন দুপুরে ঘুমোয়। সন্ধ্যের ঘোরে তালগাছের মোচ কেটে কলসী বসায়। সারাদিনের জমানো তাড়িটুকু নামিয়ে উঠোনের দিকে তাকিয়ে বসে চুক চুক করে খায়। ক'গ্লাসের পর ঘরের ভেতর তাকিয়ে বউকে হাঁক পাড়ে। বেস্পতি। যন্তর দে—

খুব সাধারণ জিনিসের যন্তর। একখানা ভালো কঞ্চির শক্ত ছিপ। তাতে আড় বঁড়শি লাগানো। কাপড়ের দোকান থেকে আনা একটা পলিথিনের মোড়ক। নারকেল মালা চাপা দেওয়া একটা গুড়ের কলসী। হ্যারিকেন একটা। আরেকখানা দা। ট্রেনে ফিরি হয়—আগুন ধরানোর ছ'আনা দামের পাথর। বিড়ির কৌটো। ব্যাস!

বেস্পতি সুশ্নি শাকের তরকারি করেছিল। সঙ্গে নুন আর ভাত। ডাবা হাঁড়িতে হাত ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে খেয়ে নিচ্ছিল হাজরা। সন্ধ্যে রাতেই রেল লাইন ধরে বেরিয়ে পড়তে পারলে অনেকটা পথ কাবার করা যাবে। এখনো তো টোপই যোগাড় হয়নি। অবিশ্যি সেজন্য কোন ভাবনা নেই। এই বন্দীপুর স্টেশনের বাজার এলাকায় যে-দোকানেই যাবে—দোকানদার নিজেই তাকে খাতির করে গোলার ঘর খুলে দেবে। হাজরা তখন আলুর বস্তা হোক, মসল্লার গুদাম হোক কিংবা কেরোসিনের আড়ত হোক—হামা দিয়ে অন্ধকারে ঢুকে যাবে। তারপর যেখানে যত আরশোলা পাবে কপাকপ ধরবে আর পলিথিনের ব্যাগে পুরবে। এই হল তার ব্যাঙ ধরার টোপ। দোকানদাররা খুশী। আরশোলা কোতলের এমন মাগনা যন্ত্র কোথায় পাবে?

ব্যাঙধরা বড় নেশা। বলা ভাল পয়সার নেশা। টপাটপ ধরে কলসী বোঝাই করে ভোর ভোর ফিরতে পারলে চাই কি বারো চোদ্দ টাকাও রাত ফুরোলে রোজগার হয়। সাহেব মেমেদের ঘেন্না পিত্তি নেই। এমন বন বাদাড়ের জিনিসও খায় কে জানতো! আর কেজি পিছু দরও চড়ছে রোজ রোজ। ব্যাঙ নাকি ফুরিয়ে যাচ্ছে—তাই।

এ তাড়াহুড়োর কাজ নয়। ঘাসের ওপর দিয়ে পা টিপে টিপে এসেছিল হাজরা। লালাজির ইঁটখোলা পার হলেই রেল লাইনের দু'ধারে শুধু অন্ধকার। তখন হ্যারিকেনটা উসকে নিল। জোলো ঘাসের আড়ালে আড়ালে গর্ত করে ব্যাঙ বাসা করে থাকে। মেঘ ডাকলে তবে জানান দেয়। নয়ত নয়। রাত বাড়লে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় বেরোবে। কতরকমের খুচরো সব পোকা থাকে ঘাসে। সেগুলো থপ থপ করে খুঁজে বেড়াবে। নয়ত ঘাপটি মেরে বসে থাকবে।

যত রাত বাড়ে সংসার তার কাছে তত পরিষ্কার লাগে। গাঁ গঞ্জের

মানুষজন সন্ধ্যের পর বিশেষ জেগে থাকে না। ওঠে ভোর ভোর। এক এক তল্লাট তখন তার জন্য ছবির মত পড়ে থাকে। সে ব্যাঙ ধরতে বেরিয়ে হ্যারিকেন তুলে তুলে সেসব জায়গা দেখে। গোলাবাড়ি। পুকুর ঘাট। কলাবাগান। উঠোন। ধানের গাদা। পোকাপড়া গাই অন্ধকার আকাশের নীচে একঠায় দাঁড়িয়ে অনবরত লেজের ঝাপটায় মশা তাড়াচ্ছে। তার এইসব দেখার সময় অন্য কেউ থাকে না। দিনের বেলা ট্রেনে যাওয়ার সময় এসব জায়গা চোখে পড়েছে—কিন্তু তখন এখনকার মত তন্ন তন্ন করে করে দেখা হয়নি।

কালকেপুরের রেলপুকুর পেরিয়ে টিনের চালতোলা ঘর পড়ল পথে। গোয়াল ঘরের বাইরে দু'জোড়া হাল জোয়াল। নিশ্চয় ষোল ষোল খেই বত্রিশ বিঘের চাষ। পরিশ্রমী চাষী একখানা হালে এক মরসুমে ষোল বিঘে জমি কাড়ায় নিশ্চয়। এখন ধানের দর ভাল যাচ্ছে। ভাগের ধানটা বেচে দিয়ে একটা তাগড়াই এঁড়ে বাছুর কেনা যেত। কিন্তু জলিল গাজি তাকে ঝুলিয়ে রেখেছে।

স্কুলবাড়ি মন্দির কামারশালা ক্লাবঘর—কত যে সে এই ক'মাস দেখল। দিনের বেলায় এমন নির্বিঘ্নে দেখা যায় না। এখন বেশ পরিষ্কার সব দেখা যায়। সে চোর নয়। হাতের হ্যারিকেনে আলো জ্বলে। ডাকাত নয়। সঙ্গে সম্বল একখানা হাত-দা মাত্র।

হাজরা রোজ নিশুতি রাতে সারা পৃথিবীর একটা আন্দাজ পায়। তখন তার দেখে বেড়ানোর পথে কোন বাধা নেই। ইঁটখোলা ছাড়িয়ে ভিমরুলতলা। এখানে নাকি বিরাট ভিমরুলের চাক ছিল এই বট গাছে। তিনজন সাহেব রেললাইন বসাতে এসে বাবা পঞ্চাননের দাস ভিমরুলের দঙ্গলকে ক্ষেপিয়েছিল। তখনকার সাহেবরা নাকি ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াত। ঘোড়া ছুটিয়েও পার পায়নি সাহেবরা। ভিমরুলের কামড়ে জ্বর—শেষে ভুল বকে মরে যাওয়ার দশা। ইংরেজের রেল কোম্পানি পঞ্চাননতলায় পুজো দিয়ে তবে রেল লাইন বসাতে পেরেছিল। এসব কথা এখানকার সবাই জানে। সে-ভিমরুলের চাক এতদিন থাকার কথা নয়। বটগাছটা পড়ে আছে। সামনেই সাহেবপুরের মাঠ।

হ্যারিকেনটা লেজের মত ঝুলিয়ে হাঁটতে হচ্ছিল। কাদায় মাটি ওগলানো জায়গা দেখলেই হাজরা দাঁড়িয়ে পড়ে। মাটির চেহারা সাবুদানার মত হলে বুঝতে হবে—এসব গনি কেঁচোর কাণ্ড। মাছের টোপে এই কেঁচো কেটে কেটে বঁড়শিতে গেঁথে দিতে পারলে মৃগেল ধরা দেবেই।

আউলিয়াপুরের মোড়লদের বড়দীঘির বকচরে অনেক কলাগাছ। বেশী রাতে জ্যোৎস্না বেরিয়েছে ফুটফুটে। সঙ্গে দক্ষিণে বাতাস। সে-বাতাসে কলাপাতার বেশির ভাগই ছিঁড়ে ফালি ফালি হয়ে যাচ্ছিল। বাঁধানো ঘাট। তাতে তিজেল হাঁড়ি গোটা দুই ডোবানো। অনন্ত মোড়লের সংসার বিরাট। দু'পক্ষের হিসেব ধরলে কম করেও জনা তিরিশেক লোক। কলাগাছের শুকনো বাসনা সরিয়ে হ্যারিকেন নামালো। গর্তের চেহারাটা চেনা চেনা। এরকম জায়গাতেই ব্যাঙ থাকে। ভাগ্য ভাল হলে এক সঙ্গে দু'তিনটেও বেরিয়ে পড়ে। কাঁধের ছিপটা নামিয়ে কোমরের ব্যাগ থেকে একটা বড় সাইজের আরশোলা তুলে নিয়ে গেঁথে ফেলল। তার পর ঠিক আন্দাজ মত গর্তের মুখে ছেড়ে দিতেই যখম আরশোলাটা গর্ত পেয়ে পাতালের ভেতর নেমে গেল। সময়টা বড় সুন্দর। এমন মিহি বাতাস। এমন খুনখুনে জ্যোৎস্না। শুধু মোড়লদের কুকুরটা যা-কিছু চেঁচাচ্ছে। আরশোলাটা এখন অনেকক্ষণ ধরে মাটির ভেতরের অন্ধকার গর্তে মাথা খুঁড়বে। তারপর একসময় এ-গলি সে-গলি করে আসল গর্তে গিয়ে পড়বে। সেখানে ছানা পোনা নিয়ে ব্যাঙের সংসার।

বাইরে মাটির ওপরে মোড়লদের গোয়ালঘরে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। মাঝে মাঝেই দড়িবাধা গরু কান লটপট করে মশা তাড়াচ্ছিল। উত্তরদিকে ঢেঁকিঘর। তার পাশেই ধানের গোলা। গোলার মাথায় টিনের পরী এক পা শূন্যে তুলে উত্তরে উড়ে চলেছে। কাল কোনো ব্রত ছিল বাড়ির মেয়েদের। উঠোনের কোণে মাটির ঘট, তাতে জল, জলে টগর ফুল ডোবানো। উঠোনের মাটি খুবলে দুধ ঢালা হয়েছিল বোধহয়। এ-বাড়িতে কোন আইবুড়ো মেয়ে আছে নিশ্চয়। অনন্ত মোড়লের প্রথম পক্ষের বড় নাতনী নয়ত? হাজরা মনে মনে একটা অঙ্ক কষে দেখল। হ্যাঁ। এতদিনে বিয়ের যুগ্যি হয়েছে। হাজরা তাকে একসময় খুকিটি দেখেছে।

এখান থেকে বাদার ভেতর দিয়ে সোজা হেঁটে গিয়ে পিচ রাস্তায় পড়লে দশঘরা গ্রাম। এপথে সোজা গেলে একঘর ব্রাহ্মণ, তিনঘর কায়স্থ, ষোলঘর মোড়লের বসতবাড়ি পড়বে। এর ভেতর অনন্ত মোড়লের কলাবাগানই সবচেয়ে পর্যাপ্ত। অনন্তর মত ভাল চাষীও এদিকটায় কম। গোড়ায় অনন্তর জমি জায়গা, হালবলদ কিছুই ছিল না। এখন আস্তে আস্তে তার সংসারটা ষোলকলায় ফুলে ফেঁপে উঠেছে।

আরশোলাটা অনেকক্ষণ পাতালে গেছে। এখনো ওপরে ওঠার নাম নেই।

মাটির দেওয়ালের গায়ে হাল জোয়াল, হাতমই ঠেসান দিয়ে দাঁড় করানো। মোটা মোটা বাবলা গাছ কেটে নিয়ে হালের কাঠ তৈরি করেছে অনন্ত। এখানকার কামারশালার তৈরি বড় একখানা ফলা হাজরা দেখল—অনন্ত মোড়ল খুলে রেখেছে। আগে তো চোখে পড়েনি। হয়ত গরু জখম হচ্ছে ফলার দোষে—তাই খুলেছে অনন্ত কামারশালায় পাঠাবে।

যদি ভাই দু'টো তার কথা শুনতো—তাহলে দাঁতে কামড় দিয়ে একবার চাষ করে দেখত হাজরা। তার সংসারও ফুলে ফেঁপে উঠতে পারত। এই বেশ ভাল। বেঁচে থাক ব্যাঙ। রোদে বেরোতে হয় না। রাতে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় কাজ। ভাত খেয়ে সারাদিন গড়াও। এ হল গিয়ে ব্যবসা। নিজের মালিক নিজে।

এই সময়টা তার বড় ভাল লাগে। এখন সে কত দেশ দেখতে পায়। এক একদিন কত দূরে দূরে চলে যায় ব্যাঙের খোঁজে। একবার ব্রহ্মডাঙায় গিয়ে চোর বলে ধরা পড়ছিল; ভাগ্য ভাল সে-গাঁয়ে হারান রায়ের বড় খুকির বিয়ে হয়েছিল। সে বেরিয়ে এসে হাজরাকে দেখিয়ে বলেছিল, আমার বাপের বাড়ির দেশের লোক। মেরো না বলছি—

এখন তার মন বলে, সব দেশে এমন চেনা জানা মানুষ আছে তার। এই পৃথিবীটাই তো তার চেনা হয়ে গেল এই ক'মাসে। বড় বড় মাঠের ভেতর দিয়ে নিশুতি রাতে ব্যাঙের লোভে লোভে ঘুরতে গিয়ে কত জিনিস যে সে দেখছে। দিনের বেলায় যেসব জিনিস খুব জরুরী মনে হবে—রাতের বেলায় তা কেমন অর্থহীন হয়ে পড়ে। এক একজন নিজের নিজের জমির আল দিয়েছে। তাতে ঢোল কলমির ডাল বসানো। মাথার ওপর চাঁদ, তারা চোখ মেলে সব দেখে যাচ্ছে। সেখানে দখল রাখা এই আল-চিহ্ন কিংবা ঢোল কলমি বসিয়ে নিরিখ ঠিক রাখার চেষ্টা নেহাত খোকাপনা। রাতে না ঘুরলে এসব কোনদিন টের সে পেত না।

আজ অনন্তর বাড়ি খুব খাওয়া দাওয়া হয়েছে। জ্যোৎস্নার ভেতর বসে একজোড়া ধাড়ি বিড়াল কুচুর কুচুর করে এঁটোকাঁটা খেয়েই চলেছে। বঁড়শিতে টান পড়তেই হাজরা সাবধান হয়ে গেল। গেঁথে গেলে ব্যাঙ ঠিক ওপরে উঠে আসবে। এলো তাই। আস্তে ছিপ সুদ্ধু উঁচু করে ব্যাঙটাকে শূন্যে তুলল। প্রায় হাফ কেজি হবে। তারপর আলগোছে বঁড়শি ছাড়িয়ে ব্যাঙটাকে চিৎ করে রেখে দিল। কালচে চামড়ার ওপর আধো অন্ধকারে মুখের কাছে আরও কালো রং বেরিয়ে এসে লেগে গেল।

আরে-শ্বাস। আরও একটা বড় ব্যাঙ তড়াক করে গর্ত থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল। এ কি ভাগ্য। কাল বন্দীপুর স্টেশনের লেভেল ক্রসিং-এ সবাই দেখতে পাবে—দুলে দুলে একটা লোক পুবের রেল লাইন ধরে এগিয়ে আসছে। গালে দাড়ি। কাঁধে ছিপ। ডান হাতে দা। কোমরে কলসী—পলিথিনের ব্যাগ। বাঁ হাতে নেভানো হ্যারিকেন। মুখ দেখলেই বোঝা যাবে—এ দিনের বেলার লোক নয়। চোখের নীচে কালি। মুখ ভরতি হাসি। তখন হাজরা রেলের পথটি ধরে দুলে দুলে আসবে বন্দীপুর বাজারে। পঞ্চাননের ব্যাঙ আড়তে। সেখানে সোনা ও কোলা ব্যাঙ—উভয় প্রকারই ক্রয় করা হয়। ঝোড়ো তার সাইনবোর্ডে সবই লিখে দিয়েছে। সন্ধ্যে হলে তাতে ডুম জ্বলে। নেভে। জ্বলে—

টপ করে চিৎ করানো জখম ব্যাঙটা কলসীতে পুরে নারকেল মালা চাপা দিল হাজরা। কিন্তু আরেকটা গেল কোনদিকে। মোট জ্যোৎস্নার ভেতর দিয়ে একদলা অন্ধকার লাফাতে লাফাতে গোয়ালের কোণে চলে গেল। কলসীর ভেতরের গুলো ছোট ছোট লম্ফ দিয়ে নারকেল মালা খুলে ফেলতে চাইছে। ভেতরে বাতাস নেই। হাজরা জানে, খানিক পরেই ওরা আপনা-আপনি ঝিমিয়ে পড়বে

হাজরা হ্যারিকেন উসকে সেদিকেই গেল। আরেকটু হলেই ধরে ফেলত। ব্যাঙটা বুঝতে পেরেছে। ওইটুকু মাথায় কত যে বুদ্ধি ধরে! ধরতে ধরতে পারল না। আবার ফসকে গেল। হাজরা উবু হয়ে যেই হাত বাড়িয়েছে—অমনি গোয়ালের মোটা তালকাঠের গুঁড়ির ওপাশ থেকে একটা কালো বিদ্যুৎ বেঁকে মাথাটা উঁচু করে দাঁড়াল।

হ্যারিকেন পড়ে যাচ্ছিল। সেই অবস্থাতেই হাজরা উঠে দাঁড়াল।

মাথায় খড়ম। লাল কেরোসিনের আলো। সব পরিষ্কার দেখা যায় না। সারা গা ছাই রঙের। কালান্তক যম। হাজরা নড়লেই ফস করে মাথা নামাবে। নামালে সেখানে তার পা। তাহলে আর কথা নেই। হাসা কেউটে। বেশ বয়স হয়েছে বুঝলো। উনি যে এখানে তা তো হাজরার জানা কথা নয়। মাথাটা দুলছে। সারা পৃথিবী নিশ্চুপ।

শুধু তার ভেতর—থুপ থাপ আওয়াজ হচ্ছিল। হঠাৎ উঠে দাঁড়াতে গিয়ে নারকেল মালা পড়ে গিয়েছে। সেই সুযোগে এক একটা ব্যাঙ কলসীর ভেতর দিয়ে লম্ফ দিচ্ছে। খোলা বাতাস পেয়ে জোর হয়েছে গায়ে। কলসী থেকে এক লাফে উঠোনের মাটিতে। তার পরেই থুপ থাপ। সেই জখম ব্যাঙটাই বেরুতে পারেনি। একবার লাফিয়ে শূন্যে উঠেছিল। হাজরার

বুকে লেগে আবার কলসীর ভেতরেই পড়ে গেল। গায়ে লাগতেই হাজরার বুকখানা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ব্যাঙটার মুখটা রক্তে ভিজে।

সাপের মুখ গায়ে লাগলে আরও ঠাণ্ডা লাগে নিশ্চয়। কিছু করার নেই তার এখন। হ্যারিকেন দোলাতে পারছিল না। কিছুই আশ্চর্য নয়। হয়ত আলোটাই দেখছে মন দিয়ে। নইলে সাত আটটা ব্যাঙ লাফিয়ে বেরিয়ে গেল—একটার পেছনেও ছুটলো না কেন।

বাবা পঞ্চানন। আমি মিস্ত্রীপাড়ার হাজরা নস্কর। জলিল গাজির ভাগচাষী। রেল স্টেশন বন্দীপুর। তোমার নামে মাসভোর গান দেব। কাঙালি খাওয়াব। এবার আমাকে বাঁচাও।

সাপটা একটুক্ষণ মাথা নামিয়েই আবার তুলে ধরল। এখনো রাত ভোর হতে অনেকক্ষণ দেরি। নাহলে লোকজন এগিয়ে আসত। কাছাকাছি গোয়ালের সামনেই কালো গাইটা সব বুঝতে পেরেছে। কান খাড়া করে একবার বড় চোখ দিয়ে হাজরার দিকে তাকাল। হাজরাও তাকালো। কিছু করার উপায় নেই। বাতাস বন্ধ। উঠোনের গা দিয়ে শিমের লতা গোয়ালের ছাদ বেয়ে উঠতে গিয়ে থেমে ছিল। ডগাগুলো তখনও একটু একটু কাঁপছে। অন্য গরু-বাছুর কিছু বুঝতে পারেনি। কেউ কেউ শুয়ে ছিল। গোবর মাখামাখি অবস্থায় একটা বড় গরু চার পায়ে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। গেরস্থর রাখাল কোথায়? সেও কি কালঘুম ঘুমোচ্ছে? এখনই গোবর কাড়ানো দরকার।

হ্যারিকেনের আলোটুকুর ভেতর হাজরার জন্যে পৃথিবী থমকে পড়ে থাকল। সেখানে খড়ম আঁকা ছোট্ট ফণা সিধে হয়ে দাঁড়ানো। তার এক-হাতেরও ভেতর হাজরার ডান পা। আঙুলগুলো ভোঁতা। এই ঠাণ্ডা ফুরফুরে হাওয়ার ভেতরে হাজরা টের পেল— তার ডান পায়ের লোমের ভেতর দিয়ে ঘামের ফোঁটা নীচে যাওয়ার পথ খুঁজছে। হাঁটু থেকে পায়ের পাতা অবধি চুলবুল্ করে উঠল। তার পা এখন আর পা নেই। এবার বাঁচলে সে ঝিনুক দিয়ে পা চুলকে রক্ত তুলে ফেলবে! সে যে কি আরাম। সামনের কালো গাইটাও মশার কামড় খাচ্ছিল। কিন্তু তাই বলে লেজ একটুও নাড়াচ্ছে না। দুখানা কানই খাড়া করে রেখেছে। তার পেছনের পায়ের দেড় হাতের ভেতর সাপটা। অত বড় মাথা সুদ্ধ ঘাড় ঘুরিয়ে সব দেখতে হচ্ছে বলে ঘাড়ে ব্যথা হয়ে গেল গরুটার। ডানচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এল।

হাজরা সব দেখেও যেমন ছিল তেমন থাকল। গরুর গা থেকে একঝাঁক

মশা উড়ে এসে তার খোলা পিঠ পেয়ে বসে গেল। হাত পেছনে পাঠাবার উপায় নেই। গোয়ালের গায়েই হাঁসের ঘর। তারা ধবধবে জ্যোৎস্না দেখে দিন বুঝি শুরু হল ভেবেছে। তাই একেবারে একসঙ্গে চাপা গলায় ঘরের ভেতর নড়াচড়া করছিল। হাঁসগুলোর জন্যে ভয় ধরে গেল হাজরার। বড় বোকা জীব। একবার তার নিজের হাঁসঘরে এমন যম ঢুকেছিল। ছোবলায়নি। কিছু করেনি। তবু একটা ধাড়ি হাঁস ভয়ে মরে যায়। না জানি এবার তার নিজের কি হয়।

হ্যারিকেনের প্রায় নীচে এসে খড়ম আঁকা মাথাটা নামলো তারপর সাপটা নিজের গলার নীচেটা ঘাসের সঙ্গে, গোয়ালের মাটিতে সামান্য ঘষে আবার ফণা তুলে দাঁড়ালো। এবার সারা শরীরটা আগাগোড়া দেখা গেল। কাছেই কোথাও বাসা বেঁধেছে।

হপ্তা দুই আগে হাজরা নিজে ব্যাঙের গর্ত থেকে একটা সাপ গেঁথে তুলেছিল। আসলে সেটা সাপেরই গর্ত ছিল। গোড়ায় বুঝতে পারেনি। সে এখনও হলফ করে বলতে পারে—সাপটাকে সে মারতে চায়নি। কিন্তু জ্যান্ত অবস্থায় বঁড়শি কে খুলবে? নগদ দশ পয়সা দামের বঁড়শিও ফেলে দেওয়া যায় না। সাপটাকে মেরে তবে বঁড়শি বাঁচায়! সেই শাপেই কি আজ তার এই দশা।

আরও কাছে এসে দাঁড়াতেই হাজরার সর্বাঙ্গ ঘেমে গেল। ডান পা-খানা থরথর করে কাঁপছিল। অবুঝ হাঁসগুলো কোক কোক করছে। পেছনে আউলিয়াপুরের মাঠ। সামনে সাহেবপুর। শেষকালে তার ভাগ্যে এই ছিল! জখম ব্যাঙটা এবারও লাফ দিয়ে হাজরার বুকে গুতো খেয়ে সেই কলসীর ভেতরেই পড়ে গেল। তার সারা শরীর ঘেমে ছিল। চোখের পলক ফেলতে পারছে না। তারই শরীরের একটা বাড়তি টুকরোর মত কোমরে ঝোলানো কলসীর ভেতর ব্যাঙটাই শুধু লাফাচ্ছে। কিন্তু থামানোর উপায় নেই।

হাজরার চোখের সামনে মিস্ত্রিপাড়ার উঠোন ভেসে উঠল! রান্নাঘরের পাশেই ছেচতলায় একটা কুমড়ো গাছ লতিয়ে উঠছে। একখানা কঞ্চি বসিয়ে দেওয়া দরকার। ঘরের গোলপাতাও আজ দু'বছর পালটানো হয়নি। বউ যা অসাবধানী! শেষে ভাগের এক বস্তা ধান চোরে না খায়।

এখন তার ছোবল খেতে কোন আপত্তি নেই। মশার ঝাঁক পিঠ খুবলে খেল। ডান পায়ের কাঁপুনি থামেনি। সেখানে লোমের ভেতর সারি সারি ঘামের ফোঁটা নেমে পড়ে জায়গাটা ভিজিয়ে ফেলেছে। ছোবল খেয়ে সবচেয়ে

আগে সে মাটিতে বসে পড়ে দু'হাতে মনের সুখে পা-খানা চুলকোবে। কেন না এখন তো সে জানে পর পর কি হবে। সাপে কাটা মানুষের বড় ঘুম পায়। সবচেয়ে আগে নাক বসে গিয়ে গলার আওয়াজ খোনা হয়ে যাবে। আহা! বড় আপশোস! সারা রাত ধরে দু'টো তালগাছে কলসী বোঝাই হয়ে তাড়ি জমেছে। খাবার লোক সে-ই থাকবে না। দুনিয়ায় এত রস। কচুর শাক। ওলের ডালনা। খেজুর তাড়ির সঙ্গে চিতি কাঁকড়া পুড়িয়ে খেতে কি যে লাগে! তারই নাম স্বর্গ। পাতলা করে কচু কেটে নিয়ে পোড়া পোড়া করে ভাজলে দিব্যি বিস্কুট হয়ে যায়। আর বাঁশের কোড়ের ডালনা। তার তুলনা হয় না। এখনো যদি ছোবল না দেয়—হাজরা তাহলে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবে।

খুট করে আগল খুলে কে বেরিয়ে এল। কে ওখানে?

অনন্ত মোড়ল। চোখ তুলেই হাজরা গলা শুনে বুঝলো—আমি।

গেরস্থকে সঙ্গে পেয়ে কুকুরটাও বেদম চেঁচিয়ে কাছাকাছি ছুটে এল। তাতে ফণা একটুও নড়লনা। একেবারে সামনে থেকে সব দেখে কুকুরের গলার পর্দা নেমে গেল। স্রেফ কুইকুই আওয়াজ বেরোতে লাগল তখন।

আমি কে? সাড়া দিচ্ছ না কেন? চলতে চলতে অনন্ত মোড়ল লাঙলের খোলা ফলাটা তুলে নিল হাতে। হাজরা পাশ থেকে সব দেখেও নড়ল না। শুধু বুঝল এখুনি তাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারবে। কিন্তু নড়বার উপায় নেই তার। মূর্তিমান বিপদ হাজরার সামনে একেবারে বুক খুলে দাঁড়িয়ে।

খুব চাপা গলায় বলল, ছুঁড়বেন না মোড়ল মশাই—

হাত তুলেছিল অনন্ত। আদর করব।

আমার বড় বিপদ—

রাতেভিতে গরু চুরি করতে বেরোলেই বিপদ হয়। গোয়াল থেকে গরু হাবিশ করলে ক'টা—

আপনি এসে দেখে যান। আমি গোয়ালে ঢুকিনি। আমি রায়পুর মিস্ত্রীপাড়ার ৺খগেন নস্করের ব্যাটা। আমার বড় বিপদ—

চালাকি ছাড়। এদিকে এসো—পালাবার চেষ্টা করলেই ছুঁড়বো—

যাবার উপায় নেই। দু'দিকে চোখ রাখতে গিয়ে হাজরার দুই ভ্রুর মাঝখানে টন টন করে উঠলো। আমার সামনে কি দেখুন—

অনন্তর বয়স হয়েছে। লোকচরিত্র তার অজানা নয়। ধরা পড়লে চোর জোচ্চোর পালাবার জন্যে অনেক ফন্দি বের করে। কাছে গেলে কিছু

মারতে পারে। সাবধানী অনন্ত বলল, এই শেষবার—এদিক তাকাও বলছি—

উপায় নেই। কেউটে ফণা তুলে দাঁড়ালো।

শব্দ, কুকুরের ডাকে অনন্তর বড় ব্যাটা উঠে এসেছিল। টর্চ ফেলেই ছোকরা চেঁচিয়ে উঠল, আরে ব'বা!

কড়া আলোয় ফণা নামিয়ে নিল। তারপর কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে গোয়ালের পেছনের নালায় এঁকে বেঁকে নেমে পড়ল।

বাপ ব্যাটা এগিয়ে আসছিল। হাজরা বুঝলো এখুনি তার হাত থেকে হ্যারিকেনটা খসে পড়বে কিংবা তার আগে সে নিজেই জ্ঞান হারাবে। তাই তাড়াতাড়ি কলসীর ভেতরে হাত গলিয়ে দিল। আঙুল ভিজে যাচ্ছিল। ছোট জিনিসটা খপ করে ধরেই গায়ে যত জোর ছিল সবটুকু একত্র করে কাদায় ছুঁড়ে দিল।

তৃতীয় মহাযুদ্ধ
রতন ভট্টাচার্য

'রেখা, ও রেখা।'

'কি বলছ?' রান্নাঘর থেকে রেখার সাড়া পাওয়া গেল। তার গলার আওয়াজে বোঝা গেল সে খুব ব্যস্ত।

শশাঙ্ক বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে কাগজ পড়ছিল। তার শরীরের অর্ধেকটা কাগজের ওপর। সে চেঁচিয়ে বলল, 'একবার আসতে পারবে?'

'এখুনি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁগো, এখুনি।' বলতে বলতে শশাঙ্ক উত্তেজিত হয়ে বিছানায় উঠে বসল। একটু আগেই চা খেয়ে কাপ-ডিস নামিয়ে রেখেছিল সে। ওঠবার সময় তার কনুইয়ের ধাক্কা লেগে ডিসের ওপর কাপটা কাত হয়ে গেল। কাপের তলানী চা খানিকটা বিছানার চাদরে এসে পড়ল। তাড়াতাড়ি শশাঙ্ক হাত দিয়ে কাছিয়ে ফেলল চা-টুকু।

রেখা ঘরে ঢুকল। বলল, 'ডাকছ কেন?' তারপর শশাঙ্ককে বিছানার চাদর থেকে চা কাছিয়ে ফেলতে দেখে বলল, 'ঈস! ফেললে তো চাদরে! ও দাগ আর উঠবে না।' এগিয়ে গিয়ে কাপ-ডিসটা চৌকির তলায় নামিয়ে রাখল সে। বিছানায় চা পড়ে গেছে বলে শশাঙ্ক একটুও অপ্রস্তুত হল না। বলল, 'ওসব দাগ-ফাগের কথা বাদ দাও দিকি। এদিকে এসে দেখ কি লিখেছে কাগজে।'

'কি লিখেছে?'

'দন্ডকারণ্য থেকে নতুন কয়েকশো উদ্বাস্তুর আগমন। সুন্দরবনে পুনর্বাসনের দাবিতে বিক্ষোভ। পশ্চিমবঙ্গ আর একজন উদ্বাস্তুর দায়িত্বও নিতে পারবে না, মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি।' রেডিওতে খবর পড়ার মত বেশ ভারী গলায় কেটে কেটে শশাঙ্ক পড়ল। পড়ে, উত্তেজিত মুখচোখ তুলে

রেখার দিকে তাকাতেই রেখা হেসে ফেলল। বলল, 'প্যাগলামী কাকে বলে। এই খবরটুকু শোনাবার জন্য সাত সকালে এমন চেঁচামেচি ফেলে দিয়েছ! আমি ভাবলুম কি না কি। রান্না ফেলে ছুটে এলুম।'

'না না রেখা হাসির কথা নয়।' বেশ গম্ভীরভাবে শশাঙ্ক বলল 'আমরা তো এখন স্বাধীন। একদিন ভারতবর্ষের সব মানুষ এই স্বাধীনতার জন্য লড়েছিল। লড়েনি? বল?' বলে সমর্থনের আশায় এক মুহূর্ত রেখার দিকে তাকাল শশাঙ্ক। বলল, 'পূর্ববঙ্গের মানুষও লড়েছে। বরং অনেকের চেয়ে বেশী লড়েছে। কিন্তু তারা কি পেল? সে কোন্ স্বাধীনতা? গুসকরা, ধুবুলিয়া এই সব উদ্বাস্তু ক্যাম্পে তিরিশ বছর ধরে যে রিফ্যুজিরা আছে তাদের কাছে স্বাধীনতার কি মানে? এমনকি দণ্ডকারণ্য কি আন্দামানে যে রিফ্যুজিরা আছে তারাও কি স্বাধীনতার কোন স্বাদ পেয়েছে?' দীর্ঘ বক্তৃতার পর শশাঙ্ক ক্লান্ত হয়ে থামলে রেখা বলল, 'সত্যি, পশ্চিমবঙ্গে রিফ্যুজি প্রবলেমটাকে যেন সবাই মিলে জিইয়ে রেখেছে। স্বাধীনতার পর এতদিন হয়ে গেল.........।' কথা শেষ করল না রেখা। তার মুখে হাসি ছিল না। মুখে হাসি না থাকলে রেখাকে বড় বিষণ্ণ দেখায়। মনে হয় শরীরের মধ্যে কোথায় যেন একটা চাপা বেদনা সে সব সময় লুকিয়ে রেখেছে।

শশাঙ্ক বলল, 'তুমি ভাবতে পার রেখা, কয়েক কোটি মানুষ তিরিশ বছর ধরে ছিন্নমূল। কোন নির্দিষ্ট আশ্রয় নেই। আজ এখানে কাল সেখানে। লোকচক্ষুর অন্তরালে সরকারী ডোলের ওপর পশুর জীবন যাপন করছে।' একটু থামল শশাঙ্ক। যেন কি ভাবল। যেন পশু বলবে কি বলবে না এই নিয়ে ক' মুহূর্তের দ্বিধা। তারপর বেশ জোর দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, পশুই তো। স্টেশনে কি এদিকে ওদিকে কিংবা লরি করে যখন কোন দলকে এক ক্যাম্প থেকে আর এক ক্যাম্পে নিয়ে যায়, তুমি যদি দেখ ওদের, পশু ছাড়া তোমার অন্য কিছু মনে হবে না। ঘৃণা হবে।' বলতে বলতে রিফ্যুজিদের মলিন ঘৃণ্য জীবনযাপনের ছবিটা নিজের চোখের সামনেই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল শশাঙ্কর। আজকাল অবশ্য সচরাচর তেমন চোখে পড়ে না। করপোরেশনের গাড়ি যেমন করে কলকাতার রাস্তার নোংরা তুলে নিয়ে যায়, তেমনি করে রিফ্যুজিদের শহর থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে। তাই পঞ্চাশ ষাট কি একাত্তরের মতন এদের আর তেমন চোখে পড়েনা। তবে হাওড়া ব্রিজের কিংবা নতুন ফ্লাইওভারের নিচে যে অজস্র ভিখিরিকে শুয়ে থাকতে, রান্না করতে, উকুন বাছতে কি গল্প করতে দেখা যায়, তাদের সঙ্গে পনেরো কুড়ি বছর আগে পর্যন্ত হাওড়া কিংবা শিয়ালদহ স্টেশনে দেখা রিফ্যুজিদের অদ্ভুত মিল

আছে। ভাবতে ভাবতে শশাঙ্কর মুখে একটা বিষণ্ন হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'রেখা, স্বাধীনতার জন্য যে মানুষ লড়ে, লড়ে মারা যায়, তারা শহীদ হয়। কিন্তু স্বাধীনতার জন্য যারা হাজারে হাজারে পশুর জীবনযাপন করতে বাধ্য হল তাদের কি বলব?'

রেখা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে কিছু বলল না। জানালার বাইরেই পায়ে চলা মাটির রাস্তা। তার ওপাশেই অক্ষয়বাবুর কলাইয়ের ক্ষেত। ক্ষেতের একপাশে ঘাট বাঁধানো কালীপুকুর। অন্য পাশে অনেকখানি জমিতে অক্ষয়বাবুর কলাবাগান। ওদিকের সদর থেকে ব্যাণ্ড আর বিউগলের আওয়াজ আসছে। ছুটির দিন সকালে নেতাজী সংঘের ছেলেরা ব্যাণ্ড প্র্যাকটিস করছে।

রেখা বাইরে থেকে চোখ তুলে এনে শশাঙ্কর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমরাও তো রিফ্যুজি, তাই না।'

শশাঙ্ক ক' পলক বিমূঢ় দৃষ্টিতে রেখাকে দেখল। বলল, 'তার মানে?'

'বিয়ের পর থেকে অন্তত পাঁচবার বাড়ি পাল্টালাম আমরা।'

'ও হ্যাঁ।' অল্প হাসল শশাঙ্ক। 'আমরা সে অর্থে রিফ্যুজির জীবনই যাপন করছি বটে। কিন্তু আমরা তো আবার সত্যি সত্যিই রিফ্যুজি। মানে বাস্তুচ্যুত।'

এখন সকাল। চৈত্রের সকাল। ক্ষেত থেকে অক্ষয়বাবু অনেকদিন আগেই কলাই তুলে নিয়েছে। জানালা দিয়ে সেই শূন্য ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে শশাঙ্কর হঠাৎ গা ভেঙে হাই উঠল।

'না। আর দেরী করা যায়না গো।' বলে রেখা ঘর থেকে বেরিয়ে দালান, দালান পার হয়ে রান্নাঘরে চলে গেল।

শশাঙ্ক দু পা সামনে ছড়িয়ে দিয়ে, কোলের ওপর কাগজ নিয়ে আর একবার পড়ায় মন দিতে চেষ্টা করল। কিন্তু কাগজে তার মন আর বসল না। হেডলাইনগুলো আর একবার দেখে নিয়ে সে কাগজটা কোল থেকে নামিয়ে রাখল।

বাইরে অল্পসল্প হাওয়া দিচ্ছে। এই প্রকাণ্ড বাড়ির খুদে খুদে জানালা দিয়ে সামান্য হাওয়া ঘরে ঢুকল। নোনাধরা দেওয়াল থেকে কিছু চুনবালি খসে পড়ল বিছানার ওপর। ঘরের মোটামোটা দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে শশাঙ্কর মনে পড়ল বিয়ের পর এই প্রথম বাড়িওলা সঙ্গে থাকছে না এমন একটা বাড়িতে তারা আছে। সত্যি, মানুষের কত বিচিত্র রকম চাওয়া থাকে। আজ দশ বছর ধরে সে এমনি একটা বাড়ি চেয়েছে, যে বাড়িতে বাড়িওলা

থাকবে না। বাস্তবিক, তার নাগালের মধ্যে যে সব বাড়িওয়ালা সে এই দশ বছরে পেয়েছে, তারা এমনই ছাপোষা যে তাদের সঙ্গে থাকা যায় না। দু-চার মাস, বড়জোর দু-এক বছর। প্রথমে মনোমালিন্য, শেষে অশান্তি। আবার প্রথমদিকের ভাবসাব দেখলে অবাক হতে হয়। কিন্তু শেষে কী যে হয়······। আবার বাড়ি খোঁজ।

অথচ শশাঙ্ক নিজে কিংবা তার বউ—তাদের কেউ কখনও খারাপ লোক বলেনি। বরং নানা ব্যাপারে তারা অতিরিক্ত উদারতা দেখিয়েছে। তবু থাকা যায় না। থাকতে পারেনি শশাঙ্ক। মাথা নীচু করে পরাজিত মানুষের মত ক্রমশই পেছিয়ে আসতে হয়েছে তাকে। আটচল্লিশ সালে বাস্তুচ্যুত মানুষদের সঙ্গে তারা পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছিল। কোন ক্যাম্পে কি স্টেশনে পড়ে থাকতে হয় নি তাদের। হাওড়া টাউনে দেশ ভাগের অনেক আগে থেকেই তাদের আত্মীয়স্বজনও ছিল। তারাই ঘর-টর ভাড়া করে দিয়েছিল। বাবা চাকরি নিয়েই এসেছিলেন। অনেকটা ট্রান্সফারের মতন। যেন ফরিদপুর থেকে সোজা ট্রান্সফার হয়ে হাওড়ায় চলে এলেন। ফরিদপুর টাউন হাসপাতাল থেকে হাওড়া জেলা হাসপাতাল।

বালক বয়সের সেই দিনগুলির স্মৃতি পরিষ্কার মনে আছে শশাঙ্কর। তখন তো সে বেশ বড়ই। চোদ্দ পনেরো হবে। স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে তাকে। তাদের বাড়িতে কোন বাড়িওয়ালা ছিল না। তারা কলকাতায় থাকত। অবশ্য তারা যেখানে থাকত সেটাকে বাড়ি বলা ঠিক হবে না। বাড়ি নয়। খালি দুখানা ঘর। অনেকখানি জমি টিন দিয়ে ঘেরা। রান্নাঘর ছিল না। বাবা খোলা দিয়ে রান্নাঘর বানিয়ে নিয়েছিলেন। বাল্যের সেই দিনগুলি যেন এখন স্বপ্ন।

'শুনছো।' রান্নাঘর থেকে রেখা চেঁচিয়ে ডাকলো শশাঙ্ককে।

'কি বলছ ?'

'আমার তরকারি হয়ে গেছে। দুখানা রুটি সেঁকে খেতে দোব। একবার বাজারে যাবে।'

রেখার শরীরের মতন রেখার গলাটাও কি রকম রুগ্ন। আস্তে কথা বললে খুব খারাপ লাগে না। কিন্তু সামান্য চড়ালেই কি রকম সরু হয়ে যায়। মনে হয় কোথাও খুব কষ্ট হচ্ছে রেখার। যেন শরীরের সমস্ত জোর একত্র করে চেঁচাচ্ছে। শশাঙ্ক চৌকি থেকে নেমে পড়ল। আর নামতেই তার মনে পড়ল, ক'মাস ধরে বাঁদিকে কোমরের কাছে একটা ব্যথা তাকে বড় কষ্ট দিচ্ছে। কোমরে হাত দিয়ে একটু পেছন দিকে হেলে দাঁড়িয়ে ব্যথাটা

ভুলতে চাইল শশাঙ্ক। ভারি অদ্ভুত ব্যথা। কখনও বেশিক্ষণ এক জায়গায় থাকে না। এই কোমরের কাছে আছে, পরক্ষণেই নেমে পায়ের গোছে চলে গেল। ব্যথাটা যখন পায়ে থাকে তখন হাঁটতে ভীষণ কষ্ট হয় তার। এক-এক সময় এমন হয় যে, কোথাও ক' মিনিট না বসে সে একপাও হাঁটতে পারে না। কখনও বা পা টেনে টেনে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয় তাকে। দিন পনেরো হোমিওপ্যাথি করছে কিন্তু কিছুই কমেনি। শশাঙ্ক মনে মনে ঠিক করল বাজার থেকে আসবার সময় আজ একবার যাবে ডাক্তারের কাছে।

আজ রবিবার। অন্য দিন এমন সময় শশাঙ্কর দম ফেলবার সময় থাকে না। দাড়ি কামানো, চান করা, খাওয়া, একটার পর একটা মেশিনের মত করে যেতে হয় সব। তার স্কুল এগারোটায়। কিন্তু নটার মধ্যে বেরোতে হয় তাকে। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক লাগে স্কুলে যেতে। সকলেই অবাক হয়। বলে, 'ভাড়াবাড়িতেই যখন থাকা, তখন তো স্কুলের কাছাকাছি থাকলেই হয়।'

অবশ্য স্কুলের কাছাকাছি থেকে সুখ করার চেষ্টা শশাঙ্ক যে করেনি, তা নয়। করেছে। বাবার আমলের সেই বাড়ি থেকে উঠে আসবার পর থেকেই তো শশাঙ্ক খুব সুখে হবে এমন একটা বাড়ি খুঁজেছে। সে বাড়ি ছাড়তে হয়েছিল, বাবার জন্য। বাড়িওলা বলেছিল, 'আমরা কলকাতার বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছি। আপনারা বাড়ি ছেড়ে দিন। আমরা থাকব।' বাবা অমনি শশাঙ্ককে ডেকে বলেছিল, 'বাড়ি খোঁজ। উঠে যেতে হবে।'

শশাঙ্ক তখন প্রায় যুবক। বিরক্ত হয়ে বলেছিল, 'মগের মুল্লুক নাকি যে বাড়িওলা বললেই উঠে যেতে হবে।'

কিন্তু তখনও রাজত্ব বাবার। কাজেই উঠে যেতে হয়েছিল। আর সেই শুরু। বার তিনেক শহরাঞ্চলেই এ-পাড়া ও-পাড়া করে দেখল সর্বত্র সমস্যা একটাই। বাড়িওলার সঙ্গে একসঙ্গে বাস করা যায় না। এই মানুষগুলির যা ঘরদোর থাকে, তাতে এদের নিজেদেরই কুলোয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও পয়সার অভাবে ভাড়াটে রাখা। শীতের রাতে গরিবের বাড়ি অতিথি এলে সে যেমন লেপটি অতিথিকে দিয়ে নিজে কাঁথাটাথা গায়ে দিয়ে রাত কাটায় এরাও সেরকম। নিজেরা কষ্টেসৃষ্টে থেকে এক-দুখানা ঘরে ভাড়াটে রাখে। ফলে, প্রথমে মনোমালিন্য, পরে গোলমাল এমন স্বাভাবিক যে, শশাঙ্ক শেষের দিকে আর অবাক হত না।

শহর থেকেও শশাঙ্কর স্কুল ছিল ঘণ্টা দেড়েকের রাস্তা। প্রথমে বাসে করে হাওড়া স্টেশন, পরে ট্রেনে মাইল তেরো গিয়ে তার স্কুল। পাঁচজনের

পরামর্শে সেই স্কুলের কাছাকাছি একটা ঘর নিয়ে শেষ পর্যন্ত গ্রামে চলে এল শশাঙ্ক। প্রথম প্রথম খুব ভালো লেগেছিল তার এই গ্রামের জীবন। কিন্তু সে আর ক-দিন। এখানেও তো সেই বাড়িওলার সঙ্গে একত্রে থাকা। শহরের বাড়িওলাদের তবু ভাড়াটে নিয়ে থাকার একটা অভ্যাস গড়ে ওঠে। এদের তাও ছিল না।

তারা গ্রামের বাড়িতে যাবার দিন পনেরো বাদে বাড়িওলার বউ তার ছ-নম্বর বাচ্চাটি কোলে নিয়ে হাসপাতাল থেকে বাড়ি এল। সাঁওতালদের মত স্বাস্থ্যবতী বাড়িওলার সেই বউ সম্পূর্ণ উদোম অবস্থায় কোমরে সামান্য একখানি নেকড়া জড়িয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে কুমীরের মত রোদ পোয়াত। বাড়িওলার মা বলেছিল, 'ওভাবে রোদ্দুরে পড়ে না থাকলে কাঁচা নাড়ি শুকুবে কেন!'

বাড়িওলা কোন চাকরিবাকরি করত না। তবে সারাদিনই নানা কাজে সে ব্যস্ত থাকত। তার গোটা কয়েক টায়ারের চাকা লাগানো ঠ্যালাগাড়ি ছিল। সেই সব গাড়ি সে মেদিনীপুরের শক্তপোক্ত মানুষদের ভাড়ায় খাটাত। মাঝে মাঝে মগরা থেকে ওয়াগন ওয়াগন বালি এনে বিক্রি করত। কোথাও যাত্রার আসর হলে সে চা-পাঁউরুটি আলুরদমের দোকানও দিত। এভাবে সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করত লোকটা। ভাড়াটের সঙ্গে গণ্ডগোল করার মত সময় তার হাতে ছিল না। এখানে গণ্ডগোল হল মেয়েদের মধ্যে। বাড়িওলার বউয়ের সঙ্গে রেখার। অবশ্য প্রথম ক' মাস তাদের ভাব-ভালোবাসার কোন সীমা ছিল না। দিনরাত একসঙ্গে থাকা, গল্প করা, সিনেমা দেখা। কিন্তু বাড়িওলার বউয়ের গ্রাম্যতা যতই কমতে লাগল ভালোবাসাও তত দ্রুত ফুরিয়ে আসতে লাগল। সেই পুরোন খেলা। শেষে সে বাড়িও ছাড়তে হল একদিন।

এবারে আর ভুল করল না শশাঙ্ক। এবারে এমন একটা বাড়ি খুঁজল যেখানে বাড়িওলা থাকে না। আর এই হল সেই বাড়ি। বাড়িওলা নেই। এত বড় একটা দোতলা বাড়ি, উঠোন, উঠোনের পশ্চিম দিকে খিড়কির দরজা পেরিয়ে বিশাল পুকুর। নানা রকম ফলের গাছের বাগান আর এর মধ্যে থাকছে কেবল সে, রেখা আর তাদের ছেলে নয়ন। বাড়িওলা থাকে কলকাতায়। মাসে একবার করে আসে। ভাড়া নেয়। চলে যায়। শশাঙ্করা কি দিয়ে কি খেল, কোথায় শুলো, তারা স্বামী-স্ত্রী ঝগড়াঝাটি করল কি করল না, এ নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা নেই। বাস্তবিক, এই থাকায় এক ধরনের সুখ আছে। কত কাল ধরে শশাঙ্ক তো এই সুখটাকেই খুঁজছে।

'কি গো, কাগজ পড়া হয়নি তোমার ?' রান্নাঘর থেকে রেখার সেই সরু ভাঙা ভাঙা গলার ডাকে শশাঙ্কর চিন্তায় বাধা পড়ল। সে চেঁচিয়ে বলল, 'কেন ?'

'এদিকে এস না। আমার রুটি হয়ে গেছে।'

শশাঙ্ক ঘর থেকে দালানে এল। পূর্বদিকের জানালা দিয়ে দালানে অনেকখানি রোদ এসে পড়েছে। চারদিক থেকে আলো আর হাওয়া এসে দালানটিকে খটখটে করে রেখেছে। ডানদিকে দালানের মাঝামাঝি দোতলার সিঁড়ি উঠে গেছে। দোতলার সব তালাবন্ধ। শুধু ছাদে যাবার সিঁড়িটা খোলা। দালানের শেষ দরজা দিয়ে রকে বেরোলে রান্নাঘর। শশাঙ্ক রান্নাঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে ব্যস্ত রেখা মুখ তুলে বলল, বাজারে যাবে তো একবার ?'

অন্যমনস্ক উদাসীন স্বরে শশাঙ্ক বলল, 'যাব !'

'তাহলে বস এখানে। আমার রুটি তরকারি হয়ে গেছে।' তারপর রুটির চাটুটা নামিয়ে উনুনের আগুনে রুটি সেঁকতে সেঁকতে বলল, 'কি করছিলে ঘরে ? তিনবার ডেকে তবে সাড়া পেলুম।'

'তিনবার ডেকেছিলে ?' কপাল কুঁচকে শশাঙ্ক রেখার দিকে তাকাল। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'তুমি মোটেই তিনবার ডাকোনি।'

রেখা হাসল। কিছু বলল না। শশাঙ্ক রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে রইল। এখানে দাঁড়ালে উঠোনের পশ্চিম দিকের দরজা দিয়ে ভেতর বাড়ির পুকুর, বাগানের অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। ঠিক দরজার ওপাশেই কাঁঠালগাছটা কাঁঠালে ভর্তি হয়ে আছে। এর মধ্যেই বেশ বড় হয়ে গেছে কাঁঠালগুলো। ওদিকের আম লিচু গাছেও ফল ধরেছে খুব।

'এবার খুব ফল হবে।' শশাঙ্ক বলল।

'ফল হলে আর আমাদের কি। গতবারেও কম হয়নি। কিন্তু তুমি নিতে দাও ?'

'না, আমাদের কি দরকার।'

'পাড়ার লোক নিচ্ছে।'

'নিক্‌গে।'

'নিক্‌গে ? বাড়িওলা কি আর জানছে যে, পাড়ার লোক নিচ্ছে। সে মনে করবে আমরাই নিয়েছি।'

শশাঙ্কর মনে হল খুব ঠিক বলেছে রেখা। ফাল্গুনে ফাল্গুনে এক বছর আর এখন চৈত্রও শেষ হতে চলল। তার মানে এক বছর এক মাস হল তারা

এবাড়িতে এসেছে। গতবারে এসেই দেখেছে গাছ ভর্তি ফল। কিন্তু একটা ফলেও তারা হাত দেয়নি। গত বছর রেখার খুব ইচ্ছে ছিল দু-একটা কাঁঠাল গাছ থেকে পেড়ে এঁচোড় রান্না করে খায়। কিন্তু শশাঙ্ক পেড়ে দেয়নি। বলেছে, 'না, এ সব করতে গেলেই বাড়িওয়ালার সঙ্গে লাগবে।'

কিন্তু তা বলে ফল বাড়িওয়ালাও পায়নি। পাড়ার লোকেরাই শেষ করেছে। বাড়িওয়ালার একটা ঝি আছে। বাড়িওয়ালা এসে কখনও কোনদিন থাকলে সে রান্নাবান্না করে দেয়। সেই ঝি, তার ছেলে, ছেলের বউ, নাতি, বাগানটা তো মনে হয় তাদেরই। ওদিকে ভাঙা পাঁচিল দিয়ে যখন খুশী ঢুকছে, যা খুশী তাই পেড়ে নিচ্ছে।

রেখার সব রুটি সেঁকা হয়ে গেল। উনুনে ভাতের জল চাপিয়ে সে রুটি তরকারি নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চল, খেয়ে নেবে।'

'তুমি ঠিকই বলেছ রেখা।' যেতে যেতে শশাঙ্ক বলল, 'বাড়িওয়ালা মনে করতেই পারে তার গাছের জিনিস আমরাই খাই। এবার এলে বলতে হবে।'

'হ্যাঁ, বলা উচিত।'

শশাঙ্ক দালানে এসে বসল। থালায় রুটি তরকারি বেড়ে দিয়ে রেখা বলল, 'ছেলেকে ডাকলে না?'

'সে কোথায়? বাজনার ওখানে তো?'

'তা ছাড়া আর কোথায় যাবে?'

শশাঙ্ক উঠে দালানের পূবদিকের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। খুব রোদ উঠেছে আজ। চৈত্রের রোদে বাইরেটা ঝলমল করছে। বাঁদিকে কালী মন্দির! মন্দিরের পেছনে, পাশে বড় বড় দোতলা তিনতলা বাড়ির কঙ্কাল চৈত্রের রোদে ঝিমুচ্ছে। মন্দিরের উল্টোদিকে কালীপুকুরের বাঁধানো ঘাট। ঘাটের ওপাশে নেতাজী সঙ্ঘের ক্লাব ঘর। এই মাত্র ব্যাণ্ডের বাজনা বন্ধ হয়েছে। না হলে এখান থেকে চীৎকার করলেও নয়ন শুনতে পেত না। ক্লাবঘরের বাইরে কাউকে দেখা গেল না। শশাঙ্ক গলা চড়িয়ে ডাকল, 'নয়ন, এই নয়ন!'

'ডাকছ কেন?' বলে নয়ন বাইরে বেরিয়ে এল।

'খাবি না?'

চোখের ওপর হাত তুলে কপাল কুঁচকে নয়ন বললে, 'যাচ্ছি।' বলে আবার ঘরের ভেতর ঢুকে গেল সে।

শশাঙ্ক ফিরে এসে খেতে বসল। বলল, 'নয়ন আসছে।' তারপর রেখার দিকে তাকিয়ে হাল্কা গলায় বলল, 'এখানে তোমার আর ছেলের খুব

সুবিধে হয়েছে ।'

'কি রকম ?'

'অনেক বন্ধু-বান্ধব পেয়েছ ! আগের পাড়ায় তো এসব ছিল না ।'

'সেতো তুমিও পেয়েছ ।'

'আমি !' ভীষণ অবাক হয়ে শশাঙ্ক রেখার দিকে তাকাল । আমার আবার বন্ধু দেখলে কোথায় ?'

'কেন ? তুমি অক্ষয়বাবুর বাড়ি তাস খেলতে যাওনি ?'

'ধ্যাৎ । একদিন তাস খেলতে গেলুম, অমনি মানুষগুলো আমার বন্ধু হয়ে গেল । ডাক্তারবাবু ছিল না । ওদের লোক কম ছিল । তাই ডেকে নিয়ে গেছল ।'

'তুমি আমাব বন্ধু কোথায় দেখলে ?' বলে মুখ টিপে রেখা হাসল ।

শশাঙ্ক হই হই করে উঠল । 'তুমি ওকথা বল না । যখন বিকেলবেলা কালীপুকুরের ঘাট আলো করে পাড়ার মেয়ে-বউরা সেজেগুজে আড্ডা মারতে বসে, তুমি যাওনা সেখানে ? কত গপ্প । সিনেমার, থিয়েটারের ।'

গল্প না বলে শশাঙ্ক গপ্প বলায় রেখা হেসে ফেলল । বলল, 'তা ঠিক । এ জায়গাটা অনেক ভালো ।'

নয়ন ঢুকল । নয়ন ঢুকলে রেখা নয়নকে রুটি তবকারি দিয়ে নিজেও নিল ।

'জায়গাটা আমারও খুব পছন্দ ।' শশাঙ্ক বলল, 'ভাবছি বাকী জীবনটা এখানেই কাটিয়ে দেব ।'

'এই ভাড়া বাড়িতে ?'

'হ্যাঁ ।'

রেখার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল । ক-মুহূর্ত নিষ্পলক শশাঙ্কর মুখের দিকে তাকিয়ে কি ভাবল সে । শেষে বলল, 'তোমরা যে সময়ে এসেছ, সে সময়ে তো রিফুজিদের গভর্নমেণ্ট অনেক টাকাপয়সা দিয়েছে । জমি দিয়েছে । তোমরা এ সব পাওনি ?'

শশাঙ্ক ম্লান মুখে হাসল । বলল, 'না ।'

'সবাই পেল । তোমরা পেলে না কেন ?'

'বাবা সে রকম ছিল না । বাবা বলত, আমার চাকরি আছে । আমি যদি সরকারের সাহায্য নিই, একজন দুঃখী লোকের সাহায্য কমে যাবে ।'

'বাবার ছেলে কি বলত ?'

'বাবার ছেলে তো তখন নেহাতই বাচ্চা ।' বলে শশাঙ্ক হাসল ।

শশাঙ্ক হাসল বটে কিন্তু মনে মনে রেখার দুঃখ বুঝল সে। ভাড়া বাড়িতে থাকার দুঃখ। রেখাকে এই দুঃখ সারা জীবনই বইতে হবে। শশাঙ্কর এমন সামর্থ্য কোনদিনই হবে না যে, সে একটা বাড়ি বানিয়ে ফেলবে। আর দুঃখ কি শুধু একট বাড়ির। রেখা জানে না, দুঃখ হল দেশ না থাকার। সেই যে সমস্ত গ্রাম জুড়ে একটা সম্পর্ক, কেউ কাকা, কেউ জ্যাঠা, মামা, এ ব্যাপারটা দু-তিন পুরুষের আগে হবে না। এমনকি তখনও লোকে বলবে, এরা তো এ গ্রামের নয়, বাইরে থেকে এসে বাড়ি করেছে। দেশের নদী, আকাশ, বাতাস, বৃক্ষলতা মানুষজনের সঙ্গে পুরুষানুক্রমে যে আত্মীয়তা গড়ে ওঠে' তা কি একটা দুটো জীবনে নতুন কোথাও চট করে জন্মায়।

একটু আগে কথাবার্তায় একটা হাল্কা সুর ছিল তা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কেউ কথা বলছিল না। রেখা একটু আগেও হাসছিল। কিন্তু এখন তার মুখের স্বাভাবিক বিষণ্ণ ভাবটা ফিরে এসেছে। নয়ন খুব তাড়াতাড়ি খাচ্ছে। নয়নের দিকে তাকিয়ে শশাঙ্কর হঠাৎ খুব মায়া হল। এই তার ছেলে। সমস্ত গ্রাম জুড়ে আত্মীয়তা কি জিনিস, ও তা জানল না। চরাচর জুড়ে সীমাহীন এক অপরিচয় আর অনাত্মীয়তার মধ্যে ও বড় হয়ে উঠবে। বড় হবে কি না কে জানে? হয়ত শুধু বয়সই হবে।

খিড়কির দিকের পুকুর পাড় থেকে আচমকা কিছু ভারী জিনিস পড়ার শব্দ হল। প্রায় বার চারেক শব্দটা শোনা গেল। 'কিসের শব্দ বল ত?' রেখা শশাঙ্কর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'কেউ গাছ থেকে কিছু পাড়ছে মনে হয়।'

'কি পাড়ছে?' বলে রেখা উঠে বেরিয়ে গেল।

রেখা উঠে যেতে নয়ন বলল, 'ঘেঁটুর ছেলে আর বৌ কাঁঠাল পাড়ছে।'

'কে ঘেঁটু?'

'জ্যাঠামশাই এলে একটা বুড়ি রান্না করে দেয় না। কালো নাম, তার ছেলে।'

'তুই কি করে জানলি ঘেঁটুর ছেলে আর বউ কাঁঠাল পাড়ছে?' ছেলের দিকে বিস্ময় নিয়ে তাকাল শশাঙ্ক।

'আসবার সময় দেখলুম যে গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে ওরা।'

রেখা ফিরে এল। তাকে বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। দালানে ঢুকল না সে। রকে দাঁড়িয়ে বলল, 'একবার এসো তো।'

'কোথায় যাব?'

'এস-ই না। ওরা কাঁঠাল পাড়ছে।'

'ওরা কাঁঠাল পাড়ছে তো আমি গিয়ে কি করব ?' শশাঙ্ক অপ্রসন্ন গলায় বলল।

'বাঃ! রেখার স্বরে বিরক্তি।' 'ক-দিন আগে বাড়িওলা দেখে গেল না অতগুলো কাঁঠাল। ভাববে না আমরা খেয়েছি!'

রুটির গ্রাসটা চিবুতে চিবুতে শশাঙ্ক বলল, 'সে কথা ওদের বলে কি হবে ? সুশীলবাবুকে বলব।'

'ধ্যাৎ।' রেখা ভীষণ অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, 'তোমার সুশীলবাবু যখন আসবে গাছে কাঁঠাল থাকবে একটাও!'

গেলাস তুলে খানিকটা জল খেয়ে শশাঙ্ক উঠে দাঁড়াল! দুহাতে কোমর চেপে ধরে বলল, 'চল দেখি।'

খিড়কির দরজা পেরিয়ে বাইরে এসে শশাঙ্ক দেখল গাছতলায় বেশ বড় বড় চারটে কাঁঠাল পড়ে আছে। ঘেঁটুর বউ দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। ঘেঁটুর ছেলে গাছ থেকে নামছে। ক' মুহূর্ত শশাঙ্ক কি বলবে বুঝতে পারল না। একবার ঘেঁটুর ছেলে আর একবার ঘেঁটুর বউয়ের দিকে তাকিয়ে থাকল সে। ভেতরে ভেতরে অল্পস্বল্প উত্তেজনাও বোধ করল। উত্তেজনা নয় অপমান। এই বাড়ি সে ভাড়া নিয়েছে। কাঁঠাল গাছটাও এই বাড়ির মধ্যেই। তার বয়েস হয়েছে।, মুখ চোখ গম্ভীর করে রাস্তা দিয়ে হাঁটলে লোকের চোখে-মুখে একটা সম্ভ্রমের ভাব ফুটে ওঠে। এ সব কথা যেন এই বউটা আর ছেলেটা হিসেবের মধ্যেই আনছে না। সে এসেছে, দাঁড়িয়ে ওদের দেখছে, ওদের কোন ভ্রূক্ষেপই নেই। বিন্দুমাত্র অপ্রস্তুত মনে হল না ওদের। এসেছ বেশ। দাঁড়িয়ে দেখ। আমরা চারটে কাঁঠাল পেড়েছি। এখুনি এগুলো নিয়ে চলে যাব। এমনি একটা বেপরোয়া ভাব ওদের চোখেমুখে। তবু গলা যথা সম্ভব গম্ভীর করে শশাঙ্ক জিজ্ঞেস করল, 'কাঁঠাল পাড়ছ কেন ?'

কেউ কোন উত্তর দিল না! দেবার প্রয়োজন মনে করল না।

'তোমরা যে এভাবে কাঁঠাল পাড়ছ, সুশীলবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছ ?'—শশাঙ্ক আবার প্রশ্ন করল!

এবারে উত্তর পাওয়া গেল। উত্তর দিল ঘেঁটুর বউ! খুব সংক্ষেপে ঠোঁট চেপে বলল, 'তুমি জিজ্ঞেস করগে যাও! আমাদের বলা আছে।'

'তার মানে ?' একটু যেন ঝাঁঝ ফুটল শশাঙ্কের গলায়। 'কবে জিজ্ঞেস করলে ?'

'করেছি। তোমাকে অত ভাবতে হবে না।'

কথা বলার ভঙ্গি, গলার তাচ্ছিল্য, তার সম্পর্কে ঔদাসীন্য শশাঙ্কের

গায়ে যেন আগুন ঢেলে দিল। এক্ষেত্রে তার কি করণীয় সে বুঝে উঠতে পারল না। তাই হঠাৎ খুব জোরে চেঁচিয়ে উঠল সে। 'ইয়ার্কি পেয়েছ? তোমরা যখন তখন যা খুশী করবে আর বাড়িওলা মনে করবে আমরা করেছি। কখন জিজ্ঞেস করলে সুশীলবাবুকে? একমাসের ওপর সুশীলবাবু আসেন নি এদিকে।'

ছেলেটা তখনও গাছ থেকে সবটা নামেনি। শশাঙ্ককে ওভাবে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠতে দেখে সে নামা বন্ধ করে দিয়ে গাছের মাঝামাঝি দাঁড়িয়েছিল। শশাঙ্ক আচমকা তার দিকে তাকিয়ে সমান জোরে চেঁচিয়ে বলল, 'নেমে আয়। শিগ্গির নেমে আয় গাছ থেকে। দেখাচ্ছি মজা, আমরা ভাবব না? তোমাদের প্রাণে যা আসবে তাই করবে, আর আমরা ভাবব না।'

পুকুরের ওপারে চার-পাঁচজন ছেলে তাস খেলছিল। শশাঙ্কের আচমকা চিৎকারে তারা খেলাবন্ধ করে এদিকে তাকাল।

ছেলেটার হঠাৎ কি মনে হল কে জানে। ঝুপ করে গাছ থেকে লাফিয়ে নেমে শশাঙ্কর সামনে গিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'এই নাও নেমে এসেছি। কি মজা দেখাবে, দেখাও।'

ভীষণ অপ্রস্তুত বোধ করল শশাঙ্ক। বড় জোর বারো তেরো বছর বয়স ছেলেটার। কিন্তু এমন অসভ্যের মত বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল, শশাঙ্কর মনে হল ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেয় গালে। রাগে সর্বাঙ্গ জ্বালা করছিল তার। কি করবে, ক' মুহূর্তে কিছুই ঠিক করতে পারল না সে। রেখা এগিয়ে এসে বাঁচাল তাকে। এগিয়ে এসে রেখা ছেলেটিকে বলল, 'কি আস্পর্ধারে বাবা। এই যা তো এখান থেকে। যা, চলে যা।'

'কেন, যাব কেন? তোমার ভয়ে?' বলে দাঁত বার করে ছেলেটা রেখার দিকে তাকিয়ে হাসল।

ঘেঁটুর বউ অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। এখন এগিয়ে এসে দুটো কাঁঠাল ছেলের হাতে তুলে দিয়ে বাকী দুটো নিজে হাতে ঝুলিয়ে নিল। ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আয়, চলে আয় গুলে।'

ছেলেটা নড়ল না। হাতে কাঁঠাল ঝুলিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁত বার করে দাঁড়িয়েই থাকল।

'তুই দাঁড়িয়ে রইলি কেন?' রেখা ছেলেটাকে বলল, 'যা কাঁঠাল নিয়ে চলে যা, খবরদার বলছি, আর আসবি না কোনদিন।'

'ওরে আমার কে রে।' মুহূর্তে ঝাঁঝিয়ে উঠল ছেলেটা। 'একশো বার আসব। আজ এসেছি। কাল আসব। পরশু আসব। রোজ আসব।'

'এলে', শশাঙ্ক দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'একটি চড়ে তোমার মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেব।'

'মারবে আমাকে? মার।' বলে ছেলেটা তড়াককরে ক'পা এগিয়ে এসে শশাঙ্কর দিকে গালটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'মার শালা বাঙাল।'

দু কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল শশাঙ্কর। শরীরের সমস্ত রক্ত যেন মুহূর্তে টগবগ করে উঠল। রাগে হাত-পা কাঁপছিল তার। মনে হল পড়ে যাবে এখুনি। ঠাস ঠাস করে ছেলেটার বাড়ানো গালে, গায়ে, মুখে পাগলের মত চড় মারতে থাকল সে।

রেখা ছুটে এল। শশাঙ্ককে হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'আঃ! করছ কি?'

ছেলেটা বুঝতে পারেনি যে সত্যি সত্যি শশাঙ্ক তাকে মারতে পারে। খুব জোরেই মেরেছে শশাঙ্ক। তার গাল মুখ জ্বলে যাচ্ছিল। খুব অপ্রস্তুত দেখাল তাকে। মনে হল এখুনি কেঁদে ফেলবে। কিন্তু পরক্ষণেই, 'তুমি শালা মারলে আমায়। শালা শুয়োরের বাচ্চা। দেখাচ্ছি তোমায়।' বলে এদিক ওদিক তাকিয়ে ধাঁ করে একটা আধলা ইট কুড়িয়ে নিয়ে উঁচু করে ধরল শশাঙ্ককে মারব বলে।

'এই কি করছিস?' রেখা চেঁচিয়ে উঠে এগিয়ে গেল। ইট সুদ্ধ হাতটা চেপে ধরল ছেলেটার।

'এই গুলে, খবরদার', বলতে বলতে পুকুরের ওপার থেকে ছেলেগুলোও ছুটে এল। গুলের দেরী হয়ে গেছল। ইট তুলেই যদি মেরে দিত, তাহলে মারতে পারত। কিন্তু বড্ড দেরী হয়ে গেল তাব। ছেলেগুলো এসেই তার হাত থেকে ইটটা কেড়ে নিয়ে ফেলে দিল। এক ধাক্কা দিয়ে তাকে খানিকটা সরিয়ে দিয়ে বলল, 'খুব বাড় বেড়েছিস গুলে।'

রেখা শশাঙ্ককে ঠেলা দিয়ে বলল, যাও। তুমি ভেতরে যাও।'

শশাঙ্ক আর দাঁড়াল না। রাগের মাথায় মেরে দিয়েছে। কিন্তু এখন বুঝতে পারল কাজটা ঠিক হয়নি। পুরোন গাড়ির মত তার শরীরটা এখনও ঝরঝর করে কাঁপছে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকায় তার কোমরের ব্যথাটা পায়ের গোছে নেমে গেছে। তাই ঘরে ঢুকেই পায়ের গোছটা টিপে ধরল সে। মুহূর্তের জন্য ব্যথায় তার মুখ বিকৃত হয়ে গেল। ব্যথা কমতে চৌকিতে হাত-পা টান করে শুয়ে পড়ল শশাঙ্ক।

বাগান থেকে এখনও চেঁচামেচির শব্দ আসছে। একটা বড় মানুষের গলাও পাওয়া যাচ্ছে, যতদূর মনে হচ্ছে গলাটা অক্ষয়বাবুর।

কি সামান্য ব্যাপার থেকে কি হয়ে গেল। সে তো ঝগড়া মারামারি করতে যায়নি। বলতে গিয়েছিল, 'দেখ, তোমরা যখন কিছু নেবে সুশীলবাবুকে বলে নিও। নাহলে ওরা ভাববে আমরা নিয়েছি।' কি সামান্য কথা। কিন্তু কি হয়ে গেল। হঠাৎ রাগ হয়ে গেল তার। বাঙাল শব্দটার মধ্যে কি আছে কে জানে। অবজ্ঞা, অপমান, অবহেলা কি আছে শব্দটার মধ্যে! শুনলেই মাথায় রক্ত উঠে যায় কেন?

রেখা ঘরে ঢুকল। ক' পলক শশাঙ্কর দিকে তাকিয়ে অল্প হাসল সে। 'কি যে কর না।'

শশাঙ্কও হাসল। বলল, 'তুমিই তো ডেকে নিয়ে গেলে।'

'হ্যাঁ। ছেলেটাকে মারতে তোমায় ডেকে নিয়ে গেলুম।'

'রাগ হয়ে গেলে কি করব?'

সে কথার উত্তর না দিয়ে রেখা বলল, 'গুলের বাবা ঘেঁটু একটা গুণ্ডা।'

'কে বললে?'

'ওই চাঁদু, দীপক ওরা বলছিল। ছেলেটা যাবার সময় শাসিয়ে গেছে, বদ্‌লা নিয়ে তবে ছাড়বে।'

'ঘেঁটু কি করে?'

'রিকশা চালায়। মদ খায়। হ্যাঁগো সত্যি ঝামেলা হবে নাকি কিছু?'

'হতে পারে।' অন্যমনস্ক স্বরে শশাঙ্ক বলল।

হঠাৎ রেখা কি রকম ভয় পাওয়া গলায় বলল, 'তাহলে কি হবে গো?'

শশাঙ্ক লাফ দিয়ে উঠে বসল। অবাক হয়ে বলল, 'কিসের কি হবে?'

তুমি একলা রাতবেরাতে বাস থেকে নেমে হেঁটে বাড়ি ফেরো। যদি মারধোর করে। বলা তো যায় না। সর্বক্ষণ মদ খেয়েই থাকে।'

'দু—র' বলে হেসে উঠল শশাঙ্ক। 'দেশে কি থানা পুলিশ নেই। ভদ্রলোক নেই! না, সবাই ঘেঁটু আর ঘেঁটুর বউ ছেলে হয়ে গেছে।'

'ভদ্রলোক!' বলে রেখা মুখটা বাঁকাল। 'তুমি এ-পাড়ার লোকদের কথা বলছ তো?'

'হ্যাঁ।'

'তারা ভদ্রলোক কি না জানি না। তবে আমাদের সম্পর্কে তাদের ধারণা তোমার ওই ঘেঁটুর বউ ছেলেরই মতন।'

'তার মানে—?'

'আমাদের সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে ওরা কি বলে জান? বলে,

আমাদের সুশীল জ্যেঠার বাঙাল ভাড়াটে। আমি নিজে শুনেছি রমার মাকে বলতে।'

অবাক হয়ে রেখার দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে রইল শশাঙ্ক। দাদা কাকা নয়, আমাদের বাঙাল ভাড়াটে। শশাঙ্কর বুকের ভেতরে যেন কি রকম করে উঠল। কথাটা শুনলেই তার বুকের মধ্যে কেন এ রকম হয় কে জানে।

'কাজেই' রেখা বলল, 'ব্যাপারটাকে তুমি অমন হাল্কা ভাবে নিওনা। ছেলেটা যাবার সময় বলে গেছে এখুনি সে ঘেঁটুকে ডাকতে যাবে।'

'যাকগে। সে যা হয় দেখা যাবে।' বলে শশাঙ্ক চৌকি থেকে নেমে এল। বলল, 'বাজারের পয়সা আর থলে দাও।'

রেখা ভুরু কুঁচকে শশাঙ্কর দিকে তাকাল। 'এই এতবেলায় এখন আর তোমাকে বাজারে যেতে হবে না।'

'এত বেলা! দশটা বাজেনি এখনও।'

'না। তোমার বাজারে গিয়ে দরকার নেই আজ।' রেখার গলায় মিনতি।

'দূর!'

'যাবে বাজারে?'

'হ্যাঁগো হ্যাঁ। পয়সাকড়ি ছাড়ো।'

'রেখার মুখ দেখে মনে হল তার একদম ইচ্ছে না শশাঙ্ক এখুনি বাইরে বেরোয়। গুণ্ডাদের কথা কিছু বলা যায় না। হঠাৎ আক্রমণ করলেই হল। কিন্তু শশাঙ্কর পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে সে টাকা আর থলে এনে দিল। শশাঙ্ক বেরিয়ে পড়ল।

শশাঙ্ক বেরিয়ে পড়ল বটে, কিন্তু মনে মনে তারও যে ভয় ছিল না তা নয়। তবে দিনের বেলা। ছুটির দিন। রাস্তায় অনবরত লোক চলাচল করছে। এর মধ্যে রেখার ভাষায় কেউ তাকে আক্রমণ করবে বলে তার মনে হল না। সদরের এদিকে ওদিকে দু-চারজন যেমন সব সময় বসে থাকে আজও ছিল। মন্দিরের সিঁড়িতে চাঁদু, দীপক, দেবু বসে আছে। ছোট্টুদের রকে বসে আছে ছোট্টুর মা আর নীলুবাবুর বউ। ঘাটে অক্ষয়বাবু, মন্মথবাবু আর নীলুবাবু। সকলেরই আলোচনার বিষয় সে; এটা বাইরে বেরিয়েই পরিষ্কার বুঝতে পারল শশাঙ্ক।

নেতাজী সঙ্ঘের ক্লাবঘরের সামনে দিয়ে হেঁটে গিয়ে শশাঙ্ক রাস্তায় উঠল। এক বছর ধরে এই লোকগুলিকে প্রতিদিন দেখছে শশাঙ্ক। প্রতিদিন দেখে দেখে এই লোকগুলিকে তার কি রকম আপন মনে হত। অবশ্য কারও সঙ্গেই তার তেমন অন্তরঙ্গতা নেই, কিন্তু তবু লোকগুলিকে আপন ভাবতে এতদিন

কোন অসুবিধে হয়নি তার। কিন্তু আজ এই মাত্র রেখার মুখ থেকে ওই অদ্ভুত কথাটা শুনে লোকগুলিকে তার ভীষণ অপরিচিত মনে হচ্ছিল। সামনা-সামনি কখনও দাদা কাকা বলে বটে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে সবাই জানে শশাঙ্করা তাদের আপন কেউ না। সুশীল জ্যেঠার বাঙাল ভাড়াটে মাত্র।

ছুটির দিন বটে, তবে রাস্তায় তেমন লোক চলাচল নেই। হয়তো বেলা হয়ে গেছে তাই লোক কম, নির্জন রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে তার ভেতরেও একটা ভয় ভয় ভাব হচ্ছিল। কবরখানার মাঠে কি এখানে এই বাঁশতলায় কেউ পেছন থেকে একটা লাঠি কি কিছু দিয়ে তার মাথায় আঘাত করলে তার কিছুই করার থাকবে না। উপুড় হয়ে এখানে মুখ থুবড়ে সে পড়ে থাকবে। ভয়টা শীতের হাওয়ার মত তার শরীরে কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছিল।

বাজারে ঢুকে তার মনে হল বাজারের সব লোক তার দিকে তাকিয়ে আছে। আশেপাশের দোকান থেকে দোকানদাররা কাজকর্ম বন্ধ রেখে তাকে দেখছে। বাজারের সব রিকশাআলাই তার মনে হচ্ছিল ঘেঁটু। দু-চারজন মুখচেনা মানুষ তাকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মাস্টার, কি হয়েছে শুনলাম।' এখানকার মানুষজন যেন কেমন। কেউ মাস্টারমশাই বলে না। প্রায় সবাই বলে মাস্টার। তাদের সবাইকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আগাগোড়া সব বলতে হল। সব শুনে কেউ কেউ বলল, 'থানায় একটা ডায়েরী করে যান। ঘেঁটুটা বড় গুণ্ডা।'

বাজার ছাড়িয়ে বাসরাস্তার দিকে একটু এগোলে ঝিলের ধারে এখানকার থানা। শশাঙ্করও মনে হল কি থেকে কি হয় কিছু বলা যায় না। একটা ডায়েরী করে রাখায় আর দোষ কি।

বাজার করা হয়ে গেছল তার। বাজারের থলে হাতে নিয়েই সে থানায় এসে উঠল। এখানকার সকলের মত থানার বড়বাবুর সঙ্গেও তার মুখ চেনা পরিচয় আছে। সব শুনে বড়বাবু একটু হেসে বললেন, 'রাগ করবেন না মশাই, আপনারা যেখানেই যাবেন একটা গোলমাল না পাকিয়ে থাকতে পারেন না। বিদেশ বিভুঁইয়ে কি দরকার ছিল আপনার……।'

বড়বাবুর বিদেশ বিভুঁই কথাটা তার বুকে তীরের মত এসে বিঁধল। দু কান গরম হয়ে উঠল তার। বুকের মধ্যে যেন মেঘ ডাকার মত গুড় গুড় করে শব্দ হতে থাকল। বুক ভেঙে দীর্ঘশ্বাস উঠে এল একটা। সব জায়গাই যদি তার বিদেশ বিভুঁই, তাহলে তার দেশ কোথায়। তিরিশ বছরেও সে তার দেশ খুঁজে পেল না। থানা থেকে বেরিয়ে এল সে। রাস্তায় বেরিয়ে সে দু-কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

এখন খুব বেশী বেলা হয়নি। সাড়ে দশটা এগারোটা হবে। কিন্তু এর মধ্যেই রোদ যেন ঝাঁ ঝাঁ করছে। না, আজ আর ডাক্তারখানায় যাবে না সে। থাক ব্যথা। কত রকম ব্যথাই তো এই শরীরে পুষে রেখেছে সে।

শশাঙ্ক বাড়ি ফিরে দেখল সদরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। খুব অবাক হয়ে গেল সে! এ রকম তো কোনদিন হয় না। সারা দিন-রাতই তো দরজা খুলে রাখে তারা। একটু সরে এসে দালানের কাছে গিয়ে শশাঙ্ক ডাকল 'নয়ন, দরজা বন্ধ কেন?'

সদর একদম ফাঁকা। কেউ কোথাও নেই। কালীপুকুরের ঘাটে দুজন অচেনা মানুষ চান করছে। নেতাজী সঙ্ঘের ঘর বন্ধ।

রেখা দরজা খুলল। খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল সে। তার মুখ থমথমে। শশাঙ্ক ভেতরে ঢুকতেই আবার দরজাটা বন্ধ করে দিল সে। শশাঙ্ক তাকিয়ে দেখল তাদের খিড়কির দরজাও বন্ধ। খুব অবাক হয়ে সে বলল, 'কি ব্যাপার রেখা, এভাবে সব বন্ধ করে রেখেছ কেন?'

'চল, বলছি।' রেখার স্বর গাঢ়।

'নয়ন কোথায়?'

'ঘরেই আছে।'

দালানে বাজারের ব্যাগ নামিয়ে রেখে ক্লান্ত শশাঙ্ক রেখার দিকে তাকালে রেখা বলল, 'আমি কথা বলতে পারছি না। তুমি আসছ না দেখে এতক্ষণ বুকের ভেতর এমন ঢিপঢিপ করছিল।'

'কেন? কি হল এর মধ্যে আবার? দরজা বন্ধ। তোমার বুক কাঁপবে কেন।'

'মিনিট পনেরো আগে মদ খেয়ে দুটো লোক এসেছিল। একেবারে রান্নাঘরের সামনে।'

'কে দুটো লোক?'

'নয়ন বলল, গুলের মামা।'

'কেন?'

'তোমায় খুঁজতে। বলছিল, মাস্টার কোথায়? আজ দেখে নেবো মাস্টারকে। ঘেঁটুর কাছে খবর চলে গেছে।'

'তারপর?'

'আমার ভীষণ ভয় করছিল। নয়ন নয়ন বলে আমি চিৎকার করে ডাকলুম। ওকি মা? বলে সদর থেকে নয়ন ছুটে আসতেই লোকগুলো

দরজা থেকে একটু সরে দাঁড়াল। নয়নকে বললুম, একবার ছুটে যাতো বাবা, অক্ষয়বাবু আছে কিনা দেখতো। অক্ষয়বাবুর নাম শুনে মাতাল দুটো একটু যেন ভড়কে গেল। আরও ক'পা পিছিয়ে গিয়ে বলল, ও সব বাবু-ফাবুর ভয় আমাদের দেখাবে না বলছি। মুখ দিয়ে ভক ভক করে মদের গন্ধ ছাড়ছে। ভয়ে আমার গা গুলিয়ে বমি উঠে আসছিল।'

'তারপর তাড়ালে কি করে?'

'কি আর করি। নয়ন যেতে চাইছে না। ঘরে ঢুকে আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েই আছে। যত বলি, যা একবার। নড়েই না। শেষে খুব জোরে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। কি ভেবেছ কি তোমরা! দেশটা কি তোমাদেরই হয়ে গেল নাকি। মদ খেয়ে দিনদুপুরে রান্নাঘরে ঢুকে হামলা শুরু করেছ? আমার চেঁচানিতে কি ভাবল কে জানে। দেখলুম বেরিয়ে গেল। যাবার সময় বলে গেছে, আসছি আমরা দল বেঁধে এখুনি। বাইরের লোক হয়ে আমাদের ছেলের গায়ে হাত দেওয়া।'

'বাইরের লোক। ওরা বলল একথা?'

'হ্যাঁগো বলল।'

কোমরের ব্যথায় আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না শশাঙ্ক। সে মেঝের ওপর বসল। বলল, 'এক গ্লাস জল দাও।' রেখা জল এনে দিলে এক চুমুকে জলটা খেয়ে নিল শশাঙ্ক। আর তাই তুমি দরজা বন্ধ করে দিয়েছ?'

'দেব না? তুমি বাড়ি নেই। ভয়ে আমার কান্না পেয়ে যাচ্ছিল।'

'ভালো করেছ।' শশাঙ্ক রেখার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'কিন্তু এ ভাবে দরজা বন্ধ করে আমরা বাঁচব না রেখা।'

শশাঙ্ক তার কথা তখনও শেষ করেনি, এমন সময় বহু দূর থেকে একটা কোলাহলের শব্দ ভেসে এল। বহু মানুষ একসঙ্গে চিৎকার করলে যে রকম শব্দ হয় কোলাহলটা অনেকটা সে রকমের। বহু মানুষের সেই মিলিত কণ্ঠস্বর মনে হল যেন এদিকেই এগিয়ে আসছে।

রেখা হঠাৎ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ক' মুহূর্তে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে যেন বুঝতে চাইল এ শব্দ কিসের। তার কোন সন্দেহ ছিল না যে, ঘেঁটুরা আসছে।

'ওরা আসছে।' শশাঙ্কর দিকে তাকিয়ে ভয়ানক ভীতকণ্ঠে সে বলল, 'শুনছো?'

শশাঙ্ক কিছু বলল না। মাথা বাড়িয়ে দালানের জানালা দিয়ে বাইরের

দিকে তাকিয়ে সে দেখল তীব্র রোদে সমস্ত সদর অসহায় বৃদ্ধের মত পড়ে আছে। কোথাও কোন মানুষজন নেই।

'ও মা, দেখবে এস।' ঘর থেকে নয়নের গলা পাওয়া গেল। গভীর উত্তেজনায় তার স্বর ফেটে ফেটে যাচ্ছিল। 'দেখবে এস মা। ঈস্! কত লোক। বিশ-পঁচিশ-তিরিশ। পাঁচশো হাজার। ওরা মাঠ ভেঙে এদিকেই আসছে। ঐ তো, গুলে, গুলের বাবা। ওমা, এযে অক্ষয়বাবু, মন্মথবাবু নীলুবাবু। এ-পাড়ার বাবুরাও তাহলে আসছে। চাঁদুদা, দীপকদা, সবাই আসছে। আমার সঙ্গে যারা ব্যাণ্ড বাজায়, তারাও। ও মা··· ··।'

ঘরের জানালা দরজা বন্ধ করে দিয়ে তাড়া করলে পাখি যেমন পাগলের মত ছোটাছুটি করে, দেওয়ালে; কড়ি-বরগায় মাথা ঠোকে, রেখা তেমনি করে পাগলের মত অস্থির পায়ে ছুটে ছুটে একবার ঘর আর একবার দালান করছিল। শশাঙ্ক স্থির হয়ে মেঝের ওপর বসে। চিৎকার চেঁচামেচির সঙ্গে সে একটা তীব্র বারুদের গন্ধ পাচ্ছিল। কোলাহল ক্ষিপ্র পায়ে এগিয়ে আসছে। কোথায় যেন প্রচণ্ড শব্দে কে একটা বিউগল বাজাল। শেষবারের মত রেখা ঘর থেকে ছুটে বারান্দায় এল। শশাঙ্কর সামনে নতজানু হয়ে দু-হাতে তার মুখ তুলে ধরে চিৎকার করে বলল, 'হ্যাঁগো, শুনতে পাচ্ছ, ওরা যে এসে গেল।'

গভীর ক্লান্তিতে ঘন ঘন শ্বাস পড়ছিল তার।

শশাঙ্ক খুব শান্ত নিরুত্তাপ গলায় বলল, 'আসুক।'

'পুরোন দরজা। এখুনি ভেঙে ফেলবে যে!'

'না। ভাঙবে না। তার আগেই দরজা খুলে দেব আমরা।'

এক বর্ষার গল্প

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

—আমি পুরিপুজোর মেলায় যাব।

—আমিও যাব। বুড়ি ঘাড় কাত করে বলল, 'ঘোড় দৌড়ের বাজি দেখব। মা যাবে, বাবা যাবে না। বাবা বাবুর-হাটে কাপড় নিয়ে যাবে।'

—বেথুন খাবি? সহসা প্রশ্ন করল রস। 'মোত্রাঘাসের জঙ্গল পার হয়ে বোন্না-গাছটা আছে না বণ্ডিতদের, তার উপর উঠে উঁকি দিতে হয়। তবে চোখে পড়বে। কি থোকা থোকা বেথুন ধরেছে রে, বুড়ি।' এ-সময় রস তালুতে জিভ দিয়ে শব্দ করল। 'কেউ দেখেনি। আমি দেখেছি। বোলতার চাক খুঁজতে গিয়ে আমি দেখলাম।' এবার সে বুড়ির কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, এখানে কেউ নেই তবু বলল। এখানে শুধু দুটো পেয়ারা গাছ. কিছু বেউ-ফলের গাছ—তার নীচে গন্ধপাদালের ঝোপ, আশে পাশে কালোমেঘের জঙ্গল, দূরে মৃত গাব গাছ, পাশেই দত্তদের পুকুর, দুধারে বোন্না-গাছের ছায়া এবং আশেপাশে ঘন বেতের ঝোপ—তবু সে ফিস ফিস করে বলল, 'যাবি? গাছ থেকে বেথুন পেড়ে দেব তুই নীচে কপ ধরবি।'

এইসব বলার সময় রসের কোমর থেকে প্যাণ্ট খুলে পড়ছিল। সে টেনে তুলল প্যাণ্টটা। শক্ত করে দুটো মাথা পেটে গুঁজে দিল। প্যাণ্টে দড়ি নেই—ওর দড়ি থাকে না—কেন যে দড়ি ছিঁড়ে যায়, সে বোঝে না। ওর এই রকম অভ্যাস গড়ে উঠেছে।

ওরা দুজন বণ্ডিতদের পুকুরপার ধরে নেমে গেল। জলে কচুরিপানা, মাটিতে ঘাসের গন্ধ, বিকেলের রোদ ঘাসের উপর। ঘাসে সাদা ফুল, মাঠে মাঠে চাষ শেষ। ওরা পাড় ধরে যেতে যেতে জমিতে চাষীদের দেখল। দূরে মাঝিবাড়ির মেলার গরু। গলায় ঘণ্টা বাজছে। ওরা গরু দুটো দেখে বলল,

'গরুর দৌড়ে এবার মাঝি-বাড়ি জিতবে।' তারপর ওরা মোত্রাঘাসের জঙ্গলে এসে দেখল—ওদের কেউ দেখছে না। ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় তবু ওরা দাঁড়াল কিছুক্ষণ—ওরা ভাল করে দেখল, কেউ দেখছে না। সুতরাং হামাগুড়ি দিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পরস্পর ওরা হাত ধরল।

বুড়ি সহসা হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, 'আয় এখানে বসি।' বুড়ি ঘাসের ভিতর বসে পড়ল।

রস বলল, 'নারে বসব না।'

খুব নরম ঘাস। এখন মোত্রাঘাসের পাতার ফাঁকে বুড়ির গভীর চোখ দুটো। চোখ দুটো বিনীত ভদ্র অথচ অপার কৌতূহলে সচেতন। বুড়ি হাত নেড়ে ডাকল, 'কাছে আয় না। শোন না। সেই গল্পটা… মাসিমার…বিয়েতে।'

রস ভাবল, বুড়ি জঙ্গলে এলেই তার সেই গল্পের কথা মনে হয়। আমি সে গল্প শুনব না! রস হাঁটতে থাকল। মোত্রাঘাসের জঙ্গল ফাঁক করে হাঁটতে থাকল।

বুড়ি ডাকল, 'রস দাঁড়া। একা আমার ভয় করছে।'

বুড়ি দু'লাফে রসকে ধরে ফেলল এবং সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে বসে পড়ল। বললে, 'বোস। পায়ে কাটা বিঁধেছে।'

রস বসে পড়ল ঘাসের ভিতর। বুড়ির পা কোলে তুলে নিল। পায়ের কাঁটা তুলে রস হাত বুলিয়ে দিল—খুব মসৃণ। বুড়ির ঘাড় পর্যন্ত চুলে বুনো ঘাসের গন্ধ। বুড়ির শরীরে ঘাম। বুড়ির শরীর বড় হয়ে উঠছে। রস ঘন হয়ে বসলে বুড়ি ফিস ফিস করে একটা গোপনীয় কথা বলল। রস বুড়ির মুখ দেখে সচেতন হতে গিয়ে দেখল দূরে বাঁশ বনের ছায়ায় মাঝি-বাড়ির বড়বউ পাতা জড় করছে। রস বলল, 'আমার ভয় করছে বুড়ি। আমার মা নেই, বাবা থেকেও নেই।'

বাঁশ বনের ছায়ায় মাঝি-বাড়ির বড়বউকে পাতা কুড়াতে দেখে বুড়ি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। তারপর মোত্রাঘাসের জঙ্গলে হামাগুড়ি দিয়ে দেখল, বোম্বাগাছটা কিছু দূরে। হামাগুড়ি দিতে গিয়ে রসের প্যাণ্ট আলগা হচ্ছে। বুড়ি রসকে এবার ধমক দিল, 'দড়ি পরাতে পারিস না প্যাণ্টে।'

দু'পাশে বেতের ঝোপ। ঝোপগুলো ক্রমশ বাজপড়া কড়ুই গাছে অথবা টিপটিকলা গাছের ডাল ধরে উপরে উঠে যাচ্ছে। কোথাও বেতের আঁকশি

ঝুলছে। কোথাও বাতাসে বেতপাতা কাঁপছে। অথবা কিছু বেতফল কাঁচা, কিছু বেতফল সামনে—বোম্বা গাছে ঝুলছে। রস বোম্বাগাছের গুঁড়ি ধরে উপরে উঠতে থাকল ; প্যান্টটা গাছের ডালে ঘসা খেতে খেতে খুলে যাচ্ছে তারপর সহসা কোমর থেকে নেমে যায় আর কি! এইসব দেখে বুড়ির অপরিণত বোধটুকু মাসিমার বিয়ের গল্পকে স্মরণ করে রসকে যেন ধমক দিতে চাইল — 'প্যান্টে দাঁড় পরাবি রস। নয়ত তোর সঙ্গে আমি বনবাদাড়ে ঘুরব না।'

রস বলল, 'কপ ধর।'

বুড়ি কপ ধরল।

রস এবার বুক ছেঁচড়ে উপরে উঠতে থাকল। ডাল ধরে ডালে এবং অন্য ডালে।—নীচে বুড়ি ভয় পাচ্ছে—'রস পড়ে যাবি, রস শক্ত করে ডাল ধর।'

রস বোম্বার পাতলা ডালে ঝুঁকে বলল, 'বুড়ি ধর। দেখবি মাটিতে যেন পড়ে যায় না।' সে এক, দুই করে বেতফলের গুচ্ছ নীচে ফেলতে থাকল।

রস এবং বুড়ি বেতফল নিয়ে ফেরার সময় শুনল, কোথাও কোন দুঃসহ শব্দ। ভেঙে যাচ্ছে, ধ্বসে যাচ্ছে যেন। জঙ্গলের ভিতর কিছু দেখা যাচ্ছে না। সব অস্পষ্ট। একটা শেয়ালের থেকে থেকে কাতরানোকে ভয় করল। ওরা দাঁড়াল না। ওরা হাঁটছে।

বুড়ি বলল, 'আমরা এবার মাঠে পড়ব।'

মাঠে রস বুড়ির হাত ধরল। বলল, শেযালের অসুখ হয়েছে রে।' একটু এগিয়ে এসে দেখলে দুটো কুমিরের মত বড় গো-সাপ ওদের দেখে দৌড়ে জলে নেমে যাচ্ছে।

ওরা দুজন পচা শালুকের জমি অতিক্রম করার সময় দেখল—বিকেলের শেষ রোদটুকু মুছে যাচ্ছে। খালের ধারে মেলার গরু - গলায় ওদের ঘণ্টা বাজছে। মেলার গরু এখন বাড়িমুখো। দিঘীর পারে পারে চাষের জমি। দিঘীতে জলজ ঘাস, কচুরিপানা। আর পারে পারে লটকন গাছ, গাছে গাছে নীলকণ্ঠ পাখি। ওরা দাঁড়িয়ে পাখির ডাক শুনল।

গাঁয়ে ঢোকার আগে ওরা দুজন দুটো হিজলের ছায়ায় বসল। নীচে হিজলের ফুল সতরঞ্চ মত। ফুলেরা ফুলেফেঁসে নকসা কাটা সতরঞ্চ যেন। ওরা গাছের নীচে পা ছড়িয়ে বসল। বেতফুল ছাড়াল দুজনে। তারপর পরস্পর বেতফল মুখে দিয়ে সুর করে বলতে থাকল : 'আম পাকে, জাম পাকে, বেথুন পাকে।'

হাট ফেরত মানুষেরা ঘরে ফিরছে। ঈসম সেখ লণ্ঠন হাতে সোনালী

বালির নদীতে তরমুজ ক্ষেতে পাহারা দেবার জন্য নেমে যাচ্ছে। দুপুরের ঘূর্ণি হাওয়া এখন আর নেই। ঘরে ঘরে এবার লণ্ঠন জ্বলবে। মসজিদে আজান, মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা বাজবে। এ-সময়ই রস এবং বুড়ির অপরিণত বোধটুকু পরস্পরকে ভালবাসার জন্য কাছে টানছে।

বুড়ি ওর বাবাকে হাট থেকে ফিরতে দেখে বলল, 'আমি যাই, রস।'

বুড়ি কেউ-ফলের গাছ দুটো অতিক্রম করে বাবাকে দেখল। গন্ধপাদালের ঝোপ অতিক্রম করে উঁকি দিয়ে দেখল রসকে। রস এখনও গাছের নীচে বসে, রস এখনও উঠছে না। বুড়ির রসের জন্য কষ্ট হতে থাকল। রসের মা নেই, বাবা থেকেও নেই। রস প্রিয়নাথদের বাড়িতে থাকে—দুবেলা দুটো ভাত, এই পর্যন্ত। রসের কষ্ট। খেতে কষ্ট, ক্ষুধার কষ্ট। সেজন্য বিকালে ঘুরে ঘুরে রসের কেউ-ফল সংগ্রহের ইচ্ছা অথবা লটকন ফল, চড়ুই ফল। অথবা কোন সময়ে ডেকল পেড়ে গোলার তুষে পাকতে দেওয়ার ইচ্ছা। বুড়ি আতাবেড়া অতিক্রম করে ভাবল, মা না থাকলে এমন হয়, বাবা না থাকলে এমন হয়।

মা বললেন, 'তুমি আজও রসের সঙ্গে গিয়েছিলে?'

বুড়ি চুপ করে থাকল।

— দাঁড়াও তোমার বাবা আসুন বলছি।

বুড়ি এবারও চুপ করে থাকল। কিন্তু কোচ থেকে কিছু বেথুন তুলে মার হাতে দিল।

মা বললেন, 'খবরদার তোর বাবা যেন জানতে না পারে।'

বুড়ি উঠোনে নেমে যাওয়ার সময় ফের ভাবল—মা না থাকলে এমন হয়, বাবা না থাকলে এমন হয়। বাবার হাতে বড় ইলিশ, বাবা বুড়িকে ইলিশ ধরিয়ে দিয়ে পুকুর ঘাটে চলে যাচ্ছেন। বুড়ি উনুনের ধারে ইলিশ রেখে মার পাশে বসে বলল, 'আমি পুরিপুজোর মেলায় যাব মা।'

রস এবং বুড়ি একদিন পুরিপুজোর মেলায় গেল। ঘোড়দৌড় দেখে বুড়ি বলল, 'বাবা বলেছে আমাদের একটা বড় ঘোড়া কিনবে।'

বুড়ির ভাই হবে বলে রস কয়েকদিনই চুরি করে বুড়ির মাকে কই মাছ ধরে দিল। যখন বিকেল হত, যখন গাঁয়ের বুড়োরা মাঝিবাড়ি অতিক্রম করে নাপিত বাড়ির উঠোনে পাশা খেলতে বসত, যখন বঙ্কিতের বাবা পালমশাই গাওয়াল করতে অন্য গাঁয়ে বের হতেন অথবা যখন নদী থেকে

ঝিনুক তুলে মুসলমানদের বিবিরা ঘরে ফিরত তখন চুপি চুপি ফুলের গুচ্ছ বাড়িয়ে কাঁকড়াদের ঘর ভেঙে রস বুড়ির মার জন্য চুরি করে কই মাছ ধরতে বসত। তখন ওদের কেউ দেখতে পেত না। দুটো ছোট ছিপ, কিছু মশা এবং জঙ্গলের ভিন্ন ভিন্ন সব উলানী পোকা থাকত, আর ওরা শিকারী বেড়ালের মত বসে থাকত।

একদিন ঝোপ থেকে বের হয়ে ওরা দুজন সোনালী বালির গদীতে ঈসম সেখের আজান শুনল। ঈসম সেখের তরমুজের ক্ষেত—তরমুজের লতারা আকাশ মুখো। ঈসম তার ছই-এর নীচে বসে এ-দুনিয়ার জন্য দোয়া মাগছে।

বুড়ি বলল, 'ঈসম বড় ভাল লোক।'

রস বলল, 'যখন তরমুজ হবে, ও আমায় খেতে দেবে।'

তখন রস বনবাদাড়ে ঘুরবে না। তখন রস বিকেল না হতেই ঈসমের ছই-এর নীচে গিয়ে বসে থাকবে। অথবা তরমুজ ক্ষেতে হেঁটে বেড়াবে। সে খুশীমত তরমুজ তুলে খাবে। এবং ছই-এর নীচে বসে ঈসমের হীরামন পাখির গল্প শুনতে শুনতে নিজেকে সেই পাষাণপুরীর রাজকন্যার পাশে কোটালপুত্র ভেবে অহেতুক এক আনন্দে ডুবে থাকবে।

বুড়ি বলল, 'রস ঈসমের ছইয়ের নীচে আমায় একদিন নিয়ে যাবি।'

—যাব। গেলেই নিয়ে যাব। কিন্তু তোর মা যদি বকে।

—হ্যাঁরে, মা এখন কি সব বলেরে আমি বড় হয়েছি বলে।

—বড় ত তুই হয়েছিসই। বলে রস দ্রুত হাঁটতে থাকল।

বুড়ি বাড়ির দিকে উঁকি দিয়ে বলল, 'দেখিস বাড়ি থেকে পালিয়ে তোর সঙ্গে আর বনবাদাড়ে ঘুরব না।' বুড়িও পা চালিয়ে হাঁটতে থাকল।— 'আমি বড় হয়েছি না তুই বড় হয়েছিস!'

বুড়ি মোটে ঘাসের ভিতর ঢুকে বলল, 'রস আসবি?'

রস ঘাড় ফিরিয়ে দেখল বুড়িকে। বুড়ি এখনও ওর প্রতীক্ষায় ঝোপের ভিতর উঁকি দিয়ে আছে। রসের কেমন ভয় ভয় হতে থাকল। সুতরাং সে ফিরল না। সে বাড়ির দিকে উঠে যাবার সময় ভাবল—আমি ফিরব না। আমার মা নেই বাবা থেকেও নেই। আমি ফিরব না। আমার পাপ হবে। এ-সময় কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল শরীরে। রসের শরীর ভিজছে।

রাতে টিনের ঘরে শুয়ে কোথাও বাজ পড়ার শব্দ পেল। তার পর ঘন বৃষ্টি। বৃষ্টিরা যেন টিনের চালে নেচে বেড়াচ্ছে। বুড়ির কথা মনে হল রসের। বুড়িকে নিয়ে একদিন বৃষ্টির জলে ভিজবার ইচ্ছা হল, অথবা আম

কুড়োবার। সে শুয়ে শুয়ে বুড়ির প্রতি স্বগতোক্তি করল : বুড়ি এই জলে চাষ হবে। এই জলে ধানের চারা পাটের চারা বড় হবে। এই জলে জলে একদিন এই দেশটা বর্ষায় ভাসবে ; তখন ঘাটে ঘাটে নৌকা, দত্তদের পুকুর, মাঝিবাড়ির পুকুরে যত নৌকা ডোবানো আছে সব ভাসানো হবে। তখন এ-বাড়ি ও-বাড়ি নদীর এপার ওপার মনে হবে।

গ্রীষ্মের অসহিষ্ণু গরমের ভিতর এইসব ঘটনাগুলো ঘটল অথবা রস এই-সব ঘটনার ভিতরে নিজেকে প্রত্যক্ষ করল। উত্তর-পশ্চিম থেকে কাল বৈশাখীরা এল—রস সেই ঝড়ে আম কুড়িয়েছে। গাঁয়ের পেঁপেগাছ একটাও থাকল না। আমগাছ থেকে সব বড় বড় ডাল ভেঙে পড়ল। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাল। জানালা দিয়ে শিলাবৃষ্টি গড়িয়েছে—রস এইসব দেখছে। গাঁয়ের বুড়োদের আড্ডা তেমন জমছে না। ওরা বলল, বড় উত্তেজনার অভাব। যুদ্ধ কোথায় লাগবে শোনা যাচ্ছিল—তারও কোন খবর নেই। অনেকদিন পর দত্তর বড়ছেলে শহরে যাচ্ছে। বুড়োরা বলল. একটা খবরের কাগজ নিয়ে আসবে বাপু। একদিনের পথ হেঁটে গিয়ে রেলগাড়ি ধরতে হবে—সাবধানে যাবে বাপু। আর এইসব ঘটনার ভিতর রস দেখল—এদেশে বর্ষাকাল লেগেছে। ঘাটে দাঁড়িয়ে বুড়ি ডাকছে, রস আমাকে পার করে নিয়ে যা।

রস একদিন বুড়ির মাকে বড় বড় পুঁটি মাছ ধরে দিল।

বুড়ি একদিন রসকে বলল, 'শাপলা তুলতে যাবি রস। গতবার যেখানে আমরা শাপলা তুলতে গেছিলাম, গতবার বঞ্চিত যেখানে ডুব দিয়ে মাটি তুলেছিল। যাবি রস ?'

ওরা নৌকা নিয়ে হিজলের ছায়া ভেঙে বেত ঝোপের পাশে এক-চিলতে জলা-জমির উপর নৌকা ভিড়াল। এখানে এখন এক লগি জল। বেতের জঙ্গলগুলো জলের নীচে ডুবে আছে। এখন এখানে টুনিফুলের লতার ঝোপ—কড়ুই গাছ ধরে ধরে অথবা বোন্নাগাছের ডালে ডালে জড়িয়ে আছে। টুনি ফুলেরা গুচ্ছ গুচ্ছ হয়ে ফুটে আছে! তার পাশের চিলতে জমিটুকুতেই ওরা পালি শাপলা তুলতে এসেছে। পুঁটি মাছ ধরারও ইচ্ছা। এখানে ধান নেই, পাট নেই জমিতে, শুধু জল, শুধু শালুক ফুল। জলের নীচে শ্যাওলারা সব বড় হচ্ছে। জলের নীচে ছোট ছোট মাছেরা খেলছে। ওরা প্রথমে কোষা নৌকার পাটাতন থেকে উঁকি দিয়ে দেখল জলে। মাছেরা খেলছে। কিন্তু কোন পুঁটি মাছের ঝাঁক এসে খেলছে না কিংবা থামছে না, থেমে শ্যাওলা খাচ্ছে না। ওরা তবু অনেকক্ষণ ধরে পুঁটি মাছের ঝাঁক খুঁজল। তারপর কোথাও কিছু না পেয়ে রস জলে লাফ দিয়ে পড়ল এবং সাঁতার কাটতে

থাকল। দু' একটা শাপলা তুলে বুড়িকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'ধর।'

তারপর রস বলল, 'নামবি জলে? দুজনে সাঁতার কাটব।'

'—অবেলায় স্নান করলে মা বকবে।'

রস বলল, 'জামা খুলে নে, মা টের পাবে না।'

ভাদ্রমাসের গরম এবং রসের এই ডুবে ডুবে সাঁতার কাটা বুড়িকে পাটাতনে বসে থাকতে দিচ্ছে না। বুড়ি স্নান করার ইচ্ছায় অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। তবু দীর্ঘদিন পর রসের সামনে গা আলগা করতে ওর সংকোচ হচ্ছিল। বুড়ির মনে হল এই দীর্ঘ এক বছরে সে যেন অনেক বড় হয়েছে এবং অনেক কিছু বুঝতে শিখেছে। সেজন্য বুড়ি চুপচাপ বসে থাকল পাটাতনে।

রস এখন পাঁতিহাসের মত সাঁতার কাটছে। অথবা পানকৌড়ির মত। ডুব দিচ্ছে রস, ডুব দিয়ে অনেক নীচে নেমে নেমে শ্যাওলার জঙ্গল স্পর্শ করার এবং ডুবে অথবা জলে ভেসে বেড়ানোর শখ। স্বচ্ছ জলে রসর শরীরে বিকেলের নিঃসঙ্গ রোদ হলুদ হতে হতে নীল অথবা বেগুনী রঙ ধরছে। স্বচ্ছ জলের নীচে রসের শরীরটা—বুড়ি পাটাতনে বসে দেখতে থাকল। নিঃসঙ্গ রোদে, আতাবেড়ার মত ঘন পাটগাছের গোপনীয়তায় শরীরের গরম ভাবটুকু নষ্ট করার ইচ্ছায় জলে, তারপর জলের গভীরে নেমে যাবার ইচ্ছা হতে লাগল।

রস বলল, 'ডুব দিয়ে মাটি তুলব?'

বুড়ি পাটাতনে বসে হাতে জল টেনে নৌকা কাছে নিয়ে বলল, 'পারবি না। এখানে এক লগি জল। ডুব দিয়ে মাটি তুলতে পারবি না।'

রস জবাব না দিয়ে জলে ডুব দিল। সে নীচে জলজ ঘাসের জঙ্গল অতিক্রম করে নীচে, নীচে নেমে গেল। ফটিক জলে রোদের পাতলা আলোয় সে শ্যাওলার জঙ্গল দেখতে পেল। জলে স্রোত বইছে। শ্যাওলার জঙ্গলেরা যেন নাচছে। সে সন্তর্পণে শ্যাওলার জঙ্গল অতিক্রম করে আঁধারে ঢুকে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে দু' সাল আগে মৃত পাহাড়ী সাপটার শরীর এবং বীভৎসতা ওর চোখের উপর ভেসে উঠল। সে ভয়ে আর নীচে নেমে যেতে পারছে না।

বুড়ি পাটাতনে বসে দেখল—স্বচ্ছ জলে রসের শরীর ভয়ানক দৃঢ়। সে নেমে যাবেই এমত প্রত্যয়ে জলের নীচে কোলা ব্যাঙের মত পা চালাচ্ছে। বিচিত্র সব জলজ ঘাসের ভিতর ঢুকে যেতেই বুড়ি রসকে আর দেখতে পেল না। বুড়ি জলের উপর কিছু ফুটকাটি দেখল। জলজ ঘাসের ভিতর রসের পা আটকে যাচ্ছে বুঝি—বুড়ি উত্তেজনায় পাটাতনে বসে থাকতে পারছে না। এই নির্জন জায়গায় অপরিণত বোধটুকু ওকে আকুল করে তুলছে। এখানে

কেউ নেই। কিছু পাখি, কিছু ফড়িং, শালুক ফুল, কিছু নীল প্রজাপতি। দু' পাশে, সামনে পাটের জমি, পাটগাছ। সামনে আতাবেড়ার মত আড়াল। পিছনে বিস্তীর্ণ চেতনাদের জঙ্গল। রসও এখন জলের উপর ভেসে নেই। সুতরাং সে নিঃসংশয় হতে পারছে। সে তাড়াতাড়ি জামা রেখে জলে লাফ দিয়ে পড়ল। এবং কোষা নৌকার অন্যপাশে শরীর আড়াল দিয়ে সাঁতরাতে থাকল।

রস জলের উপর ভেসে দেখল বুড়ি পাটাতনে নেই, নৌকায় নেই।—বুড়ি! বুড়ি! সে ডাকল। কোন সাড়া নেই! সে ফের ডাকল, বুড়ি! বুড়ি!

নৌকার অন্যপাশ থেকে মাথা তুলে বুড়ি বলল, কি-ই।

—মাটি তুলতে পারলাম নারে। অন্ধকারে নেমে যেতে ভয় করল আমার।

বুড়ি বলল, 'ভয় কি রে! তুই পারলি না, দ্যাখ আমি পারি।' বলে বুড়ি হাসল। 'এই দ্যাখ'—বলে, বুড়ি জলে ডুব দিল। কিন্তু জলজ ঘাসের নীচে ঢুকে শ্যাওলার জঙ্গলে হারিয়ে যাবার আগেই সেও যেন দেখল সেই হিজলের নীচে গুলিতে আহত মৃত অজগর সাপের শরীর এবং বীভৎসতা ওকে গ্রাস করতে আসছে। সে তাড়াতাড়ি উপরে উঠে বলল, 'নারে রস হল না।' এবং ওরা দেখল তখন নৌকাটা কাছে নেই—দূরে স্রোতের টানে ভেসে গিয়ে দুটো মাদার গাছের ভিতর আটকে আছে। বুড়ি শরীর ঢাকার জন্য ফের ডুব দিতে চাইলে রস বলল, 'তোকে আমি ছুঁই বুড়ি।'

—পারবি না। বলে বুড়ি জলে ডুব দিয়ে হারিয়ে গেল।

ওরা জলের নীচে নেমে, জলের উপর ভেসে অথবা ঘুরে ঘুরে, ডুবে ডুবে সাঁতার কাটল। ওরা ঘুরে ঘুরে শাপলা তুলল, শালুক ফুল সংগ্রহ করল। ওদের মাথার উপর দিয়ে কিছু জলপিপি কিছু বালিহাঁস উড়ে গেল। এ জলাতে বসতে এসে ওরা ফিরে গেল। জলের উপর ভেসে ভেসে বুড়ি অন্যমনস্ক হচ্ছে—এইসব পাখিদের দেখে। এই জগতে রসকে দেখে ফের মাসিমার বিয়ের গল্প, মাসিমার বরের মুখ এবং রাতের কিছু কিছু ঘটনার কথা ওকে যেন পরিণত বোধে নিয়ে যেতে চাইছে। রসকে সেজন্যই যেন বলল, 'আমি মরে যাই, রস?'

রস বলল, 'মরে যা।'

বুড়ি বলল, 'তুই ত মাটি তুলতে পারলি না। বণ্ডিত হলে ঠিক মাটি তুলত। গতবার মনে নেই বণ্ডিত এক ডুবে মাটি তুলেছিল।'

—আমিও তুলেছিলাম।

—বাণ্ডত তোর হাত ধরেছিল বলে। একা তুই পারিস নি।

রসের গলার স্বর কেমন কোমল শোনাল। 'আমি পারি বুড়ি। কিন্তু নীচে নেমে শ্যাওলার জঙ্গলে ঢুকে গেলেই—ছোট তরফের বড়বাবু দু' সাল আগে হিজল গাছে যে বড় অজগর সাপটা মেরেছিল, তার মত দুটো চোখ দেখতে পাই। ভয়ে আর নীচে নামতে পারি না।'

—ভীতু কোথাকার। মাসিমার বিয়ের গল্প বাণ্ডতকে বললে সে লাফিয়ে পড়ত। তুই ত ভয় পেলি। ভীতু কোথাকার।

রস কোন কথা বলল না। বললেও যেন এ-রকম শোনাত ঃ বাণ্ডতের মত করে আমাকে ভাবিস না বুড়ি। আমিও মাটি তুলতে পারি, পারি। সে ধীরে ধীরে নৌকায় উঠে গেল। নৌকার পাটাতনে কিছুক্ষণ ঘাড় গুঁজে বসে থাকল। বুড়ি-ও ধীরে ধীরে উঠে এসে জামা পরল, রসের পিঠে পিঠ দিয়ে বসে পড়ল। ওরা পরস্পর কোন কথা বলল না। ওরা পরস্পর অপরিচিতের মত ব্যবহার করল। এবং রোদে শরীরের জল মুছে ওরা সোনালী বালির নদীতে গয়না নৌকার হাঁক শুনল—দাউদ, পরাপরদী, নারানগঞ্জ।

বুড়িই প্রথম কথা বলল, 'বড় হলে আমার বিয়ে হবে।'

রস বুড়ির মুখ দেখল। ঘন গভীর চোখে বুড়িকে বয়সী মনে হচ্ছে। রস সহসা নিজেও কেমন বয়স্ক লোকের মত ব্যবহার করতে গিয়ে ফের বলল, 'আমার মা নেই, বাবা থেকেও নেই—যদি পাপ হয় বুড়ি!' এবং রস ঘন হতে গিয়েই ডাক শুনল দূরে ঃ বুড়ি···ই। বুড়ি···ই·ই।

রস ভয়ে ভয়ে বলল, 'বুড়ি তোকে তোর বাবা ডাকছে।'

—কি হবে রস! বুড়ি ভয়ে ভয়ে উচ্চারণ করতে গিয়ে ভয়ে কাঠ হয়ে গেল।

ওরা দেখল উভয়ে, দূরে পাটের জমির অন্য পাশে নৌকার লগিটা উঠছে এবং নামছে। নৌকাটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। বুড়ি জড়বৎ হয়ে বসে আছে ভয়ে। রস বলল, 'তাড়াতাড়ি জলে নাম বুড়ি। নৌকোটা ঝোপে ঢুকিয়ে আয় আমরা জলে ডুব দিয়ে থাকি। আমাদের দেখতে পাবে না। চিলতে জমিটা পার হলে আমরা ভেসে উঠব।' এই বলে রস বুড়ির হাত ধরে জলে নেমে গেল।

বুড়ি বলল, 'আমি ডুব দিয়ে যে বেশীক্ষণ নীচে থাকতে পারি নারে। কেবল ভেসে উঠি।'

রস বলল, 'তুই কেবল আমার হাত ধরে থাকবি। আমি শ্যাওলার জঙ্গলে ঢুকে শাপলার গুঁড়ি ধরে চুপ করে বসে থাকব।'

যখন নৌকাটা মাঝি বাড়ির খাল থেকে উঠে চিলতে জমিটাতে পড়বে, তখনই ওরা পরস্পর হাত ধরে জলের নীচে নেমে গেল। জলের নীচে নেমে যেতে যেতে ওরা যেন দূরে ফের অজগর সাপের চোখের মণি দেখতে পেল। তবু নিজেদের লুকোবার জন্য ওরা শ্যাওলার জঙ্গলে ঢুকে যেতে থাকল। তখনও যেন সেই মৃত সাপ, ওর দুটো মৃত চোখ রসের বোধ ভীত করে তুলছে। রস পারছে না, বুড়ি পারছে না, তবু শ্যাওলার জঙ্গল অতিক্রম করে শালুক লতার গুঁড়ি ধরে বসে থাকবার চেষ্টা করল ওরা। ওরা বসে থাকতে পারছে না, ভয়ে উপরে ভেসে উঠতে পারছে না। ওদের মুখ থেকে ফুটকরি উঠছে। ওরা পরস্পর ছটফট করতে করতে ভেসে ওঠবার চেষ্টায় রত। সহসা মনে হল ওরা উপরে ভেসে উঠতে পারছে না। শালুক লতার ভিতর অথবা জলজ ঘাসের অন্ধকার অতিক্রম করে কোনও পথ পাচ্ছে না। ওরা ক্রমশ জলজ ঘাসের ভিতর শালুক লতার ভিতর জড়িয়ে যেতে থাকল। এবং ওরা উপরে ভেসে ওঠবার প্রাণপণ চেষ্টায় একে অপরকে ধীরে ধীরে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করছে। পরস্পর মৃত্যুর শঙ্কায় ছটফট করছে। ওরা ছটফট করতে করতে একসময় শালুক লতার ভিতর স্থির হয়ে গেল। ওদের এই মৃত্যুর সাক্ষী হয়ে কিছু ফুটকরি জলের উপর ভেসে এক সময় মিলিয়ে গেল।

নাপিত বাড়ির উঠোনে পাশা খেলার চত্বরে ফের উত্তেজনা। গুলিতে নিহত অজগর সাপের মৃত্যুর পর এমন উত্তেজনার কারণ গাঁয়ে আর ঘটেনি। ঘরে ঘরে বলাবলি করল—নৌকা, রস, বুড়ি। কেউ কোথাও নেই। শুধু ঈসম বলেছিল, সোনালী বালির নদীতে জ্যোৎস্না রাতে কার একটা নৌকা স্রোতের মুখে নেমে গেছে। এবং যখন বর্ষার জল নেমে গেল, যখন জলজ ঘাসেরা পচতে পচতে মাটির সঙ্গে মিশে গেল এবং শালুক লতারা শুকিয়ে শুকনো হয়ে গেল তখন গাঁয়ের সকলে এই জমির আলে দাঁড়িয়ে দেখল যেন দুটো নরকঙ্কাল একে অপরের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হচ্ছে।

মনীষার দুই প্রেমিক
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আমি মনীষাকে ভালবাসি। মনীষা আমাকে ভালবাসে না। মনীষা অমলকে ভালবাসে।

ব্যাপারটা এরকমই সরল। কিন্তু অমল সম্পর্কে আমার একটা দুশ্চিন্তা থেকে যায়। এক বিশাল সন্ধেবেলা দিকচিহ্নহীন মন্থর আলোর মধ্যে অমল ও মনীষাকে যখন আমি পাশাপাশি দেখতে পাই—অমলের চওড়া কব্জির ধার ঘেঁষে মনীষার মসৃণতা, সামান্য গ্রীবা তুলে মনীষা রাসবিহারী অ্যাভিনিউকে কৃতজ্ঞ ও ধন্য করে—আমি তখন একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলি। যাক্. একই বাতাসের মধ্যে তো আমরা আছি! অমল, তুমি সৎ হও, আরও বড় হও, কতখানি দায়িত্ব এখন তোমার ওপর। অমল তুমি পারবে তো? নিশ্চয়ই পারবে, কেন পারবে না? আমি সর্বান্তঃকরণে তোমাকে সাহায্য করবো।

অমল বিমান চালায়। ভোরবেলা একটা স্টেশন ওয়াগন এসে অমলের বাড়ির সামনে হর্ন দেয়, অমল বেরিয়ে আসে—তখনও চোখে মুখে ঘুম, কিন্তু সাদা পরিচ্ছদে তাকে কী সুন্দর দেখায়! দাড়ি কামাবার পর অমলের গালে একটা নীলচে আভা পড়ে, ঠোঁট দুটি ওর ভারী পাতলা—সিগারেট ঠোঁটে চেপে কথা বলবার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে টুপ করে সিগারেটটা খসে পড়ে যায়। স্টেশন ওয়াগনে উঠে অমল ফের নিজের বাড়ির তিনতলার জানালার দিকে তাকায়। একটু পরেই দমদম থেকে অমল ইস্তাম্বুল উড়ে চলে যাবে। আবার ফিরেও আসবে।

অমল বিমান চালায়। অমল মোটরগাড়ি চালাতে জানে কিনা—আমি ঠিক জানি না। কিন্তু একথা জানি, অমল সাইকেল চালাতে

পারে না। অমল কি সাঁতার জানে? খোঁজ নিতে হবে তো! সাইকেল ও সাঁতার দুটোই আমি জানি, দেওঘর থেকে ত্রিকূট পাহাড় পর্যন্ত সাইকেল চালিয়ে গিয়েছিলাম একবার, গিরিডিতে উশ্রী জলপ্রপাতে একবার সাঁতার কাটতে গিয়ে স্রোতের টানে পড়ে বহুদূরে ভেসে গিয়েছিলাম, বাঁচবো এমন আশা ছিল না তবুও তো বেঁচে গেছি। কিন্তু ছি ছি এসব আমি কি ভাবছি! আমি কি গর্ব করবো নাকি এ নিয়ে? ভ্যাট। সাইকেল কিংবা সাঁতার জানা এমন কিছুই না! ও তো কত হেঁজিপেঁজি লোকেও জানে। কিন্তু অমল বৈমানিক, দৃঢ় স্বাস্থ্যময়, গৌরবর্ণ উজ্জল মুখ অমল, নীলিমার বুক চিরে রুপালী বিমান নিয়ে উড়ে যায় ইস্তাম্বুল কিংবা সাও পাওলো বন্দর পর্যন্ত। আবার ফিরে আসে। কিন্তু অমল, তোমাকে আরও মহীয়ান হতে হবে। সবার চোখে পড়ে না, কিন্তু আমি জানি, একটু ভালো করে লক্ষ করলেই দেখা যাবে, মনীষার পা পৃথিবীর মাটি ছোঁয় না। এই ধুলোবালির নোংরা পৃথিবী থেকে কয়েক আঙুল উঁচুতে সে থাকে। মনে আছে, সেই বৃষ্টির দিনের কথা? একটু আগেও রোদ ছিল, হঠাৎ সব মুছে গিয়ে খয়েরি রঙের ছায়া পড়লো সারা শহরে, আকাশ ভেঙে বৃষ্টি এল। আমি ছুটে একটা গাড়িবারান্দার নিচে দাঁড়ালাম। দেখতে দেখতে রাস্তায় হাঁটু সমান জল জমলো, গাড়ি-ঘোড়া অচল হল, বৃষ্টির তখনও সমান তেজ। জলের ছাটে ভিজে যাওয়া সিগারেট টানতে যে রকম বিরক্তি, সেই রকম বিরক্ত বা বিমর্ষভাবে আমি দীর্ঘক্ষণ বৃষ্টি থামার অপেক্ষায় ছিলাম। এমন সময় মনীষাকে দেখতে পাই, দু'জন সখীর সঙ্গে সে জল ভাঙতে ভাঙতে উচ্ছল হয়ে আসছে। আমাকে ডাকতে হয়নি, মনীষাই সব জায়গায় সকলকে দেখতে পায়—মনীষাই আমাকে দেখে চেঁচিয়ে বললো, এই বরুণদা, একা একা দাঁড়িয়ে আছেন কেন? আসুন, আসুন, চলে আসুন! আজ বৃষ্টিতে ভিজবো!

জলের মধ্যে মানুষ ছুটতে পারে না, কিন্তু আমার ইচ্ছে হল ছুটে যাই। একটু আগেও গায়ে সামান্য জলের ছাট অপছন্দ করছিলুম, কিন্তু তখন মনে হল হাঁটু গভীর জলে সাঁতার কাটি। সখী দু'জন ইডেন হসপিটাল রোডের হস্টেলে চলে গেল, আমি আর মনীষা মাঝরাস্তা দিয়ে হাঁটছি জল ভেঙে ভেঙে, তখনও অঝোরে বৃষ্টি, সারা রাস্তায় আর কেউ নেই, সব পায়রারা খোপে ঢুকে গেছে—চুপচুপে ভিজে গেছি আমরা দু'জনে, মনীষার কানের লতিতে মুক্তোর দুলের মতন টলটল করছে এক ফোঁটা জল, এইমাত্র সেটা খসে পড়লো। সেদিনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, মনীষা

অন্য কারুর মতো নয়—এই চেনা পৃথিবী, এই নোংরা জল কাদা, রাস্তার গর্ত, ভেসে যাওয়া মরা বেড়ালছানা—এসবের মধ্যে থেকেও মনীষা এত আনন্দ পাচ্ছে কি করে? বেড়াতে গেলে মানুষ এমন আনন্দ পায়—মনীষা যেন অন্য গ্রহ থেকে এখানে দুদিনের জন্য বেড়াতে এসেছে। আমরা এখানকার শিকড়-প্রোথিত অধিবাসী, অনেক কিছুই আমাদের কাছে একঘেয়ে হয়ে গেছে—মনীষার কাছে সব কিছুই নতুন এবং আনন্দোজ্জ্বল।

বৃষ্টির মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে ওয়েলিংটন পর্যন্ত চলে আসি। এই সময় ট্যাক্সি পাওয়া কত কঠিন, কিন্তু একটা খালি ট্যাক্সি এসে আমাদের পাশে দাঁড়ায়, বিশালকায় ড্রাইভার ক্রীতদাসের মতন বিনীত ভঙ্গিতে মনীষার দিকে চেয়ে বলে, আসুন! যেন তার নিয়তি তাকে মনীষার কাছে পাঠিয়েছে, তার আর উপায় নেই। মনীষা হঠাৎ আবিষ্কারের মতন আনন্দে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, এবার ট্যাক্সি চড়বেন? যতক্ষণ বৃষ্টি না থামে, ততক্ষণ ঘুরবো কিন্তু!

দরজা খোলার পর মনীষা যখন নিচু হয়ে ঢুকতে যায়, তখন তার ফর্সা পেট আমার চোখে পড়ে, জলে ভেজা নাভি, দার্জিলিং-এর কুয়াশায় আমি একদিন এই রকম চাঁদ দেখেছিলাম। আঁচল নিংড়ে মুখ মুছতে মুছতে মনীষা বলে, আঃ যা ভালো লাগছে আজ! এই বরুণদা, আপনি অত গম্ভীর হয়ে আছেন কেন? আমি বিনা দ্বিধায় মনীষার কাঁধে হাত রেখে বলি, তুমি একদম পাগল। বৃষ্টিতে ভিজতে এত ভালো লাগে তোমার?

—ভীষণ! ভীষণ! বৃষ্টিতে ভিজলেও আমার কখনো ঠাণ্ডা লাগে না।

—তুমি তাকাও তো আমার দিকে। তোমাকে ভালো করে দেখি।

—ভালো করে দেখবেন? আমি পাগল না আপনি পাগল?

—তা হলে দু'জনেই।

—মোটেই না, আপনার সঙ্গে সঙ্গে আমিও পাগল হতে রাজী নই। এ কথা বলার সময়েও মনীষা আমার দিকে ঘুরে তাকায়। নির্নিমেষে আমি দেখি। সুকুমার ভুরুর নিচে দুটি দ্বিধাহীন চোখ, এই যে নাক—ইতালীর শিল্পীরা এক সময় এই রকম নাক সৃষ্টি করেছে, উড়ন্ত পাখির ছড়ানো ডানার মতো ঠোঁটের ভঙ্গি, একটু দুষ্টু দুষ্টু হাসি মাখানো। একথা ঠিক, ওর ভেজা শাড়ি-ব্লাউজের রং ভেদ করে জেগে ওঠা রুপোর জামবাটির মতন স্তন আমার চোখে পড়লেও, সেখানে হাত দিতে ইচ্ছে করেনি, ইচ্ছে করেনি কুয়াশায় আধো-ভেজা চাঁদ ছুঁতে। এক এক সময় হয় এ রকম, তখন

সৌন্দর্যকে নষ্ট করতে ইচ্ছে হয় না। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, মনীষার সেই সিক্ত সৌন্দর্যের পাশে আমার লোমে ভরা শক্ত হাতটা সেই মুহূর্তে মানাবে না। আমার ইচ্ছা হয়েছিল, মনীষা আরও হাসুক, উচ্ছল হাসির তরঙ্গে ওর শরীর কেঁপে কেঁপে উঠুক, তা হলেই ওর রূপ আরও গাঢ় হবে। কিন্তু কি করে ওকে আরও খুশী করবো—ভেবেই পাচ্ছিলাম না। আমি বললাম, মনীষা, ভাগ্যিস তোমার সঙ্গে দেখা হল, নইলে আমি বোধহয় এখনও বোকার মতন সেই গাড়ি-বারান্দার নিচেই দাঁড়িয়ে থাকতাম!

রাস্তার জলের দিকে তাকিয়ে মনীষা বললো, দেখুন দেখুন, কি রকম ঢেউ দিচ্ছে ঠিক নদীর মতন।

—তুমি এদিকে কোথায় এসেছিলে?

—ইউনিভার্সিটিতে। লাইব্রেরির দুখানা বই ছিল ফেরত দিয়ে গেলাম। ইউনিভার্সিটির সঙ্গে সম্পর্ক চুকে গেল।

—কেন, তুমি রিসার্চ করবে না?

—ঠিক নেই। আপনি ওখানে দাঁড়িয়েছিলেন কেন?

—তুমি আসবে, সেই প্রতীক্ষায় ছিলাম।

চোখে চোখ রাখলো, একটু হাসল, হাসি মিশিয়েই বললো, সত্যি, কোনোদিন আমার জন্য প্রতীক্ষা করবেন? আপনি যা অহংকারী।

অমল আমাদের বাড়ির তিনখানা বাড়ি পরে থাকে। আমি নয়, সত্যি-কারের অহংকারী হচ্ছে অমল। পাড়ার কোনো লোকের সঙ্গে মেশে না। আমাকে দেখেছে, মুখ চেনে, তবু আমার সঙ্গে কোনোদিন কথা বলেনি। তা হোক, তবু অমলকে আমি পছন্দ করি। অমলের চেহারায় ব্যবহারে একটা দীপ্ত পৌরুষ আছে—অহংকারের যোগ্য সে, আমি ঐরকম অহংকার দেখতে ভালবাসি। সপ্তাহে তিনদিন অন্তত অমল কলকাতায় থাকে, ছুটির দিন সকালে, ন'টা আন্দাজ অমল বাড়ি থেকে বেরোয়, তার গভীর ভুরুর নিচের চোখ দুটিতে তখনও ঘুম লেগে থাকে—ধবধবে পাজামা ও পাঞ্জাবি পরা, পাঞ্জাবির হাতা গোটানো, পথের দু' পাশে না তাকিয়ে অমল হাজরার মোড় পর্যন্ত যায়, অধিকাংশ দিনই সে ল্যান্সডাউন রোড ধরে হাঁটতে থাকে—অমলকে আমি কোনোদিন বাসে উঠতে দেখিনি, দেশপ্রিয় পার্কের কাছে এসে অমল একটু দাঁড়ায়, সিগারেট ধরিয়ে অমল এবার পূর্ণ চোখ মেলে চৌরাস্তার মানুষজন দেখে। বস্তুত, পথের সমস্ত মানুষও একবার অমলকে দেখে, এমনই তার পৃথক ব্যক্তিত্ব। তখনও মনীষার সঙ্গে অমলের পরিচয় তত প্রগাঢ় হয়নি, অমল রাস্তা পেরিয়ে সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের দিকে তার এক বন্ধুর বাড়িতে

চলে যায়।

একদিন নয়, অমলকে দেখতে ও চিনতে আমার সময় লেগেছে। আগে আমি অন্যমনস্কভাবে অমলের প্রশংসাকারী ছিলাম। অথবা, তার ঠিক পটভূমিকায় তাকে আমি দেখিনি।

হঠাৎ দেখা না হলে মনীষার সঙ্গে দেখা হওয়ার কোনো উপায় নেই। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত সব জায়গায় মনীষার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। দিল্লী থেকে কয়েক দিনের জন্য এসেছে কোনো বন্ধু, তার সঙ্গে দেখা করতে গেছি—সেখানে সমস্ত বাড়িতে তার অস্তিত্ব ঘোষণা করে রয়েছে মনীষা। সেই বন্ধুর সঙ্গে ওর কি রকম আত্মীয়তা। সাদা সিল্কের শাড়িতে মনীষাকে খুবই হাল্কা, প্রায় অপার্থিব দেখায়—আমার কাছে এসে মনীষা বলে, একি, আপনার জামার মাঝখানের বোতামটা লাগাননি কেন? অবলীলায় মনীষা আমার বুকের খুব কাছে দাঁড়িয়ে বোতাম লাগিয়ে দেয়।

মনীষাদের বাড়িতে আমি কখনো যাবো না। ঐ বিশাল বাড়িতে অন্তত সাতখানা ঘর ফাঁকা থাকে, যদি সেখানে কোনোদিন আমি দস্যু হয়ে উঠি? যদি রূপ-হন্তারক হতে সাধ হয় আমার? মনীষা একদিন আয়নার সামনে দাঁতে ফিতে কামড়ে চুল বাঁধছিল, আমি ওর পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম—সেই দৃশ্যটা আমার বুকে বিঁধে আছে। সেই দৃশ্যটা আমি ভুলতে পারি না। মনীষা আমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে—কিন্তু আয়নার মধ্যে আমরা দু'জনকে দেখছিলাম—আমরা দুজনে একই দিকে তাকিয়ে—অথচ দুজনকে আমরা পরস্পর দেখতে পাচ্ছি—মনীষার আঁচলটা বুক থেকে খসে পড়বো পড়বো—অথচ খসেনি, কি এক অসম্ভব কায়দায় সে দুটি মাত্র হাতে চুল, চুলের ফিতে, চিরুনি এবং আঁচল সামলাচ্ছে—চোখে দুষ্টু দুষ্টু হাসি। মনীষা কখনো অপ্রতিভ হয় না—পিছনে আমাকে দেখতে পেয়ে বললো, কি মেয়েদের প্রসাধনের রহস্য দেখার খুব ইচ্ছে বুঝি? ঠিক আছে, দাঁড়িয়ে থাকুন, দেখবেন—আমি এগারো রকমের স্নো-পাউডার মাখবো।

আমি বললুম, ওরে বাবা, এত সাজ-পোশাক, কোথাও বেড়াতে যাবে বুঝি?

—হুঁ।

—কোথায়?

—ছাদে।

আয়নার ফ্রেমের মধ্যে দেখা সেই এক শ্রেষ্ঠ শিল্প। সেই শিল্পের মধ্যে আমার স্থান ছিল না। আমি নিজেকে সেখান থেকে সরিয়ে নিলুম। কিন্তু

মুশকিল এই, আয়নার মধ্যে নিজের মুখের ছায়া না ফেলে অন্য কিছুও যে দেখা যায় না।

সেইরকমই এক রবিবারের সকালে অমল ল্যান্সডাউন রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে মোড়ে এসে পেঁছিলো, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ ধরে আসছিল মনীষা, দেশপ্রিয় পার্কের কাছে ওরা ঠিক সমকোণে মিলিত হল - সম্ভ্রমপূর্ণ ভদ্রতার সঙ্গে অমল মনীষাকে বললো, কি ভালো আছেন ?

মনীষা উদ্ভাসিত মুখে বললো, আরেঃ আপান ? আপনি ব্যাংকক গিয়েছিলেন না ? কবে ফিরলেন ?

— কাল সন্ধেবেলা।

—পরশু গিয়ে কাল ফিরে এলেন ?

অমল সংযতভাবে হেসে বললো, হ্যাঁ। আপনি এখন কোন্‌দিকে যাবেন ?

—একটু লেক মার্কেটের কাছে যাবো।

- চলুন, এক সঙ্গে যাওয়া যাক্।

সেই প্রথম আমি অমলকে সোজা না গিয়ে ডানদিকে বেঁকতে দেখলাম। আমি খুব কাছেই দাঁড়িয়েছিলাম। মনীষা আমাকে দেখতে পায়নি। সেই প্রথম মনীষা আমাকে দেখতে পেল না। কিন্তু আমি ওকে ডাকিনি কেন ? আমি ডাকলে মনীষা আমার সঙ্গেই যেতো—অমলের সঙ্গে যেতো না— অমলের সঙ্গে ওর তখনও তেমন গাঢ় চেনা ছিল না। কিন্তু আমি ডাকিনি কেন ? ঠিক জানি না। হঠাৎ মনে হয়েছিল, মনীষা আর অমল যদি কখনো পাশাপাশি আয়নার সামনে দাঁড়ায়, অমলকে সরে যেতে হবে না।

ওদের দুজনকে বড় সুন্দর মানায়। বুকটা টনটন করে উঠেছিল। পরমুহূর্তে ভেবেছিলাম, ধ্যাৎ। চেহারাই কি সব নাকি ? আমি একটু বেশী রোগা—কিন্তু রোগা মানুষরা কি ভালবাসার যোগ্য হতে পারে না ?

জি. এম আমাকে তার ঘরে ডেকে বললেন, তুমি তো বিয়ে করো নি, সন্ধেগুলো কাটাও কি করে ?

অফিসে জি এম-এর মুখ থেকে এরকম প্রশ্ন আশা করিনি। সামান্য হেসে বললুম, কি আর করবো, বাড়ি ফিরে স্নান করি, তারপর চা খেয়ে বইটই পড়ি, রেকর্ড শুনি।

—সে কি হে ? আর কোনো এন্টারটেইনমেন্ট নেই ? তবে যে শুনি তোমাদের মতন ইয়াংম্যানদের জন্য কলকাতা শহরে, মানে, অনেক নাইট স্পট।

—স্যার, ব্যাপারটা কি বলুন তো ?

—শোনো, দিল্লী অফিস থেকে মিঃ চোপরা আসছেন। ওঁকে আমরা আজ গ্র্যাণ্ডে ডিনার দিচ্ছি। তুমিও থাকবে। মিঃ চোপরা একটু ইয়ে মানে লাইট স্বভাবের লোক, তুমি ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ওকে নিয়ে কলকাতার নাইট লাইফ একটু দেখিয়ে আনবে।

—নাইট লাইফ মানে ?

—সে আমি কি বলবো ? তোমরা ইয়াংম্যান যা ভালো বুঝবে ! চোপরার একটু ফুর্তিটুর্তি করার বাতিক আছে !

—স্যার আমি পারবো না। অন্য কাউকে এ ভার দিন।

—সেকি ? পারবে না কি ? চোপরার সঙ্গে তোমার আলাপ হয়ে থাকলে তোমারই তো সুবিধে। সহজেই লিফ্‌ট পেয়ে যাবে—ওরাই তো হর্তাকর্তা।

—না স্যার, এসব ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা নেই। পাঞ্জাবী তো—ওর সঙ্গে যদি আমার রুচিতে না মেলে।

—পারবে না ? ঠিক আছে, দাসাপ্পাকে বলে দেখি। ওর আবার ইংরেজী উচ্চারণটা ভালো নয়—

সন্ধের পর স্বয়ং জি এম গাড়ি নিয়ে আমার বাড়িতে উপস্থিত। বললেন, শিগগির তৈরি হয়ে নাও, তোমাকেই যেতে হবে। দাসাপ্পার মেয়ে সিঁড়ি থেকে পড়ে গেছে, হাসপাতালে—সে আসতে পারবে না। নাও নাও তাড়াতাড়ি, আটটায় ডিনার।

—কিন্তু স্যার, আমার যে ওসব ভালো লাগে না ! ডিনারের পর আমি আর কোথাও যাবো না কিন্তু।

—বাজে বোকো না ! তোমারই ভালোর জন্য বলছি—চোপরাকে খুশী করতে না পারলে তোমারও বিপদ, আমারও বিপদ। তোমাকে আমি তিনশো টাকা আলাদা দিয়ে দেবো—ডিনারের পর ওকে নিয়ে একটু···

আমাকে ছেড়ে দিন ! আমি পারবো না।

—শুধু শুধু দেরি করছো ! চট্‌পট তৈরি হয়ে নাও, এখন কথা বলার সময় নেই।

চাকরি করতে গেলে বড় কর্তাদের খুশী করতেই হয়—তাও তো আমাদের আমলে আমরা সাহেবদের···

জি এম-কে বসিয়ে রেখেই আমাকে পোশাক পাল্টে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টাই বেঁধে নিতে হল। জি এম আমার সর্বাঙ্গের দিকে তাকিয়ে বললেন ঠিক আছে, জুতোটায় একবার ব্রাশ ঘষে নাও।

ও'র সঙ্গে নিচে নেমে, যখন গাড়িতে উঠছি, সেই সময় হঠাৎ আমার মনে

হল, আমি মনীষার যোগ্য নই।···আমি মনীষার যোগ্য নই। আমি ওপরে ওঠার বদলে আরও নিচে নেমে যাচ্ছি।

মনীষাকে দেখলে রাজহংসীর কথাই প্রথমে মনে পড়ে। পরিষ্কার টলটলে জলে যেখানে রাজহংসী নিজের ছায়া নিজেই দেখে। টাটকা তৈরি ঘিয়ের মতন মনীষার গায়ের রং, ঠোঁট একটু লালচে—এমন সাদা দাঁত শুধু শিশুদেরই থাকে। মনীষার ঠোঁট আর চোখ দুটো সব সময় ভিজে ভিজে, এই চোখকেই ইংরেজীতে বলে 'লিকুইড আইজ'—মনীষাকে আমি কখনও গম্ভীর হতে দেখিনি, বেড়াতে গিয়ে কি আর কেউ গম্ভীর থাকে! ঐ যে বললুম মনীষাকে দেখলেই মনে হয়—এ পৃথিবীর কোনো কিছুই ওর কাছে পুরোনো নয়।

ঠিক চার মাস বারোদিন মনীষাকে দেখিনি। দেখিনি কিংবা দেখা হয়নি, কিংবা মনীষা আমাকে খুঁজে পায়নি। তরপর একদিন লেক স্টেডিয়ামের ধারে মনীষাকে দেখতে পেলাম। মনীষার শরীরের এক-একটা অংশ আমার এক-একদিন নতুন করে ভালো লাগে।

সেদিন চোখে পড়লো ওর পা দুটো। জয়পুরী কাজ করা লাল রঙের চটি পরেছে, কি সুন্দর ঐ পা দুটো—মসৃণ নরম, এ পৃথিবীতে মনীষাই একমাত্র মেয়ে এই ধুলি-মলিন রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলেও যার পায়ে এক ছিটে ধুলো লাগে না! মনে হল, মনীষার ঐ পা দুখানি হাতের মুঠোয় নিয়ে গন্ধ শুঁকলে আমি ফুলের গন্ধ পাবো!

মনীষা হাসলো, অবাক হল এবং অভিমানের সুরে বললো, যান্, আপনার সঙ্গে আর কথা বলবো না!

—কেন? আমি কি দোষ করেছি?

—আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন? আপনি মোটেই আমার কথা ভাবেন না।

—মনি, অভিমান করলে তোমাকে এত সুন্দর দেখায়!

সাড়ে চার মাস বাদে দেখা হলেও পথের মধ্যে মনীষার হাত ধরা যায়। হাত ধরে আমি বললুম, মনি, তুমি এখন কোথায় যাচ্ছো? আমার সঙ্গে চলো—

—এখন? ক'টা বাজে? ওমা, সাড়ে পাঁচটা? একজন যে আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের মোড়ে।

—একজন? একজন তাহলে অপেক্ষা করে আছে? সে তা হলে অহংকারী নয়?

মনীষা ঠিক বুঝতে পারলো না, একটু অন্যমনস্ক ভাবে বললো, আপনি চেনেন তাকে, অমল রায়, চলুন না, আপনিও আমার সঙ্গে চলুন—উনি দাঁড়িয়ে থাকবেন।

একবার লোভ হয়েছিল বলি, না, অমলের কাছে যেতে হবে না—তুমি আমার সঙ্গে চলো! দেখাই যাক্ না একথা বলার পর কি ফল হয়! কিন্তু অতটা ঝুঁকি নিলাম না। আলতোভাবে বললুম, না, তুমি একাই যাও, আমি অন্য জায়গায় যাচ্ছিলাম।

মনীষার চলে যাওয়ার দিকে আমি তাকিয়ে থাকি। আমার কোনো রাগ বা অভিমান হয় না। এতে কোনো সন্দেহ নেই, অমলই মনীষার যোগ্য। কিন্তু অমল, তুমি মনে করো না, তুমি মনীষাকে জিতে নিয়েছো। তা মোটেই না। আমিই মনীষাকে তোমার হাতে তুলে দিলাম। অমল, তোমাকে মনীষার যোগ্য হতে হবে। তুমি বিচ্যুত হয়ো না।

আকাশে অমল বিমান চালিয়ে ইস্তাম্বুল যাচ্ছে—আমার কল্পনা করতে ভালো লাগে—সে বিমানে আর কেউ নেই, মনীষা ছাড়া, ওরা দু'জন শূন্য থেকে উঠে যাচ্ছে মহাশূন্যে, ইস্তাম্বুলের পথ ছাড়িয়ে গেল অজানা পথে—ইস্, ওদের দু'জনকে কি সুন্দর মানায়—শিল্প এরই নাম।

আমার হাত টন্‌টন্ করছে, আমি আর পারছি না, দাঁতে দাঁত চেপে গেছে, মুখ চোখ ফেটে যেন রক্ত বেরুবে, আমি আর পারছি না···না—! আমার ছোট ভাই টাপু ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে, ন্যাড়া ছাদে, পিছোতে পিছোতে হঠাৎ গড়িয়ে পড়ে গিয়েও কার্নিস ধরে ফেলে ঝুলছিল, ওর আর্ত চিৎকারে আমি ছুটে গিয়ে ওর হাত চেপে ধরেছি, কিন্তু টেনে তুলতে পারছি না, চোদ্দ বছরের টাপু এত ভারী, কিছুতেই আর ধরে রাখতে পারছি না, আমার হাত দুটো যেন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছে শরীর থেকে—টাপু একটু একটু করে নিচে নেমে যাচ্ছে আর পাগলের মতন চেঁচাচ্ছে, আমিও একটু একটু এগিয়ে যাচ্ছি—এবার দু'জনেই পড়বো—তিন তলা থেকে শান বাঁধানো ফুটপাথে—প্রাণভয়ে একবার আমার ইচ্ছে হল টাপুকে ছেড়ে দিই। ছেড়ে দেবো, ছেড়ে দেবো, টাপুকে—এখান থেকে পড়লে টাপুকে আর খুঁজে প্যাওয়া যাবে না—টাপু আমাকে টানছে, জলে ডোবা মানুষকে বাঁচাতে গেলে দুজনেই অনেক সময় যেমন মরে—আমিও পাগলের মতন চেঁচাতে লাগলুম—সেই সময় পিছন থেকে কারা যেন তিন-চারজন আমাকে ধরলো—টাপুকেও টেনে তুললো। ঝড়ের বেগে ছুটে এসে মা টাপুকে বুকে চেপে ধরলেন। সেই তিন চারজন আমার পিঠ চাপড়ে ধন্য ধন্য করতে লাগলো। কিন্তু

ওরা জানে না, আমি এক সময় টাপ্‌কে ছেড়ে দিতে চেয়েছিলাম। টাপ্‌কে ফেলে আমি নিজে বাঁচতে চেয়েছিলাম। এমন কিছু অস্বাভাবিক কি? জীবনের চূড়ান্ত মুহূর্তে বেশীর ভাগ মানুষই শুধু নিজের জীবনের কথা ভাবে। টাপুকে মেরে ফেলে নিজে বাঁচতে চেয়েছিলাম। বেশীর ভাগ মানুষই তাই করতো। আমি বেশীর ভাগ মানুষের দলে। এই সব স্বার্থপর বর্ণকালা, অন্ধ মানুষ কেউই প্রেমিক হতে পারে না। নাঃ, আমি মনীষার যোগ্য নই, সত্যিই। অমল মনীষাকে তুমিই নাও। আমি বিনা দ্বিধায় সরে দাঁড়াচ্ছি। মনীষার সঙ্গে আর কোনোদিনই দেখা করবো না।

পরদিনই মনীষাকে টেলিফোন করলাম। আগে কখনও ওকে এমন ভাবে ডাকিনি। মনি, তুমি আগামীকাল ঠিক ছটার সময় লেক স্টেডিয়ামের কাছে আসবে। আসতেই হবে। অন্য হাজার কাজ থাকলেও ক্যানসেল করে দাও।

মনীষা খিলখিল করে হাসতে হাসতে বললো আসবো আসবো, ঠিক আসবো, কেন কি ব্যাপার?

—দেখা হলে বলবো, কালই দেখা করা চাই, ঠিক আসবে উইদাউট ফেইল! কথা দাও আমাকে!

মনীষার গলা একটু কেঁপে গেল? একবার কি সে টেলিফোনটা কাছ থেকে সরিয়ে তার অনিন্দ্য দুই ভুরু কুঁচকে একটুক্ষণ ভাবলো কিছু? দু-তিন মুহূর্ত বাদে মনীষা বললো, বলছি তো যাবো! আপনি একটা পাগল।

কাল এলো। অফিস যাইনি। অফিস গেলেই আত্মায় একটা ময়লা দাগ পড়ে। বিকেলে স্নান করে দাড়ি কামিয়েছি। আয়নার সামনে আমার নিজস্ব শ্রেষ্ঠ চেহারা। আয়নার সামনে থেকে যেই সরে গেলাম—চোখে ভেসে উঠলো অন্য একটা আয়না। তার সামনে মনীষা, দুটি মাত্র হাতে চুল, চিরুনি, ফিতে এবং আঁচল সামলাচ্ছে—মুখে দুষ্টু দুষ্টু হাসি—তার পাশে আমি—না, না, এটা মানায় না, শিল্প হিসেবে এটা সার্থক না। আমি সরে সরে গেলাম সে ছবি থেকে—অন্য মূর্তি এলো সেখানে—হ্যাঁ, এখন দুটি মুখের আলো একরকম, আমি মানতে বাধ্য।

স্টেডিয়ামের কাছে গেলাম না আমি। অমল মনীষাকে তুমি নাও, আমি তোমাকে দিলাম।

মাঝে মাঝে দূর থেকে ওদের দু'জনকে দেখি। তৃপ্তিতে আমার বুক ভরে যায়। গ্রীক-পুরুষের মতন সুদর্শন অমল, তার মুখ যোগ্য অহংকারে উদ্ভাসিত, প্রতি পদক্ষেপে পৃথিবীকে জয় করার আস্থা। আর মনীষা?

তাকে দেখলে মনে হয়— প্রতি মুহূর্তে আরও যোগ্য হয়ে উঠতে হবে।

আজকাল খুব বেশী সিনেমা দেখি! সময় কাটে না বলে প্রায় প্রতিদিনই নাইট-শো-তে সিনেমা দেখতে যাই। সেইরকমই একদিন সিনেমা দেখে বেরিয়ে রাত্রি সাড়ে এগারটা আন্দাজ চৌরঙ্গিতে ট্যাক্সির জন্য দাঁড়িয়েছিলুম। গ্র্যান্ড হোটেল থেকে অমলকে বেরুতে দেখলুম। সঙ্গে ও কে? অবনীশ না? কি সর্বনাশ, অবনীশের সঙ্গে অমলের চেনা হল কি করে? খুব যেন বন্ধুত্ব মনে হচ্ছে। অমলের পা টলছে একটু মদ খেয়েছে, তা খাক্ না, পাইলটের কাজ করে— ওকে কতদেশে যেতে হয়, কত লোকের সঙ্গে মিশতে হয়—মদ খাওয়া এমন কিছু দোষের নয়, কিন্তু পা না টললেই ভালো ছিল অবনীশের সঙ্গে অত বন্ধুত্ব হল কি করে? অবনীশ সেনগুপ্ত তো সাংঘাতিক লোক। বড়লোকের ছেলেদের বখানোই ওর কাজ। খুব সুন্দর চটপটে কথা বলে, কথার মোহে ভোলায়, বড় বড় হোটেলে এসে মদ খাওয়ার সঙ্গী হয়, তারপর নিজের বাড়ির জুয়ার আড্ডাতে টেনে নিয়ে যায়। এলগিন রোডে ওর কুখ্যাত জুয়ার আড্ডা, জুয়ার নেশা ধরিয়ে অবনীশ সেই সব ছেলেদের সর্বস্বান্ত করে ছাড়ে। আমি একদিন মাত্র ওর পাল্লায় পড়েছিলাম। অমলকে দেখে তো মনে হচ্ছে অবনীশের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব। রাস্তায় গলা জড়াজড়ি করে দু'জনে ওপাশে অমলের গাড়িতে উঠলো। অমল নতুন গাড়ি কিনেছে। অমল নিশ্চয়ই অবনীশের স্বরূপ জানে না।

পরদিন এলগিন রোডে অবনীশের বাড়িতে হাজির হলুম। দরজা খুললো, অবনীশের শয়তানী কাজের যোগ্য সঙ্গিনী, তার স্ত্রী—স্বরূপা। স্বরূপার মোহিনী ভঙ্গি অগ্রাহ্য করে আমি অবনীশকে ডাকলুম এবং বিনা ভূমিকায় বললুম, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, লালবাজারের ডি সি ডি ডি আমার মেশোমশাই হন। আমি আপনার এই বেআইনী জুয়োর আড্ডা এক্ষুণি ধরিয়ে দিতে পারি। লোক্যাল থানায় ঘুষ দিয়ে পার পেলেও লালবাজারকে এড়াতে পারবেন না। কিন্তু সে-সব আমি করবো না, একটি মাত্র শর্তে, আপনি অমল রায়ের সংসর্গ একেবারে ত্যাগ করবেন। তার ছাড়াও মাড়াবেন না। সে এখানে আসতে চাইলেই তাকে বাধা দেবেন। মোট কথা অমল রায়কে কোনোদিন এ বাড়িতে দেখতে চাই না। কি রাজী?

অবিনাশ হতভম্ব হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। তারপর আস্তে আস্তে বললো, আচ্ছা রাজী। কিন্তু অমল রায় আপনার কে হয়?

—আমার অত্যন্ত নিকট আত্মীয় সে। কিন্তু আমি যে আপনার কাছে এসেছিলাম এ কথাও তাকে বলতে পারবেন না।

আমি নিজে কখনো বাজার করতে যাই না। দু'একদিন গিয়ে দেখেছি, আমি একেবারেই দরদাম করতে পারি না—আমায় সবাই ঠকায়। তবু হঠাৎ একদিন বাজারে যাবার শখ হল। বাজারে অমলের সঙ্গে দেখা হল। আশ্চর্য যোগাযোগ। অমল নিশ্চয়ই কোনোদিন বাজার করে না। বাজার করার টাইপই ওর নয়। যে-লোক এক-একদিন এক এক দেশে থাকে—সে আজ ল্যান্সডাউন রোডের বাজারে এসেছে নিছক কৌতুকের বশেই নিশ্চয়ই। চাকরকে নিয়ে অমল খুব কেনাকাটি করছে। অমল যে প্রত্যেকটা জিনিসই কিনতে খুব ঠকছে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত, এবং বেশ মজা লাগলো। অলক্ষ্যে আমি ওর দিকে নজর রাখছিলুম। কাদা প্যাচপ্যাচ করছে বাজারে, অমলের পায়েও কাদা লেগেছে, ঘামে ভিজে গেছে পিঠ। একটুর জন্য আমি অমলকে হারিয়ে ফেলেছিলুম, হঠাৎ শুনতে পেলুম টম্যাটোর দোকানে কি একটা গোলমাল। তাকিয়ে দেখি সেখানে অমল, রাগে তার মুখখানি টকটকে লাল, অমল বেশ চিৎকার করে কথা বলছে। আমি সেদিকে এগিয়ে গেলুম। অমল একবার তরকারিওয়ালাকে বললো, এক চড় মেরে তোমার দাঁত ভেঙে দেবো। অমল চড় মারার জন্য হাতও তুলেছে। আমি দারুণ আঘাত পেলুম—এই দৃশ্য দেখে। মনে মনে বললুম, ছি, ছি, অমল, এমন ব্যবহার তো তোমাকে মানায় না। তরকারিওয়ালাকে চড় মারাটা মোটেই রুচিসম্মত নয়—তার যতই দোষ থাক্! যাক্, হয়তো অমল বেশী রাগের মাথাতেই—আমি গিয়ে অমলের পাশে দাঁড়ালুম, মৃদু স্বরে বললুম, অত মাথা গরম করবেন না। তাতে আপনারই—। অমল আমার দিকে তাকালো, চেনার ভাব দেখালো না, কিন্তু আমাকে একজন সাহায্যকারী হিসেবে ভেবে নিয়ে বললো, বুঝলেন তো, আজকাল এই সব রাস্কেলদের এমন বাড় বেড়েছে—যা মুখে আসবে তাই বলবে। আমি আরও আঘাত পেলুম, তরকারিওয়ালার একটা আত্মসম্মান আছে, সেখানে আঘাত দেওয়া তো অমলের উচিত নয়। আমি কথায় কথায় ভুলিয়ে অমলকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলাম। এসব ছোটোখাটো ব্যাপার ধর্তব্য নয় অবশ্য, অমলের তো এসবের অভ্যাস নেই—হঠাৎ মেজাজ হারিয়ে ফেলেছিল। ইস তরকারিওয়ালা উল্টে যদি ওকে একটা খারাপ গালাগাল দিয়ে বসতো!

অন্ধ ভিখারীকে পেরিয়ে গিয়েও মনীষা আবার ফিরে আসে, তারপর ব্যাগ খুলে মনীষা যখন ঝুঁকে তাকে পয়সা দেয়—তখন মনে হয়, মনীষা শুধু ওকে পয়সাই দিচ্ছে না, তার সঙ্গে নিজের আত্মার একটা টুকরোও দিয়ে দেয়। মনীষা, তোমার এত বেশী আছে যে, অমলের ছোটখাটো দোষ তাতে

সব ঢেকে যাবে। অমল দিন দিনঃআরও তোমার যোগ্য হয়ে উঠবে। আমি তো পারিনি, অমল পারবে।

অমলকে আমি চোখে চোখে রাখার চেষ্টা করি। বাতাসের তরঙ্গে একটা চিন্তা সব সময় অমলের কাছে পাঠাবার চেষ্টা করি, অমল, তুমি মনীষার প্রেমিক, এই বিরাট দায়িত্বের কথা মনে রেখো। তোমাকে নিচে নামলে চলবে না।

অফিসের কাজে দমদমের ফ্যাক্টরিতে যেতে হল দুপুরবেলা। মিঃ চোপরা দিল্লী ফিরে যাবার পরই আমার একটা লিফ্ট হয়েছে। অফিস থেকে আমাকে গাড়ি দেবারও প্রস্তাব উঠেছে। শিগগিরই যার গাড়ি হবে তাকে এখন ট্রাম বাসে চড়লে মানায় না। মিশন রো থেকেই ট্যাক্সি নিয়ে দমদম যাচ্ছিলাম, দমদম রোডের ওপর একটা বেশ বড় ভিড় চোখে পড়লো। একটা মোটরগাড়ি ঘিরে উত্তেজিত জনতা, আমি সেটা পাশ কাটিয়েই যাবো ভাবছিলাম—হঠাৎ হালকা নীল রঙের গাড়িটা দেখে কি রকম সন্দেহ হল—অমলের গাড়ি না? তাইতো, ঐ তো ভিড় ছাড়িয়ে অমলের মাথা দেখা যাচ্ছে! পাইলটের পোশাকে—অমল এয়ারপোর্ট থেকে ফিরছে। কি সর্বনাশ! অমলের গাড়ি কোনো লোককে চাপা দিয়েছে নাকি? তা হলে তো ওরা অমলকে মেরে ফেলবে। আমি ট্যাক্সিওয়ালাকে বললুম, রোকৃকে রোকৃকে। ঘ্যাচ্ করে ট্যাক্সি ব্রেক কষতেই আমি দরজা খুলে ছুটে বেরিয়ে এলাম। চেঁচিয়ে উঠলাম, অমল, অমল।

আমাকে দেখে অমল যেন ভরসা পেল, ভিড়ের উদ্দেশে চেঁচিয়ে কি যেন বললো। অমলের টাইয়ের গিঁট আলগা, মাথার চুল এলোমেলো। অমলের গাড়িতে একটা যুবতী বসে আছে, মনীষা নয়। যুবতীটির সাজ পোশাকে এমন একটা কৃত্রিম সৌন্দর্য আছে যে, এক পলক দেখলেই বোঝা যায় এয়ার হোস্টেস। এয়ার হোস্টেসটিকে অমল নিশ্চয়ই বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছিল।

কোনো লোক চাপা পড়েনি, চাপা পড়েছে একটা ছাগল। ছাগলটা থ্যাঁতলানো অবস্থায় পড়ে আছে রাস্তার মাঝখানে, টকটকে লাল রক্ত। লোকগুলো কিন্তু মানুষ চাপা পড়ার মতনই উত্তেজিত। অমল চেঁচিয়ে বললো, যার ছাগল সে সামলাতে পারেনি কেন? রাস্তাটা কি ছাগল চরাবার জায়গা? ক্রুদ্ধ জনতা চেঁচিয়ে বললো, অত তেজ দেখাবেন না, মোটরগাড়ি আছে বলে ভারী ফুটানি···দে না শালাকে দু'ঘা।

অমল আকাশে উড়ে বেড়ায়—এইসব মানুষ সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা নেই। আমি হাঁপাতে হাঁপাতে অমলের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললুম, না,

না, আমাদের আর একটু সাবধান হওয়া উচিত। আমরা এই ছাগলটারই দাম যদি দিই—

'আমরা' কথাটা আমি ইচ্ছে করেই বললুম। কেন না, ছাগলটার দাম চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা হবে নিশ্চয়ই—অমলের কাছে দৈবাৎ সে টাকা না-ও থাকতে পারে। আমার কাছে দৈবাৎ আছে। টাকাটা আমি তক্ষুণি বার করে দিতে পারতুম। কিন্তু দিলুম না, তাতে নিশ্চয়ই অমলের অহংকারে লাগবে। আগে দরদাম ঠিক হোক, তারপর না হয় আমি অমলকে ধার দেবার প্রস্তাব করবো। আমাকে না-চেনার ভান করলে কি হয়, অমল আমাকে ঠিকই চেনে, অন্তত এক পাড়ার লোক হিসেবে চেনে। অমল রুক্ষ গলায় বললো, কেন দাম দেবো কেন? আমি রাস্তার মাঝখান দিয়ে আসছিলাম, হর্ন দিয়েছি।

—ইঃ উনি হর্ন দিয়েছেন। ছাগলকে হর্ন দিয়েছেন।

—ক্যারদানি কত। পাশে মেয়েছেলে নিয়ে, দিন রাত্তির জ্ঞান নেই।

আমি অমলের বাহুতে চাপ দিয়ে অনুনয়ের সুরে বললুম, না, না, দাম দেওয়াই উচিত আমাদের, যার ছাগল তার তো ক্ষতি হয়েছে ঠিকই! কত দাম? ছাগলটার কত দাম বলুন?

ছাগলের মালিক কাছেই ছিল, সে বললো, একশো টাকা।

অমল বললো, একশো টাকা! একটা ছাগলের দাম একশো টাকা? অন্যায় জুলুম করে—

—তবু তো কম করে বলেছি! অন্তত আঠারো কেজি মাংস হবে, বারাসতের হাটে বেচলে।

আমি অমলকে মৃদু স্বরে জানালুম, আমার কাছে টাকা আছে। অমল রুক্ষভাবে বললো, টাকা থাকা না-থাকার প্রশ্ন নয়। জুলুম করে এরা—

লোকগুলো এবার আরও গরম হয়ে উঠেছে। ক্রমশ আমাদের গা ঘেঁষে আসছে। শুরু হয়েছে গালাগালি! এসব সময়ে কি সাংঘাতিক কাণ্ড হয় অমলের ধারণা নেই! ওরা আমাদের সবাইকে মেরে গাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে। অমলও এবার যেন একটু বিচলিত হয়ে বললো, ঠিক আছে, কত টাকা দিতে হবে? কত টাকা? আমি বললুম, দাঁড়ান, আপনি চুপ করুন, আমি দরদাম ঠিক করছি।

ভিড়ের দু' তিনজন লোক এক সঙ্গে কথা বলছিল, আমি তাদের উত্তর দিচ্ছিলাম, হঠাৎ দারুণ চিৎকার শুনলাম, পালাচ্ছে, পালাচ্ছে শালা—এই শালাকে ছাড়িস না, ধর্ ধর্।

নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। হঠাৎ একটা সুযোগে অমল গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিয়ে দিয়েছে। ভিড় ভেদ করে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গেল, আমার দিকে তাকালোও না—এক দল লোক হইহই করে ছুটে গেল সেই গাড়ির দিকে, আর একদল আমার কলার চেপে ধরলো। অমলের গাড়িকে আর ধরা গেল না—আমি দু' বার শুধু অমল বলে চেঁচিয়েই হঠাৎ চুপ করে গেলুম।

কিন্তু মনে মনে আমি কাতরভাবে আর্তনাদ করতে লাগলুম, অমল, তুমি যেও না, তুমি যেও না! এ কাপুরুষতা তোমাকে মানায় না। তুমি মনীষার প্রেমিক, তোমার মধ্যেও এই দীনতা দেখলে আমি তা সহ্য করবো কি করে? অমল, তুমি মনীষার এমন অপমান করো না! তা হলে যে প্রমাণ হয়ে যাবে, এ পৃথিবীতে আর একজনও যোগ্য প্রেমিক নেই মনীষার।

নন্দনকানন

সোমনাথ ভট্টাচার্য

রামতনু দাঁড়িয়ে রয়েছে লিফ্‌ট্‌-এর বন্ধ দরজার সামনে। লিফটম্যান-এর অপেক্ষায়। যার ওপর তাকে নন্দনকাননে নিয়ে যাবার জন্য পি-এ-টু ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সতী মিত্রের গোপন নির্দেশ দেওয়া আছে।

এখানে দাঁড়িয়ে মাথার ওপর সমস্ত অফিস বাড়ীটাকে রামতনুর মনে হচ্ছিল দিগন্তবিশারী ধু-ধু মাঠের মাঝখানে প্রকাণ্ড পত্র-পল্লবে নিবিড় এক ছায়া-শীতল গাছ,গাছতলায় সে দাঁড়িয়ে রয়েছে! চতুর্দিক জুড়ে রোদে-কানা দুপুর, স্তব্ধ। শুধু গাছটার ঘন ডাল-পালার অগোচর আড়ালে কোথায় একটা মৌচাক আছে। সেখান থেকে মধু সঞ্চয়রত মৌমাছির পাখার বিরামহীন অনুচ্চ গুন গুন ধ্বনি ভেসে আসছে!

রামতনু যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

রামতনু যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানকার পরিবেশ গাছতলার মতই ছায়াময় এঁটে বন্ধ করা জানালার কাঁচের শার্সীর গা-বেয়ে ফেলা নীল রং-এর পর্দায় ছেঁকে বাইরে থেকে যে আলোটুকু এসে পেঁাছচ্ছে তার রং নীলাভ। সেই আলোর ডিমের কুসুমের মত রং দেয়ালের গা-বেয়ে তেলের মত গড়িয়ে পড়ছে মোজেকের মেঝেতে। সব মিলিয়ে গাছ-তলার মতই ছায়াময় ছায়াঘন পরিবেশ। ছায়াঘন আর শীতল। পুশিং ডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই রামতনুর গা শিরশির করে উঠেছিল। তৎক্ষণাৎ তার মনে হয়েছিল পাঞ্জাবির ওপর কোটটা চাপিয়ে এলে ভাল হত।...কালকের ঠাণ্ডাটা তাকে বেশ জখম করেছে। রামতনু প্রথমটা বুঝতে পারেনি। পরে ভেবেছিল, আমি একটা আস্তো হাঁদারাম। এদিককার সবটাই, আপ-টু ফোর্টিন্থ ফ্লোর, যে এয়ার কনডিশনড করা এতো আমি অন্তত এক লক্ষবার শুনেছি—কিন্তু এত জেনেও বুঝতে পারিনি! আর তারপরই রামতনু বল ও বীর্যবর্ধক বলে বিজ্ঞাপ্তির কবিরাজী

ওষুধের শেষটুকু খাওয়ার জন্য জিভ বার করে থল চাটার মত খুব শ্রদ্ধাসহকারে এই শীতলতা শরীরের সমস্ত স্নায়ু দিয়ে শুষে নিতে শুরু করেছিল। আর মধুসঞ্চয়ে ব্যাপৃত মৌমাছিদের পাখার অনুচ্চ গুণগুণ ধ্বনির মত রামতনুর যা মনে হচ্ছিল, তা হচ্ছে মৌচাকের কোটরের মত কোটরে কোটরে চেয়ার টেবিল র‍্যাক ফাইল কাগজ ফেলা ঝুড়ির সঙ্গে ঠাসা চার হাজার কর্মচারীর সমস্ত অট্টরোল। এই অট্টরোলকে এখানে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল মৌমাছির সুর বুনুনি গুনগুনুনি। কেননা, বাইরের সেই যাবতীয় কটকটে শব্দ করিডোরের পার্টিশানের মোটা ঘষা-কাঁচের আবরণ ভেদ করে এখানে পেঁছিতে মিয়ানো ছোলা ভাজার মত হয়ে যাচ্ছিল। রামতনুর মাঝে মাঝে এজন্য মনে হচ্ছিল যে, পার্টিশানের সুদৃশ্য কাঁচটা হয়ত স্পেশ্যাল কোনো অর্ডার দিয়ে তৈরি। বিশেষ কেমিক্যাল কিছু মিশিয়ে অথবা বিশেষ কোনো প্রক্রিয়ায় তৈরি। যার বিশেষত্ব বা গুণ হচ্ছে বাইরের এই সমস্ত শ্রুতিকটু শব্দগুলোকে টেনে নিয়ে একটা সুরের মত কিছু করে এখানে পেঁছে দেওয়া। কেননা, এখান দিয়ে বস্‌-রা সর্বদা যাতায়াত করেন। পরে রামতনু ভাবল কিছুই অসম্ভব নয়। বিজ্ঞানের এ যুগে আর কিছুতেই অপারগ নয়। নইলে মেরু প্রদেশের বরফের পাহাড়ের তলায় ভুঁই-পটকার মত কে ক্যামনে একটা বোমা ফাটালে। অত্যদ্ভুৎ সব রশ্মি বেরিয়ে এল। ফলে, কোলকাতা শহরের সদর রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম্‌। পুরোভাগে একটা ছ্যাকরা গাড়ী কোলকাতা দেখতে আসা দেহাতী শোয়ারী সমেত নট-নড়ন চড়ন। পেছনে পিঁপড়ের সারির মত প্রি মাউথ্‌ স্টুডিবেকার অ্যামবাসেডার থেকে ট্রাম বাস পর্যন্ত তদবস্থার। এদিকে ট্রাফিকের আলো লাল থেকে হলুদ, হলুদ থেকে সবুজ, সবুজ থেকে আবার হলুদ লাল হতে থাকল। অপারেশন থিয়েটারে রোগার্তের ফুসফুসে ছুরি বসিয়ে ডাক্তার, নার্স, আগ্রহী মেডিক্যাল স্টুডেন্টদের চোখের আলো দপ করে ফিউজ্‌ হয়ে গেল। কিন্তু, মাথার ওপর প্রকাণ্ড শ্যাডোলেস লাইটটা নিত্য যেমন জ্বলে তেমনি কোথাও এক তিল ছায়া না রেখে জ্বলতে লাগল খর দীপ্তিতে। কোলের ছেলেকে বুকে চেপে ধরে তার খড়খড়ে শুকনো ঠোঁটের কাছে ভারী পুষ্ট স্তন এগিয়ে দিতে দিতে মা-ছেলে, ক্ষুধা-তৃষ্ণা-বাৎসল্য সব মিলিয়ে 'হিউম্যান ফ্যামিলি' চিত্র-প্রদর্শনীর একটা চিত্তাকর্ষক স্টিল ফটো হয়ে রইল।

এ প্রসঙ্গে শীর্ষশক্তিদের বৈঠকে ঢাকাখোলা হাঁড়ি থেকে ওঠা কষা মাংসের ঘ্রাণের মত উত্তেজক আলোচনা, মনীষীদের স্বেচ্ছা-কারাবরণ, বৈজ্ঞানিক ও চিন্তাশীলদের পরস্পর-বিরোধী কথাবার্তা, রাত জেগে বাছা-বাছা শব্দ ঘষে-

ঘষে দাঁত ধারালো করে প্রত্যূষের সম্পাদকীয় স্তম্ভে বিপক্ষ দলের দিকে তাকিয়ে দাঁত ঘষাঘষি এবং শেষ পর্যন্ত সব কিছু চলন্ত ট্রেনের কামরায় সময়-যাপনের আলোচনায়, চায়ের দোকানের গুলতানিতে, ছুটির দিনে মোড়ের মাথায় অবসর বিনোদনের আলোচ্য বিষয়ে পর্যবসিত হতে দেখে সমস্ত ব্যাপারটাকে রামতনু আঙুলের ফাঁক থেকে পোড়া সিগারেটের মত আলগোছে ফেলে দিয়েছে।... এসব এখন আর তার মনে কোনো উত্তেজনাই জাগ্রত করে না।

এ প্রসঙ্গে তার সুচিন্তিত অভিমত হচ্ছে, এসব অমোঘ। হবেই। এসবই অদৃষ্টের বিধান ··অদৃষ্টের মহালীলা ··পাপ···পাপের পরিপূর্তি···কলির অন্তিম···। ইনএভিটেবল ব্যাপার সব।

এখন কেউ যদি তাকে তার অভিমতকে যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে বলে—সে পারবে না। সে দৃঢ় স্বরে একটা কথাই বলবে, দ্যাখো ওসব কচকচির মধ্যে আমি নেই। আমার, এই মনে হয়েছে।

রামতনুর নিজেরই খুব খারাপ লাগতে লাগল। বস্তুত ঠিক এই মুহূর্তে নন্দন কাননে যাবার জন্য লিফ্ট-এর বন্ধ দরজার সামনে লিফ্টম্যান-এর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে এসব নিরর্থক চিন্তায় নিজেকে ভারাক্রান্ত করা তার অভিপ্রেত ছিল না।

বরং, রামতনু ভাবল, অন্য কিছু ভাবি। আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমি যে রাজ্যে যাচ্ছি সেখানকার কথা ভাবি। যেখানে আমাদের বস্-এরা হাঁফ ফেলতে যান। হাঁফ ফেলে তাজা হতে যান। সেখানে শুধুই আনন্দ—অফুরন্ত, অ-ফুরন্ত। যেখানে শান্তি পায়ের পাতাডোবা নরম গালচের মত সর্বত্র বিছানো—সেখানকার কথা ভাবি।

পরম বিশ্বাসে এবং একান্তভাবে নির্ভরতার হর্ষে রামতনুর সমস্ত মন, সমস্ত শরীর পুনর্বার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

রামতনু ভাবল, এবার আমি আমার সৌভাগ্যের কথা ভাবি। যে সৌভাগ্য আমায় সেই অপরিসীম শান্তি আর অফুরন্ত আনন্দের রাজ্যে নিয়ে চলছে। যেখানে সব কিছুই ভাবহীন—যেখানে খালি মুক্তি আর মুক্তির উল্লাস।

রামতনুর অন্তরস্থিত বিশ্বাস যেন পিদিমের বুক ভাত টলটলে তেল। সেই তেল শুষে শুষে রামতনুর দুটি চোখ জ্বলতে লাগল। হর্ষে আবেগে জ্বলতে লাগল সজল শিখায়।

সত্যি করে গর্ব করার মত যে আমার কিছুই নেই এ আমার চেয়ে ভালো করে আর কে জানে···রামতনু ভাবল, এই সৌভাগ্যই আমার সেই গর্ব,—একমাত্র গর্ব। যে-সৌভাগ্য এই অফিসের আড়াই হাজার কেরাণীর ছকে ফেলা

ভাগ্য থেকে আমার ভাগ্যকে পৃথক করেছে। রামতনু মনে মনে বলল, সতী তুমিই আমার সেই ছকে ফেলা ভাগ্যকে সৌভাগ্যে উন্নীত করেছ। নইলে আমার মত এক মাছিমারা কেরাণীর ভাগ্যে কি আর সে-রাজ্যে যাবার সুযোগ মিলত। সতী, বুক থেকে উঠে আসা বাষ্পের মেঘ রামতনুর গলা বুঁজে এল। সতী, তোমার কাছে যে আমি কি পরিমাণ কৃতজ্ঞ তা প্রকাশ করবার মত, জানাবার মত ভাষা আমার জানা নেই। তুমি যে আমাদের ছেলেবেলার সেই দিনগুলিকে পুরোপুরি ভুলে যাওনি, এত উঁচুতে উঠেও আমায় চিনতে পেরেছ, আমার যাচ্ঞা পায়ে করে তুমি ঠেলে সরিয়ে দিতে পারতে কিন্তু তা না করে এত বড় একটা রিস্ক ফর-নাথিং নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে আমায় সে-রাজ্যে যাবার সুযোগ করে দিয়েছ—এ আমার আশার চেয়েও স্বপ্নের চেয়েও বেশী।···

রামতনু শব্দ করে গলা ঝাড়ল। শ্বাসনালী দিয়ে খানিকটা গাঢ় কফ জিভের ওপর উঠে আসতে তৎক্ষণাৎ রামতনু বুঝতে পারল ঠাণ্ডা লাগাতে যে সর্দিটা গতকাল মাথা, চোখ, মুখ ঝামরে তুলছিল আজ সেটা বুকে বসেছে। আশ্চর্য মলমে ঠিকমত কাজ হয়নি, আজ বাড়ী ফিরে বুকে পুরোনো ঘি মালিশ করতে হবে। অভ্যাস মত রামতনু তারপর এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে বাদ্দিভাতি লাল রং-এর গায়ে সাদা অক্ষরে লেখা 'থুথু ফেলিবার পাত্র' লেখা পাত্রটা খুঁজল। পেল না। না পেয়ে কফ গিলে ফেলল।

রীতিমত পোশাক সজ্জিত একজন বেয়ারা এসময় পুশিং-ডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকে কোথায় যেন যাচ্ছিল। রামতনু চোখ তুলে তাকাতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। রামতনুর মনে হল লোকটা আগাগোড়া ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে। লক্ষ্য করেছে বলেই লোকটার দৃষ্টিতে বিস্ময় কৌতূহল এই সব স্বাভাবিক জিনিসগুলো ছাড়াও সেগুলোকে ছাপিয়েও ঘৃণা এবং অবজ্ঞা এবং একটা নাক সিঁটকোনো— ভাব ফুটে উঠেছে। এ স্থলে বিস্ময় এবং কৌতূহলকে রামতনু স্বাভাবিক বলেই ধরে নিচ্ছিল। কেননা. যারাই এখান দিয়ে যাচ্ছিল-আসছিল তাদের দৃষ্টিতে যুগপৎ বিস্ময় এবং কৌতূহল ফুটে উঠেছিল। সকলের দৃষ্টিতে একই জিনিস প্রত্যক্ষ করতে করতে রামতনু ব্যাপারটাকে খুব স্বাভাবিক বলে ধরে নিচ্ছিল। নিজের মনকে এই বোঝাচ্ছিল, হবে নাই বা কেন! আমার মত একটা লোককে এখানে, আর বিশেষ করে এই লিফটটার সামনে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে লোকে অবাক তো হবেই। পাগল-ছাগল বলে এখনো অর্ধচন্দ্র দিচ্ছে না—এই রক্ষে।

কিন্তু বেয়ারাটার নাক সিঁটকানো ভাবটা রামতনু কিছুতেই যেন সহ্য করে

নিতে পারছিল না। বেয়ারাটা তার দিকে পেছন ফিরেছে বুঝতে পেরেই রামতনু পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল, ভারী ডাঁট। খাস ডিপার্টমেন্টের বেয়ারা কি না সব। রামতনু মনে মনে গলার পর্দা চড়াল, দেখতাম, দেখতাম ও'রকম গদাই-লস্করী চলন কোথায় থাকত—যদি আজ বস্‌-রা থাকতেন অফিসে। বস্‌-রা আজ সবাই দিল্লীতে কিনা। থাকলে দৌড়-ঝাপ করতে করতে আর সেলাম ঠুকতে ঠুকতে হাত-পায়ের নড়া ছিঁড়ে যেত।

রামতনু মুখ ঘুরিয়ে নিল। ঢেউ-খেলানো ঘোলা রং-এর কাঁচের পার্টিশানের গায়ে ব্যস্ত সমস্ত ছায়ারা নড়ছে চড়ছে। চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। রামতনুর ছায়াগুলোকে দেখে মনে হল যেন ময়রার দোকানে শো-কেসের মধ্যে বন্দী হয়ে পড়া মৌমাছি, বোলতা। খাদ্য-সংগ্রহ করতে ঢুকে এখন আর বেরুতে পারছে না। পাখার ঝাপটা দিয়ে শো-কেসের কাচের গায়ে আঘাত করতে করতে নিস্তেজ এবং ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের যাবতীয় স্নায়ু শ্লথ করে দিয়ে রামতনু প্রকাণ্ড একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, উঃ খুব বেরিয়ে এসেছি যা হোক। ভাগ্যে আমার বেরিয়ে আসার গোপন ছিদ্রটা নজরে পড়েছিল। নইলে আমারও ওই দশা হত। অতঃপর রামতনু এই অফিসের আড়াই হাজার কেরাণীর ভাগ্য থেকে নিজের ভাগ্যকে পৃথক করতে পারার সৌভাগ্যের জন্য আরও একদফা গর্ব বোধ করে নিল।

পাঞ্জাবির হাতা ফাঁক করে রামতনু ঘড়ি দেখল। যদিও সামনেই দেওয়ালে একটা একেবারে হাল-ডিজাইনের ঘড়ি আটকানো রয়েছে। রামতনু নিজের ঘড়িতে সময় দেখে সে ঘড়িটাও দেখল এবং যথারীতি ঠিক করে উঠতে পারল না কোন্ ঘড়ির সময়টা সঠিক। তারপর ভাবল, আমার ঘড়িটা একবার অয়েলিং করা দরকার।

রামতনুর মনে হল, ঘড়ির কাঁটায় সময় যেন আর বইছে না। অথচ, এই আধ ঘণ্টা আগে সে যখন ডিপার্টমেন্টে নিজের টেবিলের সামনে বসে আউটওয়ার্ড রেজিস্টারে দু'মাস আগের পেনডিং ডেস্‌প্যাচ্ এনট্রি করছিল, তখন তার মনে হচ্ছিল পার্ট-টাইম কাজের মত ঘড়ির কাঁটা দু-হাতে সময় সরাচ্ছে। সে কিছুতেই সময়মত, সতী যে সময় দিয়েছিল দেড়টা, সেই সময়ে লিফট-এর সামনে পেঁছিতে পারবে না। লিফট্‌ম্যান তাকে লিফট-এর সামনে না দেখে লিফট্ উঠিয়ে নিয়ে যাবে। অথচ লোকটা ইউনিয়নের পাণ্ডা-ব্যক্তি জোয়ারদারবাবুর মগজে কিছু প্রবেশ করাবার জন্য ব্যাড়র-ব্যাড়র বকেই চলছিল। জোয়ারদারবাবু এমন ভাব দেখাচ্ছিলেন যেন অখণ্ড মনোযোগ সহকারে সমস্ত শুনছেন। রামতনুর দৃঢ় ধারণা জোয়ারদারবাবু খটাশ-

চোখের দৃষ্টি খুব মোলায়েমপানা করে মনোযোগ দিয়ে শুনছে, যতই এই ধরনের ভাব ফোটাতে চেষ্টা করুন না কেন, আসলে ভাবছেন অন্য কিছু। হয়ত ডানপাশের টেবিলের হিমাংশুর কথা ভাবছিলেন। পরশুদিন তার মুখের ওপর দেওয়া হিমাংশুর জবাবের কথা ভাবছিলেন। ঠিক কি ভাবে হিমাংশুকে টাইট্ দেওয়া যায় হয়ত এই তার অভিনিবেশের বিষয় ছিল। ফলে, এইসব সাত-পাঁচ ভেবে সে আগে থেকে বলে রাখা ছুটিটাও জোয়ারদারবাবুর কাছ থেকে চেয়ে নিতে পারছিল না। লোকটা ব্যাড়র-ব্যাড়র করে এক মুহূর্তের জন্য না থেমে বকে চলছিল। এদিকে ঘড়ির কাঁটায় সময় ছুটে চলছিল হু হু করে।

সামনে ডেসপ্যাচ্ রেজিস্টারটা খোলা। রামতনু ছক্‌কাটা ঘরে একের পর এক বসিয়ে চলছিল লেটার নাম্বার ডেসপ্যাচ্ ডেট্ ইত্যাদি ইত্যাদি।

—যদিও আপাত-দৃষ্টিতে দেখলে মনে হয় আমাদের গত আন্দোলন ধর্মঘট ব্যর্থ······

জোয়ারদারবাবু শুনছিলেন। লোকটা নন্-স্টপ বকে চলছিল। এলোপাথারী রেডিয়োর স্টেশন ধরা কাঁটার নব ঘুরিয়ে চললে যেমন এক-একটা স্টেশন বেজে উঠে মিলিয়ে গিয়েই আবার অন্য একটা স্টেশন রেডিয়োর স্পীকারে বেজে ওঠে—তেমনি লোকটার কথার টুকরো মাঝে মাঝে রামতনুর কানের পর্দায় এসে আঘাত করছিল কখনো উঁচু, কখনো নীচু পর্দায়।

—তার জন্য আমাদের যে ক্ষতি এবং ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে সত্যি করে তা অপূরণীয় ·····

স্রেফ্ বকুনি—। তা এখানে কেন! মনুমেন্টের চাতালে কি ঘাস গজিয়ে গ্যাছে নাকি। রামতনু মনে মনে লোকটাকে ভেংচি কেটেছিল।

রেডিয়োর স্পীকারে এবার যে শব্দ-তরঙ্গ ধরা পড়ল সেটা খুব কাছের। হয়ত আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রই—। খুউব জোর। বাংলা খবরের মত।

—কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, গত আন্দোলনের ব্যর্থতা আগামী আন্দোলনের মেরুদণ্ড। ব্যর্থতা আমাদের অনেক কিছু শিখিয়েছে। আমাদের অনেক ভুলকে আমরা জানতে পেরেছি, অনেক ত্রুটির বিষয় সচেতন হতে পেরেছি। এ সবকিছুই হবে আমাদের আগামী ধর্মঘটের ·····

ঘণ্টা হবে। রামছাগলের গলার।

তারপর কথাগুলো রামতনু ঠিক শুনতে পাচ্ছিল না। কিন্তু গলার সুর শুনে, বলার ভঙ্গী দেখে, তার কেবলই মনে হচ্ছিল লোকটা যা বলছে তা যেন তার খুব পরিচিত। এই সুর, এই ভঙ্গী যেন তার খুব চেনা।

নিঃশ্বাসের সঙ্গে গন্ধ টেনে নেবার মত রামতনু লোকটার কথার অন্তর্নিহিত বক্তব্যটুকু ধরার চেষ্টা করেছিল। পরক্ষণেই তার কাছে ব্যাপারটা জলবৎ হয়ে গেছিল। এতক্ষণে অরিন্দম, আসল কথায় এসো যাদুমণি। ধর্মঘট ডহবিল নাম দিয়ে তোমাদের আরও কিছু খ্যাঁচার তাল। নইলে, তোমাদের পেট ভরছে না, বদমাইসি করার খরচ কুলোচ্ছে না। রামতনু মনে মনে নিজেকেই বলল, সব বিশ্বাস করতাম—যদি না সেদিন স্বচক্ষে দেখতাম লোকটাকে একটু হর্স-টেল করে চুলবাঁধা, হাতা আর পেট-কাটা জামা পরা মেয়ের সঙ্গে বাজনা-বাজা রেস্টুরেণ্ট থেকে বেরুচ্ছে -।

তিতি-বিরক্ত হয়ে রামতনু ভেবেছিল, আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে অন্তত এইসব ফোর-টোয়েণ্টির কারবার নেই —।

জোয়ারদারবাবু তার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, কই হে রামতনু, উঠলে না। তোমার যে একটার সময় কোথায় আরজেণ্ট দরকারে যাবার কথা ছিল।

এক মিনিট আগে আড়চোখে দেখা ঘড়ির দিকে রামতনু এবার সর্বসমক্ষে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বুক পকেটে কলম গুঁজতে গুঁজতে সশব্দে উঠে দাঁড়িয়েছিল, একদম খেয়াল ছিল না স্যার—।

জোয়ারদারবাবু বলেছিলেন, যাও—। সঙ্গে সঙ্গে আগামী সপ্তাহের মধ্যে পেন্ডিং কাজের ক্লীয়ারেন্সের কথা মনে করে দিয়েছিলেন। রামতনু মনে মনে বলেছিল, চাইলেই যেন সবকিছু মোয়ার মত ঈশ্বর-পুত্র জোয়ারদারের হাতে এসে ধরা দেবে! মুখে বলেছিল, হয়ে যাবে স্যার।

রামতনু অস্থির এবং অধৈর্য হয়ে পড়েছিল। দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে এক পায়ের ওপর শরীরের ভর রেখে দাঁড়িয়েছিল। সেই অবস্থাতেই ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল—লিফ্‌টটার দরজাটা পাথরের দেওয়ালের মত স্তব্ধ নিরেট। অগত্যা রামতনু কাঁধের পেশীগুলোকে একটা ঝাঁকুনী দিয়ে শ্লথ করে দিয়ে মুখে ছোট্ট একটা হতাশাসূচক শব্দ করে ঘাড় ঘুরিয়ে নিল। রামতনুর মুখটা দেখাতে লাগল রসকষহীন একটা শুকনো হর্তুকির মত।

গতকালের কথা মনে পড়ল। মনে হতে রামতনুর সর্বাগ্রে যা মনে হল, তা হল কালকের একপশ্‌লা বৃষ্টিতেই তার ঠাণ্ডা লেগে গেছে! কাল যে-সর্দি মাথা-মুখে ঝামরাচ্ছিল আজ সেই-সর্দি বুকে বসেছে। আশ্চর্যমলমে কাজ হয়নি। বাড়ী গিয়ে বুকে পুরোনো-ঘি মালিশ করতে হবে। তারপর মনে পড়ল পাঁচটা সাতের লোক্যাল্ কাল সাঁইত্রিশ মিনিট লেট্ ছিল। বাড়ী পৌঁছতে তার সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছিল। বিপত্তির মূলে এক ভদ্রলোক। ঝুলতে ঝুলতে যাচ্ছিলেন—হাত ফস্‌কে চাকার তলায়। পরে, কামরার মধ্যের

আলোচনায় সে শুনতে পেয়েছিল ভদ্রলোক নাকি কোন এক অফিসের কেরাণী। তিনটে হুইসল্ দিয়ে ট্রেন থেমে যেতেই রামতনু মনে মনে বলেছিল, হল আজ—। এখন রামতনুর মনে হল, ভদ্রলোক যদি পুরোপুরি মারা পড়তেন —অর্থাৎ মৃত্যুটা স্থির জেনেও খানিকটা জ্যান্ত না থাকতেন তা'হলে সম্ভবত ট্রেনটা অতটা লেট করত না। এবং তারপরই রামতনুর মনে পড়ল তিনটে তিনটে সিঁড়ি ভেঙে উঠোন থেকে রক-এ উঠেই সেই আবছা অন্ধকারে সাইকেলের চাকার সরু লিকলিকে দাগটাকে তার বুকে হেঁটে যাওয়া সাপের বুকের দাগের মত মনে হয়েছিল। সাপের বুকের দাগের মত সাইকেলের চাকার দাগটা ঘরে ঢুকে গেছিল। সে বুঝেছিল, দুপুরে মৃণাল এসেছিল— কোনো সিনেমা-পত্রিকার কারেন্ট ইস্যু দিতে। বৃষ্টিতে ভিজবে বলে সাইকেলটা ঘরে তুলে রেখেছিল। রামতনুর মনে পড়ল ঠাণ্ডাটা যে সত্যি করে তাকে আক্রমণ করেছে সে তখনই তা প্রথম অনুভব করেছিল। তার রগ দুটো টনটন্ করে উঠেছিল।

আঃ কখন যে লিফট্‌ম্যান আসবে। আমায় নিয়ে যাবে এখান থেকে। রামতনুর অধীরতা, অস্থিরতা আকুলতায় রূপান্তরিত হয়ে উঠছিল ক্রমেই।

মালতী রোজ যেমন করে তেমনি ডেলি-রিপোর্ট পেশ করেছিল, জান আজ শ্যামাপদবাবুর বড় ছেলেটা আদুরীকে পণ্ডে দিয়েছিল। বলতে গেলাম তো শ্যামাপদবাবুর বড় ছেলে বললে, আদুরী নাকি ওদের বাগানের বেড়া ভেঙে বাগানে ঢুকে কাশীর বেগুনের চারাক'টা মুড়িয়ে খেয়েছে। পণ্ড থেকে আদুরীকে ছাড়াতে দেড় টাকা লাগল।

রামতনুর মুখের মধ্যে তখন পরোটায় পাকানো বেগুন-ভাজা। সেই অবস্থাতেই সে যথেষ্ট উত্তেজনা অনুভব করেছিল, উহুঃ কাশীর বেগুন! কোনোকালে কাশীর বেগুন দেখেছে। শুয়োরের বাচ্চা সব।

—জানো আজ কাণ্ড হয়েছে। মালতী উনুন থেকে কেট্‌লী নামাতে নামাতে বলেছিল, ছাদে বড়ি শুকোতে দিয়েছিলাম খেয়াল ছিল না। দুপুরে বৃষ্টি এসেছিল, আড়াই সের ডালের বড়ি ভিজে একেবারে ঘণ্টো।

পরোটা চিবোতে চিবোতে চোয়ালের পেশীগুলো কঠিন হয়ে উঠেছে রামতনু অনুভব করেছিল। খেয়াল থাকবে কি করে! তুমি কি আর তখন তোমাতে ছিলে। মৃণাল এসেছিল যে—। লোকসান সব আমাতেই বর্তাক। ছাগল ছাড়াতে দেড় টাকা, আড়াই সের ডালের বড়ি—আসে কোত্থেকে এসব। মালতী চা ছাঁকছিল। মালতীর মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রামতনু বলেছিল, মৃণাল এসেছিল— ?

— এসেছিল। এসে বেচারীর এক ফেরার —। বৃষ্টি নামল। যায় কি করে? ও তো বৃষ্টির মধ্যে যাবেই—। বলে ওদের ক্লাবের ম্যাচ্ আছে—দেখতে যাবে। আমি বললাম পাগল হয়েছ। এই বৃষ্টিতে তোমায় ছেড়ে দি আর একটা অসুখ-বিসুখ বাঁধিয়ে বস।

ভারি দরদ! রামতনু মনে মনে হেসেছিল ঠোঁট বাঁকিয়ে। এদিকে আমি যে পাক্কা ন'টায় দুটো ভাত কোনোরকমে নাকে-মুখে গুঁজে গেছি আর এই ফিরছি। নাক টানছি। চোখ-মুখ লাল।—এদিকে এখনও মহারাণীর নজর পড়ল না।

উনুনে এ সময় কিছু ছিল না। মালতীর সমস্ত শরীর জুড়ে আগুনের শিখার দাপাদাপি। রামতনু বেশ শব্দ করে কোঁচার খুঁটে নাক ঝেড়েছিল। তাকের ওপর থেকে কাপ-ডিস্ নামাতে মালতী উঠে দাঁড়িয়েছিল। কাপ-ডিস্ নামিয়ে আবার ছেঁড়া কথার সুতো ধরেছিল. তার চেয়ে এক কাজ কর। মৃণালকে বললাম, সাইকেলটা ঘরে উঠিয়ে আমার সঙ্গে গল্প কর। বৃষ্টি না-থামলে তোমায় ছাড়ছি না আমি। আঙুল ছুঁইয়ে চায়ের একটা কুচী পাতা তুলে নিয়ে মালতী তার দিকে কাপটা এগিয়ে দিয়ে বলেছিল, এ মাসের 'প্রেক্ষাপটটা' জোড়াকুলুঙ্গিতে আছে। পড় যদি তো পড়। কালই ফেরত দিতে হবে।

এ এক মন্দ খেলা নয়। রামতনু মনে মনে মালতীকে উদ্দেশ করে বলেছিল, এই বই দেওয়া-নেওয়া—এই তোমাদের পাতানো দেওর-বৌদির সম্পর্কটা কিন্তু মালতী—বেশ। বেশ মিষ্টি। অনেকটা সিলোফেন্ পেপারে মোড়া মিষ্টি টফির মত। যেহেতু ব্যাপারটা খুব মধুর তাই পিঁপড়ে লাগার ভয়, তাই সিলোফেন্ পেপার। বাজারে আজকাল সিলোফেন্ পেপারটা বেশ চালু হয়েছে।

মালতী ডালের কড়া চাপিয়ে দিয়েছিল উনুনে।

রামতনু ভেবেছিল, অথচ, এই মেয়েটাকে আমি ভালবেসে বিয়ে করেছিলাম। ভালবাসায় বিশ্বাস করেছিলাম। উঠে দাঁড়িয়ে রামতনু বলেছিল, আশ্চর্য-মলমের শিশিটা কোথায়?

মালতী চোখ তুলে তাকিয়েছিল, কেন? কি হবে?

আঃ, যা বলছি তার উত্তর দাও।

জোড়া-কুলুঙ্গিতে। মালতী চোখ নামিয়ে হাতের কাজ সারতে সারতে ছোট্ট করে উত্তর দিয়েছিল।

পাশ-বালিশ আঁকড়ে বিছানায় শুয়ে রামতনুর মনে হয়েছিল, সে অসুস্থ

হয়ে পড়েছে। হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে রাখা রুমালটা সর্দিতে ভিজে সপ্‌সপে। টাগরা জ্বালা করছে।—তৃষ্ণা। চোখ তাকাতে কষ্ট হচ্ছে। সারা মাথা মুখ সর্দিতে ঝামরে উঠেছে।—উঠোনের একপাশে বাঁধা ছাগলটা চেঁচাতে শুরু করেছিল এ সময়। রামতনুর মনে হচ্ছিল উঠে গিয়ে ছাগলটার জিভ্‌টা টেনে ছিঁড়ে দিয়ে আসে।

এই এদিক ফেরো। মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

চৌকিটা শব্দ করে নড়ে উঠেছিল। রামতনু অনুভব করেছিল, মালতী চৌকির উপর উঠে বসেছে। সঙ্গে সঙ্গে মালতীর হাতের স্পর্শ অনুভব করেছিল কপালের উপর। —রামতনু কথার উত্তর দেয়নি। ফেরেনি।

মালতী অপেক্ষা করেছিল খানিকক্ষণ। তারপর আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে এসেছিল। মালতীর ঠোঁট তার কানের পাশে। মালতীর বুক তার পিঠের সঙ্গে লেপ্‌টে আছে। মালতী স্বরে গাঢ়তা এনেছিল, এই, কেন তুমি এরকম বদ্‌লে যাচ্ছ বলত! কেন এরকম হয়ে যাচ্ছ দিনদিন!

রামতনু সেই অবস্থাতেই একবার চোখ তাকিয়েছিল। মালতী ঘরে ঢুকে হারিকেনের শিখাটাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। সেই আলোতে প্লাস্টার-খসা অপরিষ্কার ঘরের দেওয়াল, শ্যাওলা-ধরা ঘরের শিলিং, পাঁজরের মত কাঁড়-বরগায় সাজানো নীচু ছাদ— সমস্ত মিলে একটা অতি কদর্য চেহারা নিয়ে ঘরটা তার চোখের সামনে ফুটে উঠেছিল।—ছাগলটা চেঁচিয়ে চলছিল তারস্বরে। রান্নাঘর থেকে ভাতের ফ্যান্ পোড়া কটু গন্ধ ঘরের বাতাস ভারী করে তুলেছিল। সর্বোপরি মালতীকে—মালতীর স্বরের গাঢ়তাকে রামতনুর মনে হচ্ছিল ছেঁদো ন্যাকামি, মালতীর স্পর্শকে তার মনে হচ্ছিল একটা মাকড়সার আলিঙ্গনের মত, রক্তমোক্ষণেই যার একমাত্র আনন্দ এবং পরিতৃপ্তি···

—আপনার নাম রামতনু সরকার?

মাথার ঠিক হাতখানেক ওপরেই যেন একটা জলভরা মেঘ গুড়গুড় করে ডেকে উঠল। রামতনু ভয় পেয়ে চমকে ঘাড় ফেরাল। দেখল বিশাল একটি লোক ঘাড় হেঁট করে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

—রামতনু সরকার? ডেস্‌প্যাচ্ ডিপার্টমেন্টের ক্লার্ক?

জলদগম্ভীর স্বরে লোকটা জিজ্ঞেস করল। তার মুখের বাতাস রামতনুর কপালে লাগল।—কপালের ওপর থেকে কয়েকটা চুল সরিয়ে দিল। অন্য সময় যে-কেউ তাকে ঠিক এভাবে কেরাণী বললে রামতনু চটে যেত। কিন্তু এ-সময় এই বিশাল লোকটার কথায় রাগতে সাহস পেল না। রামতনু বশংবদ কৃতজ্ঞের মত ঘাড় হেঁট করল। এতক্ষণ লোকটার বুকের কাছে রামতনুর

মাথাটা ছিল। শিরদাঁড়া ঝাঁকিয়ে ঘাড় হে'ট করাতে রামতনু যেন লোকটার কোমরের কাছে গিয়ে পড়ল। রামতনু কথা বলতে পারল না। সেই অবস্থায় মেরুদণ্ড, ঘাড়, মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, হ্যাঁ·· হ্যাঁ···।

আরও খাদে গলার স্বরের পর্দা নামিয়ে লোকটা বলল, চলুন।

রামতনু এতক্ষণে বুঝল, এতক্ষণে যেন রামতনু তার সংবিৎ পুনরায় ফিরে পেল, ফিরে পেয়ে বুঝল, এই লোকটাই সেই লিফট্‌ম্যান—। যে তাকে নন্দনকাননে নিয়ে যাবে। সতী যার ওপর তাকে নন্দনকাননে নিয়ে যাবার গোপন-নির্দেশ দিয়েছে।

চকিতে রামতনুর দৃষ্টি দেয়ালের ঘড়িটার ওপর গিয়ে পড়ল। দেখল, কাঁটায় কাঁটায় দেড়টা।

লিফ্‌টের দরজাটা সম্পূর্ণ খোলা রয়েছে অনুভব করেও রামতনু লিফ্‌টের ভেতরটা দেখতে পাচ্ছিল না। কেননা, লোকটার বিশাল চেহারা তার সামনের সবকিছু আড়াল করে রেখেছিল।

লোকটা পাশ ফিরে রামতনুকে লিফটের ভেতরে যাবার রাস্তা করে দিল। রামতনু এবার নরম স্বপ্নাভ আলোকে উজ্জ্বল লিফটের অভ্যন্তর দেখতে পেল। পলকমাত্র, রামতনু মুগ্ধ হয়ে গেল। মুগ্ধ হয়ে ভাবল, এটা তো লিফট্‌ নয়, রথ। পুষ্পকরথ।—পুষ্পকরথে চড়ে আমি নন্দনকাননে চলেছি।

কখন যে লিফট্‌টা উঠতে শুরু করেছে রামতনু বুঝতে পারেনি। রামতনু এখন যে কোমল কার্পেটটার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে তার সুখানুভূতি ঠিক কি রকম, কী জাতীয় ভেবে ঠিক করতে না-পেরে দিশাহারা হয়ে ভাবছিল, হবে না, এই লিফট্‌টা দিয়ে বস্‌-রা যে সর্বদা ওঠেন-নামেন।

রামতনু অনুমান করছিল, কাজ করতে করতে বস্‌-রা ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তখন শ্রান্তিতে বস্‌দের মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করে। চোখের পাতা ভারী হয়। শরীরের স্নায়ুরা শ্লথ হয়ে পড়ে। পরিশ্রান্ত পায়ে বস্‌-রা গিয়ে দাঁড়ান নির্দিষ্ট জায়গায়। বেয়ারা বোতাম টিপে ডাক দেয় পুষ্পকরথকে। সোঁ করে পুষ্পকরথ এসে দরজা খুলে দাঁড়ায়। বস্‌-রা পুষ্পকরথে চড়ে সোজা চলে যান নন্দনকাননে। নন্দনকানন বস্‌-দের শ্রান্তি হরণ করে, ক্লান্তি হরণ করে। বস্‌-রা আবার সুস্থ, তাজা হয়ে ফিরে আসেন।

লোকটা তার বিশাল অবয়ব নিয়ে লিফটের প্রায় সমস্ত দরজাটা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। রামতনু তার পেছনে। রামতনু লোকটার প্রকাণ্ড চেহারাটা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। লোকটার মাথার পাশে

ঘরে ঘরে লাল আলোর ফোটা জ্বলছে, নিভছে। অগত্যা রামতনু তাতেই মনোনিবেশ করল।

চারের ঘরের আলো নিভে গেল! পাঁচের ঘরে জ্বলে উঠল। রামতনু ভাবল, আর ক নিমেষই বা—।

লোকটা সামনে থেকে সরে দাঁড়াল।

রামতনু সবিস্ময়ে দেখল, তার মনকে ফাঁকি দিয়ে কখন পনেরোর ঘরে লাল আলোর ফোটা জ্বলে উঠেছে।

আলো এসে রামতনুকে স্নান করিয়ে দিল। বাতাস ঝাঁপিয়ে পড়ল রামতনুর শরীরের ওপর।

আবেশে-আবেগে রামতনু চোখ মুদল, আঃ এ-হচ্ছে নন্দনকাননের আলো, বাতাস।

একঝাঁক প্রজাপতি যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল—ছেঁকে ধরে অভ্যর্থনা করল তাকে। রামতনুর মনে হল সে-যেন এক প্রজাপতিদের রাজ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে। রৌদ্রের মত প্রজাপতিদের পাখনার রং। প্রজাপতিরা তার পায়ের নীচে বিছিয়ে দিয়েছে নিজেদের—নিজেদের উষ্ণ নরম শরীরকে। প্রজাপতিরা যেন তাদের শরীরকে তার পায়ের তলায় পিষ্ট হতে দেবে। তার চলাকেও আর মসৃণ আরামপ্রদ, সুখকর করাই যেন প্রজাপতিদের এই আত্ম-দানের উদ্দেশ্য। প্রজাপতিদের রাজ্য থেকে, নিজের শরীরের ওপর থেকে দৃষ্টি তুলে রামতনু ঘাড় উঁচু করে তাকাল।—মাথার ওপর মাধবীবিতান! সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে ছেঁড়া কাগজের মত টুকরো টুকরো নীল রৌদ্রো-জ্জ্বল আকাশ। মাধবীবিতানে বাতাস লাগল মৃদুমন্দ—। মাটির ওপর শুয়ে থাকা প্রজাপতিরা আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠল। পাখা বাড়াল। যে প্রজাপতিরা তার সর্বশরীর ব্যাপী ছড়িয়ে ছিল তারা শিউরে উঠল। রামতনুর বিহ্বল দৃষ্টি তাকে ঘিরে অসংখ্য আনন্দ-উচ্ছল নৃত্যরতা প্রজাপতিদের ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না কিছুক্ষণ। তার চতুর্দিকে প্রজাপতিরা নানা ভঙ্গিতে উড়তে লাগল, নাচতে লাগল। তারপর প্রজাপতিরা আবার নিথর হল। শান্ত হয়ে বসল মাটিতে। তার সর্বশরীরে। যে যেমনটি ছিল ঠিক সেইভাবে। বসে ঝিম্ ঝিম্ করে পাখা কাঁপাতে লাগল। রামতনু ভাবল, এই মাধবীবিতান দিয়ে বস-রা যখন হেঁটে যান তখন রোদ রং-এর এই সব প্রজাপতিরা, হয়ত বা জ্যোৎস্নার বাদামী প্রজাপতিরাও তাদের এমনি করে জড়িয়ে ধরে, এমনি করে নৃত্য করে তাদের ঘিরে। বসদের মনকে খুশি করে, আহ্লাদিত করে।

মাধবীবিতানের মৃদু-মন্দ বাতাস তখন বিতান থেকে নেমে নন্দনকাননের ফুটন্ত, অর্ধ-ফুটন্ত ফুলেদের সুড়সুড়ি দিয়ে হাসিয়ে নাচিয়ে অস্থির করে তুলেছে। ফুলেরা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে। ঢলে ঢলে পড়ছে এ ওর গায়ে! রামতনু বিমুগ্ধ হয়ে দেখল তার সামনেই নন্দনকাননের ফুলেদের রাজ্য। রাজ্য নয়, রাজ্য তুচ্ছ—এ সাম্রাজ্য। দিগন্ত পর্যন্ত নন্দন-কাননের ফুটন্ত, অর্ধ-ফুটন্ত আর কুঁড়িদের অবিচ্ছিন্ন বিস্তৃতি। শুধু সামনে নয়,—চতুর্দিকেই। চতুর্দিকের কোনো দিক থেকেই রামতনুর দৃষ্টি প্রতিহত হয়ে ফিরে এল না। রামতনুর চোখের মণিতে দিগন্তের ছায়া পড়ল।

একেবারে পাশেই শুকনো পাতার ওপর সাপ হেঁটে গেলে যেমন শব্দ হয় তেমনি সর-সর শব্দ হতেই রামতনু চমকে উঠল। যে-বাতাস ফুলেদের হাসিয়ে নাচিয়ে উধাও হয়েছে ভেবেছিল রামতনু, আসলে সে-বাতাস যে তার পাশেই নিঃশব্দে ছিল তা বুঝতে পারেনি। ফুলেদের স্পর্শে স্পর্শসুখে মূর্ছিত হয়ে সে-বাতাস ফুলেদের বিছানায় শুয়েছিল। রামতনুর পায়ের সাড়া পেয়েই জেগে উঠে চন্দ্রমল্লিকাদের ছেড়ে হাততালি দিতে দিতে ছুটে গেল ফুলেদের অন্য পাড়ায়।

চন্দ্রমল্লিকাদের পাড়া ছেড়ে রামতনু ফুলেদের যে পাড়ায় এসে উপস্থিত হল সে ফুলেদের নাম সে জানে না। মোমের মত সেই সব ফুলেদের রং সাদা। মাথায় নীল পাগড়ীর টোপর। হাল্কা মিষ্টি একটা গন্ধ মসলিনের ওড়নার মত এ-পাড়াকে ঢেকে রেখেছে! এ-পাড়ায় সূর্যের আলো ফুলেদের গা-বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। যেন মোমবাতি ফুলেদের মাথায় জ্বলছে নীল শিখা আর তারই তাপে ফোঁটায় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়ছে মোম।

রাস্তার দু-পাশে মন্দিরের চূড়ার মত লোহার জালের গা-বেয়ে লতিয়ে উঠেছে মধুলতা। লতায় লতায় ফুল ঝুলছে থোকা থোকা। আকণ্ঠ মধুর ভারে বাসন্তী-রংএর মধুফুলেদের শরীর ভার। শরীরে মধুর ভার—তারা তাই নিশ্চুপে রোদ পোহাচ্ছে। রোদে গা-এলিয়ে, রোদে গা-সেঁকে সে-বুকের মধুকে আরও গাঢ়, আরও মিষ্টি, আরও সুগন্ধী করছে।

পথ এমনই মজার যে, পথ কখনই শেষ হচ্ছে না। এই পথ দিয়ে রামতনু হেঁটে চলেছে। দুপাশে ফুলেদের সাম্রাজ্য। অবিচ্ছিন্ন এবং অবিরাম। পথ নিজের খুশিমত দুমড়েছে, মুচড়েছে, বাঁক নিয়েছে—বাঁক নিয়ে অন্যদিকে ঘুরে গেছে। মোট কথা, রামতনু যে-পথ দিয়ে চলেছে তার যেন আদি নেই, অন্তও নেই। আর তাতে করে নন্দনকানন যে কত দূর বিস্তৃত, কত প্রকাণ্ড, রামতনু দিগন্ত পর্যন্ত তার দৃষ্টিকে প্রসারিত করেও হদিশ করতে পারছে না।

পথটা যে তাকে কোথায় নিয়ে চলেছে তাও সে বুঝে উঠতে পারছে না। পথের দু-পাশে ফুলেরা কোথাও পাড়ায় পাড়ায় আলাদা হয়ে রয়েছে। আবার কোথাও পাঁচ গাঁয়ের হাটুরে মানুষ এক হাটে এসে জড়ো হওয়ার মত জড়ো হয়েছে। বসে-দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে জটলা করছে।

মাঝে মাঝে রামতনু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। একটা মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছিল। গন্ধটা যে কোথা থেকে ভেসে আসছে রামতনু বুঝতে পারছিল না। অথচ গন্ধটা তাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করছিল। প্রতিবার সামনে ফুলেদের যে-কোন পাড়া দেখে রামতনুর মনে হচ্ছিল গন্ধটা বোধহয় সামনে ফুলেদের ওই পাড়া থেকে আসছে। সেখানে গিয়ে সে হিস্-হিস্ করে নিঃশ্বাস টানছিল। কিন্তু গন্ধ শুঁকে তার মনে হচ্ছিল, না এ-গন্ধটা সে-গন্ধ নয়।......সেই বাতাস কোথায় ছিল। হঠাৎ একেবারে সামনেই ফুলেদের পাড়ায় এসে উপস্থিত। ফুলেদের হাসিয়ে নাচিয়ে ঝরা-পাপড়ির ঘূর্ণি তুলে হাসতে হাসতে উধাও হয়ে গেল। আবার, আবার রামতনু সেই গন্ধটা পেল। বাতাসটা যেন মজা পেয়ে রামতনুকে খানিকটা ক্ষেপিয়ে দেবার জন্যে সেই গন্ধটা সঙ্গে করে এনে তার গায়ের ওপর সবটুকু ঝরিয়ে দিয়ে উধাও হয়ে গেল। রামতনু পেছন ফিরে খানিকক্ষণ ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইল। তারপর প্রতিবারের মত আরও একবার একই ভুল করল। —সামনে ফুলেদের পাড়ায় বাতাস এতক্ষণ মাতামাতি করে গেছিল, সেই মনে করে হন্‌হন্ করে সামনে এগিয়ে গেল। নাকের পাটা ফুলিয়ে ফুলিয়ে নিঃশ্বাস টানল।

যদিও রামতনু আবারও ব্যর্থ হল। সেই গন্ধটা পেল না বলে মনক্ষুণ্ণ হল। সত্যি বলতে কি এ-ফুলের কোনো গন্ধই নেই। কিন্তু ফুলগুলো দেখে রামতনু মুগ্ধ হয়ে গেল। এমন ফুল তো সে ইতিপূর্বে দেখেইনি, এমন বর্ণসুন্দর ফুল যে হয়, হতে পারে এও তার ধারণার বাইরে ছিল। অবশ্য রামতনু তৎক্ষণাৎ মনেমনে বলল, আমি কিইবা দেখেছি। কতটুকুই বা জানি।

হেঁট হয়ে ফুলেদের দেখে মাথা তুলে সামনে তাকাতেই রামতনু অবাক হয়ে গেল। আবেগে, আনন্দে, উত্তেজনায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, আরে সতী। তুমি?

সতী হাসল, মিস্টার রাঘবন নেই। হাতে কাজকর্মও নেই। বসে থাকতে থাকতে বোরড লাগল, তাই চলে এলে এখানে—। রামতনু সতীর কথার শেষটা এমনভাবে নিজে টেনে নিল যেন ব্যাপারটা

তার খুবই জানা। তারপর বলল, কিন্তু আমি কি ভেবেছিলাম জানো সতী? তুমি গতকাল বিগ্-বসের সঙ্গে সকালের প্লেনে দিল্লী চলে গেছ।

সতী বলল, দিল্লীতে, এমারজেন্ট্ মিটিং ডিরেক্টোরিয়াল বোর্ডের। যতদূর জানি, আগামী ধর্মঘটের ব্যাপার মিটিং-এর এজেন্ডা। টপ-সিক্রেট্ ব্যাপার। এসবের মধ্যে কি আমরা থাকতে পারি। হাজার হলেও— অন্যমনস্কতা থেকে ফিরে রামতনুর দিকে তাকিয়ে সতী বলল, হাজার হলেও মাস গেলে আমরাও তো পে-সিটে সই করি। যাকগে, তোমায় এখানে আসতে আট্কায়নি তো কেউ—

রামতনু চোখের দৃষ্টিকে কঠোর, মুখের পেশীগুলোকে শক্ত করল, আট্কাবে কী সতী। দারোয়ান দরজা খুলে দাঁড়াল—গট্গট্ করে হেঁটে এলাম। কাঁটায় কাঁটায় দেড়টা—লিফটটা এসে সামনে দরজা খুলে দাঁড়াল, মন্ত্রের মত ব্যবস্থা সব। তুমি অর্ডার দিয়েছ, আটকাবে কোন শা—রামতনু অতিযত্নে উৎসাহের বল্গা টেনে ধরল।

সতী বলল, তারপর দেখলে সব। কি যেন বল তোমরা! ও হ্যাঁ, প্যারাডাইস্—তোমাদের প্যারাডাইসের দেখলে সব?

সতী কথা বলতে বলতে ক'পা এগিয়ে গেছিল। রামতনু একটু জোরে পা ফেলে পেছন ধরল, কই আর দেখলাম। কতটুকুই বা দেখলাম। মজা কি জানো সতী, কি দেখেছি, কতখানি দেখেছি আসলে তাই-ই বুঝে উঠতে পারছি না। আমি শুধু গন্ধে পাগল হয়ে পথে পথে ফিরছি। বলতে বলতে রামতনুর যেন হঠাৎ মনে পড়ল, সতী, ওই গন্ধটা কোথা থেকে আসছে বলত —কিছুতেই আমি ধরতে পারছি না।

কোন্ গন্ধ? —ব্যালে-নর্তকীদের মত দীঘল করে আঁকা সতীর ভ্রূতে ছোটছোট ঢেউ উঠল।

ওই যে, পাচ্ছো না তুমি? রামতনু নিজেই নাকের পাটা ফুলিয়ে দুবার ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস টানল, ওই যে— মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ একটা—।

ও, সতী গন্ধটা পেয়ে বলল।

অতিমাত্রায় উৎসাহিত হয়ে রামতনু বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ। ওইটাই, ওইটাই।

ও গন্ধটা আসছে—বলতে গিয়ে সতী থামল। থেমে, হাসতে গিয়ে আল্তো করে দাঁত দিয়ে পাত্লা ঠোঁট চেপে ধরল।

সতীর সহাস মুখের দিকে তাকিয়ে রামতনুর চোখ-মুখ কৌতূহল ও উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, ব্যাপারটা কি, আঁ— । ব্যাপারটা কি।

সতী বলল, এই গন্ধটা সেখান থেকে আসছে যেখানে আমরা সব শেষে যাব। বলতে গেলে ওইটাই তোমাদের নন্দনকাননের লাস্ট্-ডেস্টিনেশন্।

প্রথমটা রামতনুর নিজেকে খানিকটা বিমূঢ় মনে হচ্ছিল। তাড়াতাড়ি সে-ভাব কাটিয়ে উঠে বলল, কোথায় শেষ আর কোথায় শুরু, সে আমার জেনেও কাজ নেই সতী। আমি এখানে চোখ থাকতেও কানা। তুমি যাবে, আমি তোমার পেছনে পেছনে। রামতনুর কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে আসছিল ক্রমশঃই, তুমি আমায় এখানে আসবার সুযোগ করে দিয়েছ। শুধু তাই নয়— নিজে এসেছ, নিজে আমায় নিয়ে চলেছ এ যে আমার কাছে কি, কতখানি · নামতে নামতে গলার স্বর এমন খাদে নেমে এসেছিল যে, রামতনু বুঝল এরপর কিছু বললেও সতী হয়ত শুনতে পাবে না। চুপ করে গেল।

বুকের ওপর আড়াআড়ি হাতে হাত জড়িয়ে সতী এগিয়ে চলছিল। হাওয়ায় সতীর ঘাড়ের ওপর স্তবকে স্তবকে নেমে আসা ঈষৎ রুক্ষ চুল উড়ছিল, স্বর্ণচাঁপা ফুলের রংএর শাড়ীর আঁচল।

গ্যালারীতে সাজানো এই যে ক্যাকটাসগুলো দেখছ— সতী ঘাড় ঘুরিয়ে রামতনুর মুখের দিকে তাকাল, এগুলো পৃথিবীর নানান দেশ থেকে আনানো হয়েছে। কোনোটা হয়ত মরুভূমির মধ্যে হয়েছিল—কোনোটাকে হয়ত ন্যাড়া পাহাড়ের ফাটলের ভেতর থেকে উপড়ে আনা হয়েছে। দেশ-বিদেশের অর্কিড্ আর ক্যাকটাস্ সংগ্রহ মিস্টার সেনগুপ্তের একটা হবি।

সোৎসাহে রামতনু বলল, মিস্টার সেনগুপ্ত, মানে আমাদের সেজ বস্।

এই তো সেদিন প্লেনে নিউগিনি থেকে পাঁচটা পাঁচ রকমের অর্কিড এসে পৌঁছল। যতদূর জানি, সাড়ে চার থেকে পাঁচ হাজারের মত খরচ পড়েছিল।

বিস্ফারিত বিস্ময়ে রামতনু বলল, কতো!

হাজার পাঁচেকের মতন, ছোট করে উত্তর দিয়ে সতী বলল, কিন্তু এর মধ্যে তিনটে গাছ কিছুতেই বাঁচানো গেল না। মিস্টার সেনগুপ্তের মনমেজাজ্ তো ভীষণ খারাপ।

ই—স্। তিন হাজারই বরবাদ। রামতনু খুবই বিমর্ষ বোধ করল।

সুতরাং, আবার অর্ডার দিতে হল।

যাক্—রামতনু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। এখন মিস্টার সেনগুপ্তের মেজাজ আর এতটা খারাপ নয়ত—জিজ্ঞেস করতে গিয়ে রামতনুর দৃষ্টি

সামনের এক জায়গায় আটকে কৌতূহলী হয়ে উঠল, সতী ওটা কি ? কিছু একটা তৈরী হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে ?

ও হচ্ছে তোমাদের ছোটো বস্ মিস্টার পাণ্ডের কাণ্ড। ছোটো-খাটো একটা সুইমিং পুল তৈরী করাচ্ছেন। গয়া ডিস্ট্রিক্টের লোক। ছেলেবেলায় ফল্গুর তীরে দাঁড়িয়ে ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরে পার হবার স্বপ্ন দেখতেন। যাক্, সে সব আর হয়নি। কিন্তু সাঁতার দেওয়ার অভ্যাসটা ছাড়তে পারেননি। তাই ওই সুইমিং পুল,—

রামতনুর ভীষণ ইচ্ছে করছিল এই সুইমিং পুলটা তৈরী করাতে কত খরচ পড়েছে সতীকে জিজ্ঞেস করে। কিন্তু সোজাসুজি প্রশ্নটা উত্থাপন করতে সাহস পাচ্ছিল না। অথচ কৌতূহল তাকে অস্থির করে তুলছিল। শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে গলা পরিষ্কার করে রামতনু বলল, আচ্ছা সতী, এটাও বেশ একটা খরচার ব্যাপার তাই না ?

এখানে খরচের কথা কেউ ভাবে না। এখানে শুধু ইচ্ছে—। সতী চলতে চলতে বলল, ইচ্ছা ছাড়া কেউ এখানে অন্য কিছুর মূল্য দেয় না।

সতীর মুখের দিকে চোরাচোখে চেয়ে রামতনু মুহূর্তে গুটিয়ে নিল নিজেকে, তাতো বটেই, তাতো বটেই। এটা হচ্ছে ইচ্ছাপূরণের রাজ্য।

সামনে রাস্তাটা বাঁক নিয়েছে। বাঁক নিয়ে সামনে তাকাতেই রামতনুর দুটো চোখ যেন ধাঁধিয়ে গেল। চোখের পলক ফেলতে ভুলে গেল। রামতনুর মনে হল, এক গলিত প্রবালের সমুদ্রের সামনে সে দাঁড়িয়ে। তার সামনে এক জীবন্ত গলিত প্রবালের সমুদ্র, ফুলছে, ফাঁপছে, ফুঁসছে। তার সামনে থেকে এইমাত্র যে-ঢেউটা জীবন্ত গভীর থেকে মাথা তুলল, সেই ঢেউ নীল দিগন্তকে আঘাত করতে ভেঙে ভেঙে এগিয়ে গেল।

এখানকার একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করেছ ? সতীর কথাগুলো যেন অনেক দূর থেকে ভেসে এল—নাকি হাওয়া, হাওয়া এখানে উদ্দাম বলে সতীর কথাগুলো বহু দূর থেকে বলা কথার মত মনে হল, রামতনু ঠিক করে উঠতে পারল না।

বিশেষত্ব। রামতনু খানিকটা বিহ্বল দৃষ্টি চারপাশে বুলিয়ে বলল, কি জানি সতী - ঠিক বুঝতে পারছি না।

এখানকার সব গোলাপই লাল। লাল রং ছাড়া এখানে অন্য কোন রং-এর গোলাপ নেই। জুনিয়ার মিস্টার দেশাইয়ের লাল রং-এর ওপর ভয়ংকর ফ্যাসিনেশান। ওনার পি-এ, স্টেনোর হয়েছে বিপদ। বেচারীরা কেউ লাল রং-এর পোশাক ছাড়া অফিসে আসতেই পারে না।

রামতনু চোখ মুখ কুঁচকে হাসল, রাঙা বসু কি না তাই রাঙা রং ছাড়া আর কিছুতেই মন ওঠে না।

হাতের ছোট্ট রুমাল সতী মুখের ওপর বোলাল, ওঃ তোমার সঙ্গে বকর বকর করতে করতে আমার গলা শুকিয়ে গেছে। চল একটু গলা ভিজিয়ে নেওয়া যাক।

রামতনু পুলকিত হয়ে উঠল, সে সব ব্যবস্থাও আছে নাকি সতী এখানে।

মানুষের সুখের জন্য যা যা দরকার—সতী আলগোছা ঘাড়ের ওপর থেকে চুলের ঝালর সরিয়ে দিল, সমস্তই এখানে কোল্ড স্টোরেজ রাখা অসময়ের সব্জীর মত সর্বদাই মজুত।

আহ সুখ! সে কি জিনিস। রামতনু মনে মনে বলল, তাইতো. সেই জন্যেই তো এখানে আসা—

সতী বলল, কি বিড়বিড় করছ আপন মনে ?

রামতনু বাকী কথাগুলো গিলে ফেলল নিমেষে, ও কিছু না।

যদিও তখনও গোলাপের রাজ্যের মধ্যে দিয়ে তারা হেঁটে চলছিল, তখনও গোলাপের রাজ্য শেষ হয়নি, কিন্তু রামতনু গোলাপের গন্ধ ছাপিয়েও আবার সেই গন্ধটা পাচ্ছিল। শুধু তাই নয়, প্রতিটি পদক্ষেপে সেই গন্ধ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছিল ক্রমেই। রামতনু বেশ বুঝতে পারছিল নন্দনকাননের শেষ গন্তব্য আর বেশী দূরে নেই। প্রতিটি পদক্ষেপ শেষ-গন্তব্যকে ক্রমেই নিকট'থেকে নিকটতর করে আনছে।

সতী থামল। রামতনু দেখল, তার সামনেই পথের শেষ। এক লতা-কুঞ্জের দ্বারে এসে পথ থেমেছে। দরজাটা ঘন সবুজ রংএর ঢেউ-খেলানো কাঁচের, তাতেই রামতনু অনুমান করল সরস সবুজ ঘন-বুনোটের লতার চাদরের আড়ালে কংক্রিটের শক্ত দেওয়াল রয়েছে। সবুজলতার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে অসংখ্য নীল রং-এর ফুল ফুটেছে। ফুলেরা তাদের গন্ধকোষের দ্বার খুলে দিয়ে বিহ্বল করে রেখেছে নন্দনকাননের বাতাস।

এস, সতী দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল।

খানিকটা ঠাণ্ডা বাতাস এসে গায়ে লাগল। —এ ঘরটা এয়ার কণ্ডিশণ্ড করা. পূর্ব অভিজ্ঞতা রামতনুকে স্মরণ করিয়ে দিল।

ঘরে ঢুকে রামতনুর মনে হল, সে যেন ছেলেবেলায় ইংরিজি ছবিতে দেখা অরণ্যচারী কোনো মানুষদের আস্তানায় এসে হাজির হয়েছে। ঘরের চতুর্দিকের দেয়ালে গহন অরণ্য স্তব্ধ। নিশ্ছিদ্র ঝোপঝাড়ের মাথা ছাড়িয়ে প্রাচীন গম্ভীর বনস্পতিরা তাদের শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে দিয়েছে। ঝুরি

নামিয়ে দিয়েছে। খোলা ছাতির মত মাথার ওপর তাদের পত্র-পল্লবের নিবিড় সমারোহ। পত্র-পল্লবের ফাঁকে-ফাঁকে আকাশের আরক্ত বর্ণচ্ছটা। চতুর বর্ণ ব্যবহারে সুমসৃণ মেঝে। তৃণহীন কাঁকুরে মাটির মত বন্ধুর। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত যে কৌচ, সোফাগুলো রয়েছে রামতনুর মনে হল সেগুলো যেন অরণ্য থেকে আহরিত কাঠ, কুড়ুল ফেঁড়ে আর কাঠের গুঁজি ঠুকেঠুকে তৈরী। মৃত বাঘ, বন্যমহিষ, মৃগচর্ম এই সব কৌচ-সোফার গদির গাত্রাবরণ। আশেপাশে টি-পয়-এর মত যে টেবিলগুলো ছড়ানো রয়েছে সেগুলো যেন গাছের গুঁড়ির খণ্ডাংশ ছাড়া অন্য কিছু নয়।—যদিও রামতনু ঘ্রাণে যে মৃদু বার্ণিশের গন্ধটা পাচ্ছিল মনে হচ্ছিল সেটা এইসব টেবিল কৌচ, সোফার গা থেকেই আসছে। এমন কি এই পরিবেশে টি-পয়ের ওপর কোনটাকে দেখে রামতনুর মনে হচ্ছিল যেন কালো কুচকুচে একটা পাহারাদার কুকুরের বাচ্চা। এখন নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। কারো সাড়া পেলেই শরীর কুঁকড়ে সাদা ঝকঝকে ধারালো দাঁত বার করে উঠে দাঁড়াবে।

এই সেই জায়গা,—রামতনু অনুমান করল, যেখানে এসে আমাদের বসেরা তাদের অফিসের আঁটোসাটো পোষাক আলগা করে দেন—টাইয়ের ফাঁস নামিয়ে দেন, সার্টের দুটি-একটি বোতাম ছেড়ে দেন, কোমরের বেল্টের ঘর বাড়িয়ে দিয়ে মটমট করে আঙুল মটকান।

দাঁড়িয়ে রইলে কেন বস। সতী একটা সোফার ওপর শরীর ছড়িয়ে দিল।

মৃদু একটা আলো প্রায় গন্ধের মত সমস্ত ঘরটায় ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু রামতনু এদিক-ওদিক বিস্তর খোঁজাখুঁজি করেও আলোর বাল্বগুলো দেখতে পাচ্ছিল না। মাথার ওপর তাকিয়ে খানিকক্ষণ লক্ষ করে আবিষ্কারের আনন্দে রামতনুর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। রামতনু মনে মনে বলল, বুঝেছি, বুঝেছি আকাশের এই রক্তিম বর্ণচ্ছটা আসলে অস্তগামী সূর্যের, সমাসন্ন সন্ধ্যার—

শরীর টানটান করে মুখের ওপর হাতের উল্টোপিঠ রেখে সতী হাই তুলল, টায়ার্ড—।

রামতনুর চোখে সহানুভূতির ছায়া পড়ল, হবেই তো, বাইরে যা কটকটে রোদ এখন।

স্খলিত আঁচল কাঁধের ওপর, বিন্যস্ত করে সতী উঠে দাঁড়াল, আসছি, বসো।

কোথায় যাচ্ছ, চারপাশে তাকিয়ে রামতনু যেন খানিকটা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল।

এইখানেই—

সতী উঠে একটা সোফার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল দেয়ালের দিকে। দেয়ালের ওদিকটায় বড় একটা কাঠের সিন্দুকের মত কি-যেন একটা রয়েছে—রামতনু লক্ষ করেও জিনিসটা যে কি বুঝে উঠতে পারছিল না! ওখানে দাঁড়িয়ে সতী কখনো ঝুঁকে পড়ছিল, ঝুঁকে পড়ে কিছু তুলে নিয়ে দেখে আবার নামিয়ে রাখছিল, এটাওটা নাড়ছিল—রামতনু পেছন থেকে খানিকটা বিমূঢ়ভাবে লক্ষ করে যাচ্ছিল। রামতনুকে সচকিত করে একসময় ঘরের মধ্যে বাজনা বেজে উঠল। বাজতে থাকল। সতীর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রামতনুর চোখের পাতা ছোট হয়ে আসছিল—সেই চোখের পাতা পরিপূর্ণ খুলে গেল। অল্পক্ষণ বাজনা শুনে রামতনুর মনে হল, এই পরিবেশের সঙ্গে—এই অরণ্য, অস্তোন্মুখ সূর্যের ম্রিয়মান আলো, ঘুমন্ত কুকুরের বাচ্চার মত ফোনের সঙ্গে এই বাজনার কোথায় যেন একটা অদ্ভুত মিল রয়েছে। এই পরিবেশের জন্যই যেন এই বাজনা। এই বাজনার জন্যই চারিদিকের এই পরিবেশ যেন ক্রমেই জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

সতী ফিরে এল। রামতনুর দিকে তাকিয়ে বলল, কেমন লাগছে?

গ্র্যান্ড, রামতনু কপালের মাঝ বরাবর ভ্রূ উৎক্ষেপ করল। একটু নীরবতা। যন্ত্রের সামান্য শব্দ। আবার বাজনা বেজে উঠল।

কি খাবে বল?

রামতনুর মনে পড়ল অফিসের চেয়ারে বসে থাকলে পরমেশ্বর এতক্ষণে দ্বিতীয়বার এসে সামনে দাঁড়িয়ে চায়ের দাগ-লাগা সিল্ভারের কেটলী নাড়িয়ে শব্দ করে ড্রয়ার থেকে গেলাস বার করে দিতে ইঙ্গিত জানাত। কে জানে এখানে সেসব ব্যবস্থা আছে কি না! দ্বিধাগ্রস্তভাবে রামতনু সতীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, এক গেলাস জল পাওয়া গেলে হত সতী।

জল!

রামতনুর নিজেকে ভীষণ বোকা বোকা লাগতে লাগল। কেননা, মনে হল সতী যেন অতিকষ্টে তার পাতলা ঠোঁট ফেটে বেরিয়ে আসতে চাওয়া ঝক্‌ঝকে দাঁতের সারি ঢাকল। উদ্‌গত শব্দ গিলে ফেলল।

আচ্ছা দাঁড়াও দেখি কি ব্যবস্থা করতে পারি।

সতী কৌচের ওপর বসে বসেই পাশের একটা টি-পয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ল। কাঁধের ওপর থেকে আঁচল খসে পড়ল! রামতনুর গা শিরশির করে উঠল। তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিল! তারপর সবিস্ময়ে লক্ষ করল, আলমারির কব্জা-দেওয়া পাল্লার মত টি-পয়ের একটা দিক খুলে গেছে। ভেতর থেকে সতী দুটো গেলাস্ বার করল, তারপর একটা সুদৃশ্য বোতল।

আস্তে ঠেলা দিয়ে পাল্লাটা বন্ধ করে দিল।

জিনিসটা কি সতী? রামতনু যেন অনেক চেষ্টা করেও কৌতূহল চাপতে পারছিল না।

বাজনার শব্দ ছাপিয়ে টুব্ করে ছিপি খোলার শব্দ হল! সতী হাসল, ভয় নেই, খারাপ জিনিস কিছু নয়।

কি যে বল—মুহূর্তে গলার স্বর কৃতজ্ঞতায় আর্দ্র করে ফেলল রামতনু. অস্থিরতায় হাঁটু নাড়ল. তবু জিনিসটা মানে জিনিসটা কি—অ্যাঁ।

শ্যামপেন, সতী গেলাসের ওপর বোতলের মুখ কাত করে ধরল।

শ্যাম্-পে-ন্, রামতনু হাঁটু নাড়াতে ভুলে গেল। সমস্ত শরীর যেন পাথর রামতনুর, দুটো চোখ অস্বাভাবিকভাবে বিস্ফারিত হয়ে সমস্ত মুখের আদলটাই একেবারে বদলে দিল।

একটা গেলাস পূর্ণ করে আর একটায় ঢালতে গিয়ে সতী মুখ তুলে রামতনুর মুখের দিকে তাকাল, আপত্তি আছে নাকি?

রামতনু যেন ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠল। হাতের তালুতে তালু ঘষল, না না আপত্তি কেন হবে।

বাজনা থেমেছে। রামতনু যেন তার চতুর্দিকে ঝোপঝাড়ের মধ্যে ঝিল্লিরব শুনতে পেল।

সতী গেলাস তুলে ধরল। রামতনু প্রথমটা বুঝতে পারল না কি করবে। তারপর ইংরিজি ছবির কথা মনে পড়ল। তাড়াতাড়ি গেলাস ঠোকাঠুকি করবার জন্য গেলাস তুলতে গিয়ে দেখল সতী ঠোঁটে গেলাস ঠেকিয়েছে। রামতনু গেলাসের দিকে বাড়ান হাত গুটিয়ে নিল তাড়াতাড়ি।

রামতনুর মনে হচ্ছিল তার চারপাশে অরণ্য আস্তে আস্তে জেগে উঠছে। গুহাগহ্বরে, ঝোপঝাড়ের অন্ধকার তলায়. গাছের ঘন ডালপাতার আড়ালে অরণ্য জাগছে।

সতী গেলাসের ওপর বোতলের মুখ কাত করে ধরল। রামতনু স্মরণ করে উঠতে পারল না সতী ইতিমধ্যে কতবার এমনি করে নিজের গেলাস ভর্তি করে নিয়েছে।

রামতনুর গেলাসের ওপর বোতল কাত করতে গিয়ে সতী থমকালো। মুখের দিকে তাকাল, কি ব্যাপার? গেলাস ভর্তিই যে।

খাচ্ছি, খাচ্ছি, রামতনু চোখ টিপল। তুমি চালিয়ে যাও—। তারপর একটু ইতস্তত করে দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বলল, সতী নেশা হয়ে যায় যদি—।

রক্তের ছিটে ফুটে উঠেছে সতীর গালে, কপালে। কাঁচপোকার মত

ঝক্‌ঝকে চোখ তুলে সতী রামতনুর মুখের দিকে তাকাল, ক্ষতি কি, হোক না একটু।

বাজনা থেমে গেল।

দাঁড়াও রেকর্ড বদলে দিয়ে আসি, আধশোয়া অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়াতে সতী দেরী করল। সোজা হয়ে বসল অল্পক্ষণ। ফাঁপানো চুলের ওপর দিয়ে হাত টেনে নিয়ে ঘাড়ের ওপব রাখল। তারপর কৌচের একটা হাতল খাম্‌চে ধরে উঠে দাঁড়াল।

টি-পয়ের ওপর গেলাসটার দিকে তাকিয়ে রামতনুর মনে হচ্ছিল, কানায় কানায় সুখ তার হাতের নাগালের মধ্যে। এখুনি সে তার দুটি তৃষ্ণার্ত ঠোঁট সিক্ত করে নিতে পারে—কিন্তু রামতনু সময় নিচ্ছিল, সময়কে বিলম্বিত করছিল। সেই রকম সময় নিচ্ছিল যে-রকম সময় চরম সুখে নিজেকে তৃপ্ত করতে প্রয়োজন।

আবার বাজনা বেজে উঠল। রামতনুর মনে হল এবার যে-বাজনা বাজাচ্ছে, সে-বাজনার তালের দোলা তার রক্তকে আঘাত করছে। চারপাশের অরণ্যের মত তার রক্তও জেগে উঠেছে।

কিছু মনে করো না—সতী চিতাবাঘের ছালে মোড়া একটা সোফার গদির ওপর শরীর এলিয়ে দিল। প্লিজ গ্লাসটা একটু এগিয়ে দেবে। —সতী হাত বাড়াল।

সতীর খোলা হাতের দিকে তাকিয়ে রামতনু গেলাস এগিয়ে দিল। সতী গেলাসটা বুকের ওপর বসাল।

বাজনার তাল দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠেছে। অনেক গলায় একটা কোলাহল যেন বাজনার সঙ্গে তাল রেখে তালে তালে বাজনার শব্দকে ছাপিয়ে উঠছে আস্তে আস্তে। সতীর চাঁপা রং-এর শাড়ীর আঁচল লুটোচ্ছে মাটিতে। এক পা উঁচু করে তুলে দিয়েছে সোফার ঠেসান দেবার জায়গাটার ওপর আর একটা পা চিতাবাঘের ছালে মোড়া গদির ওপর এলিয়ে পড়ে রয়েছে। বুকের ওপর গেলাসে তরল শ্যামপেন টল্‌টল্‌ করছে। বাজনার তালে তালে সতীর কোমর নড়ছে—সতীর সমস্ত শরীর বাজনার ছন্দ আর তালের আরক রসে জেরে উঠেছে।

রামতনুর চোখ সুঁচল হয়ে এল; চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। রামতনুর মনে হল কোন ফাঁকে তার জুতোর ভেতর একটা পিঁপড়ে ঢুকে পায়ের তলার চামড়ায় সুড়সুড়ি দিতে শুরু করেছে। রামতনু পায়ের বুড়ো আঙুলের ঠেলা দিয়ে জুতো খুলে ফেলল। হাত বাড়িয়ে গেলাস তুলে নিল। ঠোঁটের

সামনে গেলাস তুলে রামতনু মনে মনে বলল, এইবার, এইবার আমি এই গেলাসের বর্ণহীন সুখের রাজ্যে চলে যাচ্ছি—

মিশমিশে কালো রং-এর কুকুর বাচ্চার মত ফোনটা যেন এতক্ষণ রামতনুকে সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ করে যাচ্ছিল, রাগে গরগর করে উঠল।

ঠোঁট গেলাসের কানা ছুঁয়ে রয়েছে, রামতনু ফোনের দিকে তাকাল। তারপর সতীর দিকে।

মুখে ছোট্ট একটা বিরক্তির আওয়াজ করে শুয়ে শুয়েই কানে রিসিভার চেপে সতী সাড়া দিল।

রামতনু কিছুই শুনতে পাচ্ছিল না। চমকে উঠল। সতী ধড়মড় করে উঠে বসেছে। সতীর চোখেমুখে আতঙ্ক, সর্বনাশ হয়েছে—রিসিভার ধরা হাত কাঁপছে সতীর।

কি হল! রামতনু সতীকে দেখে ভয় পেল।

মিস্টার রাঘবন —। রিসিভারের দিকে তাকিয়ে সতী বলল।

আমাদের বিগ্ বস! কোথায়?

এই অফিসে—।

সে কি! রামতনুর গলা কেঁপে গেল, মিস্টার রাঘবন তো দিল্লীতে -

মিটিং শেষ হতেই প্লেন ধরেছেন। তারপর দমদম থেকে সোজা অফিসে। অফিসে এসে আমার খোঁজ করেছেন, আমায় দরকার পড়েছে। ফোনে বললেন, এখুনি আসছেন এখানে।

চাকরি যাবে -। প্রচণ্ড একটা আঘাতে সমস্ত শরীর যেন কেঁপে উঠল। রামতনুর হাত থেকে গেলাসটা মাটিতে খসে পড়ে চুরমার হয়ে গেল. কি করব সতী?

নিজের দিকটাই ভাবছ শুধু, সতীর চোখে ঘৃণা জ্বলে উঠল, এখানে তোমার সঙ্গে আমায় দেখলে মিস্টার রাঘবন কী ভাববেন সেটা একবার ভেবেছ?

তাতো বটেই, তাতো বটেই, রামতনু উঠে দাঁড়িয়েছিল, কি করব সতী এখন—

সতী ককিয়ে উঠল, যা হয় কর তাড়াতাড়ি—আমি কিছু ভাবতে পারছি না।

রামতনু অসহায়ের মত চারিদিকে তাকাল। তারপর প্রায় এক রকম ছুটেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল। রোদে চোখ ঝল্সে গেল। গরম হাওয়া ঝাঁপিয়ে পড়ল শরীরের ওপর। সামনের দিকে তাকাতেই চক্রবালের নীল-দিগন্ত

রামতনুকে আশ্বস্ত করল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে রামতনুর মনে হল, সে বৃথাই ভয় পেয়েছে। দিগন্তবিস্তৃত নন্দনকাননের কোন ফুলের ঝোপের আড়ালে সে লুকিয়ে থাকবে—মিস্টার রাঘবন তার হদিশই পাবেন না।

সময় নষ্ট করা উচিত নয়। রামতনু পরম নির্ভরতায় ছুটতে শুরু করল। দু-পাশে রঙীন স্রোতের মত নন্দনকাননের ফুলেদের সাম্রাজ্য। ঘাড় তুলেই একেবারে সামনেই ডবল-ডেকার বাস দেখার মত রামতনু হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিল নিজেকে। ভয়ে রামতনুর সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ছলাৎ করে রক্তের ঢেউয়ের আঘাতে মনে হল তার ফুসফুস ফেটে যাবে। বিদ্যুতের মত ঘুরে দাঁড়িয়ে রামতনু চোখ বন্ধ করল। অন্ধের মত হাতড়ে পেছনে শক্ত মত কিছু পেল মনে হল, শক্ত করে চেপে ধরল। নিঃশ্বাস খানিকটা সহজ হতে রামতনু অনুভব করল, দুহাতের মুঠোয় শক্ত করে সে যা ধরে আছে, সেটা আসলে—ভয়ঙ্কর কষ্টে রামতনু বিকৃত স্বরে যেন নিজেকেই শোনাল, না না।

সময় নেই। রামতনু সামনের দিকে তাকাল। নীল-দিগন্ত তাকে বরাভয় জানাল।

রামতনু যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। তবু পায়ের গতি বাড়িয়ে দিয়ে, গতিতে সাবধানতা এনে এগিয়ে গেল: শুঁয়োপোকার মত শুঁড় তুলে গুটিগুটি ট্রাম হাঁটছে, পিঁপড়ের সারির মত যানবাহনের স্রোত, রঙীন ট্রেতে রাখা জলের মত সায়েবদের সুইমিং পুলের নীল জল, নক্সা করে সবুজ টার্কিশ তোয়ালের মত ময়দান রোদে শুকোচ্ছে—রামতনুর এতক্ষণে যেন মনে পড়ল, এটা তাদের অফিস বাড়ীর ছাদ। ছাদের পরই ভয়ঙ্কর শূন্যতা। সে শূন্যতাকে বিস্তৃতি বলে বিশ্বাস করেছিল।

রামতনু ছুটতে ছুটতে এসে দরজা খুলে দাঁড়াল, সতী—

বাজনা বন্ধ। সতী মেঝের ওপর হেঁট হয়ে বসে তাড়াতাড়ি গেলাসের ভাঙা টুকরোগুলো হাতে তুলছিল। চমকে উঠেই মুখে যন্ত্রণায় বিকৃত একটা শব্দ করে আঙুলটা চোখের সামনে তুলে ধরল। রামতনু দেখল, সতীর আঙুলের ওপর কুঁচ ফলের বীচির মত একফোঁটা গাঢ় রক্ত ফুটে উঠেছে। সতী দু-ঠোঁটের ফাঁকে আঙুল চেপে ধরল। এখনও দাঁড়িয়ে আছ, সতীর গলা দিয়ে আর্তস্বর বেরিয়ে এল।

কোথায় যাব সতী,—রামতনুর স্বরে কাতরতা ফুটে উঠল। তুমি ফোন করে লিফট্‌টা আনিয়ে দাও—নেমে যাই।

তুমি কি পাগল হয়েছ—। মিস্টার রাঘবন হয়ত এতক্ষণে লিফট-এ উঠে

পড়েছেন। লিফট্ উঠতে শুরু করেছে হয়ত।

তাহলে, কি করব সতী।

উঃ আমি কিছু ভাবতে পারছি না। সতী যেন এখুনি কান্নায় গলে পড়বে। তোমার সঙ্গে আমায় এখানে দেখলে মিস্টার রাঘবন যে কি ভাববেন—

না না, তোমার কোনো ক্ষতি হতে আমি দেব না সতী, রামতনু গলায় জোর এনে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করল সতীকে। অনুনয়ে রামতনুর স্বর চেপে এল, আচ্ছা সতী, তুমি যদি মিস্টার রাঘবনকে একটু বুঝিয়ে বল, বুঝিয়ে বল আমি তোমার এ বয়সের নয়—বালিকা কালের ফিঁয়াসে ছিলাম, তাহলে···

সোফার ওপর হাত, হাতের ওপর মাথা রেখে সতী ডুকরে উঠল, তুমি কি আমায় মেরে ফেলতে চাও—

না না।

রামতনু বাইরে এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর আর যেন তাড়াহুড়ো নেই, এমনি ভাবে নীলদিগন্তের দিকে এগিয়ে গেল।

রোদে শুকোতে দেওয়া নক্সা করা সবুজ টার্কিশ তোয়ালের মত ময়দান রঙীন ট্রেতে রাখা জলের মত সায়েবদের সুইমিং পুলের নীল জল, পিঁপড়ের সারির মত যানবাহনের স্রোত শুঁয়োপোকার মত শুঁড় তুলে গুটগুট হাঁটা ট্রাম···ছোট হতে হতে রামতনুর দৃষ্টি পনেরোতলা নীচে পাথরের টালি বসানো ফুটপাতের সেই জায়গাটায় এসে কেন্দ্রীভূত হল, যে জায়গাটা যেখানে সে দাঁড়িয়ে ঠিক তার নীচেই।

ক্রীড়াভূমি

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

নিজের ভিতরেই আছে এক অলৌকিক। কখনো কখনো তাকে টের পাওয়া যায়। স্পষ্ট নয়—কেননা একমাত্র ধর্মের পথেই সেই অলৌকিক স্পষ্ট ও ঈশ্বরের সমতুল হয়। তুমি স্বধর্মে কখনো স্থির থাকো না—সুতরাং তুমি কখনো কখনো এক পলকের জন্য মাত্র সেই অলৌকিককে প্রত্যক্ষ করে বিপদগ্রস্ত হও।

তাই তুমি একবার স্বপ্নে এক জনহীন প্রান্তরে দাঁড়িয়ে এক নীল অতি সুন্দরবর্ণের উড়ন্ত সিংহকে তোমার নিকটবর্তী হতে দেখে ভয় পেয়েছিলে। অথচ ভয়ের কারণ ছিল না, কেননা সেই সিংহের নীল কেশর, নীল চোখ ও নীল নখ সবকিছুই হিংস্রতাশূন্য ছিল; এবং সেই নীলবর্ণ সিংহের বাসস্থান ছিল না বলে সে অতি নম্রভাবে তোমার সম্মুখের ভূমি স্পর্শ করে তোমার কাছে একটি বাসস্থানের সন্ধান জানতে চায়, কেননা তুমি এই পৃথিবীর আইনসম্মত বসবাসকারী। তুমি নিজেও জান না কেন তুমি তাকে উত্তরদিকে ভুল পথে উড়ে যেতে সংকেত করেছিলে, এবং সেই সুন্দর সিংহটি অতি ধীর ও সাবলীল গতিতে পুনরায় মাধ্যাকর্ষণ ত্যাগ করে চলে যেতে থাকলে পিছন থেকে তুমিই তাকে উপর্যুপরি গুলি করেছিলে; কেন? সেই গুলির শব্দ শুনে এবং আহত ও ক্রুদ্ধ সেই নীল সিংহ তার ক্ষতস্থান কামড়ে ধরে তোমার দিকেই ফিরে তাকালে তোমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু ঘুম থেকে জাগরণের ভিতরে চলে আসবার সময় যখন তুমি এক অতি সূক্ষ্ম বাধাকে অতিক্রম করছিলে তখন তোমার এক অংশ জাগ্রত ছিল, অন্য অংশ ছিল তখনো স্বপ্নাবিষ্ট, এবং তোমার জাগ্রত অংশ তোমার দেহবিচ্ছিন্ন স্বপ্নাবিষ্ট অন্য অংশকে ভয়ে আর্তনাদ করতে শুনেছিলে। স্বকণ্ঠের সেই অলৌকিক স্বপ্নাবিষ্ট আর্তনাদ এখনো তোমার পাপবোধকে তাড়িত করে—তুমি গুলি করেছিলে

কেন? যদি স্বপ্নে আবার দেখা হয়, যদি কয়েকটি চিহ্নের দ্বারা সেই সিংহ তোমাকে আবার সনাক্ত করে? কিংবা যেমন আর একবারও ভিন্ন এক স্বপ্নে তুমি তোমার বন্ধু অতীশকে খুন করেছিলে বলে জাগ্রতাবস্থায়ও বহুদিন তুমি বিমর্ষ ছিলে কেন? তোমার প্রশ্ন এই যে, স্বপ্নেও কেন তুমি হত্যাকারী?

কিংবা কয়েক বছর আগে এক শীতকালে টৌরিটিবাজারের কাছে তুমি যে মোটর দুর্ঘটনায় পড়েছিলে তার কথা ধরা যাক। সেদিন বিকেলের পার্টিতে তুমি সামান্য হুইস্কি খেয়েছিলে, কিন্তু মাতাল হওনি; সেদিনকার পার্টিতে তুমি অনেকক্ষণ বিদেশী নাচ নেচেছিলে, কিন্তু তুমি ক্লান্ত ছিলে না। এমন কি নাচের সময় যে মহিলা সারাক্ষণ তোমার বক্ষলগ্ন ছিল তার মুখও তোমার মনে পড়েনি। ঠিক কি হয়েছিল তা আজও তোমার জানা নেই। শুধু এইটুকু মনে আছে যে, তখন অনেক রাত, ফেরার পথে টৌরিটিবাজারের কাছে রাস্তা ফাঁকা ছিল, গাড়িতেও তুমি ছিলে একা। তুমি জোরে চালিয়ে দিলে তোমার গাড়ি। তোমার পুরোনো আমলের পৈতৃক মোটর গাড়িতে ভয়ংকর লজঝড় শব্দ হচ্ছিল বলে তুমি মাঝে মাঝে গালাগাল দিচ্ছিলে, মাঝে মাঝে তুমি তোমার প্রিয় ফরাসী গান 'ও-লা-লা ও-লা-লা' গাইছিলে, অথচ গীয়ার স্টিয়ারিং ক্লাচ ও অ্যাক্সিলেটারের ওপর তোমার হাত পা গুলি নির্ভুল কাজ করে যাচ্ছিল; বিপদের কোনো সম্ভাবনা ছিল না—কেননা তোমার গাড়িটির গান নেই, অন্যমনস্কতা নেই।—তার ধর্ম এই যে, সে শুধু তোমার সঙ্গে যুক্ত হয়, তোমার ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে প্রবেশ করে এবং তার স্বধর্মে তোমাকে টেনে নিয়ে যায়। তোমার গাড়িটির আত্মা নেই, পাপ-পুণ্য নেই, তবু তুমি এই মোটর গাড়িটিকে ভালবাস, যেমন, মানুষ তার গৃহপালিতগুলিকে ভালবাসে, অথচ তোমার গাড়িটি কি প্রতিদানশীল? কি হয়, যদি তুমি গাড়ির যন্ত্র-সংলগ্ন তোমার হাত-পা তুলে নাও, চোখ বন্ধ কর? এই অলৌকিক চিন্তা হঠাৎ মনে এলে তুমি আপনমনে হেসেছিলে। তারপর গাড়ি চালাতে চালাতে তুমি খানিকক্ষণ খেলাচ্ছলে চোখ বন্ধ করে রাখবার চেষ্টা করে দেখেছিলে চোখ আপনিই খুলে যায়। তুমি গাড়ির যন্ত্র-সংলগ্ন তোমার হাত-পা কিছুক্ষণের জন্য তুলে নেওয়ার চেষ্টা করে দেখলে ধর্মান্ধ এই মোটরগাড়ি তোমার ইন্দ্রিয়-গুলিকে অধিকার করে আছে, তার কাছে তুমি তুচ্ছ ও অন্তঃসারশূন্য। কিংবা হয়ত তুমি স্বভাবত আত্মরক্ষাকারী, সেই জন্য মোটর গাড়ির সঙ্গে তোমার সম্পর্ক অমোঘ। হতাশ হয়ে তুমি আবার কিছুক্ষণ তোমার ফরাসী-গান গেয়েছিলে এবং পরমুহূর্তেই এক অন্যমনস্কতা তোমাকে পেয়ে বসেছিল। অকারণে তোমার মনোরম, ছেলেবেলায় দেখা তোমার প্রিয় কিশোরীদের মুখগুলি তোমার

মনে পড়েছিল। সেই মুখগুলি তোমার আজও প্রিয়, কেননা ফের দেখা হয়নি। তোমার ছেলেবেলায় কবে যেন তোমার একটা মার্বেল হারিয়েছিল, আজও সেই মার্বেলটার কথা মনে রয়ে গেছে, কেননা এখনো মাঝে মাঝে স্বপ্নে সেই মার্বেলটা তুমি হঠাৎ কুড়িয়ে পাও। সেই মার্বেল তোমার মাথার ভিতরে শব্দহীন গড়িয়ে গেল। তুমি হঠাৎ লক্ষ্য করেছিলে কবেকার স্বপ্নে দেখা এক নীল সিংহ তোমার মাথার ভিতরে আজও বাসা বেঁধে আছে। অন্যমনস্কভাবে তোমার খেয়াল হয়েছিল যে তুমি যে, 'ও লা-লা ও-লা-লা' গানটি গাইছিলে তোমার সেই প্রিয় ফরাসী গানটির সুর ছিল সেইসব দুরন্ত মানুষগুলির সুরের মতো যারা খেযাল ক্ষেত্র ও বীজক্ষেত্রে ও নৌবাহকের মত এরকম গান গায় এবং আত্মপ্রবাসী নিজেকে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করে। এইখানে তুমি কিছুক্ষণের জন্য মোটর গাড়ির কথা, তোমার বিপজ্জনক খেলা ভুলে গিয়েছিলে, তারপর তোমার চলন্ত গাড়িতে বসে রইলে। দ্রুত স্মৃতি ও তোমার গানের বিষন্ন ধর্মীয় সুরে আবিষ্ট থেকে যখন এক গরীব নিরাসক্তি তোমাকে পেয়ে বসেছিল তখন ঠিক কি হয়েছিল তোমার মনে নেই। তুমি তোমার জাগ্রত অংশকে ফাঁকি দিয়ে পরে পতনশীল মানুষের মতো হঠাৎ যন্ত্র-সংগীতে তোমার হাত-পা টেনে নিয়েছিলে। তোমার মোটর গাড়ি টাল খেয়ে গেল ; পলকের মধ্যেই বিপদ বুঝতে পেরে তুমি সোজা হয়ে বসে গীয়ার স্টিয়ারীং ক্লাচ ও অ্যাক্সিলেটার চেপে ধরতে গিয়ে দেখলে মুহূর্তেই ভয়ংকর মতিভ্রংশ ঘটে গেছে, তুমি কোনোটারই ব্যবহার জান না। ইতিমধ্যে চোরাগলি, অন্ধকার, তার বাঁক ও দেয়ালের খাড়াই তোমার দিকেই আছে দেখে তুমি চীৎকার করে উঠেছিলে। স্বপ্নের ঠিক সময়ে ব্রেক চেপে ধরেছিলে তুমিই। তোমার মোটর গাড়ি ভীষণ লাফিয়ে উঠে থামল। কিন্তু স্টিয়ারিঙের সঙ্গে হয়ত সংঘর্ষে তোমার পাঁজরার একটা হাড় মট করে ভেঙে গেলে তুমি তীব্র যন্ত্রণায় ঢলে পড়ে অস্ফুট গাল দিলে 'ইডিয়ট।'

কিংবা আর একদিন, যেদিন তোমার ছিমছাম শূন্য বাড়িতে অনেকদিন পর মনোরমা এসেছিল। সন্ধ্যে হয়ে গেছে তুমি আলো জ্বালনি, আধো অন্ধকারেই সুবিধে ছিল তোমার। মনোরমা অনেকক্ষণ গ্রামোফোন বাজাল তারপর 'ধুৎ, ভাল লাগছে না' বলে উঠে গিয়ে পিয়ানোর কাছে বসল জানালার দিকে পিঠ রেখে। যদিও সে পিয়ানো বাজাতে জানত না, তবু ঐ জায়গাটা ছিল তার প্রিয়, কেননা ওখান থেকে পুরো স্বপ্নের দিকে না তাকিয়েও তোমাকে দেখা যায়। তুমি তোমার হেলানো চেয়ারে পড়েছিলে মনোরমার মুখোমুখি। মনোরমা সঙ্কোচে দেখছিলো তোমাকে—চোখ না খুলেও তুমি টের পাচ্ছিলে। তুমি কেন তাকে ডেকে পাঠিয়েছ তা জানবার কৌতূহল

থাকলেও সে কোনো প্রশ্ন না করেই তা জানতে চাইছিল। তুমি কি করে তোমার সেদিনকার হৃদয়হীন কথাবার্তা শুরু করবে তা ভেবে পাচ্ছিলে না। কেননা কথাগুলো বলা হয়ে গেলে মনোরমা চলে যাবে—এই যাওয়াটা তার পক্ষে হয় অপমানকর তা ভেবে মনে মনে বড় কষ্ট পাচ্ছিলে তুমি। তুমি এক-পলক চোখ বুজে দেখলে সে অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে আলমারির সাজানো খেলাধুলোয় পাওয়া তোমার ট্রফিগুলো দেখছে। পরমুহূর্তেই উঠে গেল সে. ছায়ার মতো তাকে বইয়ের র‍্যাকের কাছে. টেলিফোনের কাছে. ড্রেসিং টেবিলের কাছে পর পর দেখা গেল. আবছা গলা শোনা গেল তার 'তুমি কি ভীষণ চরিত্রহীন সুমন!' তুমি ভেবে পেলে না—ও কি করছে! কিন্তু সুযোগ বুঝে তুমি বলতে শুরু করেছিলে 'শোনো মনোরমা—।' মনোরমার ছায়াকে আবার পিয়ানোর কাছে দেখা গেল. তুমি আবার বললে 'শোনো মনোরমা—।' পরমুহূর্তেই মাথা নীচু করল মনোরমা. তার ডানহাত কোলের ওপর থেকে শাড়ির আঁচল তুলে নিলে তুমি অতর্কিতে বুঝতে পেরেছিলে যে মনোরমা কাঁদছে। তুমি তাড়াতাড়ি উঠতে যাচ্ছিলে. তুমি কিছু বলবার চেষ্টা করেছিলে, কিন্তু তার আগেই কান্নার ঝোঁকে ভর রাখতে গিয়ে মনোরমা বাঁ হাত বাড়িয়ে পিয়ানোর এলোমেলোভাবে রীডগুলো. ছুঁয়ে গেলে তুমি তড়িতাহতের মতো স্থির হয়ে গেলে। ধীর গম্ভীর স্বরে সেই পিয়ানো তোমাকে চুপ করতে বলল। তুমি আর একবার উঠবার চেষ্টা করলে। পিয়ানো গর্জন করে উঠল। যেন মনো-রমার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করলে ডালা-খোলা প্রকান্ড সেই অন্ধকার পিয়ানো তোমার ওপর লাফিয়ে পড়বে। তুমি আবার মনোরমার স্বর শুনতে পেলে 'সুমন, তুমি চরিত্রহীন—' স্খলিতকণ্ঠে তুমি আবার মনোরমার নাম ধরে ডাকলে. ঠিক সেই সময় উঠে দাঁড়াতে গিয়ে মনোরমা ভারসাম্য রক্ষার জন্য আবার পিয়ানোর রীডে হাত রেখেছিল তার অশিক্ষিত অপটু হাতে পিয়ানো তীব্রভাবে বেজে উঠলে ঘরের সবকিছু প্রাণ পেয়ে গেল! অর্থহীন শ্বেতপাথরের টেবিল. টেলিফোন, বইয়ের র‍্যাক, ওয়ার্ডরোব—এ সব কিছুই তোমার ওপর লাফিয়ে পড়বে—এরকম মনে হল। তীব্র ও অলৌকিক ভয় থেকে তুমি দেখলে—এ ঘরের সবকিছুই মনোরমার; তোমার ট্রফিগুলি, হেলানো চেয়ার, গ্রামোফোন. চেস্ট অফ ড্রয়ার্স-এ সবকিছু মনোরমার, তুমি আগন্তুক মাত্র। মুহূর্তেই হাঁটুগেড়ে এই কথা বলবার অলৌকিক ইচ্ছে হয়েছিল তোমার যে 'ক্ষমা করো!' তুমি নড়তে পারলে না। মনোরমা তড়িৎগতিতে তার ব্যাগ কুড়িয়ে নিল, তুমি তার আধভাঙা কথা শুনতে পেলে 'আমি সব জানি, কিন্তু কখনো বলো না সুমন. বলো না—'পরমুহূর্তেই দরজার কাছে তার দ্রুত অপসৃয়মান অবয়ব একপলকের

জন্য দেখা গেল, কি গেল না! ইচ্ছে হয়েছিল সিঁড়ি পর্যন্ত দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরো, কিন্তু তখনো ধর্মরক্ষাকারী সেই পিয়ানোর স্বর বাঘের মতো মনোরমাকে পাহারা দিচ্ছিল, ঘরের সবকিছুই ছিল—তোমার ট্রফিগুলি, টেলিফোন, বইয়ের র‍্যাক ও হেলানো চেয়ার। কিছুক্ষণ ঠিক কি হয়ে গেল তুমি তা বুঝলে না। এরপর তুমি অনেকদিন পিয়ানোর কাছে বসেছ, কখনো ধীরে কখনো দ্রুতবেগে তোমার শিক্ষিত সুপটু আঙুলে রীড চেপে দেখেছ—পিয়ানোর ভিতরে অলৌকিক কিছু নেই। কিন্তু কোথাও ছিল সেই ঘরে, অন্ধকারে, তোমার স্পর্শকাতরতার ভিতরে পিয়ানোর সেই অচেনা 'নোট'—মনোরমা না জেনে কয়েক মুহূর্তের জন্য সেইখানে তার হাত রেখেছিল।

ছেলেবেলায় তুমি যে সব খেলা খেলেছিলে তার মধ্যে একটা খেলা খেলে-ছিলে তোমার মায়ের সঙ্গে। অথচ নিতান্ত বালক বয়সেই তুমি তোমার মাকে শেষবার দেখেছিলে। খুব দীর্ঘ চুল ছিল তাঁর—এটুকু ছাড়া আর কিছুই তোমার মনে নেই। তোমার মাকে যারা দেখেছিল তারা বলত তুমি মাতৃমুখী ছেলে—ভাগ্যবান। যে দু-একটি ছবি ছিল তোমার মায়ের তা থেকে চেহারা ভাল বোঝা যায় না, শুধু বোঝা যায়—তোমার মতোই তীব্র চিবুক ছিল, একটু চাপা গাল আর একটু উঁচু কিন্তু খুব সুন্দর নাক ছিল তাঁর। কিশোর বয়সের সমস্ত লক্ষণ শরীরে ফুটে উঠলে একদিন কৌতূহলবশত তুমি শাড়ি পরেছিলে, তোমার মায়ের কিশোরী-বয়সের ছবিতে যেমন ছিল তেমনি দুচোখে কাজল এবং কপালের ভ্রূ-সঙ্গমে কাজলের টিপ পরেছিলে তুমি, তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তুমি তোমার প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে চোরাহাসি হেসে আপনমনে প্রশ্ন করেছিলে 'এ রকম ছিল আমার মা?' আয়নায় অচেনা এক কিশোরীর মুখ তোমার দিকে চেয়ে গোপন ও রহস্যময় কোনো কারণে হেসে উঠেছিল! বড় তির্যক ও বিচিত্র ছিল তার দুই চোখ। এ তো তুমি নও! তুমি ভয় পেয়েছিলে। 'আমি কি সুমন?' তুমি এই প্রশ্ন করেছিলে, কেননা সেই কিশোরী-প্রতিবিম্বের তীব্র ও রহস্যময় টান গোপন স্রোতের মতো তোমাকে সম্ভবত বীজরূপে আর একবার তার গর্ভস্থ অন্ধকারের দিকে আকর্ষণ করেছিল। মনে পড়ে তুমি একবার দুহাত বাড়িয়ে আয়নার ফ্রেমটা ধরবার চেষ্টা করেছিলে, পরমুহূর্তেই তুমি আর ছিলে না। ঠিক কি হয়েছিল তোমার তা জানা নেই, শুধু সন্দেহ হয় কিছুক্ষণের জন্য সেই ঘরে একা এক কিশোরীই ছিল তার প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে, তুমি তার কোথাও ছিলে না। অনেকক্ষণ পর যখন তুমি সচেতন হয়েছিলে তখনো তোমার মনে 'আমি কি সুমন?' এই প্রশ্ন আবছাভাবে খেলা করে গিয়েছিল। মনে পড়ে ক্রমে ভয়

ভেঙে গিয়েছিল এবং তুমি তোমার কিশোর-বয়সে তোমার কিশোরী মায়ের সঙ্গে আরো কয়েকবার এই খেলা খেলেছিলে। কথার মাঝখানে, খেলার মাঝখানে, ঘুমের মাঝখানে অতর্কিতে সচেতন হয়ে তুমি মাঝে মাঝে নিজের ভিতরে এক রহস্যময় নারীত্বকে লক্ষ্য করে 'আমি কি সুমন?' এই প্রশ্ন করে মনে মনে চমকে উঠেছ। কালক্রমে যদিও তোমার শরীর মুষ্টিযোদ্ধাদের মতো পুরুষ ও সুগঠিত হয়েছে তবু তোমার মুখে কোথাও এখনো সেই এক কিশোরীসুলভ রহস্যময় নম্রতা রয়ে গেছে, একপলক আয়নায় তাকালেই তুমি তা ধরতে পারো। এখনো যখন তুমি নানা কাজে থাকো, যখন সিঁড়ি ভেঙে ওঠো, কিংবা সিঁড়ি ভেঙে নামো, যখন দরজা খুলতে হাত বাড়াও, কিংবা কেউ 'সুমন' বলে ডাকলে পিছন ফিরে সাড়া দাও, বিদেশী নাচের আসরে যখন অচেনা মহিলাকে হালকা আলিঙ্গনে বন্ধ কর তখন মাঝে মাঝে কয়েক মুহূর্তের গভীর অন্যমনস্কতা থেকে নিজের ভিতরে হঠাৎ এক অলৌকিক 'আমি কি সুমন?' এই প্রশ্ন শুনে বিস্মিত হয়েছ।

তোমাদের পরিবারে ছিল চোখের অসুখ! তোমার বাবার একটু বয়স হয়ে গেলে তাঁরও দৃষ্টিশক্তি খুব কমে এসেছিল। খুব ভারী ঘোলাটে কাচের চশমা ছিল তাঁর, তবু ঘড়ি দেখবার জন্য, চিঠি পড়বার জন্য সবসময় তাঁকে একটা আতসকাচ ব্যবহার করতে হত। যখন চোখ দিয়ে দেখবার ক্ষমতা আরো ক্ষীণ হয়ে আসছিল তখন সবকিছু দেখবার আগ্রহ ক্রমশ বেড়েছিল তাঁর। তুমি তাঁকে কখনো দেখেছ সিঁড়ির ফাটলের কাছে বসে আতসকাচ দিয়ে পিঁপড়েদের চলাফেরা লক্ষ্য করছেন, কখনো আতসকাচের ভিতর দিয়ে পিয়ানোর ওপর জমে ওঠা ধুলোর আস্তরণের দিকে অকারণে চেয়ে আছেন। কতদিন তুমি দেখেছ তোমার বাবা বাড়ির দক্ষিণ কোণে ভিতের কাছে তাঁর আতসকাচটি নিয়ে বসে আছেন, তাঁর ধারণা ছিল দক্ষিণ কোণ থেকেই বাড়িটা ভাঙতে শুরু করবে, কেননা ঐ কোণ থেকে বাড়িটার ভিত গাঁথা শুরু হয়েছিল। তোমাকে কাছে ডেকে কখনো কখনো তিনি বলেছেন, 'তুমি কি খুব বেশী আয়ু চাও? খুব বেশী দৃষ্টিশক্তি চাও? সুমন, তুমি কখনো খুব বেশী চেও না।' মাঝে মাঝে তিনি তোমাকে তোমার ঠাকুমার গল্প বলেছেন। বাড়িতে কারো দৃষ্টিশক্তি ভাল ছিল না, দাদু অন্ধ, জ্যাঠামশাই অন্ধ হয়ে যাচ্ছেন, তখন সকলের চোখের দেখা তোমার ঠাকুমা একলা দেখতেন। এত বেশী প্রখর হয়েছিল তাঁর চোখ যে তোমাদের মস্ত বাগান থেকে একটি ফুল কেউ তুলে নিলে তিনি টের পেতেন, তোমার প্রায়-অন্ধ পিসিমার খেলনার বাক্স থেকে পুঁতির মালা চুরি গেলে তিনি ধরে ফেলতেন। এইভাবে সবকিছুর ওপর তাঁর ভয়ঙ্কর মায়ার সৃষ্টি

হয়েছিল বলে মরবার সময় তাঁর প্রাণ বেরোতে অনেকক্ষণ সময় লেগেছিল, আর শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার পরও দেখা গিয়েছিল তাঁর চোখ খোলা রয়েছে। এইভাবে তোমার বাবা তোমাকে প্রায়ই কাছে ডাকতেন, তোমার গলার শব্দ শুনতে চাইতেন। তুমি তোমার বাবার ভিতর খুব আনন্দ কিংবা খুব বিষাদ কখনো দেখনি। খুব কাছের কিংবা খুব দূরের বলেও তাঁকে তোমার কখনো বোধ হয়নি। শুধু তাঁর রহস্যহীন পরিষ্কার মুখ চোখ দেখে তোমার প্রায়ই তাঁকে বড় দূর-ভ্রমণকারী বলে মনে হত। তখন তোমার যৌবন আরম্ভের সময়ে তুমি একদিন তোমার প্রথম নীতিবিগর্হিত যৌন স্বপ্নটি দেখেছিলে, এবং আর একদিন তুমি অলি নামে মেয়েটিকে প্রথম চুম্বন করেছিলে। সেই সময়ে তুমি প্রায়ই বড় অন্যমনস্ক ও অস্থির ছিলে। এমনই একদিন যখন তুমি তোমার বাবার ঘরের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলে তখন তিনি চোখ কুঁচকে তোমাকে দেখবার চেষ্টা করে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি সুমন?' তুমি সাড়া দিলে তিনি বললেন, 'একবার আমার কাছে এসো।' তুমি কাছে গেলে বললেন, 'হাঁটু গেড়ে আমার সামনে বোসো।' তুমি তোমার বাবার হাঁটুর ওপর হাত রেখে বসলে তিনি তাঁর আতসকাচটি তুলে নিয়ে 'দেখি সুমন, তোমার মুখখানি' এই বলে তোমার মুখের ওপর আতসকাচটি ধরলে তুমি কাচের ভিতরে তাঁর মস্ত বড় গভীর চোখগুলি দেখেছিলে। তোমার মনে হয়েছিল, বহু দূর বিস্তৃত রয়েছে সেই চোখ এবং তোমার এই বোধ এসেছিল যে সেই চোখের ভিতরে ধূসর মাঠ, পর্বতশৃঙ্গ, সমুদ্র ও আকাশ রয়েছে—একটুও ভুল নয়—কিন্তু এই চোখ তাঁর যিনি কাছের ও দূরের সবকিছু দেখতে পান, যিনি আলো ও অন্ধকারে সমভাবে দেখেন, যিনি ঈশ্বর, এবং তোমার স্রষ্টা। তাঁর ডান হাতখানা তোমার মাথার ওপরে স্থির হয়ে ছিল। খানিকক্ষণ তোমার শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল, কেননা তোমার বোধ হয়েছিল তিনি তোমার ধর্মহীন ক্রিয়াকাণ্ডগুলি, তোমার সমস্যা-শূন্য বোধ ও প্রবৃত্তিগুলিকে প্রত্যক্ষ করছেন। তিনি একবার বিড় বিড় করে বললেন, 'চোখ বড় মায়ার সৃষ্টি করে।' তারপর তিনি তাঁর হাত ও আতসকাচ সরিয়ে নিলেন। সেই দিনই দুপুরবেলা তোমার বাবা তাঁর আতসকাচটি নিয়ে নিঃশব্দে ছাদে উঠে গিয়েছিলেন এবং শেষবারের মতো আতসকাচ দিয়ে সূর্যকে প্রত্যক্ষ করবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর দুটো চোখই পুড়ে গিয়েছিল। তাই তারপর থেকে তুমি সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য করেছ মানুষের চোখ। প্রথমে তুমি নিজের চোখ দিয়ে শুরু করেছিলে। জল খেতে গিয়ে তুমি কতদিন গ্লাসের জলে নিজের চোখের ছায়া দেখে চোখ ফেরাতে পার নি। কতদিন তুমি ইচ্ছে করে চোখ বুজে রাস্তা দিয়ে বহু দূর পর্যন্ত হেঁটে গেছ। বড় রোমাঞ্চকর ও

অস্বাভাবিক ছিল তোমার তোমাকে নিয়ে সেই খেলা। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তুমি অন্ধের মতো হাঁটতে শিখেছিলে, তুমি চোখ বুজে দিক নির্ণয় করবার কৌশল আয়ত্ত করেছিলে, এবং অন্ধের যেমন হয় তেমনি তোমার অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি প্রখর ও স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছিল। এইভাবে অনেকদূর অগ্রসর হয়ে তুমি ভেবেছিলে এখন তুমি তোমার অন্ধকার দিনগুলির জন্য প্রস্তুত।

তুমি অনেকদিন তোমার বন্ধুদের চোখ বুজে হেঁটে যাওয়া ও দিকনির্ণয় করার কৌশল দেখিয়ে বিস্মিত করেছ। যারা তোমার এই কৌশল দেখেছিল তাদের মধ্যে একমাত্র অতীশ তোমাকে মাঝে মাঝে বলেছিল যে এই খেলা ভাল নয়। কারণ জিজ্ঞেস করলে সে সঠিক উত্তর দিতে পারত না, শুধু বলত 'দেখো তুমি—এ ভাল নয়।' অতীশ ছিল শান্ত ও নিঃশব্দ প্রকৃতির এবং প্রথম চেনা হওয়ার পর থেকেই তুমি মাঝে মাঝে লক্ষ্য করেছিলে যে তার মুদ্রাদোষের মতো একটি স্বভাব রয়েছে। কম কথা বলত অতীশ এবং কখনো কখনো কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যেতো সে। যেন কথা ভুলে গিয়ে কি বলছিলাম বলো তো? কেন বলছিলাম? এই প্রশ্ন করে বোকার মতো চেয়ে থাকত। তুমি অনেকদিন কথার খেই ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছ কিন্তু অতীশের ধাঁধা কাটত না, সে প্রশ্ন করতে থাকত 'কেন বলছিলাম? কেন বলছিলাম? কেন?' তারপর আর সে প্রশ্নও থাকত না এবং সে কিছুক্ষণ প্রাণপণে কোনো কথা বলবার চেষ্টা করত, পারত না। অবশেষে সে তার স্বাভাবিকতা ফিরে পেলে বহুদিন লজ্জাবশত উঠে চলে গেছে। অথচ তুমি ক্রমশ বুঝতে পেরেছিলে তোমাদের কুড়ি-একুশ বছর বয়সের সব বন্ধুদের মধ্যে অতীশ ছিল সবচেয়ে জ্ঞানী ও অনুভূতিপ্রবণ। মাঝে মাঝে তুমি তার এই স্বভাবটি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছ, সে সঠিক উত্তর না দিয়ে হেসে বলত 'ওটা আমার মনের তোতলামি!' কিন্তু কতদিন মনে হয়েছে—বহুজনের মধ্যেও অতীশ তোমাকে লক্ষ্য করছে অতি নিবিষ্টভাবে যেন গোপনে সে তোমাকে কোনো কথা বলতে চায়। খেলাধুলো করত না অতীশ কিন্তু তুমি যখন খেলতে নেমে ফুটবলের পিছনে ছুটছ তখনো টের পেয়েছ মাঠের সীমানার বাইরে ভিড় থেকে অতীশ তোমাকে লক্ষ্য করছে, যখন তুমি চোখ বুজে পিয়ানোর সঙ্গে গান গাইছ তখনো টের পেয়েছ অতীশ আর সকলের মতো গান না শুনে তোমাকে লক্ষ্য করছে। কিন্তু কারণ জিজ্ঞেস করলে হেসে এড়িয়ে যেত, বলত 'তুমি বড্ড বেশী স্পোর্টসম্যান সুমন। বোধ হয় তুমি সব কিছু নিয়ে খেলতে পারো।' তুমি উঁচু গলায় হেসে উঠে বলেছ 'ইয়াঃ!' খেলা শেষ হয়ে গেলে তুমি আর অতীশ ফাঁকা খেলার মাঠে পাশাপাশি শুয়েছিলে, অতীশ বলছিল 'খেলা শেষ হয়ে গেলে

খেলার মাঠ আমার ভাল লাগে।' তুমি চোখ বুজে ছিলে, উত্তর দিলে না। অতীশ আচমকা কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে বলল 'সুমন, আমার একটা খেলার কথা তোমাকে বলতে পারি, কারণ তোমার একটা খেলার সঙ্গে আমার খেলাটার বোধহয় মিল আছে।' তুমি চোখ বুজে সতর্ক গলায় প্রশ্ন করলে 'কি সেটা?' অতীশ হাসল 'বলছি। আগে বলো তো কত ছেলেবেলার কথা তোমার মনে আছে!' তুমি হালকা গলায় বললে 'এই ধরো পাঁচ বছর বয়সের কথা কিছু কিছু মনে আছে।' অস্থির গলা শোনা গেল অতীশের 'না, অতো নয়। ও তো অনেকেরই মনে থাকে, আরো ছেলেবেলার কথা মনে নেই?' উৎসুক হয়ে তুমি একটু ভেবে দেখলে 'খুব মনে নেই, তবে আমার একটা নীল রঙের টি-পটের কথা মনে পড়ে মার হাতে দেখেছিলাম—যখন আমার তিন সাড়ে তিন বছর বয়স।' অতীশের ব্যগ্র গলা শোনা গেল 'আর কিছু, আরো ছেলেবেলার?' তুমি অবাক হয়ে আধ-বসার মতো উঠে অতীশের আবছা মুখের দিকে চেয়ে দেখলে, তোমার মনে হয়েছিল অতীশ এতকাল যা বলতে চেয়েছিল তা আজ বলতে চায়। তোমার ভয় হচ্ছিল অতীশ তার পুরোনো অভ্যাসবশে চুপ করে না যায়। তুমি শান্ত গলায় বললে 'বোধহয় একবার জ্বরের ঘোরে আমি একটা থার্মোমিটার ভেঙে ফেলেছিলাম, তখন আমার বয়স বোধহয় আড়াই কি তিন, আবছা মনে পড়ে আমি থার্মোমিটারটা ছুঁড়ে ফেলছি। কিন্তু এটা আমার কল্পনাও হতে পারে।' হতে পারে।' অতীশ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল 'কিন্তু এরকম মনে করবার চেষ্টা করে দেখো আরো ছেলেবেলার কথা তোমার মনে পড়ে কিনা।' তুমি অনেকক্ষণ ভেবেছিলে, তুমি কিছুটা অস্বস্তিবোধ করে বলেছিলে 'না। কিন্তু আর কি মনে পড়বে! দু একটা ঘটনার কথা পুরোনো ছবির মতো মনে থেকে যায়। ব্যস।' অতীশ অস্পষ্ট গলায় বলল 'দু একটা ঘটনার কথা নয়, সবকিছু একের পর এক স্পষ্ট মনে করবার কথা বলছি যা তুমি আর কারো কাছ থেকে শোনোনি, যা কল্পনারও নয়।' তুমি হেসে উঠেছিলে 'পাগল! তুমি কি পারো আরো ছেলেবেলার কথা মনে করতে?' অতীশ হাসল না, ধীর স্বাভাবিক গলায় বলল 'পারি।' তুমি দ্রুত চিন্তা করে বললে 'কতোদূর পারো?' অতীশ তেমনি স্বাভাবিক গলায় বলল 'অনেক, যতদূর যাওয়া যায়।' তুমি হাসছিলে 'তার মানে এক দেড় বছর, ছ' মাস না জন্মমুহূর্ত পর্যন্ত?' অন্ধকারে জ্বল জ্বল করে উঠল অতীশের চোখ 'ঠিক জন্মমুহূর্তটিও মনে পড়তে পারে।' বলেই সম্ভবত লজ্জায় সে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে হাত তুলে বলে উঠল 'সুমন, ঐ দেখ ওরিয়ন।' সে কথা ঘোরাচ্ছে বুঝতে পেরে সেদিকে তুমি

কান দিলে না। 'ঠিক আছে' তুমি বলেছিলে 'কিরকম ছিল তোমার জন্ম-মুহূর্ত ?' অতীশ মুখ লুকিয়ে খুব আস্তে আস্তে বলল 'অন্যরকম, আমাদের রোজকার জীবনের মতো নয়।' তুমি নিজেও জান না কেন অতীশের স্বর শুনে তোমার রোমকূপে কাঁটা দিয়েছিল। অতীশ হাসল 'মনে করতে করতে ফিরে যাওয়া যায়। তুমিও চেষ্টা করে দেখতে পারো।' তুমি বিশ্বাস করোনি, বলেছিলে, 'কি করে সম্ভব ?' অতীশ হাসছিল 'ঠিক জানি না, আগে আমি এটা খেলতাম কিন্তু এখন আর আমি ইচ্ছে করে খেলি না, খেলাটাই পেয়ে বসে আমাকে। কথা বলতে বলতে, কিংবা পথ চলতে চলতে আমার ভিতরে খেলাটা শুরু হয়ে যায়। তখনি চেনা-পরিচয় মুছে যায়, কথা ভুল হয়ে যায়, আমি ফিরে যেতে থাকি।' খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তুমি হঠাৎ উঁচু গলায় হেসে উঠলে অতীশ বড় লজ্জা পেয়েছিল। তুমি বিশ্বাস করোনি, কিন্তু তারপর গোপনে তুমি মাঝে মাঝে অতীশের খেলাটা খেলতে চেষ্টা করেছিলে—কিছুই তোমার মনে পড়েনি। ঠিক স্মৃতিচারণের খেলা নয় একটু ভিন্ন ও রহস্যময়—ঠিক অতীশের মতো করে সেই খেলা তুমি খেলতে পারোনি। তুমি একা একা আপনমনে 'ইয়ার' বলে হেসে উঠেছ। কিন্তু একদিন রোজকার মতোই তুমি খুব ভোরে উঠে খেলার মাঠে গিয়েছিলে। একা একা আবছা অন্ধকারে তুমি আস্তে গড়িয়ে দিলে তোমার ফুটবল তারপর ছুটতে শুরু করলে। প্রথমে আস্তে আস্তে তারপর তোমার গতি বাড়ছিল। মাঠের সীমানা ধরে তুমি তোমার বলটির পিছনে ছুটছিলে মাঠকে সবসময়ে বাঁ দিকে রেখে চক্রাকারে। সাধারণত তুমি চারবার মাঠটিকে ঘুরে এলে ভোর হয়ে যায়। তুমি তিনবার ঘুরে এসে চারের পাক শুরু করেছিলে, তোমার মাংসপেশীগুলি সতেজ ও রক্তস্রোত দ্রুত হয়ে উঠছিল, ভোরের বাতাস দম নিয়ে তোমার ফুসফুস পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছিল—এইভাবে চারের পাক শেষ হয়ে এল। কিন্তু ভোর হল না। তোমার খেয়াল ছিল না—বলটা তোমার পায়ের টোকা খেয়ে গড়িয়ে যাচ্ছিল—তুমি অভ্যাসমত ছুটছিলে। কিন্তু একসময়ে তুমি বুঝতে পেরেছিলে তোমার পায়ে বলটা আর নেই—কোথায় গড়িয়ে গেছে। থেমে তোমার খেয়াল হল তুমি অন্তত সাতবার মাঠটাকে ঘুরে এসেছ অথচ ভোর হয়নি। তুমি বলটা খুঁজবার জন্যে মাঠের দিকে তাকালে সেখানে গাঢ় অন্ধকার জমে আছে, তুমি আকাশের দিকে তাকালে—সেখানে গাঢ় অন্ধকার জমে আছে। মাঠ না, আকাশ না, সূর্য ও নক্ষত্র কিছুই তুমি দেখতে পেলে না। তুমি পা বাড়িয়ে দেখলে, তুমি হাত চোখের সামনে এনে দেখলে—কিছুই দেখা যায় না। তোমার শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। তুমি যত্নে শেখা তোমার ইন্দ্রিয়গুলির স্পর্শ-

কাতরতার কথা ভুলে গিয়েছিলে, চোখ বুজে দিকনির্ণয় করবার কৌশলের কথাও তোমার মনে এল না। মনে আছে তুমি আস্তে আস্তে হাঁটু গেড়ে বসেছিলে, তোমার দুটি হাত কোলের ওপর জড়ো করা, গাল বেয়ে চোখের জল পড়ছে। নিতান্ত তুচ্ছ কারণেই তুমি কাঁদছিলে—কখনো অলি নামে যে মেয়েটিকে তুমি প্রথম চুমু খেয়েছিলে তার জন্য, কখনো বাড়ি ফিরে যাওয়ার পথটির জন্য, মাঠ সূর্য ও নক্ষত্রগুলির জন্য। তুমি চোখ চেয়ে দেখেছ অনেক, তুমি চোখ বুজেও দেখেছ অনেক, আর একধরণের দেখা তোমাকে খেলাচ্ছলে শিখিয়েছিল অতীশ—তুমি অনুভব করলে সেই খেলা তোমার ভিতরেই গোপন ছিল এতদিন। তোমার ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সেই খেলায় অতি দ্রুত পশ্চাৎগামী রেলগাড়ির মতো তুমি ফিরে যাচ্ছিলে। ক্রমশ আলো ও অন্ধকার লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল—ক্রমে চেষ্টারহিত তুমি বুঝেছিলে চোখের মতোই তোমার অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি একে একে নিবে গেল। তুমি আর কিছুই স্পর্শ কর না, কিছুই প্রত্যক্ষ কর না, কিছুই শ্রবণ কর না, তুমি খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ কর না, তোমার আনন্দ ও বিষাদ কিছুই নেই— সেইখানে খুব ভোর আকাশের নীচে তোমার প্রিয় মাঠের ওপর তোমার বীজটি পড়ে আছে যার সঙ্গে আমি এই বোধটুকু মাত্র ধমের মতো সংলগ্ন আছে, আর কিছুই নেই। আমি' এই বোধটুকু মায়ার মতো তোমার ইন্দ্রিয়গুলিকে সৃষ্টি করেছিল—অলৌকিক এই শিল্প-নির্মাণ। এ তোমারই। তুমি প্রাণপণে এই বোধ ভেদ করতে চাইছিলে, চীৎকার করে উঠতে চাইছিলে, দৌড়াতে চাইছিলে—পারলে না। কয়েকটি অলীক মুহূর্তের পর কে যেন আবার খেলাচ্ছলে তোমার কোলের কাছে বলটি ঠেলে দিলে তুমি দু হাতে তুলে নিলে তোমার বল, বুকের মধ্যে চেপে ধরে তাকিয়ে দেখলে—সবুজ বিস্তৃত মাঠ, সূর্য উঠছে। তুমি নড়লে না, তুমি তেমনি বসে রইলে—এতদিন তুমি যা দেখেছ, এতদিন তোমার যা দেখা হয়নি সব কিছুর জন্য অবিরল চোখের জলে তোমার বুক ভেসে যাচ্ছিল। তুমি চোখ মেলে সেই অন্ধকার আর কখনো দেখনি।

এরপর দীর্ঘকাল কেটে গেলে একবার বিদেশে থাকতে তুমি জেনেছিলে অতীশ সন্ন্যাস নিয়ে ঘর ছেড়ে গেছে, এই কারণে যে, সে বিয়ে করবার পর নিতান্ত সন্দেহবশত তার বউ মল্লিকার কৌমার্য হরণ করতে পারেনি বলে মল্লিকা তাকে ত্যাগ করে গিয়েছিল। তারপর অতীশের কথা তোমার আর মনে ছিল না। কিন্তু যখন তুমি বিদেশে প্রবাসে অচেনা আস্তায় ও মাঠে হেঁটেছ, যখন কোন নদীর ধারে দাঁড়িয়ে নিসর্গ প্রত্যক্ষ করেছ, যখন সমুদ্র পাড়ি দিয়েছ তখন শৈশব বাল্য ও কৈশোরের কোনো কোনো ছবি মনে ভেসে উঠলে তোমার অতীশের

সেই খেলাটার কথা মনে পড়েছে। তুমি একা একা আপনমনে 'ইয়াঃ' বলে হেসে উঠেছ। এইভাবে তুমি তোমার উনত্রিশের জন্মদিন পার হয়ে গেলে একদিন এক পার্টিতে তোমার পরিচিতদের মধ্যে একজন তোমার হাতটা চেপে ধরেই ছেড়ে দিয়ে বলেছিল 'সুমন, তোমার গায়ের জোর কমে যাচ্ছে।' তুমি চমকে উঠেছিলে, কেননা তুমি বাস্তবিক অনুভব করেছিলে তোমার জেদ অনেক কমে এসেছে। তুমি আগেকার মতো আর ফুটবল নিয়ে দৌড়োও না। খেলাধুলো তুমি প্রায় ছেড়ে দিয়েছ। সেই স্পর্শকাতরতাও তোমার আর নেই। তুমি অনুভব কর তুমি কখনো বিধর্মী, কখনো তুমি ধর্মদ্রোহী—তাই তোমার মধ্যাস্থ অলৌকিক এখন তোমার ভিতরে মাঝে মাঝে রাগের সঞ্চার করে। আর তোমার যা আছে তোমার ধর্মহীন ক্রিয়াকাণ্ড, বোধ ও প্রবৃত্তি—এ সবই তোমার কাছে তুচ্ছ। আপাদমস্তক তুমি তোমার কাছেই গুরুত্বহীন ও সমস্যা শূন্য। সুতরাং বিপদে কে তোমাকে রক্ষা করে, একাকিত্বে কে তোমাকে সঙ্গ দেয়। আবার তোমার বিশ্বাস এই যে তুমি স্পষ্টতই এক ধারাবাহিকতার সূত্রে গ্রথিত আছো—তুমি অনেকের জন্য রক্ষিত, তুমিই আবার অনেকের রক্ষাকারী। প্রয়োজনশূন্য তুমি নও—তুমি সম্পর্কযুক্ত মানুষ—ধারারাহিক—তুমিও দূরবর্তী ক্রীড়াভূমির দিকে একজন—মশালবাহী--তোমার এ বিশ্বাস গ্রথিত গম্বুজের মতো দুর্মদ। সুতরাং অলৌকিক তোমার কাছে নীতিবিগর্হিত অনুপ্রবেশকারী, যেহেতু তুমি আয়নায় প্রায়ই নিজের মুখ প্রতিবিম্বিত দেখেছ, তুমি দোকানে দোকানে রকমারী যুবতীদের দেখেছ, তুমি গাছে গাছে বয়সের ফসল প্রত্যক্ষ করেছ, তুমি ফসলের ক্ষেত্রকর্ষণ, বীজবপন জলসেচন ও পাট শস্যকে কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত করো। তোমার ইন্দ্রিয়গুলি সতেজ ও কর্মক্ষম, তুমি বাহ্যকাম ও ব্যবহারগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারো, তুমি স্বভাবে আছ, তবে কেন এই অলৌকিক?

প্রবেশ

বুদ্ধদেব গুহ

বৌদি, ফোন।

সরমা বাথরুমের দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলল।

বিরক্ত সুমি, শাওয়ারের কলটা বন্ধ করে উৎকর্ণ হয়ে বলল, চান করার সময়ও একটু শান্তি নেই তোমাদের জন্যে। কে ফোন করেছে এই অসময়ে?

বীণা দিদি।

ও বীণাদিদি? ধরতে বলো, ধরতে বলো। আমি আসছি এক্ষুণি। বলেই, দরজার হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখা ছাড়া-হাউসকোটটাই জল-ভেজা নগ্ন শরীরে জড়িয়ে ভিজে বাথরুম-স্লীপার পায়ে গলিয়ে বাথরুমের দরজা খুলে দৌড়ে এল ড্রইংরুমে।

অনেকদিনের পুরনো কাজের লোক সরমা বলল, আস্তে, আস্তে। পড়ে যাবে যে।

তারপরই বলল, দেখেছো! সারা ঘর জলময় করে দিলে গো! কার্পেটটাও ভিজিয়ে দিলে। নিজেই আছাড় খেয়ে মরবে যে ফেরার পথে!

সুমি ফোনের কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে সরমা বাথরুমের দরজা থেকে বেডরুম, বেডরুম থেকে ড্রইংরুমে সুমির ভিজে গা-গড়ানো জল মুছতে লাগল বিড় বিড় করতে করতে।

হ্যালো। বীণাদি? বলো, আমি সুমি।

ওপাশ থেকে কি বলা হলো তা সরমা শুনতে পেলো না। তবে লক্ষ্য করল যে, সুমিতার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

দেখা হয়েছিল? কি বললেন? সত্যি? আমি ভাবতেই পারছি না।...কবে? ....এই শনিবার? না না অশেষ তো বলছিল সুমন ইতিমধ্যেই নেমন্তন্ন খাইয়ে

দিয়েছে। ...বাঃ... না কেন? অশেষের বন্ধু সুদীপের ছেলের জন্যে, আর কেন? সবিতাদির থ্রুতে আলাপ হল, আর দ্যাখো কেমন ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেল।...... কি বলছ? হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি অশেষকে এক্ষুণি ফোন করছি। না না, আমাদের কোনো গাফিলতি হবে না। ওকে ত এখন দিনে দশঘণ্টা পড়াচ্ছি। তারপর মিস্টার হবসন্-এর কাছে কোচিংও নিতে যাচ্ছে। ...হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি যাও। না. না কী যে বল! কোনোই অসুবিধা হয়নি আমার। চান ত এই পঁচিশবছরে বহু হাজার বার করেছি, বেঁচে থাকলে আরও বহু হাজারবার করব। তুমি যা করলে বীণাদি, কী বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাব, বলতে পারছি না। হ্যাঁ হ্যাঁ। অশেষকে বলব মেঘুদাকে ফোন করতে।

সুমিতার স্বামী একটি এককালীন ব্রিটিশ এবং অধুনা মাড়োয়ারী মালিকাধীন ফেরা-কোম্পানীর বড় অফিসার। সে সবে লাঞ্চ রুমে ঢুকেছিল। এমন সময় তার পি. এস মিস নাগবেকার দৌড়তে দৌড়তে এসে বলল, 'স্যার ইটস ভেরী আর্জেন্ট। মিসেস বোস ইজ অন ইওর পার্সোনাল ফোন। প্লীজ টেক দ্যা কল্। অশেষ কার্পেটের উপরে বসানো চেয়ার সজোরে ঠেলে উঠে দাঁড়াল।

কথাক'টি বলেই, মিস্ নাগবেকার, মহিলা পি· এস্দের জন্যে নির্দিষ্ট লাঞ্চরুমের দিকে চলে গেলেন। এখন লাঞ্চ টাইম শুরু হয়ে গেছে। পি· বি এক্সও বন্ধ।

চ্যাটার্জী টাইয়ের নট ঢিলে করতে করতে অশেষের দিকে চেয়ে বলল, তাও গার্ল-ফ্রেণ্ডের ফোন হলে বোঝা যেত। বৌ-এর ফোন পেয়ে এখনও এত দৌড়াদৌড়ি?

লাঞ্চ রুম থেকে দৌড়ে বেরিয়ে যেতে যেতে অশেষ বলল, ব্যাপার আছে। এসে বলব।

সরমা বিরক্ত গলায় বলল, তোমার শরীরের আর চুল-গড়ানো জলে যে ঘর ভেসে গেল গো বৌদি। কত আর নাই-কাজ করব আমি?

করো! করো! লক্ষ্মী সরমা! চাঁদুর বোধহয় হয়ে যাবে সেণ্ট-জেভিয়ার্স-এ ছেণ্ট জেভিয়াস্ কি গো?

আঃ। এখন বিরক্ত করো না। তোমার দাদা আসছেন ফোনে। বলেই, মুখ ঘুরিয়ে সরমাকে বলল, কাউকে বোলো না কিন্তু।

মুখ বিকৃত করে গুল-দেওয়া কেলে মাড়ি আর দাঁত বের করে সরমা বলল আমার বয়েই গেছে কাউকে বলতে। তাছাড়া, ছেণ্টেরও আমি কিছু বুঝি না, জেভিয়াসেরও নয়।

অশেষ হাঁফাচ্ছিল। একটু ভুঁড়ি হয়ে গেছে। খেলাধুলো সব গেছে, তার

উপর নিত্যনৈমিত্তিক পার্টিও লেগেই আছে। মালিকরা মদ সিগারেট ছোঁন না কিন্তু তাদের চাকরীর এটা এখন অঙ্গ। উপরতলার সমাজে ঘোরা-ফেরা কাজ-কারবার করতে হলে মদ না খেলে চলে না। দেশ বদলে গেছে। সময় বদলে গেছে। এখন প্র্যাকটিক্যাল প্রাগম্যাটিক না হলে বেঁচে থাকা মুশকিল। এই নব্য নগরসভ্যতার র‍্যাটরেস-এ ওরা সকলেই সামিল হয়েছে।

হাঁফাতে হাঁফাতে অশেষ বলল, বল সুমি? বীণাদি....কি বললে? হয়ে যাবে? সেণ্ট ফেজিয়ার্স এ? সত্যি? ও মাই! মাই। আই উইল গেট ড্রাঙ্ক টুনাইট। তুমি একটি সুইটী পাঈ ডার্লিং। আমি আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরব। চাঁদু কোথায়?

পড়ছে।

কি পড়ছে?

এখন সামস্ করছে।

ভেরী গুড। তুমি কি করছ?

চান করছিলাম।

আঃ ডার্লিং। যাও যাও ভাল করে চান করো আজকে। উই উইল বীট ইট আপ্ টুনাইট! ছাড়ছি!···কি বলছ? কাউকে বলব না? চ্যাটার্জীকেও না? কেন? কি? ওর বোনপোও চেষ্টা করছে? সেণ্ট ফেজিয়ার্স-এই? মাই গুডনেস্। থ্রু দ্যা সেম সোর্স? সত্যি! ভাগ্যিস বললে। না না। পাগল। আর বলি!

ফোন ছেড়ে দিয়ে লিফ্টের বোতাম টিপল অশেষ। ফোন ধরতে আসার সময় উত্তেজনায় লিফ্ট ডাকার জন্যে অপেক্ষা করার তর সয়নি।

লাঞ্চ রুমে ততক্ষণে অনেকে এসে গেছেন। মকবুল বেয়ারা স্যুপও সার্ভ করে দিয়েছে। চ্যাটার্জী উল্টোদিকের চেয়ারে বসেছিল। স্যুপ-স্পুন দিয়ে স্যুপ মুখে তুলে বলল, হলটা কি?

অশেষ বলল, চ্যাটার্জীর চোখে চোখ রেখে, ডাহা মিথ্যে কথা: তেমন কিছু নয়। না। সুমিতার এক ফার্স্ট্ কাজিনের ফার্স্ট্ প্রেগনান্সী। বেলেভিউতে অ্যাডমিশন নিয়েছিল। এক্ষুণি খবর এসেছে যে, ছেলে হয়েছে।

ওঃ। চ্যাটার্জী বলল। তারপর বলল। বাপ-মায়ের অশান্তির শুরু হল। আই রিয়্যালী পিটী দ্যা প্যারেন্টস্।

কেন? এ আবার কি কথা?

বাঃ। ছেলে হতে আর কি মুশকিল। ইজিয়েস্ট ব্যাপারই ত সেটা। এই মুহূর্ত থেকে স্কুলের অ্যাডমিশান নিয়ে ভেবে মাথার চুল পেকে যাবে। আমার

একবছরের বড় দাদার বিয়ে হয়েছে দশ বছর। নিউ আলিপুরে থাকে। কোনো ইস্যুই হলো না এই ভয়ে চার বছর। পাঁচ বছরের মাথায় প্রিন্স অফ ওয়েলস এলেন কিন্তু তাকে এখন স্কুলে ভর্তি করতে জুলপী পেকে গেছে। শুধু তার নয়, আমাদের সকলেরই। দেখি, একটি সোর্স আছে, তাকে ধরেছি। তোমার ছেলের কি হল? হল কিছু?

নাঃ। স্কুলে ভর্তি করার কোন সোর্স না থাকলে ছেলেমেয়েকে পৃথিবীতে এনে ভাসিয়ে দিয়ে লাভই বা কি?

আমার দাদা-বৌদিও ত তাইই বলে।

কথাটা ভুল বলে না। সকলেই ত ভাই তোমার মত ওয়েল-অফ্ফ নয় যে, ছেলেকে ডুন-স্কুল বা আজমীরে বা গোয়ালিয়রে পাঠাবে? সকলের শ্বশুরমশাই ত আর ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট নয়।

যোগেশদা মানে যোগেশ ঘোষ, চিফ্-এঞ্জিনীয়ার, পূর্ব-বাংলার কোথায় যেন বাড়ি ছিল, খ্যাঁক করে হেসে উঠলেন বিদ্রূপের গলায়।

হাসছেন যে?

চ্যাটার্জী ও অশেষ দুজনেই একসঙ্গে জিগ্যেস করল।

তোমরা, ভাইডিরা কোন্ ইস্কুলে পড়ছিলা?

অশেষ এবং চ্যাটার্জী মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল একবার। অশেষ বলল, দ্যাটস ইরেলিভেন্ট। আমাদের সময় আর এখনকার সময় এক নয়।

ক্যান আমাগো পোলারা কি ল্যাজ লইয়া জন্মাইতেছে?

যোগেশদা সেই মুষ্টিমেয় বাঙালদের একজন যিনি আজও বাঙাল বলে গর্ব বোধ করেন। পূর্ব বাংলার ভাষায় কথা বলেন। বলেন, যাই কও আর তাই কও "আইসেন বইসেন" কইলে যতডা ভালোবাসা ভালোবাসা গন্ধ পাওন্ যায় তোমাগো আসুন বসুনে তার ছিটাফোঁটাও নাই।

মানুষটি বহু বছর ইংল্যাণ্ডেও ছিলেন যৌবনে। ইংরেজী বলেন সাহেবদেরই মত অথচ বাংলা বলবেন, ইচ্ছে করে এমন করে। ওরা বুঝতে পারে না বললে বলেন, হেইডাই ত ভাষা আমার। বাঙাল হইয়া করলুম খেলুম মরলুম জ্বললুম কইর‍্যা জাত খোওয়াইতে পারুম না। আমি হইতাছি গিয়া লাস্ট অফ দ্যা মোহিকানস্। বোঝলা না।

অশেষ অথবা চাটার্জীর পাঁচ গ্রেড উপরে আছেন। ওঁর লেভেলের অন্য অফিসারেরা অশেষদের লেভেলের অফিসারদের সঙ্গে মেলামেশা বিশেষ করেন না, অত্যন্ত ফর্ম্যাল হয়ে থাকেন। লোকে বলে আর এক বছরের মধ্যেই বোর্ডে যাবেন উনি। অথচ মানুষটা এমন কাঠখোট্টা বাঙালই রয়ে গেলেন। একটুও

আধুনিক, অথবা সাহেব হতে পারলেন না। এখনও বাড়িতে লুঙ্গি পরেন- শুঁটকি মাছ খান ; ভাবা যায় না।

চ্যাটার্জী বলল ল্যাজ নিয়ে জন্মায় না কিন্তু আজকালকার দিনকাল কত কম্পিটিটিভ। ভাল স্কুলিং না হলে জীবনে কোথায় হারিয়ে যাবে ছেলে তার ঠিক আছে ? ইংলিশ-মিডিয়াম্ ভাল স্কুলে না পড়লে কি কম্পিট করতে পারবে কারো সঙ্গে ? অমানুষই হয়ে থাকবে।

আমার প্রশ্নডাব জবাব কিন্তু পাই নাই। তোমরা কিন্তু কও নাই এখনও আমারে তোমরা কোন্ স্কুলে পড়ছিলা।

চ্যাটার্জীর বাড়ি বর্ধমান জেলার এক অজ গ্রামে। বর্ধমানেরই একটি স্কুলে সে পড়াশুনা করেছিল। ছাত্র ভাল ছিল। তার বড় মামার মেজশালার সলিসিটর ফার্মে ঢুকে ল এবং অ্যাটর্নিশিপ পাশ করেছিল কলকাতায় এসে। মীর্জাপুরের অন্ধকার মেস-এ থাকত। ল পরীক্ষাতেও দ্বিতীয় হয়েছিল। এই কোম্পানীর ও এখন ল আফসার। চাকরিতে ঢুকে কোম্পানী-সেক্রেটারী-শিপটাও পাশ করে নিয়েছে। চেয়ারম্যান নাকি হায়ার লেভেলের কোনো লোককে বলেওছেন যে, সেক্রেটারী গজদার সাহেব রিটায়ার করলে চ্যাটার্জীই সেক্রেটারী হবে। হয়ত বছর পাঁচেক লাগবে আর। এবং তারপর বোর্ডে যাবে। আজ অা ম্যাটার অফ কোর্স। আর অশেষদের বাড়ি ছিল খুলনাতে। দেশভাগের পর তার বাবা কলকাতায় ভবানীপুরে শালাদের বাড়ি এসে ওঠেন। ওঁরা কলকাতারই বাসিন্দা হয়েছিলেন দু পুরুষ হল। ছেলেবেলার সেই অসম্মানের দিনগুলোর কথা কখনও সে ভুলতে পারে না। মিত্র ইনস্টিট্যুশানে জায়গা না পেয়ে সে ভর্তি হয়েছিল গিয়ে হারাধন ইনস্টিট্যুশানে। নিজেরও বড় হবার, পায়ে দাঁড়াবার খুব একটা জেদ ছিল। ভাল রেজাল্ট করে প্রেসিডেন্সীতে ঢুকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করবার পর কলকাতায়ই বসবাসকারী বাবার এক বাল্যবন্ধুর চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সী ফার্ম-এ ঢুকে সে পরীক্ষা পাশ করে। পরে কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্সীও করে। ওর বাবা ছিলেন জমিদারী সেরেস্তার মুহুরী। ধুতির উপর হাফ-হাতাওয়ালা ফতুয়া পরতেন। পানজর্দা খেতেন তাও বেশি নয়। এবং নস্যি। এ ছাড়া নেশাও ছিলো না কোনো।

অশেষের পাইপ আর হুইস্কি।

ওদের দুজনের স্কুলের কথা শোনার পর যোগেশদা বললেন তমাগো কথাত কনফেস করলা। এহনে আমার কথাডা কই ? দ্যাশ্ ছাইড়া আসনের পর বাবায় ত আমারে দিল এক স্কুলে ভর্তি করাইয়া কুমুদিনী পার্কের আপোজিটে।

পাঁচ টাকা মাইনা ছিলরে ভাই। কোন স্কুল কও দেহি? দুর্গাপতি ইনস্টিট্যুশান। মানুষে কইত আমাগো সময়ে 'যার নাই কোনো গতি হে যায় দুর্গাপতি'। কিন্তু কইলে কি হয়? যহন তোমাগো ছেণ্ট ফেজিয়ার্স-ভর্তি হওনের লইগ্যা গ্যালাম গিয়া, ফাদার গেফার, কলেজের প্রিফেক্ট, স্কুলের নাম শুইনা কইলেন কি জানো? যা কইলেন তা শুইন্যা ত আমার ভিরমী লাগনের যোগাড়।

কি?

কইলেন, দ্যাটস আ ভেরী গুড স্কুল। সো মেনী গুড স্টুডেন্টস্ কেম ফ্রম দ্যাট স্কুল।

ডক্টর হিতেশ চক্রবর্তী। শুনেছো নাম? আরে এহনে, আমাগো পশ্চিম বাংলার ডাইরেক্টর অফ হেল্‌থ সার্ভিসেস, হেই দুর্গাপতিরই ছাত্র। ভেরী হ্যান্ডসাম মানুষ রে ভাই। আর আরও জুনিয়র, ঐ তোমাগো ফুটবলার? মুনী গোস্বামী? হেও ত। আরও কত্ত পোলায়। স্কুল-ফুল সব বোগাস রে ভাই, আসলে হইতাছে ইন্ডিভিজুয়াল। বাড়িতে মা-বাপের ইন্টারেস্ট যদি থাহে আর পোলার নিজের মগজে যদি মাল এট্টু থাহে তাইলে স্যা উপরে উইঠা আইবই আইব। তারে ঠেকায় কোন্ হালায়? তাই যদি না হইতরে তাইলে ত হক্কল ভাল ভাল স্কুল-কলেজের হক্কল পোলায়ই লাইফে এক্কেরে ক্যান্টার কইর‍্যা থুইত! লাইফে তাদের মধ্যে কয়জন ভাইস্যা গেছে আর আমরাই বা কয়জন আছি কও দেহি একবার?

চ্যাটার্জী বলল, যোগেশদা আপনি বুঝছেন না। দিনকাল সত্যিই বদলে গেছে। আমাদের ছেলেবেলার দিন কি আর আছে? এখন একটি ভাল স্কুলে ছেলের অ্যাডমিশান না করতে পারলে তার জীবন অন্ধকার।

অশেষ বলল, সমাজে স্ট্যাটাস থাকে না। বন্ধু-বান্ধবের ছেলেমেয়েরা মিশবেই না আমাদের সঙ্গে।

তরে একটা হনুমান ছাড়া আর কিছুই কওন যায় না। ভাইবা দ্যাখ, ঠাণ্ডা মাথায়। ভাল স্কুলে, ভাল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে এডুকেশান দ্যায় যে তায় সন্দেহ নাই কিন্তু হেই শিক্ষা লইতে পারে কয়ডা পোলায়? যারে কয় রিসেভ্‌টিভিটি তাইই যদি না থাহে, তয় সে পোলার লবডংকা অইব। আরে তোমরা যা কইতাছ তাই যদি হওনের কথা ছিল তাইলে ত শুদা বড়লোকের পোলারাই লাট-বেলাট হইত আনে। লাইফে কি তাই দ্যাখস্ নাকি? চারধারে চক্ষু মেইলা দ্যাখসও না নাকি তোরা?

আপনার ছেলে, যে এখন স্টেটস-এ আছে সে কোথায় পড়েছিল?

হেডার মাথাটা ত তার বাপের মত ভাল ছিল। হেডারে দিছিলাম নরেন্দ্রপুরে। বৌদিই লইয়া গিয়া দিয়া আইছিল। তারপর প্রেসিডেন্সী। বরাবর ত স্কলারশিপ লইয়াই পড়ছে।

তাইই বলুন। সকলের ছেলেরাই ত ব্রিলিয়ান্ট হয় না। যাদের মগজ শার্প নয় তারা কি জীবনে বড় হবার চেণ্টা করবে না?

ইডিয়টের মত কথা কইতাছো তোমরা। কোনো পোলার মগজই পাঁচ বছরে শার্প থাকে না। মগজরে পরিষ্কার করনের, ধার দ্যাওনের ত তহনই আরম্ভ। তোমাগো লইয়া হতাই পারন যায় না!

লাঞ্চের পর নিজের নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে চ্যাটার্জী আর অশেষ বলল, বাঙালকে নিয়ে সত্যি পারা যায় না। কোন্ যুগে যে বাস করেন যোগেশদা। বড় জ্ঞান দেন সব সময়।

চ্যাটার্জী বলল, বাংলাদেশের কোন্ জায়গার বাঙাল উনি? কে জানে? আমি ত বাংলাদেশের গায়ের গন্ধ মুছে ফেলেছি।

যাইই বলিস, বাঙাল তুইও যদিও, তবু তুই যোগেশদার মত গ্রস্ নোস। তোর মধ্যে রিফাইনমেণ্ট আছে। বাঙাল ওরিজিনাল হলে, বড় ইগো থাকে তাদের। কি বল?

অন্যমনস্ক-গলা অশেষ হঠাৎ গলা নামিয়ে বলল হয়ত। ওর বাবার কথা মনে পড়ে গেল। বাবারও ইগো ছিল। ভেঙে যেতে রাজি ছিলেন, কখনই মচকাতে নয়। গত বছর বাবা মারা গেলেন ভবানীপুরের সেই গলির বাড়িতে। শেষ দিকটাতে বাবাকে বড়ই অবহেলা করেছিল অশেষ। এই দিনকালে ইচ্ছে থাকলে পারা যায় না।

॥ ২ ॥

চাঁদুর বয়স পাঁচ। সে পাশের ঘরে শোয়। হালকা নীল কট্। ডনাল্ড ডাক আর ডল্‌ফিনদের রঙিন ছবি আঁকা তাতে। ছোট্ট বইয়ের আলমারী। পড়ার টেবল্। নীলরঙা টাইলস-এর বাথরুম। জামাকাপড় রাখার ছোট্ট নীলরঙা আলমারি। রঙিন টি ভি-র পর্দায় সুখী পরিবার এবং দারুণ সুন্দর অভ্যন্তরের যেমন দৃশ্য দেখা যায় ঠিক তেমনি করেই অশেষের ফ্ল্যাট সাজানো। মাঝেমাঝে অশেষের মনে হয় যে, তার সব বন্ধু-বান্ধবের ফ্ল্যাট বা বাড়ি কম বেশি একই রকম করে সাজানো। জীবনযাত্রায় বড় একঘেয়েমি। সকলেরই একই আশা আকাঙ্ক্ষা, শুক্র শনিবার রাতে এর তার বাড়ি পার্টি, রবিবার

সকালে ক্লাবে গিয়ে বীয়ার বা জিন বা ভডকা খাওয়া। অবস্থাপন্ন সমস্ত মানুষই বোধ হয় এই একইরকম ভাবে বাঁচছে। বিশেষত্ব কিছু নেই।

হালকা হলুদ রঙের সিল্কের নাইটি পরে চাঁপা ফুল রঙের কম্বলের নিচে শুয়ে বেডরুমের নীল আলোর সুইচটাও নিবিয়ে দিল সুমিতা। হাই তুলল একটা। বলল, আজ ওসব থাক বুঝেছো। ভারী ঘুম পাচ্ছে। ঠিক আছে। আসলে এরকমই হয়। কি হবে কি হবে করে এতদিন তুমি কীইড্-আপ্ হয়েছিলে ত! আজ যখন বীণাদির কাছ থেকে খবরটা পেলে তখনই ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছো। যাইই হোক, অলস ওয়েল দ্যাট এন্ডস্ ওয়েল।

দাঁড়াও অ্যাডমিশনটা হোক আগে। না আঁচালে বিশ্বাস নেই। কাউকেই বোলো না কিন্তু তুমি। কেউ জানলেই, ভাঙচি দেবে।

হুঁ। বীণাদি আর কি বললেন?

বললেন যে, টেস্ট কিন্তু নেবে।

নেবে? আতঙ্কিত গলায় বলল অশেষ।

বলেই, উঠে বসল বিছানাতে। সে কী? তাহলে আর করলেনটা কী বীণাদি?

হ্যাঁ। প্রদীপ সেন না কি তাইই বলেছেন ওঁকে। টেস্ট-এ রীজনেবুলি ভাল করা চাই।

মাই গুডনেস্। আমি ত ভেবেছিলাম সেন্ট লরেন্স, ক্যালকাটা বয়েজ স্কুল, ডন-বসকো এবং পাঠভবনেও আর চেষ্টা করার দরকার নেই। এখন ত দেখছি ঢিলে দিলে একটুও চলবে না।

না। সুমিতা বলল। গলায় কান্নার সুর লাগল ওর। ওর দিকে সহানুভূতির চোখে চেয়ে অশেষ বলল, অ্যাডমিশন টেস্ট যে ছেলের না আমাদেরই তাই-ই বোঝা দুষ্কর। দ্যাখো, নিজেদের সব পরীক্ষা, সব বিপদ ধীরে ধীরে প্রায় কাটিয়েই উঠেছি বলা চলে। যখন ভেবেছিলাম, সুখের জীবন শুরু হবে ঠিক তখনই মনে হচ্ছে দুঃখের জীবনের আরম্ভ হল। অথচ আমাদের দুজনেরই এই সুখ অথবা দুঃখের উপরে কিছুমাত্রও হাত নেই। ছেলে মানুষ না হলে, ছেলের বউ ভাল না হলে মনে হবে ওদের নিয়ে যা অশান্তি তাতো আমরা অ্যাভয়েড করলেই পারতাম।

ছিঃ। কী যে বল। তুমি কি বলছ, চাঁদু না থাকলেই ভাল হত। খুশী হতাম আমরা? অমন করে বোলো না।

কী বলতে চাইছি বুঝছো না তুমি সুমি।

ব্রান্ডি খাবে নাকি একটা? ছেলের চিন্তা ত আছেই। আমার তোমাকে

দেখেও কম চিন্তা হচ্ছে না।

সুমিতা অস্ফুটে কী যেন বলল, বোঝা গেল না।

পাশের ফ্ল্যাটে টিবড়েয়ালারা ভি সি আর এ কোনো ইংরেজী ছবি দেখছে। রাত সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। গমগম্ করছে আওয়াজ। একটুও কনসিডারেশন্ নেই। একজন মানুষেরও কনসিডারেশান নেই অন্যর প্রতি। পথের মোড়ে ট্র্যাফিক কনস্টেবল এক মুহূর্ত না থাকলেই এই সময়টার, এই যুগের চরিত্রটা যেন আয়নায় ফুটে ওঠে। চাঁদুরা যে কেমন করে বাঁচবে এই যুগে। বড়ই কষ্ট ওদের কপালে।

অশেষ উঠে গিয়ে ড্রয়িংরুমের বাতি জ্বেলে সুমিতার জন্যে একটি কনিয়াক্ আর ওর জন্যে একটি হুইস্কি ঢেলে, সেলার বন্ধ করে বাতি নিবিয়ে দিল। চাঁদুর ঘরের ফুট-লাইটটা জ্বলছে। মৃদু আলোতে আভাসিত হয়ে আছে ঘর। পায়ে পায়ে এগিয়ে গ্লাসদুটো হাতে নিয়েই একবার ছেলের বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। পাশ ফিরে দুটি হাত জড়ো করে ঘুমের মধ্যে ছেলেটা কী যেন প্রার্থনা করছে। প্রার্থনা করছে কি ও ও ওর বাবামায়েরই মতো, যেন সেন্ট জেভিয়ার্স-এ অ্যাডমিশনটা হয়ে যায়?

পাঁচ বছরের শিশু। এই স্কুলের অ্যাডমিশানের পরীক্ষাতেও ধরাধরি করে, কানেকশনস্ বের করে তাকে পার করতে হবে। যদি ভর্তি হয়ও, স্কুল-লীভিং পরীক্ষায় যদি ভাল না করতে পারে তখন আবার আর এক পরীক্ষা কলেজে অ্যাডমিশানের। তারও পর কেরিয়ারের পরীক্ষা। ততদিন কি বাঁচবে অশেষ? যা হেকটিক লাইফ লীড করতে হয় ওকে। আজ বম্বে কাল মাদ্রাজ, পরশু ব্যাঙ্গালোর তরশু দিল্লি। আগে আগে বেশ একটা ফীলিং অফ ইমপরট্যান্স্ হত, আজকাল বড় ক্লান্ত লাগে। ভাল লাগে না একেবারেই। তারপর চাকরিতে ঢুকেও ত প্রত্যেক মুহূর্তেই পরীক্ষা। ল্যাঙ-মারামারি। ইঁদুরের মত কাটাকাটি একে অন্যকে। পাঁচ বছর বয়স থেকে পরীক্ষার শুরু হল চাঁদুর। চলবে মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত। জীবন মানেই পরীক্ষা। এই জীবন চাঁদুদের বড়ই সংগ্রামের, খেয়োখেয়ির, বড় দ্বেষ, ঈর্ষা, বড়ই রেষারেষির হবে। চাঁদুর ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে ভাবছিল অশেষ এই পৃথিবীতে কেন যে আনল ও আর সুমিতা বেচারীকে। শিশুর শৈশব নেই, কিশোরের কৈশোর নেই, যুবকের যৌবন নেই, প্রৌঢ়র বানপ্রস্থ নেই। প্রতিটি মুহূর্ত টেনশানের, প্রতিযোগিতার। অথচ, এই প্রতিযোগিতা কিসের জন্যে? ভাল চাকরি, ভাল রোজগার, স্ট্যাটাস, ভাল ফ্ল্যাট, গাড়ি, ফোন, ফ্রিজ, ভি সি আর? শুধু এইটুকু পাওয়ার জন্যেই কি একজন মানুষকে পৃথিবীতে আনা? এই প্রতিযোগিতাতে ছিন্নভিন্নই যদি

হতে থাকে সবসময় তবে ওরা বাঁচবেটা কখন? জীবন মানে শুধু কি এই? এইই সব?

বেডরুমে এসে নীল লাইটটা জেবলে সুমিতাকে কনিয়াকটি দিয়ে নিজে গাল্প্ করল একবারে অনেকখানি হুইস্কি।

সুমিতা সচরাচর ড্রিঙ্ক করে না। কদিন হল কেমন যেন হয়ে গেছে। বিছানায় উঠে বসে সেও চুমুক দিল।

ওকে অন্যমনস্ক করার জন্যে অশেষ বলল, বিকেলে কি করলে?

ও। বলিনি তোমাকে বুঝি? চাঁদুকে মিস্টার হবসন্ এর স্কুলে নামিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রসদনে গেছিলাম। শ্যামলদা'দের সেই প্লে দেখতে। শ্যামলদা ইংরিজিতেই বললেন। কী দারুণ ইংরিজি বলেন। উনি কি ইংল্যাণ্ডের 'হ্যারোতে' পড়াশুনা করেছিলেন? না 'ইটন্'এ?

চুপ করে রইল অশেষ কিছুক্ষণ। তারপর নিজের কানে আশ্চর্য শোনালেও কথাটা বলল সুমিতাকে। বলল, যোগেশদার কাছে শুনেছি, উনি নাকি বালীগঞ্জ গভর্নমেণ্ট স্কুলে পড়েছিলেন।

সে কি? লা-মার্টস্ বা সেন্ট জেভিয়ার্সেও নয়।

নয়। ওসব স্কুলে বড়লোকের ছেলেরাই পড়তে পায়। শ্যামলদার বাবা ত খুব অল্পবয়সেই মারা যান। শিশুকালে তাঁর মা অনেক কষ্ট করেই ওঁকে বড় করেছিলেন। জানো তুমি, যোগেশদা হয়ত ঠিকই বলেন। বালীগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুল অবশ্য খুবই ভাল স্কুল, কিন্তু ইংলিশ মিডিয়াম ত নয়। মানুষ যদি নিজেকে বড় করতে চায় যোগেশদার ভাষায়, তার মধ্যে যদি নেওয়ার ক্ষমতা মানে রিসেভ্টিভিটি থাকে, তাহলে সেই সব ব্যক্তি নিজেদের গুণে একদিন প্রতিষ্ঠানের চেয়েও অনেক বড় হয়ে ওঠেন। আমি সুগতর কাছে শুনেছি যে শ্যামলদা নাকি রেডিওর বি বি সি স্টেশান শুনে শুনেই অমন ইংরিজি উচ্চারণ রপ্ত করেছিলেন। সত্যি কী না জানি না অবশ্য। যে বড় হবে, তাকে তার পরিবেশ, অনুষঙ্গ, চারপাশের বিরূপতা কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখতে পারে না হয়ত।

সকলেই ত আর শ্যামলদার মত ওরকম বড় হবার ক্ষমতা নিয়ে আসে না। আমাদের চাঁদু ত সাধারণ। আমি তুমিও ত সাধারণই। তাইই ইচ্ছে করে ছেলেকে একটি ভাল স্কুলে দিই। তুমি যখন অ্যাফোর্ড করতে পারো। তাছাড়া ভাল স্কুলিং-এর দাম ত আছে একটা।

নিশ্চয়ই আছে! তবে, সত্যিই হয়ত বাবা-মায়ের শাসন এবং ছেলের নিজের বড় হওয়ার তাগিদটাই আসল। স্কুলের চেয়ে, সেটা অনেকই বড় ব্যাপার।

হঠাৎই ওরা দুজনে চমকে উঠল, দ্রুত কিন্তু লঘু পায়ে পাশের ঘর থেকে চাঁদুকে দৌড়ে আসতে শুনে। স্লিপিং সুট পরে চাঁদু তার ছোট্ট চটি-ফট্ ফট্ করে দৌড়ে এল ও ঘরে। সুমিতা লাফিয়ে উঠল বিছানা ছেড়ে। আতঙ্কিত গলায় বলল, কি হয়েছে বাবা? ভয় পেয়েছো? স্বপ্ন দেখেছো?

দেওয়ালের কোয়ার্টজ ক্লক-এর দিকে চেয়ে দেখল অশেষ, রাত বারোটা বেজে কুড়ি।

চাঁদু সে কথার উত্তর না দিয়ে বলল, মাম্মী, 'সিজর্স' বানানে কটা এস্! কটা এস্?

অশেষ বলল, চারটে।

তাই? তাইইত! আমি ত ঠিকই জানি। সেন্ট ফেভিয়ার্সের সাদা ড্রেস-পরা ফাদার যে বললেন, আমি ভুল বলেছি!

তুমি স্বপ্ন দেখছিলে?

না বাবা। আমি অ্যাডমিশান টেস্ট দিচ্ছিলুম। চাঁদুর ঘুম-ভাঙা আতঙ্কিত মুখের দিকে চেয়ে সুমিতার দুচোখ সমবেদনায়, অসহায়তায়, ক্রোধে, হতাশায় জ্বলে উঠেই পরমুহূর্তে জলে ভরে গেল। মুখ ফিরিয়ে নিল ও জানালার দিকে।

অশেষ চাঁদুকে কোলে তুলে ওদের বেডরুমের বাথরুমে নিয়ে গিয়ে ওর ঘাড়ে, কানের পেছনে এবং হাঁটুতে ও গোড়ালীতে জল দিল। স্নায়ু সব ঠাণ্ডা হয় অমন করলে। ওর মা বলতেন। মাও এখন ভবানীপুরেই থাকেন সুরেশের সঙ্গে। বড় কষ্টেই থাকেন। কিছু টাকা দেয় অশেষ। জানে যে তা কিছুই নয়, কিন্তু আর পারে না। ওদের লাইফ-স্টাইল যে বদলে গেছে!

চাঁদু অশেষের গলা জড়িয়ে ধরে বলল, বাবা! আমার ভয় করছে।

কোন ভয় নেই। আমি আছি না। অশেষ বলল। ঠিক এমনি করে মাও বলতেন ওকে ছেলেবেলায়। মায়ের কাছে একমাসের উপর যেতে পারেনি। মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল।

চাঁদুকে বলল, পারবে, তুমি ঠিক পারবে টেস্টে। দেখো তুমি। এখন চলো ঘুমোবে। লাইক আ গুড বয়। তুমি হাঁদা জ্যাঠার মত বাঘ শিকার করবে বলো না? ঢিসুম ঢিসুম্। তবে? ভয় পাবে কেন? চাঁদু ঘোরের মধ্যে বলল, তা হলে ফাদার যে বললেন, না। সিজর্স্-এ একটা এস্।

ফাদার জানে না বাবা।

তা হয় না। চাঁদু বলল।

চাঁদুকে শুইয়ে, গায়ে ওর হালকা নীলরঙা কম্বলটা চাপিয়ে 'মশারি গুঁজে' কপালে একটা চুমু দিয়ে অশেষ বলল, গুড নাইট বাবা! ঘুমোও এবারে!

বেডরুমে ফিরে এসে দেখল সুমিতা এক করুণ অসহায় ভঙ্গীতে শুয়ে আছে ওর হাতের কনিয়াকের গ্লাস ঢেলে কম্বল ভিজে গেছে। অশেষ কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাকল, সুমি।

সাড়া নেই কোনো। অজ্ঞান হয়ে গেছে চাঁদুর মা।

অশেষ তাড়াতাড়ি ওর নাড়ি দেখল। তারপর ডাঃ ভৌমিককে ফোন করল। এই মাল্টিস্টোরিড বাড়িরই দশতলায় থাকেন উনি। তারপর সারভেন্টস্ কোয়ার্টারের বেল টিপল। ডাঃ ভৌমিক এলেন স্লিপিং সুটের উপর ড্রেসিং-গাউন চাপিয়েই। সুরমাও এলো প্রায় একই সময়ে। ডাঃ ভৌমিকের ব্যাগটা নিয়ে বেডরুমে এল অশেষ সুরমা আর ডাঃ ভৌমিকের সঙ্গে।

পরীক্ষা করতে করতেই জ্ঞান ফিরে এল সুমিতার, কিন্তু জ্ঞান আসার আগে ঘোরের মধ্যেই সুমিতা বলল, বীলিভ মী ফাদার! হী নোজ এভরীথিং। বীলিভ মী। ও নার্ভাস হয়েই ভুল বলেছে। সত্যিই কিন্তু ও জানে। ও কি অ্যাডমিশান পাবে না ফাদার?

ডাঃ ভৌমিক বুঝলেন।

অশেষকে বললেন, কবে?

পরশু থেকে আরম্ভ। পর পর। সেন্ট লরেন্স, ডন-বসকো, ক্যালকাটা বয়েজ, লা-মার্টস্, সেন্ট-ফেভিয়ার্স।

হুঁ। বলেই, সুমিতার প্রেসার মাপলেন। তারপর নিজের ব্যাগ থেকে পাঁচ মিলিগ্রামের ক্যাম্পোজ বের করে দিয়ে বললেন, জল দিয়ে গিলে শুয়ে পড়ুন। কাল ঠিক হয়ে যাবেন।

ডাঃ ভৌমিকের দারুণ প্রাকটিস। মানুষও নাকি খুব অমায়িক। চারখানা গাড়ি। লোকে পেছনে পেছনে দোড়ে বেড়ায়। অশেষ শুনেছে যে, ওঁর বাবাও অত্যন্ত বড় ডাক্তার ছিলেন। উনিও নাকি বিদেশে গিয়ে অনেক ডিগ্রী নিয়ে এসেছেন। আজই প্রথম বিপদে পড়ে ডাকল ওঁকে। নইলে ওদের ডাক্তার ডাঃ সেন।

ডাঃ ভৌমিক লিফ্‌ট-এর সামনে দাঁড়িয়ে লিফ্‌ট-এর বোতাম টিপে বললেন, মিসেসের নার্ভাস ব্রেকডাউন মত হয়েছে। নাথিং টু ওয়ারী বাউট। প্রেসক্রিপশান ত লিখে দিয়েই গেলাম একটা। ওষুধ আনিয়ে কাল সকাল থেকেই দিতে আরম্ভ করবেন।

লিফ্‌টের দরজা বোধহয় কেউ খুলে রেখে দিয়েছে। মাল্টিস্টোরিড বাড়ির

চাকর-আয়ারা রাতে যা খুশি তাইই করে। ডাঃ ভৌমিক কিছুক্ষণ মুখ নিচু করে লিফ্‌টের অপেক্ষায় থেকে হঠাৎ বললেন, আমি জানি না মিস্টার বোস কলকাতায় আমরা এত বড়লোক বাঙালী আছি, বাঙালী গভর্নমেন্ট আমাদের. আমরা সকলে মিলে কি আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্যে কটি ভাল স্কুলও তৈরি করতে পারি না? কলকাতায় ত বটেই, সমস্ত মফস্বল শহরেও?

স্কুল ত কতই আছে। কিন্তু স্কুলের মত স্কুল কোথায়? মানে, যেখানে ভাল ভাল পড়াশোনা হয়, ইংলিশ মিডিয়ামে।

অশেষ বলল।

যে সব স্কুল আছে বাঙলা-মিডিয়ামের, তাদেরও কি আমরা আধুনিক ও ভাল করে তুলতে পারতাম না? ইংরিজি শিখতে বাহাদুরীটা কি লাগে? নিউমার্কেটের ফলওয়ালারাও ত ইংরিজি বলে। ইংরিজি শেখার চেয়েও বড় শিক্ষা চরিত্র গঠন। যে সাহেবরা আমাদের বাবাদের শোষণ করেছিলেন তাদের পোশাক. কমোড. হুইস্কি আর পাইপই নিলাম আমরা, চরিত্রটাই ফেলে দিলাম। তখনকার ইংরেজদের গুণও ছিল অনেক। কী বলেন?

আপনি কোন স্কুলে পড়েছিলেন ডাক্তার ভৌমিক?

আমি? বাংলাদেশের পাবনার এক অখ্যাত গাঁয়ের স্কুলে।

আপনার বাবা ত এম আর সি পি, এফ আর সি এস ছিলেন, তাই না?

ডাঃ ভৌমিক একবার তাকালেন অশেষের চোখে মুখ তুলে। বললেন, কে বলেছে আপনাকে? ভুল শুনেছেন। আমার বাবা এম বিও ছিলেন না, পুরোনো দিনের এল এম এফ ছিলেন। কিন্তু ডাক্তার ছিলেন ধন্বন্তরী।

স্যরি। আমি আপনার সঙ্গে আপনার বাবার কোয়ালিফিকেশান গুলিয়ে ফেলেছিলাম।

নিচে দরজা বন্ধ করার আওয়াজ হল। কারো দয়া হল বোধহয়।

লিফ্‌টটা এসে গেল। অশেষ, ভদ্রতা করে লিফ্‌ট-এর গেট খুলে দিল। ডাঃ ভৌমিক বললেন, না, সেটাও ভুল শুনেছেন। আমি নিছকই একজন এম বি বি এস ডাক্তার।

আপনার ফীসটা?

হাসলেন ডাঃ ভৌমিক। বললেন, আমি পুরোনো দিনের লোক, প্রতিবেশীকে আত্মীয় বলেই জেনেছি ছেলেবেলা থেকে।

লিফ্‌ট্‌-এর মধ্যে মুখ নিচু করে গেটের ভিতরের দিকটা টানতে টানতে বললেন, বোস সাহেব, স্কুল এবং ডিগ্রীর সঙ্গে শিক্ষার কোনোই সম্পর্ক নেই বোধহয়। হয়ত আরেরও নেই। ওড়িশা থেকে আসা ভাল কাজ জানা কলের

মিস্ত্রী, বিহার বা ইউ. পি থেকে আসা পানের দোকানদার, এঁরা সবাই কিন্তু মার্কেন্টাইল ফার্মের অনেক বাঙালী অফিসারের চেয়েই বেশি রোজগার করেন। একমাত্র ছেলেকে নিয়ে কি করতে চান আপনারা তা-ই ভাল করে ভেবে ঠিক করুন। কলকাতার ভাল ভাল স্কুলে যেসব ছেলেমেয়ে পড়ার সুযোগ পায় বা পেয়েছে, পরবর্তী জীবনে তারা কি সকলেই কেউ-কেটা হয়েছে? সো-কলড্ খারাপ স্কুলের ছেলেমেয়েদের কাছে তারা কখনও হেরে গেছে কি যায়নি তাই নিয়েও একটি সার্ভে করার সময় বোধহয় এসেছে। একমাত্র সন্তানকে কী করে তুলতে চান তাই ভাবুন ভাল করে দুজনে। পরীক্ষা আপনাদেরই।

অশেষ লিফ্‌টের বোতাম টিপে রেখে দাঁড় করিয়ে দিল লিফ্‌ট্‌টিকে।

কাকুতি-ভরা গলায় বলল, কী করতে বলেন আপনি আমাদের, ডাক্তার ভৌমিক?

কিছুই বলি না। ছেলেকে শিক্ষিত করে তুলুন। জীবিকার সঙ্গে শিক্ষার কোনো বিরোধ যেমন নেই, তেমন কোনো কানেকশানও নেই। যা-কিছু করেই একজন মানুষ জীবিকানির্বাহ করতে পারে। এমনকি যদি কড়াইশুঁটি কি কচুরিব দোকানও দেয়। আপনি কি সত্যিই মনে করেন যে, যাঁরা টাই পরে গাড়ি চড়ে অফিসে গিয়ে অন্যের বেশি মাইনের চাকর হয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন তাঁরাই শুধু শিক্ষিত আর অন্যরা সবাই অশিক্ষিত? ছেলেটাকে শিশুকাল থেকেই কতগুলো প্রি-ডিটার্মিনড্ আইডিয়াজ-এর চাকর করে তুলবেন না। ওদের মানুষ করে তুলুন। ভাল স্কুলে অ্যাডমিশান হলে ভাল, কিন্তু তা না হলে যে তার জীবন বৃথা হয়ে যাবে এমন মনে করার মত মূর্খতা কিন্তু আর নেই। ফটফট করে ইংরিজি ফুটোলেই সে শিক্ষিত, সে জীবিকায় সফল হবে; তার কোনো মানেই নেই। তাছাড়া জীবিকার জন্যে ত জীবন নয়, জীবনের জন্যেই জীবিকা।

অশেষের হাতের আঙুল আপনা থেকেই ঢিলে হয়ে এল। লিফ্‌টটা উঠে গেল উপরে। ওর মনে হল, ডাঃ ভৌমিক যেন ওকে নিচেই ফেলে রেখে নিজে অনেক উঁচুতে চলে গেলেন।

সুরমাও তার কোয়ার্টারে যেতে, দরজা বন্ধ করে ফিরে এসে অশেষ আর একটা হুইস্কি ঢেলে বেডরুমে গিয়ে দেখল সুমিতার নিঃশ্বাস গাঢ় হয়ে গেছে। দশ মিলিগ্রাম ক্যাম্পোজ পড়াতে ঘুমে এলিয়ে পড়েছে ও।

গ্লাসটি হাতে নিয়ে দরজা খুলে ও বারান্দায় এসে দাঁড়াল। বেশ ঠান্ডা পড়েছে কলকাতায় গতকাল থেকে। উল্টোদিকের চোদ্দতলা গাল্‌টিস্টোরিড বাড়িটির কিছু কিছু ফ্ল্যাটে তখনও আলো জ্বলছে। ঐ সমস্তক'টি ফ্ল্যাটেও কি

পাঁচ বছরের শিশুরা জীবন ও জীবিকার প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্যে কাঁচির ইংরিজি প্রতিশব্দ বানানে কটি 'এস্' আছে তা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত? না তাদের মা-বাবারা ভাল ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলে তাদের ভর্তি করতে না-পারার চিন্তাতে সুমিতারই মত নার্ভাস ব্রেকডাউনে ভেঙে পড়েছেন আলো-জ্বালা বেডরুমগুলিতে?

অশেষের চোখে হঠাৎই বাঙাল, খাঁটি, সোজা কথার মানুষ যোগেশদা'র মুখটি ভেসে উঠল। এক ঢোকে হুইস্কিটা শেষ করে দিল ও। ওর মনে হল এই মুহূর্তে ওদের মতো অনেক দম্পতিই শুধু নন, ওদের নয়নমণি চাঁদুদের মত কিছু শিশুই শুধু নয়, পুরো বাঙালী জাতটাই বোধহয় এক ধরনের নার্ভাস ডেবিলিটিতে ভুগছে। ক্যাম্পোজ খেয়ে ঘুমোলে সেই জড়তা হয়ত শুধু বাড়বেই। যা দরকার তা জেগে থাকার, দু চোখ খুলে রাখার. সবাই যা করে, যা ভাবে; তা না করে নিজের পরিবেশ ও নিজস্ব পরিপ্রেক্ষিতে ঠাণ্ডা মাথায় বোধহয় একটু ভাবা দরকার। ভাল চাকরী আর বেশি মাইনেই যে তাদের অনেক আদরে-আনা সন্তানের জীবনের একমাত্র গন্তব্য নয় এ কথাটা হঠাৎই মনে হল ওর। ভাল-থাকা ভাল-পরার, ভি. সি. আর ও পয়সার চক্করে ফেঁসে, গরীব বাঙালীদের যা কিছুই গর্ব করার ছিল একদিন তার সবই বুঝি খোয়াতে বসেছে তারা।

সুমিতা কাল যা বলে বলুক, সকালে কোনো বাঙালী স্কুলে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করাবে চাঁদুকে। তারপর সেই স্কুল যাতে তার সন্তানকে যথার্থ শিক্ষিত করে তুলতে পারে সে জন্যে নিজে ত বটেই, চ্যাটার্জী, যোগেশদা, ডাঃ ভৌমিক এবং অগণ্য বাঙালীদের কাছে সাহায্য চাইবে অশেষ। সরকারের উপর সব দিক দিয়ে চাপের সৃষ্টি করবে। কেরালাও ত কম্যুনিস্ট। কিন্তু শিক্ষিতের হার সেখানে কত বেশি! অশিক্ষিত বেকার মানুষ বাড়লে ভোট পেতে সুবিধে নিশ্চয়ই হয়. কিন্তু রাজ্যের কি হয় তা ওঁদের বোঝার সময় এসেছে। এই জাতটিকে এমন ঘোরতর স্নায়বিক দৌর্বল্য থেকে টেনে তোলাটা শুধুমাত্র তার নিজের ছেলেকে অতি স্বল্পসংখ্যক অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেদের স্কুলে তথাকথিত শিক্ষিত করে তোলার স্বার্থপর ইচ্ছে থেকে অনেকই বড় ব্যাপার।

চাঁদু ডাকল, বাবা।

তাড়াতাড়ি ঘরে গেল অশেষ বারান্দা থেকে।

অ্যামেরিকার প্রেসিডেন্টের নাম কি বাবা? ডনাল্ড ডাক?

না বাবা। রনাল্ড রিগ্যান। কিন্তু এসব তোমার আর মুখস্থ করতে হবে না। শিশু ভোলানাথ পড়াব আমি কাল তোমাকে, অবনঠাকুরের রাজকাহিনী,

বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী পড়ে শোনাব ; দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের ঠাকুরমার ঝুলি, সুনির্মল বসুর ছন্দের টুং-টাং। কাল থেকেই দেখবে পড়া-শুনোটা কত আনন্দের। কত মজার। আজ ঘুমিয়ে পড়ো লক্ষ্মী সোনা। সিজার্স-এর এস্ নিয়ে আর ভাবতে হবে না তোমাকে। কাঁচিই আমাদের অনেক ভাল। রাতারাতি এক অদৃশ্য কাঁচি দিয়ে তোমাকে এই মিথ্যে কণ্টর থেকে বিচ্ছিন্ন করে এক সুন্দর দিশি জগতে ফিরিয়ে আনব আমি। ঘুমোও তুমি। আমার আদরের ধন। তোমার স্বপ্নে পরীরা আসুক। শুকসারি, সুয়োরাণী দুয়োরাণী। ফ্যান্টম আর সাদা-পোশাকের ফাদাররা নাই-ই বা এলেন।

বাবা। আমার সঙ্গে শোবে তুমি ?

নিশ্চয়ই শোব !

অশেষ বলল।

চাঁদুর পাশে শুয়ে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরল একদা ব্রিটিশ, অধুনা মাড়োয়ারী কোম্পানীর ইংরেজি ফুটোনো চাকর। ওর বুকের মধ্যে ছেলেবেলার সব বোধ ফিরে এল। কানে এল গ্রামের রাতে পাখির শীতার্ত স্বর, নদীর উপরের হাওয়ার হু হু শব্দ। নাকে এল প্রথম ভোরের খেজুরের রসের গন্ধ, পাকা ধান আর নদীর কুয়াশার গন্ধর সঙ্গে ভেসে। বড় বড় কই মাছের, ধনে পাতা ফুলকপি দিয়ে রাঁধা ঝোলের গন্ধ। বাঙালীয়ানার গন্ধ। ঘুমন্ত চাঁদুকে বুকে জড়িয়ে অশেষ বলল, তোকে আমি শিশুকাল থেকেই এই অপমানের অসম্মানের জগৎ থেকে বাঁচাব। শিশুকাল থেকে এই হিউমিলিয়েশানের মধ্যে বাঁচতে হলে তুই অমানুষ হয়ে যাবি। তোকে জবরদস্ত বাঙালী করে তুলব। দেখি তুই ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে টক্কর দিতে পারিস কি পারিস না জীবনে। বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, স্যার আশুতোষ, বিধান রায়, সত্যজিৎ রায় এবং অনেকেই যদি ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলে না পড়েও বড় বাঙালী হতে পেরে থাকেন ত তুইই বা পারবি না কেন ? তোকে আমি আমার মত এয়ার-কণ্ডিশনড অফিসের স্যুট পরা ফ্যাকাশে পুতুল করব না, রক্ত মাংসের বিবেক সমৃদ্ধ মানুষ করে তুলব। যেমন অনেক মানুষের দরকার এই মুহূর্তে, এই হতভাগ্য রাজ্যে।

দেখিস, চাঁদু।

বাবা। দেখিস তুই।

দুই পিতা
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

'ট্যাং' করে ঘড়িতে একটা শব্দ হল। রাত সাড়ে দশটা। ঘড়িটা অনেক কালের প্রাচীন। পরমেশ্বরের গোঁফ জোড়ার মতই পুরোনো। সস্তা জাপানী ওয়াল ক্লক। মেজাজ অনেকটা পরমেশ্বরের মত। কোন ভনিতা না করেই দুম করে সময় ঘোষণা করে। পরমেশ্বরের সব কিছুই প্রাচীন। এখন যে আমকাঠের তক্তাপোশের উপর বসে বসে চুমুক দিয়ে তারিয়ে তারিয়ে এক গেলাস দুধ খাচ্ছেন, সেটার বয়স কম হবে না। ইচ্ছে করলেই একটা ভালো খাট কিনতে পারতেন, কেনেননি। টাকাটা ব্যাঙ্কে সুদে বাড়ছে। ঘুমটাই বড় কথা, খাটটা বড় নয়। বিছানাটাও একটা অদ্ভুত সমন্বয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কন্ট্রোলে কেনা, মিলিসিয়ার খোলের মধ্যে শিমুল আর কাপাস তুলো ঠেসে ঢোকানো। চাদর একটা বড় বহরের মার্কিন। মশারি এক সময় সাদা ছিল, এখন ধূসর। বেশি টানাটানি সহ্য হবে না বলে ঝলমল করে ঝুলছে। একটা পাশ গোটানো, সেই অংশে পরমেশ্বর বসে আছেন। হাতে ধরা গেলাস। গেলাসে সরওলা গরুর দুধ। গেলাসটাও বহুকালের। পরমেশ্বরের হাতে সব কিছুরই পরমায়ু বেড়ে যায়। এমন কি নিজের জীবনেরও। পরমেশ্বরের সঙ্গে যাঁরা জীবন শুরু করেছিলেন তাঁদের অনেকেই আবার নতুন জন্ম পেয়েছেন।

ঘড়ির শব্দের কোন ঝঙ্কার নেই। একটা ভারী ধাতব শব্দ। পরমেশ্বর চোখ তুলে তাকালেন। গোঁফের উপর একটু সর জড়িয়ে আছে। —বড্ড দেরি হচ্ছে। কথাটা বললেন একটু দূরে টুলের ওপর বসে-থাকা ছেলেকে লক্ষ্য করে। ছেলের নাম বঙ্কিম। বঙ্কিম অপরাধীর মত মুখ করে বসে রইল, বাবার গোঁফের উপর লেগে থাকা সরের দিকে তাকিয়ে। সে জানে সরটা মুখের

যাওয়া-আসার পথের উপর এমন একটা অনুভূতিহীন অংশে পাশ কাটিয়ে সরে গেছে, পরমেশ্বরকে না বলে দিলে সরের অংশটা ওইখানেই সারারাত নিরাপদে থেকে যাবে। পরমেশ্বরের মতে সরই হল দুধের সারাংশ। যেদিন দুধে সর পড়ে না, সেদিন তিনি বাড়িতে কোর্ট বসিয়ে ফেলেন। সর কোথায় সরে গেল না জানা পর্যন্ত নিস্তার নেই।

বঙ্কিম আজ অপরাধী। অপরাধীর কথা বলা-উচিত নয়. তা না হলে সে গোঁফের উপর সরের কথাটা সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিতে পারত। বঙ্কিমের অপরাধের সীমা নেই। প্রথম অপরাধ. সে প্রেম করে বিয়ে করেছে। হাফ প্রেম, হাফ সম্বন্ধ। পরমেশ্বরেরই এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মেয়ে। প্রেমটা যখন প্রায় বিপজ্জনক সীমায় এসে ঠেকেছে তখনই সে স্টিয়ারিং ছেড়ে দিয়েছে পরমেশ্বরকে। প্রথমে খেলছিল তারা দুজনে., সেকেণ্ড হাফ খেললেন পরমেশ্বর আর পরমেশ্বরের বাল্যবন্ধু। তখন নায়ক নায়িকারা গ্যালারীর রুদ্ধশ্বাস দর্শক। গোল হতে হতে হয় না। শেষে পরমেশ্বরের বন্ধু জালে বল জড়িয়ে দিয়ে, ঝাড়া হাত পা হয়ে বিদেশ চলে গেলেন।

বঙ্কিমের উপর পরমেশ্বরের সেই থেকে রাগ। মুর্খ ছেলে। বিয়ে করলি করলি তা বলে এইভাবে! পাওনা গণ্ডা নিয়ে একটু দর কষাকষির স্কোপ রাখলি না। উল্টে বউভাতে ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সে হাত পড়ে গেল। নেহাত সবেধন নীলমণি। পরমেশ্বর ব্যাপারটা মেনে নিলেন।

দ্বিতীয় অপরাধ. পরমেশ্বর ছেলেকে সোজাসুজি বলেছিলেন—দ্যাখো বিয়ে করেছো, করেছো, তোমার ইনকাম তেমন ভাল নয়. এখনই যেন সন্তান-সন্ততি না হয়। ছেলেপুলে না বলে শুদ্ধ ভাষা বললেন। পরমেশ্বরের এইটাই বৈশিষ্ট্য। রেগে গেলে বলেন, ব্লাডি বাগার। বঙ্কিমের শ্বশুরমশাই বিয়েটা খুব কম খরচেই সেরেছিলেন। একটি হাতঘড়ি, পাঞ্জাবি-ধুতি, একজোড়া জুতো, কয়েক ভরি সোনা, হাজার খানেক টাকা নগদ। একটা বিছানা। খাট দেননি। কারণ বংশের কোন এক জামাই খাটে বসে ফুলশয্যার রাতে হুঁকো খেতে গিয়ে পুড়ে মারা গিয়েছিলেন, সেই অপরাধে বঙ্কিমের বরাতে খাট জোটেনি। পরমেশ্বরই ছেলে-বউকে একটা কায়দার খাট কিনে দিয়েছিলেন। পরমেশ্বর ভেবেছিলেন, খাটের শাসনে প্রথম বিয়ের উচ্ছ্বাস ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। হয়েছিলও তাই। বউয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবে কি, সারা রাত শবাসনে শুয়ে থাকত। পাশ ফেরারও উপায় ছিল না। কিন্তু বয়সের এমন দোষ। বছর না ঘুরতেই বঙ্কিম ফাদার হতে চলেছে। এই সেই রাত। ফাদারের সামনে টুলে বসে আছে অপরাধীর মত মুখ করে। বউ নার্সিং হোমে। খবর আসবে শ্যালকের

সাইকেলে। রাত সাড়ে দশটা হয়ে গেল। এখনও কোন খবর নেই।

তৃতীয় অপরাধ বঙ্কিমের নয়, বঙ্কিমের বউয়ের। দশটার মধ্যে পরমেশ্বর শুয়ে পড়েন। পরমেশ্বরের নিয়মের রাজত্ব আর এক পরমেশ্বরের চেয়ে কম যায় না। তাঁর নিয়মের ঠেলায় স্ত্রী অনেক আগেই চলে গেছেন। বঙ্কিমের ওপর একটি বোন ছিল, সেও সরে পড়েছে। কেবল বঙ্কিমই আটকা পড়ে গেছে। তাকে খাওয়াদাওয়ার পরে ঘরের মধ্যে গুনে গুনে একশো বার পায়চারি করতে হবে। প্রথম রাতে বাঁ পাশে কাত হয়ে শুতে হবে মধ্যরাতে চিৎ। শেষ রাতে ডানপাশ। সকালে খালি পেটে এক গেলাস জল। চায়ে চুমুক দেবার সময় শব্দ হবে না, খেতে খেতে চক চক শব্দ করা চলবে না। জোরে হাসা চলবে না, হাসলেও দাঁত দেখা যাবে না। বউয়ের শাড়ির তলা থেকে সায়া বেরোবে না। চলার সময় পায়ের শব্দ শোনা যাবে না। গুন গুন করে গান চলবে না। সিনেমা, যাত্রা, থিয়েটার ঘন ঘন নয়, মাঝে-মধ্যে একটা। খাবার পর শব্দ করে ঢেকুর নট অ্যালাউড। সেই পরমেশ্বর আজ পৌনে এগারটার সময়েও শুতে যাননি, কারণ বঙ্কিম, কারণ বঙ্কিমের বউ। বঙ্কিমের বউ কেন এত দেরি করছে। কেন দশটার আগেই সে একটি প্রাণকে পৃথিবীতে আনতে পারছে না। বঙ্কিমের মনে হল প্রসবের দায়িত্বটা যদি তার হাতে থাকত তা হলে দশটার আগেই সে কাজটি সমাধা করে তার বাবাকে সন্তুষ্ট করার শেষ চেষ্টা করে দেখত। বঙ্কিমের মনে হল, পরমেশ্বর মনে মনে বলছেন—অপদার্থ।

পরমেশ্বর শুয়ে পড়ছেন না কেন? মনের দিক থেকে সময় সময় তিনি দুর্বল। যতই হোক পুত্রবধূ। যদিও বাক্যালাপ অনেক দিন বন্ধ। বউ হয়ে আসার সাত দিনের মাথাতেই শ্বশুর আর পুত্রবধূতে মুখ দেখাদেখি বন্ধ। পরমেশ্বর অবশ্য বিয়ের রাতেই তাঁর এক আত্মীয়কে বলেছিলেন—এইবার আমাকে একটু রাশ টানতে হবে একটু কড়া হতে হবে! তা না হলে ডিসিপ্লিন বজায় রাখা যাবে না। বঙ্কিম বিয়ের পিঁড়েতে বসে কথাটা শুনে ফেলেছিল। একে তার পৈতে হারিয়ে গেছে তার উপর বাবার সামনে বিয়ের আসনে বসার লজ্জা, সেই সময় তার বাবার ভবিষ্যত-চেহারা, সব মিলিয়ে এক মর্মান্তিক পরিস্থিতি। বঙ্কিম সেই ছেলেবেলা থেকেই বাবার ভয়ে কাতর বন্ধুরা বলত। বাবাতঙ্ক। এর কোন চিকিৎসা নেই।

বঙ্কিমের ধারণা অসহযোগ আর বয়কট পরমেশ্বরের হাত থেকেই মহাত্মা গান্ধীর হাতে গিয়েছিল। পরমেশ্বর তাঁর বিচিত্র সংসারে এই অস্ত্র দুটিকে শানিয়ে, এর ধার পরীক্ষা করে বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য গান্ধীজীর হাতে যেন তুলে দিয়েছিলেন। মারধোর নয়, রাগারাগি নয়, মুখের উপর একটা

ভয়ঙ্কর গাম্ভীর্যের মুখোশ টেনে সংসারের সমস্ত মানুষকে তটস্থ করে একেবারে মৌনী হয়ে গুমোট আকাশের মত দিনের পর দিন বসে থাক। বুঝিয়ে দাও পরমেশ্বর অখুশী। এই সময় অপরাধীর মুখোমুখি হলেই একটা অদ্ভুত নাচের ভঙ্গী করে পরমেশ্বর একপাশে সরে যেতেন। পচা মৃতদেহ কিংবা সকালে মেথরের মাথায় বিষ্ঠা দেখলে মানুষের যে প্রতিক্রিয়া হয় সেই রকম একটা ভাব করে তিনি ঘৃণার মাত্রাটা অপরাধীকে বুঝিয়ে দিতেন। বঙ্কিমের বরাতে এই ধরনের ব্যবহার যে কতবার জুটেছে! শেষ জুটেছে বিয়ের ঠিক আগে।

বঙ্কিম ঠিক প্রেম বা বিয়ে কোনটার জন্যেই প্রস্তুত ছিল না। বঙ্কিমের মা মারা যাবার পর পরমেশ্বরই তার জীবনশিল্পী হতে চেয়েছিলেন। যখন যে ভাবটা পেয়ে বসত সেইভাবেই বঙ্কিমকে চালাতে চাইতেন। নিজে ছিলেন বৃটিশ আমলের সরকারী অফিসার। ইংরেজ বলতে অজ্ঞান। কথায় কথায় বলতেন—সাহেবের জাত, ওরা সব দেবতা। আবার চৈতন্যচরিতামৃত পড়তেন, বিবেকানন্দ পড়ে আবৃত্তি করতেন, ঊর্ধ্বরেতা হবার ব্যাপারটা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। আবার স্যার সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতার কথা প্রায়ই বলতেন। বঙ্কিমের ভবিষ্যৎ জীবনের রূপকার হতে চেয়েছিলেন পরমেশ্বর, অথচ সেই ভবিষ্যত সম্পর্কে তাঁর কোন সম্যক ধারণা ছিল না। আকাশে মেঘ আর রোদের খেলার মত বড় বড় জীবন আর ভাবের প্রভাবে তিনি অনবরতই পেন্ডুলামের মত দুলতেন। ছেলের নাম রেখেছিলেন বঙ্কিম কারণ যে পূর্ণিমার বিকেলে তাদের পুরোনো বাড়ির স্যাঁতসেঁতে আঁতুড়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, সেই বিকেলে পরমেশ্বর বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ পড়ছিলেন। আর বঙ্কিমের মত এক মহাপুরুষের জন্ম দিয়ে তার ক্ষীণজীবী মা যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন এবং সেই বিকেলেই সূতিকার জীবাণু জন্মনাড়িতে জড়িয়ে নিয়ে মহাপুরুষের তিন বছর বয়সেই পরমেশ্বরের মত ডাকসাইটে পিতার হাতে ছেলেকে জিম্মা করে দিয়ে সরে পড়েছিলেন। পরমেশ্বর বঙ্কিমের বিয়ের কয়েক বছর আগে ছেলেকে এক মহান ত্যাগী সন্ন্যাসীর চেহারায় দেখতে চেয়েছিলেন। বঙ্কিম কিন্তু তখন অন্য এক্সপেরিমেণ্টে ব্যস্ত। সে তখন নিজেকে জিতেন্দ্রিয় অবতার ভাবতে শুরু করেছিল। ছেলেদের সঙ্গে যেভাবে সহজে মেশা চলে সেইভাবে মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার পরীক্ষা চালাচ্ছিল। সবে অধ্যাত্ম রামায়ণ পড়ে মনে মনে আওড়াতে শুরু করেছে—স্ত্রীয়া সমস্ত সকলা জগৎসু। মেয়েরা সব মায়ের মত। 'মানুষ' বলে প্রচণ্ড একটা দার্শনিক প্রবন্ধ লিখে কোন এক ধর্ম পত্রিকার সন্ন্যাসী সম্পাদককে তাক লাগিয়ে দিয়েছে।

এই পরীক্ষার মুখে বঙ্কিমের পিতৃবন্ধু সপরিবারে বিদেশ থেকে ফিরে এলেন। বঙ্কিম যখন খুব ছোট সেই সময় তাঁরা চাকরির খাতিরে বাইরে চলে গিয়েছিলেন। ছেলেবেলায় বঙ্কিম তার পিতৃবন্ধুর মেয়ের সঙ্গে খেলা করত। সেই সময়কার তোলা একটা গ্রুপ ফটোতে দুটি পরিবারকেই দেখা যায়, বঙ্কিম একেবারে সামনের সারিতে বসে বসে আঙুল চুষছে আর পিছনের চেয়ারে বসে আছেন বঙ্কিমের শাশুড়ী, কোলের কাছে দাঁড়িয়ে আছে তার বউ একটা চোখ একটু বোজানো, জিভটা বেরিয়ে আছে সামনে, বোধ হয় ক্যামেরম্যানকে ভেঙচি কাটছিল। দীর্ঘ পনের বছর পরে বাল্যসঙ্গীর সঙ্গে যখন দেখা হল, তখন সে বড়-সড় একেবারে জেন্টল লেডি। বঙ্কিম হল বঙ্কিমদা, বঙ্কিমের বাবা--কাকাবাবু। দীর্ঘকাল বাইরে থাকার ফলে জড়তা ঝরে গেছে। সালোয়ার কামিজ পরে। সাইকেল চালায়। বাংলার মধ্যে হিন্দির মিশেল ঃ যেমন টক নয় খাট্টা, মিহি নয় পিনো, ভাল নয় বড়িয়া, মাসি নয় মৌসি, বিড়াল নয় বিল্লি। বঙ্কিমও তখন সেই ছেলেবেলার আঙুল চোষা বাঁদর নয়, বেশ চোখা যুবক, একমাথা ঘন কালো কোঁচকানো চুল, ঘাড়ের কাছে ঢেউ ভাঙা, চোখ দুটো ভাসা ভাসা বড়ই ছিল, ত্রাটক সাধনার ফলে সেই চোখের দৃষ্টি তখন আরো তীক্ষ্ণ, ডিমে তা দেবার সময় পাখির চোখের দৃষ্টির মতো উদাস ফ্যালফেলে, তার উপর সোনালী ফ্রেমের শিল্পী চশমা, নাকটা বেশ খাড়া। ভদ্রমহিলা এই বাঙালী যুবকটির তীক্ষ্ণ চেহারায় যেন প্রথম থেকেই একটু মজে গেলেন। বঙ্কিমের কিন্তু অন্য ব্যাপার, তার তখন নতুন এক্সপেরিমেন্ট চলেছে। ইন্দ্রিয়কে যে জয় করে ফেলেছে তার কাছে ছেলে আর মেয়ের তফাৎ কোথায়।

আর ঠিক সেই সময় পরমেশ্বর একটা নাটক করার অদ্ভুত সুযোগ পেয়ে গেলেন। আবার সেই বয়কট। বঙ্কিম বসে বসে বই পড়ছিল। বিকেলটা বই পড়েই কেটে যেত ; কিন্তু সেই নিয়তি। কখন কার জানালার গরাদ ধরে হেসে ওঠেন বলতে পারে না। পরমেশ্বর কদিন ধরেই একটু গুমোট ছিলেন। ব্যাপারটা ঠিক কি বোঝা যাচ্ছিল না। মনের এইরকম একটা গুমোট অবস্থায় পরমেশ্বর সকাল বিকেল গঙ্গার ধারে বেড়াতে চলে যান। বাড়িতে যতক্ষণ থাকেন দুমদাম করে গোড়ালির উপর ভর দিয়ে হাঁটেন। মার্কিনের লুঙ্গি বুকের উপর তুলে বাঁধেন। আর মাঝে মাঝে বিকট গলায় তারা তারা বলে চিৎকার করেন। সেই চিৎকারে রাস্তার ছাড়া-কুকুর চমকে উঠে জানালার দিকে মুখ তুলে এক ভলক ঘেউ ঘেউ শব্দ ছাড়ে। পরমেশ্বর যথারীতি বেরিয়ে গিয়েছিলেন। বঙ্কিম পড়ছিল, এমন সময় বঙ্কিমের বউ এসে হাজির। পড়া ভণ্ডুল হয়ে গেল। বঙ্কিমদার সঙ্গে বেড়াতে যাবে। দূরে কোথাও নয়, গঙ্গার

ধারে। আহা কি সুন্দর চাঁদ উঠেছে!

বঙ্কিম বুক ফুলিয়ে বেরিয়ে পড়ল। গঙ্গার ধারে দুজনে হাত ধরাধরি করে চলেছে, হঠাৎ উল্টো দিক থেকে পরমেশ্বর এসে পড়লেন। বঙ্কিম ডেস-পারেট। ছেলে আর মেয়েতে তার কাছে তখন কোন তফাৎ নেই। হাতে হাত ধরাই রইল। পরমেশ্বর তির্যক দৃষ্টিতে একবার তাকিয়েই গম্ভীর মুখে রাস্তার একপাশ দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আর সেই রাতেই তাঁর মনের আকাশ পুরোপুরি মেঘে ঢেকে গেল। মাঝে মাঝে তারা তারা গর্জন। বঙ্কিমকে দেখলেই সেই নাচের ভঙ্গী করে সরে যাওয়া। ডেলিকেট ফুট ওয়ার্ক। নিজের বোনকে ডেকে বললেন, বলে দে, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বংশের মুখে চুনকালি মাখাতে হবে না। যা করার বিয়ের পর করুক। মোস্ট আনবিকামিং অফ আওয়ার ফ্যামিলি, ছি ছি ছি ছি, তারা তারা। পরমেশ্বরের বিধবা বোন, বিধবা হবার পর থেকেই পরমেশ্বরের সংসার দেখাশুনা করেন। ভদ্রমহিলা পরমেশ্বরের মেজাজ বোঝেন। পরমেশ্বর জল নিচু বললে তিনি নিচু বলেন, উঁচু বললে উঁচু। আনবিকামিং শব্দটা কীভাবে তাঁর কানে গেল কে জানে। তিনি বললেন, ডেকে আনবো ছোড়দা? পরমেশ্বর খেপে গেলেন—ডেকে আনবি, কাকে ডাকবি? ভগবানকে ডাক। সব ভেসে গেল। পরমেশ্বরের সারা জীবনটাই গেল গেল। সমাজ গেল, সংসার গেল, ধর্ম গেল, কর্ম গেল। আসলে কিছুই যায়নি। যাবার মধ্যে তাঁর পরিবারের সকলে একে একে পরপারে চলে গেছেন। আর গেছে তাঁর মাথার চুল। ঘাড়ের কাছে চামরের মত এক থুপপি অবশিষ্ট আছে। পরমেশ্বর বললেন—পাঁজি আছে? আমি কালই বিয়ে দেব। ওই ভলাপচুয়াস মহিলার সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় খেলে বেড়ানো! বোন বললেন—ভোলা পালটাবে কেন, ওতো এখন শাড়িই পড়ছে ছোড়দা। পরমেশ্বর বললেন, গেটআউট। আসলে ভদ্রমহিলা ইংরেজী বোঝেন না। আর কথায় কথায় ঘুমিয়ে পড়েন। একদিন ভাতের হাঁড়ি থেকে ভাত সেদ্ধ হয়েছে কিনা দেখার জন্যে হাতা ঢুকিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, জেগেছিলেন ভাত পুড়ে চড়চড়ে হয়ে যাবার পর। আর একদিন একতলা থেকে দোতলায় ওঠার সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, তারপর ঘুমন্ত অবস্থায় তিনতলার নেড়া ছাদ থেকে পড়তে পড়তে রক্ষা পেয়েছিলেন। পরমেশ্বরের গেট আউটে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল, বললেন চা করে আনব? এই সব উত্তেজনার মুহূর্তে পরমেশ্বর ঘন ঘন চা খেয়ে নার্ভ শক্ত রাখেন। পরমেশ্বর একটু নরম গলায় বললেন—একটু কড়া করে। পরমেশ্বরের ছায়ার মত এই বোন। বোন না থাকলে তাঁর এক মুহূর্তও চলে না।

বঙ্কিমের কানে যথাসময়ে কথাটা গেল। আর তখনই জেদের বশে সন্ন্যাসী

বঙ্কিম প্রেমিক বঙ্কিম হয়ে গেল। বিয়ের কথা সে কোনদিন ভাবেনি। সন্ন্যাসী হবারই তোড়জোড় করছিল। পরমেশ্বরের কেরামতির ফলে গেরুয়া ছেড়ে সিল্কের পাঞ্জাবি পরে বিয়ের পিঁড়িতে বসে পড়ল। পরমেশ্বরের তখনও অসহযোগ চলছে। সবই করেছেন কিন্তু মুখ কালো। অন্য সময় হলে বঙ্কিম ভিরমি যেত। নিলডাউন হয়ে ক্ষমা চাইত। নেহাত নববলে বলীয়ান বলে বঙ্কিম খাড়া ছিল। অনেকটা নেশার ঘোরেই পিঁড়িতে বসেছিল। বঙ্কিম তখনও জানত না তার বরাতে কি আছে। পরমেশ্বর বঙ্কিমকে লটকে দিয়ে খাঁচার পোরা পাখি করে আস্তে আস্তে তার অবাধ্যতার প্রতিশোধ নেবার প্ল্যান করেছিলেন। বিয়ের পর পরমেশ্বর টেরিবল পরমেশ্বর হয়ে ছেলে-বউয়ের জীবনে নেমে এলেন। অসহযোগই তাঁর অস্ত্র।

বউভাতের দিন ঘোষণা করলেন, এটা কামজ বিবাহ। পরমেশ্বর গেঞ্জি গায়ে বেঞ্চিতে বসে বোনকে কথাটা বলেছিলেন, বোন দৌড়ে গিয়ে একটা কামিজ এনে দিলেন। পরমেশ্বর কিছুক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে জামাটা পরে ফেললেন। বেয়াই হলেও বাল্যবন্ধু, কিন্তু তাঁর সঙ্গে এমন ব্যবহার করলেন, ভদ্রলোক খুব ঘাবড়ে গিয়ে মেয়েকে কানে কানে বললেন, সাবধানে থাকিস, শত্রুপুরী। মেয়ে মুচকি হাসল। সে জানত দুর্গে যখন একবার ঢুকেছে তখন শত্রুপক্ষকে ছারখার করা শক্ত হবে না। বঙ্কিম বেচারা হাতে দুর্বো ঘাস বাঁধা ছাগলের মত ঘুরছে। পরমেশ্বর শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, যেসব পুরুষের ব্যক্তিত্ব নেই, ম্যাদামারা, তাদের বরাতে অনেক দুঃখ। আসলে পরমেশ্বর বঙ্কিমের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে পুত্রবধূকে একটু জব্দ করতে চেয়েছিলেন। অত সহজে বুকের ধন কেড়ে নিয়ে সুখে থাকবে তা হচ্ছে না। বঙ্কিম হামারা, তুমহারা নেই।

তিন দিনের দিন পরমেশ্বর আবিষ্কার করলেন, পুত্রবধূর শাড়ির তলা দিয়ে সায়ার লেস বেরিয়ে আছে। বোনের হাত দিয়ে একটা কাঁচি পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, কেটে ছোট করতে বল। পুত্রবধূ কাঁচিটা সেলাইয়ের বাকসের মধ্যে পুরে রাখল, সায়ার লেস শাড়ির নীচে আরো এক ইঞ্চি বেশী ঝুলল। চতুর্থ দিনে পরমেশ্বরের মাথায় বঙ্কিমের বউয়ের ভিজে শাড়ির জল এক ফোঁটা পড়ল। পরমেশ্বর চান করে উঠোন দিয়ে আসছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আবার গঙ্গায় ফিরে গেলেন। ফিরে এসে আবার শাড়ির তলায় দাঁড়ালেন যদি আবার এক ফোঁটা পড়ে তাহলে আবার দুমদুম করে গঙ্গায় যাবেন। শাড়ি তখন শুকিয়ে এসেছে, দ্বিতীয় ফোঁটা না পড়ায় হতাশ হলেন। ওপরে উঠে এসে বোনকে বললেন—ব্রহ্মতালুতে একনাদা গোবর ঘুঁটে করে লাগিয়ে দে, যা জীবনে

হয়নি তাই হলো, মেয়েদের শাড়ির জল মাথায় পড়ল, আমার পরমায়ু কমল।

বঙ্কিম স্ত্রীকে বলল—ছি ছি শাড়ি একটু নিংড়ে দিতে পার না। বউ বলল, কাকাবাবুর কি দরকার ছিল কাপড়ের তলা দিয়ে যাবার। পঞ্চম দিনে বউ মাঝরাতে খিলখিল করে খাট দুলিয়ে হেসে উঠল, পরমেশ্বর সারা রাত দুমদুম করে ছাদে পায়চারি করলেন আর মাঝে মাঝে বুক কাঁপানো জয় মা, জয় মা ডাক ছেড়ে বুঝিয়ে দিলেন তিনি উত্তেজিত।

ষষ্ঠ দিনে বঙ্কিমের বউ সন্ধ্যেবেলা পরমেশ্বরের আহ্নিকের সময় রেডিওতে হিন্দি গানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজের ঘরে টুইস্ট নাচের অভ্যাসটা আর একবার ঝালিয়ে নিল। পরমেশ্বরের আহ্নিক মাথায় উঠল। নিজের ভাঙা ক্যাশবাকস খুলে একটা পোস্টকার্ড বের করে সঙ্গে সঙ্গে বহু দিনের ভুলে যাওয়া এক নিঃসঙ্গ আত্মীয়াকে বর্ধমানে চিঠি লিখতে বসলেন: কল্যাণীয়াসু, জীবনের বাকী কটা দিন তোর আটচালাতেই কাটাতে চাই। একটা গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগে সেই রাতেই নিজের সব জিনিস প্যাক করে ফেললেন। সমস্যা হল দাড়ি কামাবার সেটটা নিয়ে। ৩১ সালে সেটটা কিনেছিলেন হোয়াইটওয়ে লেডল থেকে। প্রথমে নিজেই কামাতেন। ৫৬ সালে বঙ্কিমের দাড়ি গজাবার পর সেও এই সেটে কামাত। বাড়িতে আর দ্বিতীয় কোন আয়োজন নেই। সেটটা ব্যাগে ভরে ফেললে সকালে বঙ্কিমের বিপদ হবে। কিন্তু রক্ত তখন তাঁর ফুটছে। এইরকম মানসিক অবস্থায় তিনি শঙ্করাচার্যের মোহমুদ্গর আওড়ান—কা তব কান্তা কস্তে পুত্র। সেটটা ব্যাগে ভরে ফেললেন। বঙ্কিমের দাড়ি বঙ্কিম বুঝবে। বঙ্কিমের বউ বুঝবে। বঙ্কিমের জন্য অনেক করেছেন। কলেজে ঢোকবার আগে পর্যন্ত নিজে হাতে কপচে কপচে চুল কেটে দিয়েছেন। চুলকাটার অবশ্য আর একটা গোপন কারণ ছিল। বঙ্কিমকে যতদিন পর্যন্ত পারা যায় সেলুনে যাওয়া থেকে আটকে রাখা। প্রথমত পয়সা বাঁচবে, দ্বিতীয় নিজের খুশি মত ছোট বড় চুল ছেঁটে ঘাড়ের শাঁস বের করে চোখের সামনে নবকার্তিক হয়ে ঘুরবে না। সব রেডি করে পরমেশ্বর এস্রাজ নিয়ে বসলেন। এইরকম মারাত্মক দিনে তিনি একটি গানই বাজান—পর কি কখন হয় রে আপন, যতন করিলে পরই রয়।

বঙ্কিম এই সুরের সঙ্গে পরিচিত। সাপ যেমন সাপুড়ের বাঁশির সুর চেনে। বঙ্কিম বউকে জিজ্ঞাসা করল, আজ কি খেল দেখিয়েছ? বউ বলল, ধেই ধেই করে নেচেছি! বঙ্কিম খুব অবাক হয়ে গেল—নেচেছ? তার মানে? তার মানে নেচেছি। কোথায় নেচেছ? বঙ্কিম এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল, নার্ভাস হয়ে বসে

পড়ল ! বউ বলল, আজ অবশ্য এই ঘরেই নেচেছি, কাল ভাবছি দালানে নাচব। বঙ্কিম উঠে দাঁড়াল, কে তোমাকে নাচতে বলেছিল? নতুন বউ মাথা নাড়ল, কেউ বলেনি, সবাই এ বাড়ির নাচছে, আমিও নাচলুম। বঙ্কিম অবাক হল—সবাই নাচছে? বউ বলল, তোমার বাবা তো তাথৈ তাথৈ করে নাচছে। আমার সঙ্গে কোন সময় মুখোমুখি হলে একেবারে ঝম্প নৃত্য। বঙ্কিম চিৎকার করে উঠল—শাট আপ।

বঙ্কিমের চিৎকার পরমেশ্বরের কানে গেল—জয় মা, পোরুষ জাগছে, শের-কা বাচ্চা। পরমেশ্বর তখন তক্তাপোশের উপর দুম দুম করে পায়ের তাল ঠুকে ঠুকে এস্রাজ জোরে জোরে বাজালেন, 'আপনার জন সতত আপন।' বঙ্কিম রেগেমেগে বেরিয়ে গেল। বঙ্কিমেরও রাগ হলে গঙ্গার ধারের বাঁধা বটতলাই গতি। চাঁদ উঠেছিল, হাতের আংটির জ্বলজ্বলে পাথরটার দিকে চোখ পড়ল। আংটিটা বিয়ের আগে তার বউ আদর করে হাতে পরিয়ে দিয়ে বঙ্কিমের সন্ন্যাসী হৃদয়ে প্রেমের তুফান তুলেছিল। বঙ্কিম সেদিন বউয়ের বুকে হাত দিয়ে চুমু খেয়ে চরিত্র নষ্ট করেছিল।

বাবা বলতেন, বিবেকানন্দের মত চোখ চাই। বঙ্কিম ড্যাব ড্যাব করে আরশির দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে নিজের চোখে সেই চোখ খুঁজত। আঙটির দিকে তাকিয়ে বঙ্কিমের রাগ জল হয়ে গেল। দাঁতে দাঁত চেপে বলল—টর্চার চেম্বার। ভদ্রলোক সারাটা জীবন কেবল অশান্তি করে গেলেন, অশান্তি ইজ হিজ লাইফ ব্রিদ।

পরমেশ্বরের অবশ্য বর্ধমান যাওয়া হল না। সারা রাত তিনি ব্যাপারটা ভাবলেন। বর্ধমানের সেই দুঃস্থা আত্মীয়ার বাড়ীতে ভাল বাথরুম নেই, তাছাড়া জীবনে যার খোঁজখবর কখনও করেননি সেখানে হঠাৎ যাওয়াটা কি ঠিক হবে! পরমেশ্বর এই প্রথম প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়েছেন। তিনি ভাবতেও পারেন না সেদিনের মেয়ে, যার অন্নপ্রাশনে কাঁসার থালা দিয়ে পাত পেড়ে খেয়েছিলেন, সেই মেয়ে কিনা তাঁকে কাবু করে দিলে। পরমেশ্বর পাশ ফিরে শুলেন। পরমেশ্বরের গৃহত্যাগ করা হল না। সকালে ব্যাগ থেকে শেভিংসেট বের করে আলমারির মাথায় যথাস্থানে রেখে দিলেন। তারপর উদাস চোখে কিছুক্ষণ চেয়ারে বসে রইলেন। বয়স যত বাড়ছে চোখের দৃষ্টিটাও যেন কেমন ঘোলাটে হয়ে আসছে। চোখের দিকে তাকালে বোঝা যায় জীবনীশক্তি কমে আসছে। পরমেশ্বরের চোখের দিকে তাকালে মানুষটার জন্যে বঙ্কিমের বুকটা কেমন করে ওঠে। সংসারে অ্যাডজাস্ট করতে পারলেন না বলে সারা জীবনই নিঃসঙ্গ। আত্মীয়স্বজন থেকে দূরে। বন্ধুবান্ধব নেই। কিছু আশ্রিতের উপর লাঠি

ঘুরিয়ে আর প্রভুত্ব করেই জীবনটাকে পাথর বানালেন। চূর্ণ চূর্ণ হয়ে বালি হতে পারলে হয়ত কিছু পদচিহ্ন থেকে যেত। বঙ্কিম জানে এক সময় সে এই মানুষটির হৃদয়ের অনেকখানি জুড়ে ছিল। এখন পরের মেয়ে এসে তার অধিকার কায়েম করছে। সেই ঝাপসা ভোরে পরমেশ্বর তাঁর ঘরেই বসে দেয়ালে ঝোলানো স্ত্রীর অস্পষ্ট ছবির দিকে তাকিয়ে রইলেন। সেই ছবি থেকে যেন তাঁর বিবেকের কণ্ঠ শুনতে পেলেন—তুমি অবহেলা করেছ, অত্যাচার করেছ, আমি এখন অনেক দূরে, আমার কোন দোষ নেই, আমি সংসার চেয়েছি, তুমি সংসার ভেঙেছ।

বঙ্কিম বোধহয় একটু ঝিমিয়ে পড়েছিল। ঘড়ির শব্দে চমকে উঠল। রাত এগারটা। ফাঁকা রাস্তা দিয়ে খড় খড় করে কয়েকটা কুকুর দৌড়ে গেল। পরমেশ্বর মশারির ভিতর পা গুটিয়ে ধ্যানাসনে বসে বললেন—আর বসে থেকে কি করবি, যা শুয়ে পড়, ও আজও হতে পারে কালও হতে পারে। যাবার সময় আলোটা নিবিয়ে দিয়ে যাস।

বঙ্কিম আলোটা নেবাতে গিয়ে একটু শক খেল। এটাও এ বাড়ির বৈশিষ্ট্য। সবই ডিফেক্টিভ। মানুষ থেকে শুরু করে ফিটিংস, আসবাবপত্র এমনকি উটকো বেড়ালটা পর্যন্ত। বঙ্কিমের ঘুম চটকে গেছে। রাস্তার দিকে বারান্দায় বেরিয়ে পরমেশ্বরের ঘরের বাইরে দরজার পাশে হাঁটুর উপর মাথা গুঁজে পিসিমাকে ঘুমোতে দেখল। বঙ্কিমের বড় মায়া হল। পরমেশ্বর রোজ শুতে যাবার পর এই ক্লান্ত পিসিমাকে পরমেশ্বরের কোমর আর পা টিপতে হয় যতক্ষণ না পরমেশ্বরের ঘুম আসে। ভদ্রলোকের সায়েটিকা আছে। টিপে না দিলে যন্ত্রণায় সারারাত ছটফট করেন। বঙ্কিম আঙুল দিয়ে পিসিমাকে একবার খোঁচা দিল। ভদ্রমহিলা চমকে উঠেই জিজ্ঞেস করলেন, ছেলে না মেয়ে। বঙ্কিম বলল কোন খবর আসেনি। আজ যেন বঙ্কিম'স ডে। সারা বাড়িকে তার কেরামতিতে একেবারে অ্যাটেনশনের ভঙ্গীতে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। শ্যালক এসে স্ট্যান্ড অ্যাট ইজ করাবে। রেলিংয়ে ভর দিয়ে দু' বাহু প্রসারিত পিচের রাস্তার দিকে তাকিয়ে বঙ্কিম মনে মনে বলল, শালা আসছে না কেন।

বঙ্কিমের লজ্জা লজ্জা ভাবটা এতক্ষণে একটু কমে এসেছে। বাবা হবে বেশ করবে, সব বিবাহিত লোকই বাবা হয়। পরমেশ্বরও হয়েছিলেন, সো হোয়াট। কি মুখখুমিই না সে করেছিল। যেদিন তার বউ এসে কথাটা বললে, সেদিন বঙ্কিমের মনে হয়েছিল সেই বুঝি অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে। বাবা—বলে এমন একটা করুণ আর্তনাদ করেছিল। বউ বলেছিল, আমার ব্যাপার আমি বুঝবো। বঙ্কিম শোনেনি, সন্ধ্যাবেলা বউকে বেপাড়ার ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল, যদি রক্ষা

পাবার কোন রাস্তা বেরোয়। ডাক্তারবাবু একটু অবাক হয়ে বলেছিলেন, পাগল হয়েছেন, ফার্স্ট ইস্যু মশাই, সেলিব্রেট করুন। বঙ্কিম ফি গুণে দিয়ে বউকে নিয়ে গুটি গুটি বেরিয়ে এসে এক হোমিওব চেম্বারে ঢুকেছিল। ভদ্রলোক একটু বদমেজাজী। পরীক্ষা-টরীক্ষা কবে বলেছিলেন, বেড়ে হয়েছে। বঙ্কিম তাঁকে কিছুতেই বোঝাতে পারে না, বেড়ে হলে চলবে না, বাবা মেবে ফেলবেন। বৃদ্ধ ডাক্তাব রেগে গিয়ে বলেছিলেন—বিয়ে করা বউ তো, নাকি কুমারী, পরস্ত্রী? বঙ্কিম একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল। বৃদ্ধ বলেছিলেন, অতই যদি ভয় বাবা একটা বাঁজা মেয়েছেলেব দাব পবিগ্রহ করলেই পারতে। যাও যাও বযস আছে বছবে বছবে হোক। ওসব শ্লোগান-টোগানে কান দিও না। বাবাব গলায় নাতিনাতনীব মালা ঝুলিযে দাও, বুড়ো দেখবে সংসাবে মজে গেছে। বঙ্কিম শেযে অসহাযের মত বলেছিল আমাব কি হবে? কি আর হবে? দুধের টিন বগলে বাড়ি আসবে, বাঙা মশারি, অযেল ক্লথ সুতো কাঁথা ভবপুব সংসাব জীবন বাবাজী। বঙ্কিমের বরাতে বাবা হওযা ঝুলছে কে খণ্ডাবে। না অ্যালোপ্যাথি, না হোমিওপ্যাথি।

এখন বঙ্কিম ভাবে, কি ছেলেমানুষীই সে করেছিল। নিজের সন্তানকে হত্যা কবতে চেয়েছিল। এত রাত পর্যন্ত পবমেশ্বরের ঘরে থাকার কারণ বঙ্কিম জানে। বঙ্কিমের পিসিমা স্বপ্ন দেখেছেন, বঙ্কিমের দাদু ছেলে হয়ে ফিরে আসছেন। সেই ছ' ফুট লম্বা বিশাল চেহারার দাদু। যিনি একটা পুরো কাঁঠালের রস পাঁচপো দুধের ক্ষীরের সঙ্গে মেড়ে খেতেন। যিনি একবার একটা কাবুলীকে ল্যাং মেরে ফেলে দিয়েছিলেন। শেষে জীবনটা বঙ্কিমের বাড়িতেই কাটিযে গেছেন, কারণ সংসারে তিনিও বিশেষ সুবিধে করতে পারেননি। পরমেশ্বরের ঘরে ভাঙা তানপুরায় রাম দত্তের গান গাইতেন তারস্বরে। আমার দিন যে আগত দেখি জগত জননী। গানে সুর ছিল না, ভাব ছিল। চোখে জলের ধারা নামত। পরমেশ্বরেরও অল্প বয়সে স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন, দাদুরও তাই। মাইলখানেক দূর থেকে সেই গান শোনা যেত। লোকে বলত, একটু পা চালিয়ে যাও বঙ্কিম, বাড়িতে আগুন লেগেছে, ফায়ার ব্রিগেড ডাকতে হতে পারে। সেই দাদু ফিরে আসছেন, ছোট্ট এতটুকু হয়ে। ভাবা যায় না। যাঁর এতখানি ভুঁড়ি ছিল। স্নানের সময় নাভিতেই পোয়াখানেক তেল খেত। মৃত্যুর পরে দাদুর কাঠের সিন্দুক থেকে সেরখানেক সিদ্ধি আর একটা খুলি বেরিয়েছিল। মাঝরাতে তন্ত্রসাধনা করতেন। বঙ্কিমের বউয়ের গর্ভে সেই যোগভ্রষ্ট তান্ত্রিক আবার ফিরে আসছেন।

মধ্যরাতের সেই নির্জন রাস্তায় ল্যাম্পপোস্টের আলোতে একটা সাইকেলের

হ্যান্ডেল চকচক করে উঠল। চলার কাঁপুনিতে বেলটা ঝিন ঝিন করছে। ওই আসছে বঙ্কিমের শ্যালক। অনেকটা ফিল্মের হিরোর মত চেহারা। বঙ্কিম একটা চাপা উত্তেজনা নিয়ে পরমেশ্বরের ঘরে ঢুকল। অন্ধকার ঘরে ঝলমলে মশারির মধ্যে ঝাপসা পরমেশ্বর তখনও ধ্যানাসনে খাড়া বসে। এত বয়সেও পরমেশ্বরের মেরুদণ্ড এতটুকু দোমড়ায়নি। সংসারে যিনি এত স্পষ্ট ছিলেন এখন কি অস্পষ্ট! অথচ কি ভীষণ ঋজু সৈনিকের মত। বঙ্কিম বলল—আসছে। পরমেশ্বর প্রথমে কোন জবাব দিলেন না, তারপর বললেন. আলোটা জ্বাল। আলো জ্বালতে জ্বালতেই বঙ্কিমের শ্যালকের প্রবেশ। বঙ্কিমের চেয়ে বয়সে বছর খানেক বড়। বঙ্কিমের ছেলেবেলার খেলার সাথী।

পরমেশ্বর মশারির বাইরে এলেন. কি খবর ?

ছেলে হয়েছে. সাত পাউন্ড ওজন।

নাভিটা দেখেছ ? পরমেশ্বরের প্রশ্নে শ্যালক অবাক। লাল মত ছেলেটাকে সে নার্সের কোলে এক ঝলক দেখেছে। নাভিটা তো দেখা হয়নি। আর দেখবেই বা কি করে! সে জায়গাটা তো ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। অথচ পরমেশ্বর সেই রাতেই লক্ষণ মিলিয়ে নিতে চাইছেন। বঙ্কিমের দাদুর নাভির একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। অনেকটা পদ্মফুলের মত।

পরমেশ্বর প্রশ্ন করলেন, হাত-পাগুলো ঠিক আছে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, সব ঠিকঠাক আছে, যেখানে যেমনটি থাকার ঠিক সেইরকম আছে।

পরমেশ্বরের ধারণা ছিল, বোধ হয় ডিফেকটিভ মেশিন থেকে ডিফেকটিভ প্রোডাকশান বেরোবে।

টাইমটা অ্যাকুরেটলি নোট করেছো তো ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক দশটা পঞ্চান্ন।

সময় সম্পর্কে পরমেশ্বর সারা জীবনই সচেতন। বঙ্কিমের জন্মসময়ের ব্যাপারে ইদানীং তাঁর সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কোষ্ঠী বলছে সন্ন্যাসযোগ, অথচ সেই সন্ন্যাসী এখন ফাদার হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে।

পরমেশ্বরের পরের প্রশ্ন একটু দ্বিধা জড়ানো, ছেলের মা ? বউমা বলার চেষ্টা একবারই তিনি করেছিলেন, কিন্তু বউমার পরের খেলায় তিনি আর ঘৃণায় মা শব্দটা উচ্চারণ করেননি। ওটা জগৎ মাতাকেই উৎসর্গ করেছিলেন।

শ্যালক বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, বেশ ভাল আছে। প্রথমে তো গিয়েই ওয়ার্ডে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তারপর চেপে ধরে ডোলি—কথাটা আর শেষ করলেন না। পরমেশ্বরকে ভদ্রলোক ভয় পান। যে শব্দটা ব্যবহার করছেন সেটা শাস্ত্রসম্মত

কিনা বুঝতে পারলেন না. শুদ্ধ বাংলাটাও মনে এল না। ফলে কথাটা ঝুলিয়ে দিলেন।

পরমেশ্বর মুখটা এমন করলেন, যেন বঙ্কিমের বউ যে ধরনের মেয়ে তাতে ইচ্ছে করলে রাস্তায় চলতে চলতেই ডেলিভারি করে ফেলতে পারে।

পরমেশ্বর বললেন, ডাক তোর পিসিমাকে। পিসিমাকে ঘরের বাইরে থেকে খুঁচিয়ে তোলা হল।

কি. ছেলে না মেয়ে ?

ছেলে।

বলেছিলুম ছোড়দা।

পরমেশ্বর বললেন, ঠিক আছে, তুই বাজা। শাঁখ বাজা।

সেই সিঁদুর মাখা ফুটো শাঁখটা বেরোল। এই শাঁখ বাজিয়ে বঙ্কিমকেও পৃথিবীতে অভ্যর্থনা করা হয়েছিল, এক শীতের বিকেলে। শাঁখটার সবই ভাল, কেবল বাজাবার কৌশল এই পরিবারের দু-এক জনেরই জানা ছিল এবং সেই দক্ষ শিল্পীরা এখন সকলেই গতায়ু। পিসিমা গাল ফুলিয়ে কয়েকবার ফুঁ ফাঁ করলেন। পরমেশ্বর খুবই বিরক্ত, হিন্দুর মেয়ে শাঁখটাও বাজাতে পারিস না। ভায়ের সঙ্গে তর্ক করার সাহস নেই। শাঁখটা কেউই বাজাতে পারে না। বঙ্কিম ছেলেবেলায় মুখেই শাঁখ বাজাত আর ফুটো-শাঁখটা প্রথামত কারুর ঠোঁটের কাছে ধরা থাকত। বঙ্কিমের এখনও সেই টেকনিকটা লাগাবার ইচ্ছে হল; কিন্তু সাহস হল না। বঙ্কিমের ডাকাবুকো বউ অবশ্য এ সংসারে আসার পর একদিন চ্যালেঞ্জ করে শাঁখটা বাজিয়েছিল; কিন্তু তাকে এখন পাবে কোথায়। নিজের ছেলের জন্মের শাঁখ কোন মা কি বাজাতে পারে ?

পরমেশ্বর হাল ছেড়ে মশারির ভিতর ঢুকে যাচ্ছিলেন, আর তখনই মধ্যরাতের নিস্তব্ধ জনপদকে সচকিত করে, প্রায় শখানেক বছরের প্রাচীন একটি বাড়ির এলোমেলো প্রকোষ্ঠে কেঁপে কেঁপে তিনবার শাঁখ বেজে উঠল। পরমেশ্বর মশারির ভিতর ঢুকতে ঢুকতে মনে মনে বললেন, তোমার শাঁখ তুমিই বাজাও।

টাঙ্গি

শেখর বসু

শুকনো ঘাসপাতা আর গাছের ডালের স্তূপ থেকে আগুনের শিখাটা মাথার ওপরে লাফিয়ে উঠতেই ওরা চারজন হৈ-হৈ করে উঠল। আর নিববে না। এবার বসা যাক। বারান্দা থেকে চারটে চেয়ার টেনে এনে আগুনের চারপাশে গোল হয়ে বসে পড়ল ওরা।

মলি বলল, 'পাঁপরপোড়া খাবে?' বলেই ঘর থেকে পাঁপরের প্যাকেট নিয়ে এল। পাঁপর পোড়ানোর পরে চা হল। টি-পট্‌টা পাশের ছোট্ট টুলের ওপর রাখতে গিয়ে রূপা চেঁচিয়ে উঠল, 'টাঙ্গিটা এবার সরাও তো, দেখলে ভয় লাগে।'

টাঙ্গির কথা বিকেল থেকেই হচ্ছিল। বিকেল মানে সত্যেন যে মুহূর্তে বাঁ কাঁধে টাঙ্গি আর ডান হাতে দুটো মুর্গী ঝুলিয়ে বাংলোয় ফিরেছিল তখন থেকেই। ছ'মাইল দূরের আদিবাসীদের বাজারের সওদা। মুর্গী দারুণ শস্তা। তবে টাঙ্গি ওরা যাকে-তাকে বেচে না। সত্যেন কত করে বন্ধুত্ব পাতিয়ে কিনেছে।

টাঙ্গি মন্ত্রপড়া। কড়ি, সিঁদুর আর শিকড় দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে টাঙ্গির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তারপর সেই বুড়োটা টাঙ্গিতে ঠোঁট ছুঁইয়ে জিজ্ঞেস করেছে—তুমি এর কাছে যাবে? টাঙ্গি নাকি বলেছে—হ্যাঁ। বুড়োটা টাঙ্গির দিকে তাকিয়ে ঠিক-ঠিক বলে দিয়েছে, সত্যেনরা ক' ভাই ক' বোন; সত্যেন বড় চাকরি করে—এইসব। তবে কড়া নির্দেশ আছে যতবার চান করবে ততবার টাঙ্গিকেও করাবে। যতবার তেল মাখবে ততবার টাঙ্গিকেও মাখাবে। টাঙ্গি গৃহস্থের মঙ্গল করে, তবে—। আগুন ধরাতে সবাই এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে, 'তবে'র পরেরটুকু সত্যেনের আর বলা হয়নি।

সেই জের টেনে সত্যেন এখন বলল, 'আসল কথাটাই তোমাদের বলা

হয়নি।' কাপে ঠোঁট লাগিয়ে রেখেই ও চা শেষ করল। তারপর সিগারেট ধরিয়ে চুপ করে বসেই রইল। ঘাসপাতা জ্বলে গিয়ে কাঠে আগুন লেগে গিয়েছিল ভালভাবে। গনগনে আগুন। তিনটে লালচে মুখ সত্যেনের লালচে মুখের দিকে তাকিয়ে। আর্চ-করা গাছের সারি বাংলোর মুখে একটুখানি। চারদিকে শাল, কাঁঠাল, নিম, আম আর বুনো গাছের জঙ্গল। গ্রাম এখান থেকে কয়েক মাইল। আরো কয়েক মাইল দূরে পিচের সড়ক। কান পাতলে ট্রাকের শব্দ মাঝেমধ্যে শোনা যায়। গাছের মাথায়, মাটিতে চাঁদের আলো ফেটে পড়ছিল।

'কী কথা?' মলির গলাটা কেমন অস্বাভাবিক ঠেকল।

'টাঙ্গিকে প্রথম রাতে, মানে আজ রাতে রক্ত খাওয়াতে হবে, না হলে—'

'না হলে?'

'টাঙ্গি আমাদের ক্ষতি করবে।'

সত্যেনের কথাটা শেষ হতে না হতেই রঞ্জন হো-হো করে হেসে উঠল। রুপা হাসল, মলিও। কিন্তু হাসিটা কেমন যেন দপ্ করে নিবে গেল।

রঞ্জন বলল, 'কুসংস্কার।'

সত্যেন বলল, 'সেটা ঠিক, তবে বুড়োটা টাঙ্গি দেখে আমার সম্পর্কে অনেক কথা ঠিক-ঠিক বলে দিয়েছে।'

'আন্দাজে বলেছে, স্রেফ আন্দাজে। আমি তো হাত দেখতে জানি না, কিন্তু একজনের হাত দেখে অনেক কথা মিলিয়ে দিয়েছিলাম।'

'টাঙ্গিটা নাকি স্ত্রীলিঙ্গ!'

'ওহ্ সেইজন্যেই—'

মলির কথায় হেসে উঠল সবাই। এবার আর হাসিটা দপ্ করে নিবে গেল না। হাসতে হাসতে কেউ আয়েশ করে বসল, কেউ শুকনো পাতা কুড়িয়ে এনে আগুনে ঢেলে দিল। ওই আগুন থেকে সিগারেট ধরালো রঞ্জন। সপ্তর্ষিমণ্ডল আর কালপুরুষ চেনা নিয়ে তর্ক চলল খানিকটা। এইভাবেই চলছিল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে রঞ্জন হঠাৎ টাঙ্গিটা মাথার ওপর ঘুরিয়ে কী একটা যাত্রার পদ আওড়াতেই রুপা আহ্ বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। 'ওটা রাখো তো, তোমার বেশি-বেশি।'

রঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে ওটা টুলের ওপর রেখে দিয়ে বলল, 'তুমি বড্ড ভীতু।'

সত্যেন বলল, 'দাঁড়াও রক্ত খাইয়ে টাঙ্গিটাকে শান্ত করি।' বারান্দা থেকে হ্যারিকেন নিয়ে ও কোণের ওই রান্নাঘরে ঢুকল। তারপরেই চিৎকার—'আরে! মুর্গীদুটো কোথায় গেল?'

তাই নাকি। ইশ্! এ মা! বলতে বলতে বাকি সবাই রান্নাঘরের দিকে ছুটে গেল। রঞ্জন ছিল সবার শেষে। ওর পায়ে লেগে টুল উলটে টাঙ্গিটা মাটিতে পড়ে গেল ঝন-ঝন করে। ও টাঙ্গিটা তুলতে গিয়েও তুলল না। প্রায় দেড় বিঘত লম্বা ইস্পাতের ফলাটা ঝকঝক করতে লাগল চাঁদের আলোয়।

রান্নাঘরের আনাচে-কানাচে, মহুয়া গাছের নীচের জঙ্গলে অনেকক্ষণ ধরে খোঁজ করেও মুর্গীদুটোর কোনো হদিশ পাওয়া গেল না। বিরক্ত হয়ে এ তাকে, সে তাকে দুষল। রান্নাঘরের খিল কেন ভাঙা? পচা দড়ি দিয়ে মুর্গী বাঁধা হয়েছিল কেন? এমন ধরনের প্রশ্নও উঠল কয়েকটা। চৌকিদার ছুটি নিয়ে মেয়ের বাড়ি গেছে জেনেও সত্যেন গলা ফাটিয়ে চৌকিদার-চৌকিদার বলে চেঁচাল কয়েকবার। বাংলোর প্রকাণ্ড চৌহদ্দি, চতুর্দিকের নির্জন গাছপালা গমগম করে উঠল। পাশের কাঁঠালগাছে ডানা ঝাপটানোর ঝট্‌পট্‌ শব্দ উঠল। এতক্ষণ ঝিঁঝিঁর ডাক ছিল না, শুরু হল এইমাত্র।

মলি বলল, 'ভালই হয়েছে, রোজ-রোজ মুর্গী খেয়ে ঘেন্না ধরে গিয়েছিল। আজকের মেনু গরম ভাত, মাখন, আলু সেদ্ধ, পাঁপর ভাজা আর সবুজ কাঁচা লঙ্কা।'

রঞ্জন বলল; 'যাবে কোথায়? ব্যাটাদের কাল সকালেই ধরব।'

উনুন জ্বালানো ছিল, মলি চট করে ভাত চাপিয়ে দিয়ে এল। আবহাওয়া সহজ হয়ে গেল আবার।

কাঁঠালগাছের গুঁড়িটা শানবাঁধানো। সেখানে বসে একথা-সেকথা হতে না হতেই ভাত হয়ে গেল। পোর্সিলিনের বাসনে সুখাদ্যের প্রশংসা করতে না করতেই ভাত শেষ। গোগ্রাসে খেল সবাই। দারুণ হয়েছে। বেশ খিদে পেয়েছিল। জলহাওয়ার গুণ। ঢেকুর তুলল সবাই। শব্দ করে আঁচাল। সুপুরির টুকরো মুখে দিয়ে সিগারেট ধরাল রঞ্জন আর সত্যেন।

ওদিকটা বোধ হয় উত্তর দিক। উত্তর দিক দিয়ে হাওয়া আসছিল হু-হু করে। শীতের শেষ। হাওয়া তত অসহ্য না হলেও বেশ শীত-শীত লাগছিল সবার। ভাত খাওয়ার পরে গায়ের চাদরে কান-মাথা ঢেকে নিল প্রত্যেকেই। তারপর ওপাশের আমগাছ ঘুরে আগুনের কাছে ফিরে এল। মোটা-মোটা সব ক'টা কাঠেই আগুন ধরে গিয়েছিল। এ আগুন চট করে আর নিববে না।

চেয়ার টেনে বসার পরেই সত্যেন বলল, 'আরে টাঙ্গিটা ওখানে গেল কী করে?'

'আমি মানে, আমার পায়ে লেগে··· ।' থেমে থেমে এমনভাবে রঞ্জন উত্তর দিল যেন ও কিছু গোপন করছে ।

কাঁচা কাঠে আগুন লেগে ফটফট করে শব্দ উঠছিল । মলির হঠাৎ মনে পড়ল, কে যেন তখন বলছিল চিতায় শোয়ানো মড়ার মাথা ঠিক এইভাবেই ফাটে ।

একটু পরে সত্যেন বলল, 'টাঙ্গিটাকে ঘরে রেখে আসি ।' মলি চেঁচিয়ে উঠল, 'না' ।

'না কেন ?'

মলি কোনো উত্তর দিল না ।

সত্যেন আরো কিছুক্ষণ ওইভাবে বসে থাকার পরে টাঙ্গিটা ঘরে রেখে এল আস্তে আস্তে ।

চাঁদ এখন ঠিক মাথার ওপর । বাংলোর বাঁকানো টিনের চাল চকচক করছিল । চালে অনেক শুকনো পাতা । শুকনো পাতা মাঝেমধ্যে উড়ে যাচ্ছিল খড়খড় করে ।

সত্যেন মৃদু গলায় বলল, 'টাঙ্গি দিয়ে মুর্গীদুটো কাটব ভেবেছিলাম । আমরা মাংস খেতাম, আর টাঙ্গি রক্ত খেত ।'

'ওসব নিয়ে এখনো ভাবছ নাকি ?' হাসতে হাসতেই রঞ্জন বলল । একটু থেমে আবার হাসল । কিন্তু, আর কেউ হাসল না । রঞ্জন অপ্রস্তুত হয়ে সিগারেট ধরাল ।

'একটা গান ধরো তো ।'

'কী গান ?'

'বেশ তালের ।'

সত্যেন দুই ভুরুর মাঝখানে আঙুল দিয়ে টোকা মারতে লাগল ।

মলি বলল, 'বিকেলেই মুর্গীদুটো কাটলে পারতে ।'

'বিকেলেই কাটলে পারতে । বেড়াবার শখ উঠেছিল কেন তখন ?'

গলার স্বর সরু করে সত্যেন যখন এভাবে কথা বলে হেসে ওঠে সবাই । এখন কিন্তু কেউ হাসল না । মলি পালটা কোনো জবাবও দিল না । সবাই চুপ ।

উত্তুরে হাওয়ার জোর কমে গেছে বেশ । গাছের ডালে কোনোরকম শব্দ নেই । মাঝেমধ্যে বহু দূরের পিচের রাস্তা থেকে ট্রাকের শব্দ ভেসে আসছিল, তাও শোনা যাচ্ছে না অনেকক্ষণ । শাল, নিম, বুনো গাছপালার জঙ্গল আরো যেন নির্জন হয়ে উঠেছে । পাশের বটগাছের পাকা ফল নীচের শুকনো

পাতার ওপর খসে পড়ছিল টুপটুপ করে। সেই শব্দে রূপা চমকে উঠে বারকয় পেছনে তাকাল ·

এমন সময় ঠন্‌ন্‌ন্‌ন্‌ করে শব্দ উঠল ঘরে।

'টাঙ্গির শব্দ ?'

'টাঙ্গির শব্দ।'

'দেয়ালে হেলান দিয়ে রেখেছিলে বোধ হয় ?'

'হ্যাঁ, কিন্তু পড়ল কী করে ?'

'ইঁদুর-টিদুর থাকতে পারে।'

'অত ভারি জিনিসটা !'

'ইঁদুরগুলোও বড়-বড়।'

'ইঁদুর দেখলে কোথায় ?'

'মাঠে।'

'মাঠের ইঁদুর ঘরে ঢোকে না।'

'হয়ত টাঙ্গিকে রক্ত খাওয়াতে গেছে।'

'ইয়ার্কি কোরো না—।'

নেড়া নিমগাছের ফাঁক দিয়ে সপ্তর্ষিমণ্ডল না কালপুরুষ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে রঞ্জন বলল, 'তোমরা এগুলো সত্যি-সত্যি বিশ্বাস করো নাকি ?'

'কোন্‌গুলো ?'

'এই টাঙ্গির রক্ত খাওয়া-টাওয়া।'

'না।'

'তবে ভয় পেয়েছ কেন ?'

'কে বলল ভয় পেয়েছি !'

'চুপ করে আছ কেন ?'

'কোথায় চুপ করে—মাথা ধরেছে।'

'সবার ?'

'তুমিও তো চুপ করে আছ।'

একটু পরে 'দাঁড়াও' বলে রঞ্জন হারিকেনটা হাতে নিয়ে লাফ দিয়ে বারান্দায় উঠল। বারান্দা থেকে ঘরে। ঘর থেকে চেঁচিয়ে বলল, 'যা বলেছি তাই, টাঙ্গিটা পড়ে গেছে।' কিন্তু ঘর থেকে বেরোবার মুখে দরজার পাল্লায় ধাক্কা লেগে হারিকেনটা ভেঙে গেল। তবে, এ নিয়ে কেউ কোনো কথা বলল না। রঞ্জন এসে নিজের চেয়ারে বসে বলল, 'টর্চটা কোথায় ?'

'ঘরে।'

'ঘরে কোথায় ?'

'জানি না।'

'মোমবাতিটা ?'

'ঘরে।'

'ঘরে কোথায় ?'

'জানি না।'

কালও বোধ হয় এই সময়, এই সময় না আর একটু পরে, চাঁদটা ঠিক এইভাবে ওদিকে হেলে পড়েছিল। ঠিক এই সময়েই আমগাছের দিক থেকে তক্ষক ডাকতে শুরু করেছিল। মাপা বিরতিতে অদ্ভুত তীক্ষ্ম ডাক। একটানা ঝিঁঝিঁর ডাক এখন আর কানে লাগছিল না কারও।

আগুনে পুড়ে-পুড়ে অনেকগুলো কাঠ কয়লা হয়ে গেছে। বাকি কাঠ-গুলোয় ভাল রকমের আগুন। কাঁচা কাঠ ফাটার শব্দ উঠছিল না আর। হাওয়ার জোরও তেমন নেই। শুকনো পাতা আর খড়খড় শব্দে উড়ে যাচ্ছিল না। এই ভয়ংকর নিস্তব্ধতার মধ্যে তক্ষকের ডাক পৌঁছে যাচ্ছিল বহু দূর পর্যন্ত। ওই যে দূরের ভাঙা ইঁদারাটা, তার পাড়ে দাঁড়িয়েও বোধ হয় পরিষ্কার শোনা যাবে।

কাল ওরা ওখানে দাঁড়িয়েই শুনতে পেয়েছিল। শুনতে পেয়ে মাঠ থেকে বাংলোর রাস্তায় উঠে এসেছিল তাড়াতাড়ি। পড়ে-থাকা লম্বা ঘাস, শুকনো ডাল দেখে চমকে ওঠা, ভয় পাওয়া—গলা ফাটিয়ে একসঙ্গে হেসে উঠে ভুল শুধরে নেওয়া চলেছিল কতক্ষণ ধরে। তার মধ্যেই ছিল কত রকমের কথা আর গান। পথের ওপর আর্চ-করা গাছের ছায়ায় যে জাফরি তৈরি হয়েছিল তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিল সবাই। নিবন্ত আগুনে ঘাসপাতা, কাঠকুঠো এনে জ্বালাবার সমান উৎসাহ ছিল সকলের। আজ ঠিক তার উল্টো। কেউ কোনো কথা বলছিল না। হাঁটু মুড়ে, পা ছড়িয়ে যে যেমনভাবে বসেছিল, ঠিক তেমনিভাবে বসে থাকল।

তক্ষক ডেকে চলেছিল একইভাবে। ডাকগুলো আগের চেয়েও তীক্ষ্ম। এ-নিয়ে আজ আর কোনো কথা উঠছিল না। তক্ষকের বাসাটা কোথায়, দেখতে কেমন, তক্ষক কামড়ালে বাঁচে কি না—এ-সব নিয়ে কেউ কোনো আগ্রহ দেখাচ্ছিল না। ওই তো কাছেই পথের ওপর অসামান্য জাফরি, কিন্তু তা নিয়েও কেউ কোনো কথা বলছিল না। আরও কয়েকটা কাঠ জ্বলতে-জ্বলতে কয়লা হয়ে গেল।

আবার ঠন্‌ন্‌ন্‌ন্‌ করে শব্দ উঠল ঘরের মধ্যে।

'ইঁদুর বোধহয়।'

'হ্যাঁ, ইঁদুরই।'

গাছের পাতা দুলছিল না একটুও। একটা লম্বা মেঘ চাঁদটাকে ঢেকে দিল এইমাত্র। আগুনের জোরও তেমন নেই। চারপাশে চারজন অন্ধকার হয়ে গেছে। পথের ওপরের জাফরি আর নেই। সব অন্ধকার। ইঁদারার সাদা পাড়, বাংলোর চকচকে টিনের চালেও অন্ধকার।

আবার ঠন্‌ন্‌ন্‌ন্‌ করে শব্দ উঠল ঘরের মধ্যে।

'কালকেই ফিরছি তো?'

'হ্যাঁ কালই। অনেক দিন হয়ে গেল এখানে।'

বাংলোর কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে কী যেন একটা ভেতরে এসে ঢুকল। কুকুর। কুচকুচে কালো রঙের। কিছুটা পথ নিঃশব্দে এগিয়ে এসে পেছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে বসল। অন্ধকারেও চোখদুটো জ্বলজ্বল করছিল। কিছুক্ষণ বসে থেকে আমগাছের তলায় ঘুরতে লাগল। শুকনো পাতা ভাঙার শব্দ উঠতে লাগল খড়খড় করে। তারপর বারান্দার নীচে গিয়ে দাঁড়াল। কী যেন শুঁকল। শুঁকে লাফিয়ে উঠল বারান্দার ওপর।

ঠিক এমনসময় ঠন্‌ন্‌ন্‌ন্‌ করে শব্দ উঠল ঘরের মধ্যে।

অমনি কুকুরটা বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়ে তীরের মতো ছুটে কাঁটা-তারের বেড়া ডিঙিয়ে দূরের ওই অন্ধকারের মধ্যে মিশে গেল।

কিছুক্ষণ পরে শুকনো পাতার ওপর পাকা বট পড়ার শব্দে রূপা চমকে উঠল আবার।

'ঘুম পাচ্ছে না?'

'না।'

'ঠাণ্ডা লাগবে, চলো শুয়ে পড়ি।'

'না।'

'কেন?'

'ভাল্‌ লাগছে।'

চাঁদটা পাতলা মেঘের সারি থেকে বেরিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য চতুর্দিক উদ্ভাসিত করে ওপাশের ঘন কালো মেঘের মধ্যে ঢুকে গেল। সবাই, সব কিছু আবার অন্ধকার। হাওয়া ছিল না একদম। হাওয়া উঠল। প্রথমে আস্তে, তারপর জোরে, ঝড়ের মতো। শুকনো পাতাগুলো টিনের চালে, বারান্দায়, গাছের তলায় খড়খড় শব্দে উড়তে লাগল। চারপাশের গাছপালা

দুলতে লাগল। দুলতে-দুলতে এ-গাছের ডাল সে-গাছে, সে-গাছের ডাল এ-গাছে। কয়েকটা পাখি ঝটপট করে উঠল। অনেকগুলো পাকা বট টুপটুপ করে খসে পড়ল শুকনো পাতার ওপর। তক্ষকের ডাক থেমে গিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্যে, আবার শুরু হল। এবার অনেক জোরে। ধারকাছেই এগিয়ে এসেছে বোধহয়। গাছপালাগুলো দুলছিলই, দুলতে-দুলতে আরও এগিয়ে এল। তারপর যেন ডালপালা ছড়িয়ে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরল ওদের!

আগুন নিবে গেছে প্রায়। থেকে-থেকে দু'একটা ফুলকি হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছিল। কাঁটাতারের বেড়ার ধারে কালো মতন কী যেন একটা! কুকুরটা, সেই কুকুরটা।

হঠাৎ হাওয়া বন্ধ হয়ে গেল আবার। গাছপালাগুলো দুলতে-দুলতে যে যার নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে চুপ হয়ে গেল। নেড়া নিমের সরু কালো ডালগুলো আবার টানটান হয়ে গেল। শুকনো পাতাগুলো যে যেখানে যেমনভাবে ছিল থেমে গেল। তক্ষকের ডাক থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কালো কুকুরটা ঠিক আগের মতো তীরবেগে ছুটে দূরের অন্ধকারে মিশে গেল আবার।

সবাই, সব কিছু উৎকর্ণ হয়ে থাকল, যেন এক্ষুণি কিসের শব্দ শোনা যাবে

অন্তরাত্মা

সমরেশ মজুমদার

বেশ কিছুক্ষণ হ'ল আমার ঘুম ভেঙেছে এবং আমি এই সময়টুকু সমস্ত শরীর গুটিয়ে নিয়ে, অনেকটা তে-মাথা বুড়ির মত ঘুমের আমেজটাকে জিইয়ে রাখতে চাইছিলাম। আচার খাওয়ার পর জিভটাকে চকচক শব্দে নাড়াচাড়া করতে যেমনটি লাগে।

এখন এই সকালে মেঝেতে পাতা বিছানায় শুয়ে আমি সারা ঘরে ছড়ানো কাগজ, একটা মাটির ভাঁড়ে উপচেপড়া সিগারেটের টুকরো ও আমার বালিশের পাশে গোড়ালি সাদা-হওয়া একপাটি জুতো আবিষ্কার করে ঈষৎ বিরক্ত হলাম। এবার আমি উঠবো। রাত্রে নগ্ন শোয়া স্বাস্থ্যপ্রদ মনে করায় এখন লেপের আড়ালে প্যান্টটা গলিয়ে নিয়ে থার্মোমিটারের মত টুথব্রাশ মুখে পুরে এক-তলায় নামবো। দরজা খোলার আগে আমার দশ ইঞ্চি এবং প্রায় অস্বচ্ছ আয়নায় মুখটা একবার বুলিয়ে চোখের শ্রী ফিরিয়ে নেব। কারণ, আমি জানি, এ সময়ে নীচের কলতলায় কয়েকটি মেয়ে ব্যস্ত থাকবেই। এ বাড়ির বাসিন্দে মেয়েরা সুন্দরী কি! হলেও তাদের প্রতি কোন দুর্বলতা আমার নেই; তথাপি পিচুটি-চোখে কোন মহিলার মুখোমুখি হওয়া আমি 'ক্রাইম্' মনে করি। কলতলায় নামলেই চাক ঘিরে থাকা মৌমাছির মত কল আঁকড়ে থাকা মেয়েগুলো আলগা হবে এবং ইত্যবসরে আমি সুড়ুৎ করে কর্মটি সেরে নিই। এই সময় নিয়মিত দুটি বাক্য শ্রবণ করি—'আজ বড় তাড়াতাড়ি উঠলেন যে!' অথবা 'আজ অনেক বেলা হয়ে গেছে কিন্তু।' এক টুকরো প্রণামী হাসি চটকাতে চটকাতে যখন ওপরে উঠে আসি তখন তলপেটে ঈষৎ চাপ অনুভূত হওয়া সত্ত্বেও কোন বাথরুম খালি না থাকায় আমাকে জামা গলিয়ে 'ভালো আছেন মাসীমা' গোছের মুখ করে পাড়ার চায়ের দোকানে ছুটতে হয়। আমার প্রাত্যহিক খরচের একটা বাজেট থাকে। কিন্তু ব্যক্তিগত

খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে সেটি মেনে চললেও প্রায়শই তা অতিক্রম করে যাই। কারণ যে-কোন সময় যে-কোন 'মহিলার সঙ্গে আলাপ' ইত্যাদির জন্যে কিছু খরচ আমার হয়ই। আমি একটি সরকারি অফিসে মাঝারি চাকরি করলেও কর্তৃপক্ষ আমার ইতিহাসে রাজনীতির গন্ধ খুঁজে ক্লান্ত। যদিচ তাঁরা সন্দেহের কাঁটাকে লালন করতে বদ্ধ পরিকর এবং আমি নিশ্চিন্ত আনন্দে নিয়মিত মাইনে নিয়ে যাচ্ছি।

সম্পূর্ণ টিপটপ না হয়ে পথে বের হই না আমি। মাথার টেরি থেকে জুতোর টো আমার ঝকঝকে থাকবেই। ঘণ্টা খানেকের ব্যবধানে সিগারেট কেনার সময় পানের দোকানের আয়নায় কোদাল চালানোর মত চুলে কয়েকটা কোপ মারি চিরুনি দিয়ে। দ্বিতীয়টির জন্য আমাকে ট্রাম-বাসে উঠতে হয়। কারণ, প্রকাশ্যে পকেটের জুতোর টো মোছা—সে একটা বিশ্রী ব্যাপার। ট্রামে উঠে ইচ্ছে করে রুমালটাকে পায়ের কাছে ফেলে দিই। এবং সেটাকে ওঠাবার ভঙ্গী করে নিপুণ হাতে টো পালিশ করে নিই। রুমালটির দুটো ভাঁজ আছে, একটিতে মুখ মুছি অন্যটিতে জুতো।

যেদিন প্রথম ডিপার্টমেণ্টে ঢুকেছিলাম সে দিন খুব গম্ভীর হয়ে কথা বলেছিলাম। কারণ, জেনেছিলাম যে. আমার অফিসাররাও আমার ডিগ্রির কাছাকাছি যাননি। বস্তুত 'এম এ পাশ' শব্দ দুটো কাগজ পাকিয়ে কানে সুড়সুড়ি নেবার মত আমার কাছে আরামদায়ক ছিল। আমার পাশের সহকর্মী আমার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছিল আমার ডিগ্রির খবর পেয়ে। 'দাদা এখানে আর ক'দিন থাকবেন।' ইত্যাদি স্তুতি সে করেছে প্রচুর। কিন্তু যেদিন শুনলো আমার এম-এ'র সাবজেক্ট কি ছিল সেদিন থেকেই লোকটা ইয়ার-দোস্তের মত 'আবে শালা' বলতে শুরু করলো। আমার খুব সন্দেহ, লোকটা কলেজেই ঢোকেনি। ফলত. এখন আমি নিজেকে গ্র্যাজুয়েট বলি পরিচয়—প্রসঙ্গে। বাংলায় এম-এ বলা মানে দেশী আয়নায় নিজের তিনরকম মুখ দেখা এ সত্য জেনেছি মজ্জায় মজ্জায়।

অত্যন্ত দ্রুত আমি স্নান সেরে নিই। কারণ, এই বারোয়ারি স্নানঘরটা যেমন অন্ধকার তেমনি নোংরা। মেয়েদের মাথার চুল থেকে সাবানের ফেনা সর্বদা জলে ভাসে। বেশিক্ষণ গায়ে জল না ঢাললে আরশোলার আদর খেতে হবে সর্বাঙ্গে। ওই গা ঘিনঘিন ভাবটা এড়াবার জন্য আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে স্নান শুরু করি। শুকনো গামছা দিয়ে ধরে মাঝে মাঝে কয়েকটা টান দিয়ে নিই। অনেকটা ট্রলি গাড়ির বেগ কমে এলে পেছন থেকে ঠেলার মতন।

সকাল বেলায়ই আমি খুব অসহায় বোধ করি। কারণ, এখন কোন

বন্ধুকে পাওয়া যাবে না যে যার বস্-এর কাছে বশংবদ। তবু চৌরাস্তায় এসে একটা সিগারেট ধরালাম প্রাত্যহিক অভ্যাসে। এখন মেয়েদের স্কুল ছুটি হয়েছে। বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে বত্রিশ দাঁতে পান চিবুনোর মত ডাঁটো মেয়েগুলোকে দেখি। কতক মুখ আমার চেনা হয়ে গেছে। এবং এক সময় হঠাৎই বাসে প্রচণ্ড ভিড় লক্ষ করে ঈষৎ বিরক্ত হয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। মেয়েদের পেছনে হাঁটার উত্তাপ সর্বাঙ্গে নিয়ে আমি এক বন্ধুর দোকানে ঢুকে পড়লাম! সুহৃদ টেবিল বাজাচ্ছিলো। ওর বাবার দোকান এটা। রেডিওর। ভদ্রলোক বারোটার পর নামেন। এ সময়টা সুহৃদ সম্রাট। টালিগঞ্জ পাড়ায় একদা ঘোরাঘুরি করেছিল, বাবার হুকুমে সেটা স্থগিত থাকলেও বর্তমানে নবনাট্য করছে। নাটক মঞ্চস্থ হবে কি না ঠিক নেই, কিন্তু রিহার্সাল দিয়ে চলেছে। ফলত সদস্যরা অনিয়মিত হচ্ছে নিয়মিত। আমাকে দেখেই সুহৃদ ওদের কানা দারোয়ানটাকে এক ভাঁড় চায়ের হুকুম দিয়ে পাশ থেকে এক দিস্তে কাগজ টেনে আনলো। 'বুঝলি অনিমেষ, এখানটায় যা ট্রিটমেন্ট করেছি না —অনেকটা পিকচারাইজড্। জাম্প শট বুঝিস? ফিল্মে আছে—নাটকেও তাই আনছি। আই অ্যাম দ্য ফার্স্ট ম্যান, ফার্স্ট অ্যাক্টিং-এর সঙ্গে —।'

চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে একটা বিরাট হাই তুলে বললাম, 'ওটা গর্ডন ক্রেগ করেছে।' চোয়াল ঝুলিয়ে ঘসঘসে গলায় সুহৃদ বলল, 'গর্ডন করেছে!' যেন গর্ডন আমাদেরই আর এক বন্ধু! ওর হাতটা যেভাবে মুঠো হলো তাতে গর্ডন ক্রেগ সামনে থাকলে একটা কিছু হয়ে যেত। তাড়াতাড়ি সামলে নিলাম—রবার্ট লুইস তো সেই রকমই লিখেছেন। বুঝলি সুহৃদ, এই নাটক-ফাটক করে কিস্যু হবে না। তার চেয়ে ফিল্মের দিকে—। আসলে সুহৃদকে বধ করতে হলে এইসব নাম বলতে হবে এটা আমি জানতাম। এসব নিয়ে ও পড়াশুনা করে তা আমি জানি। নাম দুটো আমার মুখে শোনার পর ও একটা ফিল্টার-টিপ বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে এগিয়ে দিয়ে বললো, 'নাঃ, ডকুমেন্টারি করবো। হাজার দুয়ের মামলা তো। ষোলো মিনিটে ট্যালেন্ট দেখিয়ে দেব। বিন্দুতে সিন্ধু।'

'ডকুমেন্টারির চেয়ে ফিচার ফিলম বেটার। তবে নেহাতই যদি করিস তবে ইন্দিরা গান্ধীর ওপর কর। 'প্রিয়দর্শিনী' নাম দে। গভর্নমেন্ট কিনে নেবে।'

এবং আমরা এই সব কথাবার্তা বলে গেলাম বারোটা অবধি। এবং গত দু'বছরের মত আমাদের আলোচনার কোন সিদ্ধান্ত হবে না। আমরা যখন কথা বলি, সুহৃদ ও আমি একটা ছবি করবো, সিরিয়াস হয়েই বলি। সেই

মুহূর্তে আমরা কেউ স্মরণে আনি না যে, নাটকের জন্য একজন অভিনেত্রী পঞ্চাশ টাকা পারিশ্রমিক চেয়েছিলেন এবং তা সাধ্যাতীত ছিল বলে আমরা রিহার্সাল বন্ধ রেখেছি। এই সময় চলচ্চিত্রের যাবতীয় খুঁটিনাটি নিয়ে আমরা আলোচনা করবো। একসময় আমি উঠে পড়লাম। আমি ও সুহৃদ কেউই আলোচনার সিদ্ধান্ত নিয়ে মাথা ঘামালাম না।

এই সময় আমি দ্বিপ্রাহরিক আহার গ্রহণ করি। এ ব্যাপারে সাধারণত পাঞ্জাবী দোকানই আমার পছন্দ। কারণ, বাঙালী পাইস হোটেলের পরিচ্ছন্নতা এবং ভাত ছ'আনা, ডাল দু'আনা ইত্যাদি দ্রুত নামতার মত কানের কাছে চেঁচানো হয় বলে আহার গ্রহণে বিঘ্ন ঘটে।

এসব ব্যাপারের বাইরে আমি নিভৃতে পকেটের সঙ্গে বোঝাপড়া করি। অল্প পয়সায় রুটি সহযোগে তড়কা অত্যন্ত উপাদেয়—পাঞ্জাবী হোটেলে ঢোকার পেছনে এ আমার অন্যতম যুক্তি। বস্তুত পেঁয়াজ ও লেবু সহযোগে তড়কা খেতে খেতে আমি মাংসের আঘ্রাণ পাই। অবশ্যই স্বীকার করবো দিনের মধ্যে দু'বার, খাবার সময়, বহু যোজন দূরে অবস্থানকারী আমার পিতামাতার মুখ স্মরণ হয়। অন্যথায় আমি নিজেকে ভালবাসি বা 'আত্ম-কেন্দ্রিক' এই বিশেষণ অস্বীকার করি না! তা ছাড়া বিচিত্র হিন্দি ভাষা শেখার অন্যতম জায়গা পাঞ্জাবী হোটেল এবং স্বীকারে লজ্জা নেই, আমি শিক্ষানবিস।

বেশ কয়েকটা পরিতৃপ্তির ঢেকুর তুলে আমি ট্রামে উঠলাম। সাধারণত যেসব ট্রামের পেছন দিকে দরজা থাকে সেগুলো আমি পরিহার করি। স্বচ্ছন্দ হয়ে থাকা যায় না। বরং পেট-কাটা ট্রামের দরজায় দাঁড়ানো বেশ আরাম-দায়ক। জয়ন্ত, আমার এক বিরাটকায় বন্ধু পেশ করেছিল, প্রথমটি পুরুষ ও দ্বিতীয়টি স্ত্রী ট্রাম। এবং আমার পক্ষে স্ত্রীজাতির প্রতি অনুরাগ দেখানো স্বাভাবিক। ট্রামে উঠেই আমার চোখ উজ্জ্বল হল। মেয়েটি মুখ ঘুরিয়ে রাস্তায় নজর দিতেই দ্বিধামুক্ত হলাম। যদিও ওর চোখে কালো চশমা, কিন্তু ফাঁপানো চুল আর খাটো ব্লাউজের সঙ্গে সাদা ঝোলানো ব্যাগটা আমি দেখতে পেয়েছিলাম। এই মেয়েটির সঙ্গে আমি কখনো কথা বলিনি, কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে আমি একলা নই। ক্রমশ স্থির করে ফেললাম আজ আলাপ করবোই। এবং কিভাবে কথা বলবো তার একটা ফর্মুলা আমার আছে। যেমন মেয়েটির সামনে গিয়েই একটু অবাক ও চিন্তিত চোখে বলবো, 'মাফ করবেন, আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি মনে হচ্ছে—কোথায় থাকেন বলুন তো?' সাধারণত এই প্রশ্নের উত্তরে যে কোন মেয়েই বলবে 'কেন, আপনার

কি দরকার ?' তখন কাঁধ দুটো বেশ প্রশস্ত করে ঈষৎ লজ্জা ও বিব্রত ভঙ্গীতে বলতে হবে, 'না, তেমন কিছু নয়, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আপনি খুব চেনা। অবশ্য মানুষেরই ভুল হয়।' এর পরে চোখ রাখতে হবে মেয়েটির চোখে। প্রশ্রয়ের আভাস পেলে ভরা পালে কথার নৌকো ছুটবে। নইলে কেতাদুরস্ত ইংরেজী ভদ্রতা।

নিউ সিনেমার সামনে মেয়েটি নামতেই আমি ট্রাম ছেড়ে দিলাম। ঠিক এই মুহূর্তে আমার একটা আশঙ্কা ছিল—হয়তো এর কোন ব্যক্তিগত বন্ধু অপেক্ষা করছে কোথাও। মেয়েটি মার্কেটের রাস্তায় এগোতে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম সহসা! ত্বরিতে মেয়েটিকে ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে নির্জনতম জায়গায় দাঁড়ালাম! মেয়েটি অন্যমনে হাঁটছে। হাঁটবার সময় ঊর্ধ্বাঙ্গের ও নিম্নাঙ্গের আন্দোলন আমার শিরায় শিরায় রোমাঞ্চ জাগাচ্ছিল। কাছাকাছি হতেই এগিয়ে গেলাম, মাথাটা বেঁকিয়ে ঈষৎ অপ্রস্তুত ভঙ্গীতে (সম্প্রতি কোন ছবিতে নায়ককে এভাবে হাঁটতে দেখেছিলাম)। হঠাৎই সব এলোমেলো হয়ে গেল এবং আমি সব ফরমুলা ভুলে দু'হাত জোড় করে ঈষৎ হেসে বললাম, 'নমস্কার, আপনাকে আমি অনেকবার দেখেছি, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাই।'

মেয়েটি হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো এবং দীর্ঘ নরম ঘাড় বেঁকিয়ে আমাকে দেখলো। তারপর আলতো করে উচ্চারণ, 'কেন বলুন তো ?'

এ প্রশ্নটাই মারাত্মক। আমি চোখ বুজে পরক্ষণেই হেসে ছোট্ট শ্রাগ করে বললাম, 'আলাপ করতে ইচ্ছে হলো খুব।'

'কি হবে আলাপ করে ?' মেয়েটির দৃষ্টি আমাকে মাপছে। আমি বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে বললাম, 'জানি না, তবে এক একটা ইচ্ছেকে চেপে রাখা যায় না তাই।'

'ও।'

'আমি নিখিল রায়। কাস্টমসে আছি।' এখান থেকেই আমি আমার ফরমুলায় এসে গেলাম। কখনোই কাউকে আসল নাম ও অফিস আমি বলি না। 'আপনি তো এদিকেই যাবেন ?'

মেয়েটি হাসলো, 'হ্যাঁ।' আমরা এগুলাম। কথা নেই কিছু। অস্বস্তি হচ্ছে! মেয়েটির পরিচিত কেউ এসে পড়লে অপ্রীতিকর হবে। গলায় কৌতুক নিয়ে বললাম, 'কারো সঙ্গে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে বুঝি ?'

'আছে ! টেলারের সঙ্গে। আমার কয়েকটা জামা ফিট করতে দিয়েছি, আজ ট্রায়াল ডেট।'

এরপর আমরা কথা বললাম। যে কেউ এ মুহূর্তে আমাদের অন্তরঙ্গ ভাববে। অফ্‌ ডিউটিতে সিনেমা দেখার উদ্দেশ্য এ পাড়ায় আমার আগমন —জানালাম। আসলে মেয়েটি সিনেমায় আসুক এ আমি চাইছিলাম।

'এই যে আমার শপ।' মেয়েটি বাঁ চোখে আমাকে দেখলো। তাড়াতাড়ি জোড়া দিলাম, 'আমি কি অপেক্ষা করবো ?' ভেতরে ঢোকার আগে মেয়েটি বললো, 'আচ্ছা'।

এটি একটি ফরাসী দর্জির দোকান। বিরাট বিরাট গাড়ীতে বিভিন্ন বয়সের মেয়েরা আসছে অনবরত। তাদের ব্লাউজের চেহারা দেখে আবার জয়ন্তকে মনে পড়লো। মার্কেটে ঘুরতে ঘুরতে একদা ক্রীসমাসে জয়ন্ত বলেছিলো, বালিশের ঢাকনা, লেপের ওয়ার যেমন আছে, বুঝলি, এই ব্লাউজগুলো তেমনি অন্তর্বাস ঢাকনা। মাপে মাপে তৈরী।

তিনটে সিগারেট শেষ হলে মেয়েটি বেরুলো! পাশাপাশি কয়েক পা হেঁটে সমস্যায় পড়া গেছে, এমন ভঙ্গিতে বললাম, 'অথ গন্তব্য কোথায় ?'

মণিবন্ধে বাঁধা চৌকো বড় ঘড়িটা দেখালো সে। 'আমাকে তিনটের মধ্যে বাড়ি ফিরতেই হবে।' অর্থাৎ এখনো ঘণ্টাখানেক সময় আমি পাবো। কৃতার্থ ভঙ্গিতে বলি, 'ওঃ অনেক দেরী আছে। চলুন কোথাও জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যাক।' 'জমিয়ে আড্ডা' শব্দ দুটো, আমি ইচ্ছে করেই বললাম। কারণ, এতে আমার সরলতা ও লোভহীনতা প্রকাশ পাবে। তা ছাড়া মেয়েটি যদি কলেজ-য়ুনিভার্সিটির ছাত্রী হয়, তা হ'লে আমার মেজাজের সঙ্গে একটা সাধর্ম খুঁজে পেয়ে খুশি হবে। কফি হাউসে অনেক মেয়েকে শব্দ দুটো ব্যবহার করতে শুনেছি।

'কোথায় আড্ডা দেবেন। যা রোদ্দুর।' আকাশ দেখলো।

'চলুন কোথাও বসা যাক।' আমি দরাজ হলাম। ক্রমশ আমি একটা করে রেস্তোরাঁর নাম বলে গেলাম এবং সে নাকচ করে গেল। হয় তার কোন আত্মীয় নিয়মিত সেখানে আসেন অথবা সে পরিচিত। শেষ পর্যন্ত যে দোকানে আমরা প্রবেশ করলাম, সেটি সাহেবপাড়ায় অত্যন্ত দামী এবং আমার দীর্ঘকালের বাসনায় ছিল। সেই স্বপ্নলোক সম শীততাপ নিয়ন্ত্রিত সজ্জিত কক্ষের কোণায় সোফায় বসে মেনু হাতড়ে হাতড়ে যে পানীয়ের হুকুম দিলাম, তার বিনিময়ে আমার চার বেলার মিল খাওয়া হয়ে যেত। 'বেশী কিছু খেতে পারবো না, এই মাত্র লাঞ্চ সেরেছি আমি, আপনি ?' বলার সময়ে তড়কার ঢেঁকুর উঠলো যেন। আমি জানতাম, যে-কোন মেয়েরই একবার অর্ডার দেওয়া হয়ে গেলে মুখ ফুটে অন্য খাবার চাইবে না। এবং এই সময়

মনে মনে এই বাড়তি খরচটুকু আগামী সাতদিনের বাজেট থেকে কিভাবে পুষিয়ে নেব, তার একটা খসড়া করে নিলাম অতি দ্রুত।

এখন পর্যন্ত মেয়েটির নাম আমি জানতে চাইনি ; কারণ, আমি চাইছিলাম, মেয়েটি বুঝুক, আমি ঠিক লাইনের ছেলে নই। 'লাইন' বলতে আমি লোভী কামুক এবং ইতর কিছু মানুষ যে পদ্ধতিতে আনাগোনা করে, সেই পদ্ধতির কথা বলছি। এছাড়া আরও একটা কারণ এই যে, আমি মেয়েটির বিরাট চ্যাপ্টা সাদা চামড়ার ঝোলানো ব্যাগটার গায়ের খোপে বসানো সাদা কাগজে লেটারিং করা নাম 'দময়ন্তী গুপ্ত, বি এ (অনার্স)' দেখতে পেয়েছিলাম। এবং এই বিশ্ব-চরাচরে প্রথম কোন স্ত্রীলোককে হাত-ব্যাগের শরীরে নিজের নাম ও ডিগ্রীর খবর লিখতে দেখে পুলকিত হলাম।

সোফায় মাথা এলিয়ে মেয়েটি বসেছিল। আমি ওর স্ফীত ঊর্ধ্বাঙ্গে ইচ্ছে করেই চোখ রাখছিলাম না। কারণ ; আমি জানি, মেয়েরা এ বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন এবং আমাকে এ ব্যাপারে উদাসীন দেখলে সে ক্রমশ আমার ওপর আস্থাশীল হবে।

'রেস্টুরেণ্টটা খুব ডেকোরেটিভ।' মেয়েটি দেয়াল দেখছিল।

'সাহেব পাড়ার সঙ্গে আমাদের উত্তর কলকাতার পার্থক্য এখানেই।' সুন্দর করে বললাম আমি। দুটো ভ্রু এক করে মেয়েটি বললো, 'আপনি নর্থে থাকেন ?'

'শ্যামবাজারে।'

'আচ্ছা— !' এমন আলতো স্বরে শব্দটা সে উচ্চারণ করলো যে, ওর ঠোঁট একটুও কাঁপলো না 'আমি বিডন স্ট্রীটে।'

'তা হলে বেথুনে পড়েছেন ?' আমরা ক্রমশ সিঁড়ি ভাঙ্গা অঙ্কের মত ধাপে ধাপে নামছিলাম। আমি খুব কাছাকাছি বসে আইসক্রীম খেতে খেতে মেয়েটির সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হলাম। আমার অনেক কিছু শখ হচ্ছিলো, কিন্তু আমি কোন উৎসাহ দেখাচ্ছিলাম না। হঠাৎই লক্ষ্য করলাম আমাদের বিপরীত কোণে দুটি মারোয়াড়ী ছেলে মেয়েটি সম্পর্কে আলোচনা করছে বিশ্রী ভঙ্গিতে। আমি উত্তেজিত হলাম। মাথা নিচু করে মেয়েটির কানের কাছে মৃদুস্বরে বললাম 'ঐ কোণের ছোকরাগুলোকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার।' স্প্রীংয়ের মত মাথা ঘুরিয়ে কোণের দিকে তাকালো মেয়েটি। তারপর সমস্ত মুখের পেশী শিথিল করে লাফিয়ে উঠলো, 'হ্যালো ম্যান! হা ডু য়ু ডু ?' লাট্টুর মত শরীর ঘুরিয়ে মারোয়াড়ী-টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলো সে। কয়েক মুহূর্ত নির্বিকার ভূমা দর্শন করলাম। বিলটা

পে করতেই বাঁ চোখে ঝাঁকুনি দিয়ে মেয়েটি ডাকলো, ওঁকে চেনেন না ? ওমপ্রকাশ—টেব্‌ল টেনিস চ্যাম্পিয়ান ! উঃ কদ্দিন পরে তোমার সাইট পেলাম প্রকাশ।' ওরা আমাকে লক্ষ করছিল না। পায়ে পায়ে কখন দরজার কাছাকাছি চলে এসেছি নিজেই টের পাইনি। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষের বাইরে এসে এক ঝলক আগুনের তাপ নিলাম সর্বাঙ্গে। সেয়ানে সেয়ানে পাঞ্জা কষে পরাজিত সম্রাটের মত প্রচণ্ড রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে মনে হ'ল, লক্ষ লক্ষ সিসিফাস তো জন্মাচ্ছে, তবু সূর্যের তেজ একটুও কমছে না। শালা !

কয়েক শো টাকার বাজী হেরে যাবার মেজাজ নিয়ে হাঁটছিলাম। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলা দরকার। যদিও শেষ দিন কথা বলার সময় আমি ভেবেছিলাম আর আসবে না। ইনি বাংলা দেশের তথাকথিক সম্মানিত ও পদস্থ ব্যক্তি। এঁকে দেখে আমার মিশরের প্রাক্তন রাজা ফারুকের চেহারা মনে পড়ে। আমার কর্তৃপক্ষ যে রাজনীতির গন্ধ আমার ইতিহাসে পাচ্ছেন বলে শুনেছি, তার সঙ্গে চৌদ্দ পুরুষের আমার সম্পর্ক ছিল না। অতএব এই মিথ্যে অভিযোগকে মিথ্যে প্রমাণ করতে আমাকে লাট্টুর মত ঘুরতে হচ্ছে। আমাকে প্রমাণ করতে আমি সৎ। শ্রীরামচন্দ্রকে যদি বলা যায় 'ওহে বাপু, তুমি প্রমাণ করো দেখি, দশরথ তোমার বাপ কিনা।' তবে ভদ্রলোকের সমস্যা নিশ্চয়ই আমার চাইতে নেহাত কম হতো না। ঈশ্বরের তৃতীয় নয়নের মত সর্বদুয়ারের অদৃশ্য চাবিকাঠি এই ফারুক ভদ্রলোকের হস্তগত। অতএব আমাকে তার সামনে লেজ নাড়তে হচ্ছে সমানে।

লালদিঘির কাছাকাছি আসতেই শুনলাম কে যেন চেঁচিয়ে আমাকে ডাকছে। সেই ঘড়িওয়ালা গির্জার সামনের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে মল্লিকদা হাত নাড়ছেন। মল্লিকদাকে দেখেই আমি তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লাম। সুরার পাত্রে মল্লিকদা আমার গুরুদেব। পনের পেগেও ভদ্রলোক যথাযথ। এক টেবিলে বসে একদিন বিল মেটাতে গেছিলাম চক্ষুলজ্জায়। ফোঁস করে উঠেছিলেন মল্লিকদা 'বয়েস কত ? আমাকে যেদিন বয়সে টপকাবে, সেদিন বিল পে করতে এসো। অডাসিটি ! হতচ্ছাড়া, ঐ বয়গুলোকে টিপস্‌ দিতেই ফতুর হয়ে যাবে যে।' মল্লিকদার অবস্থা কি রকম জানতাম না। তবে কখনো পকেট খালি দেখিনি। মল্লিকদা বিবাহিত, দুটি সন্তানের জননী তাঁর স্ত্রী। ষোলো পেগের ঝোঁকে একদিন বলে ফেলেছিলেন, 'তোমার বউদির বাচ্চাদুটো আমার নয়। ওঁর পূর্ব প্রেমিকের। প্র্যাক্‌টিক্যালি ওকে বিয়ে করে এসব শুনে আর টাচ্‌ করার ইচ্ছে জাগেনি।' আর তাই দার্জিলিং-এর নেপালী মেয়ে

লীনার মায়ের কাছে কুশলবার্তা নিয়ে যান মল্লিকদা। ডরোথীর বুড়ো বাপকে লাঠি কিনে দিয়ে আসেন ডক্টর লেনে গিয়ে। গহন রাত্রে টেমাল বা ঈশাকে বসে লক্ষ রাখেন দশ পেগ পেরিয়ে গিয়েও ডরোথী লীনারা খদ্দেরের চাপে হুইস্কি খাচ্ছে কিনা।

'কোথায় চললে?' মল্লিকদা নাক কোঁচকালেন 'চলো! লীনার কাকা এসেছে দার্জিলিং থেকে। বেশ মজার লোক।'

'না মল্লিকদা, একটু ব্যস্ত এখন।' বিব্রত আমি।

'অল রাইট। রাত সাড়ে নটার মধ্যে ঈশাকে এসো।' এক মুহূর্ত আর অপব্যয় করলেন না মল্লিকদা। ট্যাক্সির জন্য হাত তুলে ছুটলেন রাস্তার ওধারে।

সিংহদুয়ারে অনেক কথা খরচ করে অনুমতি যদিও মিললো ভিতরে যাবার, মধ্যদুয়ার একপ্রস্থ তদারকিতে কঠোর হলো। ক্রমশ যখন সেই আকাঙ্ক্ষিত দেবতাটির সামনে এসে দাঁড়ালাম, ঠিক তখনই লাল আলো জ্বলে উঠলো। শুনলাম, এই মাত্র একজন বিখ্যাত মহিলা অন্দরবর্তী হয়েছেন। তাকিয়ে দেখলাম অপেক্ষা করার ছোট্ট ঘরে তিনজন পুরুষ ও জনা দুয়েক মহিলা কাগজ পড়ছেন। একটি অজস্র ছাপার ভুল ও কালি চুপসানো খবরের কাগজ টেনে নিয়ে সোফায় বসতেই কানে সুড়সুড়ি দেবার মত আরামদায়ক কিছু সংলাপ ভেসে এলো, 'আমি সাধারণত স্লিভলেস পরি না, তবে যেখানে-যেমন শুনেছি ইনি অত্যন্ত আপ-টু-ডেট।' সঙ্গে সঙ্গে সোডার বোতল খোলার মত শব্দ হলো, 'ইয়ং ম্যান অব সেভেনটি। আমাকে এখনও 'এসো খুকি' বলেন। ওঁর একটা লাইসেন্স আজ দেবেন বলেছেন। আফটার অল ত্রিশ বছরের সম্পর্ক। মুহূর্তে আমার মনে হ'ল, আমি দেবদর্শনে এসেছি এবং অপ্সরাবৃন্দের কাকলি শুনছি।

অনেক অপেক্ষার শেষে মুখোমুখি হলাম। দু'পা টেবিলের নীচে চালান করে স্ফীত ভুঁড়ি দামী সাদা খদ্দরের পাঞ্জাবিতে ঢেকে শ্রীফারুক বসে আছেন। ভদ্রলোকের গায়ের চামড়া অসম্ভব রকমের ফরসা। পেছনের দেওয়ালের সর্বাঙ্গ জুড়ে জাতির জনকের পার্ক-স্ট্রিটির ছবি আছে। নীল পর্দা দিয়ে ঘরের একটা দিক ঘেরা। ওখানে ইনি বিশ্রাম করেন। একটা টাইপ করা চিঠি হাতে নিয়ে চশমার ফাঁকে তাকালেন তিনি, 'চাকরিটা এখনও আছে?'

গলায় আমার এত কফ ছিল জানতাম না। কোন মতে বললাম, 'হ্যাঁ, তবে ওয়ার্নিং দিয়েছে। আমাকে স্যার আপনি বাঁচান। আমি কোনদিন রাজনীতি করিনি। স্যর এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ। আমার ঠাকুরদাকে

তো আপনি চেনেন। মানে সেই লিয়াকত আলির আমলে, যখন উত্তর বাংলার সাঁওতাল শ্রমিকদের উনি মুসলমান বলে প্রচার করেছিলেন তখন আপনাকে আমার ঠাকুরদা ওই ব্যাপারের বিরুদ্ধে অনেক তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। আমরা কেউ রাজনীতি করি না স্যার।'

আমার কথায় কোন আঁচড় পড়লো না মেদগঠিত শ্রীফারুকের মুখে। বাঁ হাত বাড়িয়ে টেলিফোন তুলে অপারেটরকে বললেন হোম ডিপার্টমেণ্টকে লাইনটা দিতে। আমার শিরদাঁড়ায় একটা আনন্দ ছটফট করছিল। এমন সময় এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে টেবিল থেকে কয়েকটা কাগজ তুলে আড়চোখে আমার দিকে তাকালেন। নাকটা কুঁচকে শ্রীফারুক বললেন, 'এর কেসটা নিয়ে একটা কিছু করাব জন্য হোম ডিপার্টমেণ্টে ফোন করছি। কি বলো?'

'কি কেস স্যার?'

রাজনীতি করেছে বলে চাকরি যাচ্ছে। আমাব ডিস্ট্রিক্টের ছেলে।'

'সেকি স্যার। আপনি ডিপার্টমেণ্টে ফোন কেন করবেন? আপনার একটা স্ট্যাটাস আছে তো? আপনি ববং এর কাছ থেকে একটা দরখাস্ত নিয়ে হোম মিনিস্টারকে ফরোয়ার্ড করে দিতে পারেন।'

সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতটা রিসিভারটা তুলে আনলো এবং শ্রীফারুক অপারেটারকে জানিয়ে দিলেন হোম ডিপার্টমেণ্টকে দরকার নেই। তারপর টেবিলে রাখা প্রতীক্ষিতদের ভিজিট কার্ডগুলো তুলে নিয়ে বাছতে বাছতে বললেন, 'তা হ'লে একটা দরখাস্ত লিখে দিয়ে যেও। আমি ফরোয়ার্ড করে দেব। আচ্ছা—।' ভদ্রলোকের ঘাড নাড়ার পর আমার দাঁড়িয়ে থাকার পেছনে যুক্তি নেই। কিন্তু আমার হঠাৎ ইচ্ছে করলো ভদ্রলোককে প্রণাম করতে। ছেলেবেলায় প্রথম ঠাকুব বিসর্জন দেখে গুরুজনদের প্রণাম করার জন্যে যেমন এমটা ইচ্ছের আবেগ বুকে ছটফট করতো ঠিক তেমনি। বিরাট চন্দ্রাকার টেবিলের তলায় পা দুটো। খুঁজতে লাগলাম ব্যাকুল দৃষ্টিতে। শ্রীফারুক তাক তেই বলে ফেললাম গাঢ স্বরে, 'আপনাকে স্যার প্রণাম করব।'

ঠিক আছে যান।' পার্শ্ববর্তী ভদ্রলোক ভেটকি মাছের মতন মুখ করে আমার ইচ্ছেটাকে চুরমার করে দিলেন। পায়ে পায়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। আঃ! কি হাল্‌কা লাগছে নিজেকে। বিরাট ঐতিহাসিক বারান্দা, চওড়া কাঠের সিঁড়ি, প্রেস রিপোর্টার, পুলিশ ইত্যাদিকে আদৌ লক্ষ না করে আমি জুতোর টো-তে হাঁটতে হাঁটতে কয়েকটা শিস দিয়ে নিলাম। আপাতত পৃথিবীতে কোন সমস্যা নেই।

বাইরে প্রচুর আলো। দুপুর গড়িয়ে চলছে। ডালহৌসির ছুটি হতে বেশী দেরি নেই। গর্ভবতী মেয়ের নবম প্রহরের অস্বস্তি ভাব চারদিকে। এবার আমার সময় রুটিনে বাঁধা। ট্রামে ঝুলে সোজা চলে এলাম কলেজ স্ট্রীট বাজারের সেই বই-এর দোকানে। সুবোধদা এবং পঁচিশ থেকে পঞ্চান্ন কয়েক-জন নানা বয়সী মানুষ রোজ দোকানটার পিছন দিকে জমা হই। দুঘণ্টা ধরে টানা সাহিত্য চলে। আমি কনিষ্ঠতম কথা বলার অধিকার তাই কম। সুবোধদাই বলেন। বিখ্যাত এক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত উনি। বাকী সবাই এপাশে ওপাশে লেখেন।

আমাকে দেখেই সুবোধদা চোখ বন্ধ করে কিছু ভেবে নিয়ে আকর্ণ হেসে মাথা দোলালেন, 'তোমার গল্পটা পড়লাম। সেণ্টেন্স কন্সট্রাকসনে নজর দাও। কথা বলা আর লেখা এক জিনিস নয়।'

এসব কথায় আমি খুব বিব্রত বোধ করি। এবং সব চেয়ে বাঁচোয়া যে, কোন বিষয়ের আলোচনা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এখানে সুবোধদাই ব্রহ্মলোকে, আমরা তাঁর কথায় ডিটো দিই। আসলে আমাদের মধ্যে একটা রেষারেষি আছে সুবোধদার করুণা পাবার। সেই বিখ্যাত কাগজে লেখা ছাপাবার রাস্তাটা আয়াসসাধ্য। সুবোধদার করুণা প্রাপ্তির লোভ আমাদের আছে।

সন্ধ্যে ঘন হবার পর বেরিয়ে পড়লাম। এত মানুষের চলাফেরা, এই ভিড় দেখে আমার ক্রমশ বিরক্তি বাড়ছিলো। এখন আমি এক জায়গায় ফোন করতে পারি। আমার সমস্ত পাপ ও পাপহীনতার একমাত্র শরিকের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারি।

'আমি বলছি।'

'কলেজ স্ট্রীট থেকে করছো?'

'হ্যাঁ।'

'কেমন আছো?'

'ভালো।'

'ডানহাতের ব্যথাটা সেরে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'কটা সিগারেট খেয়েছ?'

'জানি না।'

'তুমি আমার কথা একটুও শোন না। কিছু বলছো না যে।'

'কি বলবো?'

'বেশী সিগারেট খাবে না, বেশী ঘুরবে না; কেমন?'

'আচ্ছা।'

'কাল ফোন করবে তো?'

'হ্যাঁ।'

'পরশু?'

'হ্যাঁ।'

'আমার জন্যে তোমাকে —।'

'রাখছি।'

'কাল করবে তো?'

'হ্যাঁ।'

একটা ফোঁপানোর শব্দ কানে আসতে না আসতেই রিসিভার নামিয়ে রাখলাম। ঠিক এই ক'টি মুহূর্তে, সারা দিনের এই সময়টুকু আমি সৎ. আমার বুকের ভেতর কোন ছলনা নেই, ফরমুলা নেই। আসলে মুখোশের তলায় দগদগে ঘা ভরা মুখে ওষুধ লাগাবার সময় এটা। প্রতিদিনের ফোনের সময়—আমার শান্তির সময়। একটা বাইশ বছরের যৌবন ওদিকে সর্বাঙ্গ শুকিয়ে বিছানায় লেপ্টে আছে। থাকবে সারা জীবন। শুধু দুটো হাত আর মুখ ছাড়া সর্বাঙ্গ নথর। ক্রমশ হয়তো ফুরিয়ে যাবে সেটুকু, আর কোন হাত প্রতিদিন হয়তো অপেক্ষা করবে না রিসিভারটা তুলে নিতে এবং গির্জায় স্বীকারোক্তির পরের তৃপ্তির স্বাদ আর পাবে না। আমার ভালবাসা, আমার কান্না, আমার শান্তি -এই সময়টুকুতে কয়েকটি সংলাপের উদ্যানে।

দরজা ঠেলতেই মনে হলো আমি নরকে এলাম। বিরাট হলঘরে অগুনতি টেবিল ঘিরে অসংখ্য নারী পুরুষ, মদের গ্লাস, সিগারেটের ধোঁয়া আর চিৎকারের মধ্যে পথ করে সেই ব্যালকনিতে উঠেই মল্লিকদাকে দেখতে পেলাম। সর্বাঙ্গ চেয়ারে বসে রয়েছেন। টেবিলে গ্লাসের তলায় চাপা দেওয়া বিলের সংখ্যায় বুঝতে পারলাম বেশ কয়েক পেগ হয়ে গেছে। জায়গাটা বেশ নির্জন। যদিও নীচের মেয়েদের শ্লীল হাসি আর তাদের শরীর জড়িয়ে ধরে মাতাল পুরুষদের চিৎকার এখানে আসে, সে সব দৃশ্যও স্পষ্ট দেখা যায় এখান থেকে কিন্তু ওপরে ওদের ভিড় কম।

'এতো দেরি হলো যে!' মল্লিকদার গলার স্বর বেশ জড়ানো। উত্তরে শুধু হাসলাম। 'লক্ষ্য রাখো তো, ঐ নিচের কোণের থামটার পাশে নিগ্রোটার সঙ্গে বসেছে ডবোথী। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কি খাচ্ছে ও? রাম না হুইস্কী?'

এখান থেকে সাদা চোখেই বোঝা মুশকিল। তবু গ্লাসের আয়তনে

বোঝা গেল বিয়ার। শুনেই মল্লিকদা লাল ছোপ ধরা দাঁতে হাসলেন 'গুড। জানো, ডরোথী খুব ভালো মেয়ে। ওর বাবা বললেন, ও নাকি স্কুলে ফার্স্ট হতো। কি খাবে?'

'আজ থাক।'

'না কিছু বলি। কেন খাবে না?'

'এমনি।'

মল্লিকদা একবার একটু ভালো করে দেখার চেষ্টা করে হাসলেন। গুড্। জানো তোমার বউদিকে আজ দেখে বুঝলাম দ্যাট ম্যান ইজ গোয়িং স্ট্রং।'

'মানে?'

'শী ইজ এক্সপেক্টিং হার থার্ড ইস্যু।'

বেশ কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারলাম না। মল্লিকদা গ্লাসটা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন, 'লেটস্ গো। ব—য়।'

মল্লিকদার পিছন পিছন নীচে নামছিলাম। সিঁড়ির মুখটায় প্রচণ্ড হইচই হচ্ছে। একটি ছাইমাখা মাগুর মাছের মতো মেয়ে, দুই বুকের মধ্যে একটি টইটুম্বুর পেগ-গ্লাস নিয়ে মাথাটা পেছনে অনেকটা বেঁকিয়ে দ্রুত তালে নাচছে। ওর সামনে একটি অ্যাংলো টেকো, প্রচণ্ড মোটা, বুড়ো ছুঁচোর মত মুখ করে গ্লাস থেকে চুমুক দেবার চেষ্টা করছে সমস্ত শরীর দুলিয়ে। কয়েকটা অ্যাংলো ছোকরা রক্ত গরম করা সুর বাজাচ্ছে উৎসাহ দিতে। ভিড়ের মধ্যে একটু দাঁড়াতেই দেখলাম টেকো ঠোঁট দিয়ে গ্লাসটা তুলে নিয়েছে এবং মেয়েটিকে একটা লম্বা গ্লাস ভর্তি বিয়ার এক ছুটে এনে দিলো। সবাই চিৎকার করল আনন্দে। মেয়েটি বিয়ার দেখে কান-ফাটানো খিস্তি করল বুড়োটার উদ্দেশে। আমরা পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে আসছিলাম। হঠাৎই মেয়েটি খিস্তি থামিয়ে গ্লাস ভর্তি বিয়ার ছুঁড়ে দিল আমার শরীরে। এবং দোলের দিনের শিশুসুলভ চাপল্যে হাততালি দিতে থাকল দাঁত বের করে। আচমকা সমস্ত শরীর বিয়ারে ভিজে যেতে আমি চিৎকার করে উঠলাম। সমবেত জনতার উল্লাসের মধ্যে মল্লিকদা আমায় বাইরে টেনে এনে ফিসফিসিয়ে বললেন, 'ডোণ্ট ওরি। এখানে এসে—না খেয়ে বেরোনোটা অত্যন্ত অভদ্রতা। ভগবান তাই তোমার শরীরে কিছু চালান করিয়ে দিলেন। থ্যাঙ্কস্।'

পাড়ার কাছাকাছি আসতেই ওদের সঙ্গে দেখা হলো। আড্ডা শেষ করে ফিরছে। আমি কাছে যেতেই সুহৃদ চেঁচিয়ে উঠল: 'ক' পেগ টেনেছ গুরু! দেশী, না জাহাজী? জয়ন্ত আমার মুখ বুক শুঁকে চাপা

আফসোসে যেন ফেটে পড়ে সুখে আছিস রে। রেগুলার মাল টানছিস। আর আমি শালা তিন হপ্তা—।' এবং আমি হঠাৎ এইসব কথা শুনতে শুনতে মাতালের মত কথা বলতে শুরু করলাম। ওদের সিদ্ধান্ত সঠিক রাখতে এই গভীর রাত্রে কয়েকটা যুবকের বুকে ঈর্ষা ঢুকিয়ে ইচ্ছে করে বেতালে হাঁটতে শুরু করলাম। আহা, কি আনন্দ।

সমস্ত বাড়ি অন্ধকার। এখন গভীর রাত। চোরের মত পা টিপে টিপে, একটুও শব্দ না করে তালা খুললাম। ঘরে আলো জ্বালাতে ইচ্ছে হলো না। আমি এখন এসেছি এটা এ বাড়ির কাউকে জানাতে ইচ্ছে হচ্ছিলো না আমার। এই রাত্রে যখন এ বাড়ির সবাই গভীর ঘুমে অচেতন, যখন অন্ধকার—চোঁয়ানো বাতাসে বেশ একটা ঠাণ্ডা আমেজ আসছে তখন আমার জামা থেকে উপচে পড়া বিয়ারের গন্ধে মাথা ভার-ভার করতে লাগলো। জামা খুলতে গিয়ে মনে হলো কিছু একটা পড়ে গেল পকেট থেকে। অথচ আলো জ্বালার ইচ্ছে হচ্ছিলো না কিছুতেই। এই অন্ধকার মেঝেয় পাতা বিছানায় শরীর এলিয়ে এবার ঘুম। সারা রাতের জন্য ঘুম।

কিন্তু বিছানায় শুয়েও অস্বস্তি ভাবটা কাটলো না। আমার পাশ থেকে বিয়ারের গন্ধ আসছে। অথচ জামাটা আমি ওই কোণায় ছুঁড়ে ফেলেছি। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আমি আলো জ্বালালাম। পোস্টকার্ডটা কুড়িয়ে নিতেই আমার সমস্ত শরীর যেন কুঁকড়ে ছোট হয়ে আসতে লাগলো। গতকাল থেকেই বুকপকেটে পোস্টকার্ডটা ছিল। এখন আমার হাতে পরা পোস্টকার্ড থেকে ভুরভুর করে বিয়ারের গন্ধ আসছে। সম্পূর্ণ ভেজা। চিঠিটার লেখাগুলো ঝাপসা হয়ে গেছে—পড়া যাচ্ছে না কোন শব্দ। অথচ কোন্ অলৌকিকতায় শেষ শব্দগুলো বেঁচে থেকে আমার সকল ইচ্ছাকে একটা ভাঁড়ের পোশাক পরিয়ে দিল জানি না। কিন্তু দু'চোখ বন্ধ করলে এই বুক কী ভরাট মনে হয়, শব্দগুলো বাজে: 'ভাল থেকো। ইতি, আশীর্বাদিকা, তোমার মা।'

অন্য নকসি

আবুল বাশার

রুহুল ফকির পরম বিস্ময়ে মাথার আকাশে চেয়ে রইল কোন এক আশ্বিন মাসে। গতকাল আশ্বিনে-আঁধি শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আজ দেখা যাচ্ছে, আকাশ থেকে এখনও একখানা চটা-মেঘ স'রে যায়নি। থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিথর। ওপারে কুষ্টিয়ার মেলায় এপারের কীর্তনাঙ্গের দানাদার বাউল-গান শোনাতে গিয়েছিল সে। ওপারের গানে কীর্তনীয়ার চমক নেই, আছে ফকির সারল্যে সহজ গীতিময়তা। সেই মেলার সম্মিলনে এইসব কথা উঠেছিল,। আরো অনেক কথাই উঠেছে, আসন-সংক্রান্ত সমালোচনা হয়েছে। আসনে-ফকির কী প্রকার গোঁড়া. মতিচ্ছন্ন, শিষ্যশাবকদের প্রতি কী চাতুরী করে, সব কথাই হয়েছে। আসনেদের সঙ্গে বিতণ্ডা হয়েছে প্রচুর। যেখানে আসন সেখানেই দুর্নীতি। রুহুলের মন ভাল নেই। এখন তার আঁধি-নিষিক্ত হাওয়ায় কাঁড়িয়ে শীত ধরেছে। চরে হাওয়ার প্রহার খুব মারাত্মক। চেয়ে দেখল, মেঘের পেটে বাজ আর আগুন এখনও নিহিত, ক্রোধ যায়নি সবখানি। চমকাচ্ছে মৃদু মৃদু। চটা মেঘ উদাসীন। কিন্তু মনে তার আশ্চর্য গুমোর ' চালবে মনে হচ্ছে।

রুহুল দাঁড়িয়েছে ভি-পয়েন্টের উপর। ঠিক তখনই এক মৌলবী সাহেব সাইকেল নিয়ে পুব মুখো দাঁড়িয়ে। ওপারে এক চাকা, এপারে আর এক চাকা। এক রীমে ভারতবর্ষের কাদা, অন্য চাকায় বাংলাদেশী কাদার ন্যাড় জড়িয়ে গিয়েছে। মনে মনে রুহুল ইংরাজদের শাসনপদ্ধতির অপূর্ব মহিমার তারিফ করে। তারপর মৌলবী মিজানজীর কালো কার্ল মার্ক্স-মার্কা ঝাঁকড়া খাটো সুন্নতের দিকে তাকায়। মাথায় জড়ানো কালো পশমী মাফলার, গায়ে হলুদ রঙা খদ্দরের মোটা চাদর। কিছুটা কিম্ভূত দেখায়। পা খালি, হাঁটুর উপর এক পায়ের লুঙ্গি উঠে গিয়েছে। কাদায় খালি পা ম্যাড়ম্যাড়

করছে। সকাল থেকে বিকাল অব্দি রোদে চরের এ'টেল কাদা পুরোপুরি শুকায়নি। মেঘের গলায় অকস্মাৎ ফাটা শব্দ হয়। জমিনের মাঝামাঝি ওরা দাঁড়িয়ে পড়েছে। মিজানজীর জমি এটা। জমির মাঝ বরাবর সীমান্ত-রেখা টেনে রাখা হয়েছে। অবশ্য তা চোখে দেখা যায় না। শুধু দু'একটি বিক্ষিপ্ত ছিটানো পিলার চোখে পড়ে। এটা একটা ভি! ইংরাজীর V। ভি-য়ের এলাকা। সীমান্ত-রেখা সরল নয়। বক্র। এ'কে বে'কে উঠে নেমে যায়। ফলে ইংরাজী V-আকৃতি গড়ে ওঠে। এই V-এর দুই বাহু, আর বাহুমূল আছে। বাহুমূলে দাঁড়ালে, এক চাকা বাংলাদেশ, অপর চাকা ভারতবর্ষ।

মৌলবী স্থির। মেঘের দিকে চাইলেন। বললেন—আছ ছালামো আলা মানিত্তা আবাল হুদা।

কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল রুহুল। এ-কেমন সহবৎ দেখাচ্ছেন খোদার বান্দা। ছালাম দিচ্ছেন বুঝি? কিন্তু রকম যে অন্যধারা মনে হয়। কথার কী মানে খোদা মালুম। কিন্তু আলাপ মন্দ নয়। বেশ বেশ! রুহুল বলে—ছালাম মৌলবী সাহেব।

—জী। আছ ছালামো আলা মানিত্তা আবাল হুদা।

মৌলবী ফের গলায় সুর তোলেন। শুধিয়ে ওঠেন—গান গাইতে যাওয়া হয়েছিল বেশরা ফকিরের?

রুহুল নির্লিপ্ত উত্তর করে—আজ্ঞে! হয়েছিল। কিন্তু আপনার আরবীখানার অর্থ যে বোঝা যায় না মিজানজী।

মৌলবী বলেন—কিছু নয় ফকির সাহেব। ছালামই দিলাম আপনাকে।

রুহুল কিঞ্চিৎ আহত গলায় বলে—এমন তো কখনও শুনিনি।

মৌলবী জবাব করেন—তা শুনবেন কেন? এ-ছালাম তো সচরাচর দেওয়া হয় না। সকলে জানেও না। বিধর্মীদের জন্য এটা স্পেশাল। এটাই বৈধ! 'আছ ছালামো আলাইকুম' দিতে নেই। ওটা মুসলমানদের নিজস্ব রীতি, নিজেদের মধ্যে। আপনাকে ওইটেই দিলাম!

যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে খানিকটা এসেছে, পুরোপুরি ইসলাম গ্রহণ ক'রে মুসলমান হয়নি বা হতে পারেনি, তার জন্য এই নমস্কার।

রুহুল বলে—বেশ করলেন! আমরা তো মুসলমান নই, এই ফকিররা। কিন্তু কোরান-হাদিসের মধ্যে এত বড় অপমানের ব্যবস্থা আছে, আমার জানা ছিল না। যাই হোক। ছালাম দিলেন, আপনার হাঁটুর উপরে কাপড়। সেটা কি ঠিক হ'ল?

মৌলবী বললেন—গু-মুত খাওয়া ফকিরের বেলা এইটেই জায়েজ মনে করি। তা এখন যাবেন কোন্ পানে? হারুডাঙ্গা তনুর ঘর? বিটির আমার কত প্রকৃতি। সেই প্রকৃতির কত ফের-ফাঁপর। সাত-ভাতারীর ষোলকলা, কিন্তু 'আছে-কি-নেই-ভাতারীর' চৌষট্টি। যান চলে যান। আসমানের মেঘখানার মতোই বিটি আমার হামলায়। এক আইলে ঢালে, অন্য আইল শুখা। খটখট করে। দ্যাখেন ক্যানে, কেমন ফুরফুরিয়ে নীলা করছে।

রুহুল চেয়ে দেখে, সত্যিই বড় অদ্ভুত দৃশ্য। বৃষ্টি হচ্ছে। পশ্চিম আকাশে সূর্য সুবর্ণ। পুব-আইল ভিজিয়ে দিচ্ছে মেঘ। পশ্চিম ভাগ শুকনো। বাংলাদেশ ভিজে যায়। একই মেঘ ভারতবর্ষে বৃষ্টিচ্ছায়া গুটিয়ে রেখে ঝ'রে যাচ্ছে ওপারে। নিয়ম উল্টোও হয়। দেখতে দেখতে রুহুল ফকির প্রকৃতির রকমারিতে দিশে হারিয়ে ফেলে। মৌলবীর ক্ষেতের একভাগ সিক্ত, অন্য ভাগ শুকনো বিস্ময়ে নিশ্চুপ। মৌলবীর গলা থেকে তপ্ত সীসে ফকিরকে মর্মে বিদ্ধ করে। ফকির হাঁটতে শুরু করে হারুডাঙ্গার বস্তির দিকে। মনে মনে বলে—কোরান-হাদিস, তোমার নিজস্ব সম্প্রদায়ের সম্পত্তি। সেখান থেকে তোমরা আমাদের উচ্ছেদ করতে চাও। তোমরা বল বিসমিল্লা, আমরা বলি বীজ মে আল্লা, মানুষ বীজরূপী। এই বিশ্ব বীর্যময়। সে মর্ম তুমি কখনও বুঝবে না শরার মৌলবী। চিরকাল আমাদের গু-মুত খেতেই দেখলে। রূপ-রস-বীজ-মাটির করণ বিষম করণ, কী করে বোঝাই তোমাকে? চলি, তোমাকেও সালাম দিই, আজ ছালামো আলা মানিত্তা আবাল হুদা! তুমিও আমার কাছে বিধর্মী বই নও। তবে তোমার জন্যে একখানা গান শুনিয়ে যাই, ওপার থেকে এনেছি। রুহুল দোতারায় সুর টানে :

আহা রে খোদার বান্দা
কার প্রেমে আছো বাঁধা?
একদিন তোর হবে আঁধার
ভাবে বোঝা যায়।
টাকা পয়সা জমিদারি
পাইয়া সুন্দর নারী
করিতেছ বাহাদুরী
এই দুনিয়ায়।

মৌলবী মিজানআলি পায়ের তলার জমিনে নিচু হয়ে ভুরভুরে মাটি তুলে

তালুতে চটকাচ্ছেন। ফকিরের জবাবী গানে অপমানের পাল্টা ধাক্কা এসে ওর মুখকে আরো কালো করে তোলে। ফকিরদের এই হচ্ছে স্টাইল। সুরে জবাব, সুরে বিদ্রূপ, সুরে ফরিয়াদ ও বিদ্রোহ। ভাবখানা যেন কেমন ধারা। তোমার আত্মার কালো দাগ তাদের নজর এড়ায় না। তনুর জীবন নিয়ে এত অপশ্রান্ধ কেন, রুহুল ফকির কী জানে না? সব জানে। আর এই যে বেহক ক্রোধী মৌলবী, তার নকশা ফকিররা কম চেনে না। রুহুল তরুণ ও াব কম পাশ ফকির। চক্ষুষ্মাণ দিনদারীতে। গাইছে:

আছে দুই কাঁধে দুই ফেরেস্তা
আইন মতন করেন ব্যবস্থা
কালি-কলম কাগজের বস্তা
সঙ্গে বাখো নাই।
উল্লাসে কবিলি প্রেম
ভুলে গেলি খোদার নাম
না করিলি নিজ কাম
কী হবে উপায়?

গাইতে গাইতে ফকির হাবুডাঙ্গার চরবস্তির দিকে এগিযে যায। সন্ধ্যা নামে। চরের আকাশে নির্মেঘ সন্ধ্যা-তারকা টলটল করে।

চব-সীমান্তেব জীবন খুবই অসম্ভব অদ্ভুত, বিশেষ এই চব-সীমান্ত-গ্রাম হারুডাঙ্গার বসতি ঘিরে জীবনেব রূপ আরো উত্তেজক কটু। অস্থির চঞ্চলতায় পীড়িত সেই অস্তিত্ব। এবার সেইকথা।

তনু নকসি কাঁথাখানা সময়ের সঙ্গে পাল্লা ধরে বুনছে। ফকির পৌঁছনোর আগেই কাঁথাব শেষ ফোঁড় দেবে স্থিব কবেছে। ফকির তো এক রাতের বেশি হারুডাঙ্গায বাস কববে না। তার নানা কারণ। লোকে ফকিরদের সয় না। রুহুল ফকির বেহক শবা মৌলবীদের চক্ষুশূল। নানা রকম গান বেঁধে শুধু যে সুন্নীদের তাতিয়ে রাখে, তাই নয়। সুন্নীদের বিচারে, ফকিরের নজর খারাপ। সেইখানেই মস্ত বিবাদ আছে। আর তনু সেই বিবাদের আড়ালে জীবনের অন্য মহিমা দেখেছে। অস্থিব জীবন খানিকটা দড় ডাঙ্গাল জমি প্রত্যাশা করে। শেখপাড়ায়, বুধিডাঙ্গায, কাহাবপাড়ায় কিংবা হারু-ডাঙ্গার চরে সেই ডাঙ্গাল সত্যিকাব দড় জমিন কোথায়? তনু কুপির শিখা হাতেব আড়াল কবে ঘনিয়ে ওঠা সন্ধ্যাব দিগন্ত বিস্তৃত ধু ধু চবের পূবপারে চোখ মেলে খানিক স্থিব হযে দাঁড়ায়। শিরশিবানো হাওয়া দিচ্ছে চরে। এই শীতে ফকির কেমন আছে কে জানে। আজ তার ফিরে আসার কথা।

দূরে একবার সন্ধ্যার মুখে দোতারা বেজে উঠে থেমে গেছে। সেটা বিভ্রম। মনেই বেজেছে দোতারা। এই হয়. এই দেহই দোতারার মতন বাজে। লাউবাঁধা এই তনুর দোতারা প্রকৃতির রূপে অপরূপ। রমণী রূপের কূপ। বলতেন নীলরতন গোঁসাই। যেমন কিনা লাউয়ের নিতম্ব মধ্যে সুর থাকে, এই বড় নৈরাকারের মাঝ থেকে সেই সুর উঠে আসে। কিন্তু এই দেহ কি কম কথা ? আকারের মধ্যেই নিরাকারের বাস। তাই বা কেন ? নিরাকারের ধন্দ কিছু নয়। ধন্দ এই দেহের। দেহ ছাড়া রূপও নেই, সুরও নেই। সেই তৃষ্ণাই বাউলের তৃষ্ণা। বাউল মানে পাগল। সেই পাগল কখন আসে, তনুর আজ সেই প্রতীক্ষা।

নকসির শেষ ফোঁড় হয়ে গেল। ফকিরের সুরেলা দোতারা দুয়ারে এসে থামল। আজ চরের অন্ধকার বড় নিবিড়। তনুর ভয় করছিল। শেখপাড়া, কাহারপাড়ার সুন্নীরা চায় না. হারুডাঙ্গার চরে রূহুল ফকির আশ্রয় নেয়। পনের দিন আগে দহ-র ডিঙ্গিতে করে বাউল যখন দেহের ওপর যাচ্ছে, মাঝি কাদের মিঞা তনুকে চোখের ইশারায় অশুভ ইঙ্গিতে বুঝিয়েছিল, সময় খারাপ।

তনু জানে. সময় কীভাবে খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কেন ঐধারা চোখে অশুভ ঘোর ফুটে ওঠে মাঝির। তথাপি তনুর মুক্তি ঐ পুব পারে ঊষার কুসুমে ঝলমল করে সেইদিন। কেন করে. সে-কথা কেউ জানে না। কারণ সেটা তনুর কল্পনা।

আজ বিকালে মিজান মৌলবী তনুকে শাসিয়ে গিয়েছে। জমি দেখতে এসেছিল সাইকেল হাঁকিয়ে। শাসিয়ে রেখে ভিটেয়র দিকে দাবড়ে গেল বাইক। কথা কী ? না, তানজিয়া ওরফে তনু খাতুন হাজমত সেখের বউ। দ্বিতীয় পক্ষ। শেখপাড়ার সব গেরস্ত, ব্যবসায়ী, টাঙ্গাওলা সবাই জানে সেকথা। ভুলে যেও না। মুসলমানের বউ হয়ে রাধিকেগিরি করে না। ফকিরের সাথে মুসলমানের জল-চল থাকলেও তারা আমাদের কউমের (গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়) কেউ না। সেই পার্থক্য ঘুচিয়ে দিও না বিবি। তুমি ওয়াক্তী নামাজ ছেড়ে দিয়েছ, দেখতে পাই। এক ওয়াক্ত নামাজ কাজা হলে আশি হুগবা দোজখ মনে রেখো। এক হুগবায় আশি বছর। আশি হুগবায় কত ? আশি গুণিতক আশি কত সন হয় ?

শুনতে শুনতে তনুর মুখ বেঁকে গিয়েছিল। ঈষৎ হাসিতে ফুটে উঠেছিল অবাধ্যতার রেখায়ন। এই ধরনের চাপ কতদিন ধরে চলছে। স্বামী হাজমত সেখ এপারেরই লোক। তার প্রথম পক্ষ মৃত। কিছুদিন আগে বিষ খেয়ে মরেছে, স্বামীর বেবৃশ্যা আহ্লাদ সইতে পারেনি। কারণ হাজমত তৃতীয় পক্ষের

ব্যবস্থা করছে ওপারে, রটনা হয়েছিল। প্রথম পক্ষের মৃত্যুর পরপরই ওপারে লেহেজানকে নিকে করল হাজমত। চর এলাকায় এসব কোন ব্যাপারই নয়, ডালভাত। দু' নম্বরী ব্যবসায় দু'পারে দু'টি বউ রাখা স্বাভাবিক সিদ্ধ কর্ম। চালাক লোকেরা তাই করে। জগত তাতে বিস্মিত হয় না। প্রথম বউটির মাথায় পোকা হয়েছিল। তনু জানে, দু' নম্বরী মাল চালানী ব্যবসা চরের আসল জীবিকা। ভিটেয়ের ওপাশে এপাশে ঘর আছে একই লোকের। ওপারে চার চালাও যার, এপারের দালানও তারই। দালান আর কী, কাঁচা বাড়ির কোঠাপাড়া ঘর হলেই তাকে দালান বলতে হবে। ওপারে হাজমতের সেই দালানে লেহেজান শুয়ে থাকে। তনুও ওপারেরই মেয়ে। মাল বইবার সুবিধার জন্য এপারে এনে কাহারপাড়ায় হাজমত দালান তুলেছিল। তারপর ওপারে লেহেজানকে ফুসলাতে লাগল। যার বউ থাকে না, তার রাখনী থাকে। রাতের অন্ধকারে এই রাখনী বা বউরা কেউ কেউ অনেকেরই বস্তাভর্তি জামাকাপড়ের মালপত্তর কাঁধে করে পার করে দেওয়ার বেলা সাহায্য করে। তাছাড়া দু'পারে দু'খানা বউ থাকলে আর সেকথা বি. এস. এফ. দের কানে তুলে রাখলে সুবিধা। কোথা যাওহে হাজমত? ওপারে বউ আছে, বালবাচ্চা আছে, তাই যাচ্ছি। কোথা যাও তনু বিবি? ওপারে স্বামীর কাছে শুতে যাচ্ছি, স্বামী কয়দিন আমার সতীন ছেড়ে আসেনি।

মনে পড়ে একথা শুনে রুহুল ফকিরের চক্ষুস্থির হয়ে গিয়েছিল। কে এক নচ্ছার ছোকরা ফকিরের সামনে মস্করা করে সাঁজাল পোয়াতে পোয়াতে বেফাঁস করে বলেছিল গত সনে। কী বলেছিল? মনে পড়লে আজও তনুর মুখমন্ডল শরমে রাঙিয়ে ওঠে তৎক্ষণাৎ। আসলে হাজমত আর এপার মুখো হত না সেই সময়। ছোকরা বলেছিল—ওপারে তনুর সোয়ামীর আর এক পক্ষের গেরাস্ত, জানলেন ফকির। এপারে একলা ভোঁ ভোঁ করে। জিন্দেগির টানাটানি কী জিনিস তনুকে না দেখলে মালুম হয় না। রাতে শুতে যায় মেয়ে, বোঝেন রহস্য!

তারপর ছোকরা খিকখিক করে হেসে উঠে বলেছিল—দিনের বেলা এপারে দাসীগিরি, রাতে মাল বহে গিয়ে বা আনতে গিয়ে সোয়ামীর পাশে শুয়ে আসা, হেঃ হেঃ! জিন্দেগির বাহার দেখেন কী। ভিটেয়ের দুখানা হাতে মরণ নিবাস করে। মিলিটারির গুলি ছুঁড়লেই সাধের বুকখানা এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে চলে যাবে। মুন্ডু রইবে ইন্ডেয়, ধড় থাকবে বাংলায়, কচুপাতার পানি ছলকে গেলেই, ব্যস্! এই ভোজবাজির চরায় আপনি কেন এলেন জী! তনু হল গে চর-চরানী মেয়ে, আপনার গান শুনলেই চোখ বুজে কাঁদে!

কথা কয়টি বলেছিল সোভান, ছয় মাস আগে সেই তাজা ছেলেটা মিলি-

টারির গ্লিতে নিকেষ হয়ে গিয়েছে। কারণ প্রতি বছরই দ্'একটি লাশ সীমান্তরক্ষী বাহিনী ভি-পয়েন্টে ল্বন্ঠিত করে ফেলে রাখে, ওটা ওদের কড়া পাহারার দর্শনীয় নম্না। কিন্তু তা বলে চরের বাসিন্দারা থেমে থাকে না। এপার ওপার এবেলা ওবেলার পথ, সীমান্ত রেখায় জীবন আটকায় না, তার মান্যতাও কিছ্ নেই এদের কাছে। ভি-পয়েন্টের বাহ্ম্লে পথ সংক্ষিপ্ত, পাহারাও কড়াকড়ি, ফের সেখানে চোখে ধ্লো বা পকেটে গোঁজা মেরে পথ খালাস রাখতে হয়। দ্ই বাহ্র গায়ে বি. এস. এফ পাহারা মোতায়েন। বিশদ গাওনা আরো আছে, তবে ছোটকথায়, বাহ্জ্বড়ে ম্ত্যু ঘ্রে বেড়ায়, চরে, বেড়ায় ছায়ার মতন। এরা জানে না, কোন পারে জীবনটাকে খ্ঁটায় বাঁধা যায়। এপারে ওপারে শাদি হচ্ছে, যাত্রা আলকাপ বাউলগান শ্নতে যাচ্ছে আসছে, ওপারের একটা বাচ্চা ছেলে এপারে শেখপাড়ায় এসে হাটবাজার করে সন্ধ্যার ম্খে ফিরে গেল, সবই চলছে। কিন্তু ম্ত্যুও জীবনের মতোই চঞ্চল। পারাপার মানে না। কিন্তু তন্র জীবনে একখন্ড ডাঙ্গাল দড় জমির বড় দরকার ছিল, খ্ব নিজস্ব সেই আবাদপাতি জমি জিরাতের দেশ। জলা নয়, বানভাসি নয়। পদ্মার উথালি-পাথালি চরের আতঙ্ক নয়। ফকিরের অচঞ্চল আত্মার মতন স্থির। আর যেন কী?

তন্ মনে করতে পারল না, ফকির তাকে কত কথা শ্নিয়েছে। বলেছে, হৃদপিন্ডের উপর কেমন করে ন্রের বাতি জ্বলছে। সেই রৌশনীর বিশদ খবর তাকে শোনাতে চেয়েছে ফকির। সেই ফকির আজ ফিরে এল। একপক্ষ কাল পর অমাবস্যার নিবিড় অন্ধকারে। তন্র হাতে কুপির শিখা কেঁপে কেঁপে ওঠে।

স্বাধীনতার সময় বাংলা যখন দ্ভাগ করে গেল ইংরাজ, তখনকার জমানায় একটা মজাদার কলের গান চাল্ হয়েছিল। দহ-র ডিঙ্গি বাইতে বাইতে কাদের মিঞা এখনও সেই গান গাইতে থাকে। ভুল গিয়েছে অনেকখানি। ভুলে যাওয়া পয়ারে নিজের মতন করে স্র আর ছন্দ গ্ঁজে ভাষা তৈরি করেছে। সেই গানের মধ্যে জীবনের যে অস্থিরতা দ্লে উঠেছিল তা আজও দোলায়মান।

ওরে বাবারে বাবারে বাবারে বাবা! আচমকা গেয়ে ওঠে ধমকানীর ত্রাসে কাদের মিঞা, যেন বাজ প'ড়ে গেল।

এবার স্বাধীনতা পেলি বাবা
স্বাধীনতার গ্ঁতায় গরিবের প্রাণ যায়
এখন বল কোথা যাবা
কোথায় বল হাওয়া খাবা
হিন্দ্স্থানে না পাকিস্থানে বাবা
বাসা এখন বাঁধিবা?

তনুর এই গানখানা শুনলে হাসি পায়, শুনতে শুনতে গা দুলে ওঠে; আঁচলের ফুঁপি মুখে গুঁজে ভাবতে হয় চরচরানী মেয়ের চরান্ধকার জীবনের থই কোথাও নেই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃত্যুভয়জড়িত চোরা মাল বইবার প্রতি রাতের রহস্য তাকে হাজমতের যৌন-দাসী করেছে।

এরা সব চোর ছ্যাঁচোড়, দাগী আর খুনী। এপারে খুন করে ওপারে পালিয়ে গিয়ে কিছুকাল বসবাস করে। দেশের রাজা বদল হলে, এখানকার জোতদার মহাজন নেতার দু' নম্বরী কারবারের নাফাদার মোড়লের মোড়লীর ছত্রছায়ায় রাজনৈতিক গ্যারান্টি পেলে ফিরে আসে। খুন করে মোড়লের মহাজনের ইশারায়। এখানে নানা রকম গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আছে। ফরাজী আর হানাফীদের বিবাদ আছে। মসজিদে শুক্রবার জুম্মাদিন এক আজান না দুই আজান, মাথায় টুপি গোল না চৌকো, মুর্দা কবরে কাৎ না চিৎ হয়ে শোবে তা নিয়ে বিসংবাদ অন্তহীন। এইসব বিবাদ থেকেও কখনও বা ঘর পোড়ে, কারো মাথায় ঘোল ঢালা হয় বা মুন্ডুপাতও হতে পারে। তাছাড়া রাজনৈতিক গুপ্তিমার এখানকার একটা উৎসব। দু' নম্বরী টাকায় জুয়া খেলা চলে, সেখানেও মারপিট। অন্যের বউয়ের কাছে রাতে চলে যায় কালো লোভী ছায়া, হঠাৎ মাঝরাতে চোরপড়ার ভয়ার্ত নারীকন্ঠের চিৎকার, আসলে চোর নয়, লোভী একটা আদিম নগ্নছায়া, ধরা পড়ে গিয়েছে। ফলে একচোট মার হয়ে গেল। তনু এই জীবন কখনও চায়নি। পেটের দায়ে জীবনটা তার কেমন হয়ে গিয়েছে। ফাটা সেই রেকর্ডখানা ঘষটে ঘষটে বেজেই চলেছে ঃ

হিন্দুস্থানে না পাকিস্থানে
কাহারপাড়া নাকি হারুডাঙ্গায়
নাকি ওপারের লেহেজানের দালানে
জীবনটা স্থির হয় ?

তনুর দীর্ঘশ্বাস পড়ে কুপির শিখার উপর। তখনই চোখ পড়ে উঠোনে বাউলের ছায়া।

বাউল বলে—তনু, আমি এলাম।

তনু বলে—সে সুর আগেই শুনেছি ফকির ছায়েব। দাওয়ায় বসেন। চালজল সেবা করেন। আপনার সাথে ঢের কথা আছে। মানুষের সেবাধর্ম এখনও বুঝি না, আপনাদের মানুষ-পূজার পেন্নাম করা রীত আমায় শিখিয়ে দেবেন এইবেলা ?

রুহুল বলল—সে হবে'খন। আস্তে আস্তে শেখো। চালজলের নিয়মটা কি তোমার খারাপ লাগে ? তোমায় যাবার দিন ব'লে গিয়েছিলাম, আমার জন্য চালজল রেখো, পেট হচ্ছে চামড়ার মশক। যত বাড়াবে তত বাড়বে,

কমালে কমে, মনে আছে তোমার ?

—তা আর নেই ? আপনার সব কথা আমি মুখস্ত করব। বলেই নিঃশব্দে মিঠে করে হেসে নেয় তানজিয়া। বাঁ হাতে কুপি ধ'রে ডান হাতে গুটানো ছোট মাদুরখানা দাওয়ায় মেলে দিয়ে বলে—একটু বাদে চা দেব। পরে সাঁজাল ক'রে দেব, চরের ঠান্ডা আপনার সইবে না।

কাঁধের কাপড়ের ব্যাগ ঘাড় থেকে নামায় রুহুল, মাদুরে বসে, খুঁটিতে দোতারা হেলান দিয়ে রাখে। তনু খুব দ্রুত রুহুলের পায়ের কাছে টিনের বদনায় জল রেখে শুধায়—ঢেলে দিব ?

রুহুল বলে—তুমি মুসলমানের বউ। পায়ে জল ঢেলে চুলের গোছায় মুছিয়ে দেবে যে বেচারিকে, সে তো তোমার পর হ'য়ে গিয়েছে, তোমার স্বামীধন ? আমি তো ফকির। আমি চাই সত্যিকার একটা স্বাধীন মেয়ে আমার পায়ে জল ঢেলে সুখী হোক। তিন নোকতা কথা, তার একটা তানা ছিঁড়ে গিয়েছে। বাকি দু' নোকতা নিজেই তুমি ছেঁড়ো।

হাজমত ফরাজী। তিনমাসে তিন তালাক দেবে তনুকে। ফরাজীদের হাদিস হানাফীদের মতো হাল্কা নয়। একমুখে তিন মিনিটেই তো তালাক হয় না। তিন চাঁদ লাগে। অবিশ্যি এইসব কারণেই হয়ত ফরাজীদের মধ্যে তালাকের চল কম। কিন্তু অনুশাসনে ফরাজীরা হানাফীদের চেয়ে বেশি দড়। হাজমত তনুকে এক তালাক শুনিয়েছে, বউকে বশে আনবার জন্যে। তনু প্রথম থেকেই বাগে আসে না এমন নয়। আসলে এই ফকির আসার পর থেকেই কেমন একটা রোখ এসেছে মেয়েটার মধ্যে। কী সেটা, হাজমত বুঝতে পারে না। ওর চোখ সাদা। ওর যেন মনে হয়, লেহেজানকে নিকে করার পর তনুকে সে খানিকটা কাঙাল ক'রে দিয়েছিল। চর পেরিয়ে শুতে যাওয়া, তারপর কত রাতে স্বামীর দেহ নাগালে পেত না তনু, লেহেজান দখলে রেখে দিত। সেইটে হিংসে বটে অপমানও বটে। তারপরই তো রোখটা এল। কথাটা কারো কাছে ভাঙা যায় না। মিজান মৌলবীকেও বলা যায় না।

হাজমত বলেছে—পুরো তালাক তো দিব না মৌলবী ছায়েব। খানিক ডর ধরিয়ে সিধে করব। আজকাল আমাদেরও ডরপুক হয়, পাছে না মর্দানী করে মোকদ্দমা ঠুকে খোরপোষ চায়। চোখমুখ অলা তেজি মেয়েছেলে, পেটে বিদ্যেও আছে দু' ফোটা। তিরাইলে হাইস্কুলে পড়ত দু' কেলাস, খুব গরিব বুলে সতীন-ঘরে এস্যাছে। উর ভিতুরির ছটফটানি যে কী সোয়াদে তৈয়ারি হ'ল, শালা ফকিরই জানে। আজ রুহুল ফকির তনুকে বলল,—সত্যিকার একটা স্বাধীন মেয়ে আমার পায়ে জল ঢেলে সুখী হোক। তিন

নোকতা কথা, তার একটা তানা ছিঁড়ে গিয়েছে। ফকিরের উচ্চারণ চিন্তার গভীর স্পর্শ থেকে আসে। অস্পষ্ট অনুভব করে তনু। স্বামীধন পর হ'য়ে গিয়েছে, খুব সত্য কথা। কাহারপাড়ার দালান ছেড়ে তনু হারুডাঙ্গায় একলা আছে বছর ভর। স্বামীর ঘরে নেই। মাস তিন থেকে হাজমতও না-ছোড় হ'য়ে এপারে মিজান মৌলবীর লেজে খেলছে। কাহারপাড়ায় রেখে মাল বওয়াবে, অবুঝ মেয়ে রাতে কুকুরের মতন স্বামীর আলিঙ্গনে ধরা দিতে যাবে, সেটা রদ হ'লে পুরুষ তো ক্ষেপেই ওঠে। কামড়াবে, কিন্তু পথ পাচ্ছে না। নাগাল দিচ্ছে না তনু। তার মনের মধ্যে খুব পুরনো গোষ্ঠীযোগের মেয়ে, মাতৃতন্ত্রের সাহসিনী নারী, স্বতন্ত্র দাপুটে নারীবোধ ছটফট করে ওঠে ফকিরের কথায়। তনু জানে না, সে নিজেই বা কে ? কিন্তু বুঝতে পারে, ফকির তাকে খুব সাহস দিয়েছে। গত বছর একবার ফকির এই পথে ওপারে গিয়েছিল। সেইবার ঈষৎ হলুদ জামা, সাদা ধুতি আর ঘাড়ের দু পাশে বুকের মাঝভাগ অব্দি ঝোলানো ফোতা কাচতে দিয়ে তনুকে বলেছিল—ধুয়ে দাও। এই নাও সোডা। ভাটার ক্ষার। দোকানে কিনিনি। ইট-ভাটার মধ্যে এই ক্ষার পাওয়া যায়, বিনে পয়সায় সাবানের কাজ হয়। তনু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। তার বিস্ময়-মুগ্ধ চোখে চেয়ে বলেছিল রুহুল—গরিবের ধর্ম এই ফকিরের ধর্ম। আয়োজন বেশি লাগে না। অল্পে বাঁচা যায়, খুব কমে সন্তুষ্ট আর পূর্ণ হওয়া যায়। কথাটা ফাঁকা কথা নয় তনু বিবি। গরিবরা, মার খাওয়া, একেবারে মাটির তলার, জীবনের চাপে পড়া অকুলীন বিবর্ণ আমরা, খুব নিজের মতন করে এই বাঁচার ধর্ম গড়েছি। ভোগ করব জীবনকে, দু'মুঠি খাব দশ মুঠি ছিটিয়ে ফেলব, তারপর হায় হায় করব, তেমন তো নয়। খোদা বলেছে, ইন্নাতায়না কাল কাওছার আমি তোমাকে কাওছার দান করেছি। কোরানের কথা, সেটা কী ?

তনু সাথে সাথে বলেছিল—আমার মা রাজশাহী জোয়ারীর মেয়ে, ফকির-সঙ্গ করত। তা নিয়ে বাপের সাথে বনল না, বাপ গো-মাংস খেয়ে মুসলমান হ'ল। তারপরই মা কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। তেমন মানুষ না পেলে, শরার ফাঁস গলায় পরে ফকির সাহেব, সেই থেকে আমিও পতিত হয়েছি, শুধু টলটলে বেড়াচ্ছি। পেটের খিদে আর দেহের আশকে জীবনটা দেখুন কেমন জব্দ হয়ে গিয়েছে। দু'মুঠো ভাতের জন্যে চোর হয়ে আছি।

রুহুল বলেছিল—কিন্তু খোদার বয়ান, 'আমি তোমাকে কাওছার দান ক'রেছি।' এমন এক বেহেশতী পানীয়, যা খেলে খিদে তেষ্টা কমে যায়। খিদেকে জব্দ করার স্ফূর্তি হ'ল কাওছার। সেই আনন্দের পানীয় এই দেহেই আছে। ফকিররা সেই খোঁজ জানে তনু বিবি। সেই ফকিরের টানেই মা

তোমার হারিয়ে গিয়েছে। মৌলবীরা পাঁচবেলা নামাজে দাঁড়িয়ে ইন্নাতায়না করছে। কিন্তু সেই কাওছার কোথায় জানে না। তোমার মাকে আমি খুঁজে দেখব।

আজ রহুল ঝোলা থেকে কতকগুলো ফটো বার করল। বলল, দেখো তো ইনি তোমার মা কিনা! তোমার মাকে খুঁজে পেয়েছি মনে হচ্ছে।

হাতে একতারা। গান গাইছে। এক প্রৌঢ়া মহিলা। বাউলের পোশাকে সুসজ্জিতা। তনু ঝুঁকে প'ড়ে ফটোর মাকে চিনতে পারে। মেলার মঞ্চে মা গান গাইছে। পাশে গান গাওয়া রহুলের যুগলবন্দী বেশ।

প্রথম আলাপের দিন, যখন এই চরে ওপার যাওয়ার পয়লা খেপ দিচ্ছে ফকির, সেইদিনই তনু মায়ের কথা তুলেছিল কথার পৃষ্ঠে। মায়ের নাম বলেছিল সে। বলেছিল—তাহলে মায়ের একটু খোঁজ সত্যিই করবেন ফকির ছাযেব?

সেই মা। তনু পরম আগ্রহে ফটোখানা হাতে তুলে নিয়ে দু'চোখ ভরে দেখতে দেখতে বলে—মায়ের উপর কত অত্যাচার হয়েছিল। আমাদের একঘরে করেছিল দেশের লোক। জল বন্ধ করে বাপকে বউ তালাক দেবার জন্যে চাপ দিয়ে একেবারে নাজেহাল করেছে। মা তবু মাথা নোয়ায়নি। ফকির-সঙ্গ ত্যাগ করেনি। বাপকেই ছেড়ে গিয়েছিল। বাপমায়ের ছাড়াছাড়ি তো চোখের জলেই হয়েছে সেদিন। কাঁদতে কাঁদতে চোখের জলেই দুটি জীবন আলাদা হ'য়ে গিয়েছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তনু। ফকিরকে ফটোখানা ফেরত দিয়ে বলে—বাপ পরে শরিয়তীদের ঘরে নিকে ক'রে মুসলমান হ'ল। সৎমা পরেজগার মেয়ে। পাঁচবেলা বেঁধে নামাজ করে। তারপরই আমার বিয়ে হ'ল, একেবারে পাথারে পড়লাম। মায়ের জন্যে কষ্ট হয়। মা একবার বাপকে দেখতে এসেছিল, দেশের লোক দূর দূর ক'রে খেদিয়ে দিয়েছে। মা বলেছিল, আমি থাকতে আসিনি। চলে যাচ্ছি। আমার ওপর জুলুম করবেন না। আমার ধর্ম আমার, তোমার ধর্ম তোমার। ধর্মে জুলুম নেই। কোরানে সেকথা আছে।

রহুল বলল—হ্যাঁ, সুরা কাফেরুনে সে কথা আছে। ধর্মে জবরদস্তি কোরো না।

তনু শুধাল—তবু এরা অত্যাচার করে কেন, ফকিরদের হাত-পা পর্যন্ত কেটে দেয়! আপনি এসেছেন, আমার খুব ভয় করছে। অবিশ্যি খেতে না পেলে এ-সমাজ দেখে না, ধর্মের বেলা খুব হম্বিতম্বি।

ফকির গত বছরই বলেছিল—তোতাপাখির ধর্ম, তনু। মুখে কোরান পড়ার জন্যে, মান্যতার জন্য নয়।

তনু শিউরে উঠেছিল—কী কথা বলছেন ফকির ছায়েব। লোকে শুনলে খুন করবে।

রুহুল বলেছিল—ফকির নিধন তো ইতিহাসে নতুন নয়। আমাদের খুন করেছে। মেরেছে। আমরা কখনও হাত তুলিনি। হাতে দোতারা কি একতারা। এই তো সম্বল। ছোরা ধরতে ফকির পারে না। গান গাইলে মনটা যে নরম হ'য়ে থাকে তনু, আর কাওছারের স্বাদ পেলে খুনের ইচ্ছে রক্তে আসে না।

আজ বলল রুহুল—হম্বিতম্বি কেন করবে না, ওরা যে দলে ভারী। আমরা সংখ্যালঘু। ওরাই বলে মুসলমানের ৭২ দল। বাহাত্তর ফেরকা। তা একটা গানে আছে, শোন বলি। সবখানি ভাল মনে নেই।

দম ধরে ফকির মনে করে কিছুক্ষণ।

তারপর বলে ঃ

৭২ ফেরকা ১ দল হ'ল নাজিয়া।

সে দলে নাই অধিক লোক

দেখো মনে ভাবিয়া।

নেক লোকের ছোট জামাত ;

রসিদ কয় মনসুরকে আয়াত।

পড়ো আলহামদোল্লিল্লাহে—

আল্লা বহুল রহুল সুরে।…

কোরানে নহুল সুরা আছে তনু। আমরা সেই নাজিয়ার দল। আমাদের তো মারবেই। আমি এসেছি. আমি আসব। তোমার মাকে দেখতে ইচ্ছে করে না? সেকথা বলতে এলে কি পাপ হয়?

তো ফকির আজ বলেছে, একটি স্বাধীন মেয়ে তার পায়ে পুজার জল ঢেলে সুখী হবে. শিবলিঙ্গে দুধ ঢেলে কোন কামনা নয়. মানুষের পায়ে মানুষের তর্পণ। এই ফকির এ-বছর ওপারে যাবার বেলা গাইতে গাইতে গিয়েছিল ঃ

দেখবি যদি সোনার মানুষ

দেখে যারে মন পাগলা। (গানের উচ্চারণ পাগোলা)।

সেই সোনার মানুষ কি আজ চোখের সামনে বসে একটি স্বাধীন মেয়ের স্বপ্ন দেখছে? তনু বদনা ফেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। বাইরে কার যেন গলা শোনা যায়—খালাগো? বাড়ি আছো! গেরস্ত এই তরকারিটুকুন তুমাকে পেঠিয়েছে সরপোষ ঢেকে লিয়ে আনছি। লাও যতন ক'রে তুলে রাকো রেতে ভাত-মেখে খেও।

বলতে বলতে বছর চৌদ্দর একটি ছেলে গায়ে পাতলা চাদর জড়িয়ে হাতে একখানা সাজানো থালা নিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়ায়। তনু ঘর থেকে বাইরে এসে ছেলেটির মুখের কাছে কুপির আলো তুলে ধরে। হাত থেকে ঢাকা দেওয়া থালা নিয়ে ঘরে ঢুকে ঢাকনা তুলে দেখে কেমন চমকে ওঠে। দ্রুত ঢাকনা ফেলে ঢেকে দেয়। তারপর মুখে আঁচল তুলে চেপে ধরে নিজের মুখ, যেন সাংঘাতিক কিছু সে গোপন করতে চায়। ফের দ্রুতপায়ে বাইরে এসে ডাকে--শুনে যা রছুল !

রছুল বাইরে চলে এসেছিল, তনুর ডাকে উঠোনে ফেরে। তনু শুধায়--গেরস্ত কী করছে ?

রছুল উত্তর দেয়—মজলিস ! তুমাকে নিয়ে কতা হচ্ছে ! গিজান মৌলবী সুদ্দো। খানিক বাদে আসবে। আজ তুমার বিচির (বিচার) হবে। তুমাকে মাল আনতে দলের সাথে লিযেদ করেচে গেরস্ত। আরো একখান তালাক হবে খালা গো !

কথা শেষ করে ছেলেটি আর দাঁড়ায় না। তনু অস্ফুট ব'লে ওঠে—রছুল দেখে গেল ফকির এসেছে। ওদিকে মজলিস বসছে ওবা। নসীবের ফেরে রছুল ওদের চর। চোখ দুটো ডাকরার মতন ভয়ে পাকানো। ছিঃ।

এই 'ছিঃ!' শব্দটুকু রছুলের কানে ছিটকে আসে। রছুল হাত-পা ধুয়ে ফেলেছে। চানজল সেবা করতে গিয়ে মুখে চাটি ফেলে কপালে গেলাস 'আলেক' ব'লে (মুসলমানরা যেমন বিসমিল্লা ব'লে খেতে শুরু করে সেই রকম) ঠেকিয়ে নিয়ে জলে চুমুক দিতে গিয়ে থেমে গেল। রছুলের কথা শুনতে শুনতে সে হাত-পা স্খালন করেছে। তারপর দাওয়ায় উঠে গামছায় হাত-পা মুছে মুখে চাল ফেলেছে। তারপর ছিঃ শুনে চমকে মুখ তুলল। জলের গেলাসে চোখ ফিরিয়ে জল দেখল। চুমুক দিল। কোন কথা বলল না। রছুল চর। তনু মনে করে হাজমতের' হাজমত মনে করে তনুর। মাঝখানে টানাভরনার মাকু এই ছেলেটা। গলার সুরে বড় মায়া। তনু প্রথম ইতস্তত করেছিল, তরকারি নেবে কিনা। নিতে গ্লানি হয়। যখনই এইধারা ভেট আসে, সেই রাতে হাজমত তনুর কুটীরে রাতবাস করে। তরকারি হতে পারে, একটা ক্রীম কি পাউডার কিংবা শাড়ি হতে পারে, নিদেন কিছু রেশমি চুড়িই বা। সবই গ্লানিময়। তথাপি এই জোরাজুরির নোংরা জীবন ছাড়ান পেল না। তা পেতে গেলেও কেন যেন বুক কাঁপে। 'আরো একখান ত তালাক হবে খালা গো' কথাটার মধ্যে কেমন বিষাদ জড়িয়ে গিয়েছে। এখানেও জীবনটা কুপির শিখার মতন কেঁপে কেঁপে মাটির দেওয়ালে কালি লেপন করে হিজিবিজি কী সব

লিখে চলে যেন। তনু সেইদিকে চেয়ে ছিল। ওপার থেকে হারুডাঙ্গায় বস্তা চালানের তদারকি তনুর। বাকি পথ রছুল বহে নিয়ে পেঁছে দেয় গেরস্তকে। ঘর ছেড়ে যাবার সময় রছুলকে ঘরে পাহারায় রেখে যায় তনু। স্বামীর সাথে রছুলের মাধ্যমে টাকাকড়ির হিসেব চলে। বস্তাপ্রতি চালানের একটা মজুরি তার পাওনা। সম্পর্ক মজুর মালিকের। কেবল শরীরের বেলা স্বামী-স্ত্রী। মনেই হয় না দেহ কথা বলতে পারে। লাউয়ের তনুতে সুর থাকে। মেয়ের দেহ একখানা একতারার মতন। সেইটে ঐ ফকিরের পাগলামী। সুন্নীর চোখে এই দেহ উলঙ্গ ফল, যাতে মালদহ-র ফজলীর মতন নীল মাছি বসে। ভাবতে গিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তনু। সেই শব্দ শুনতে পায় রুহুল। আবার চোখ তোলে। বাকি জলটুকু গলায় নিংড়ে নেয়। বলে—আমি কখনও একেবারে চোখের উপর বউ তালাক দেখিনি। আজ দেখতে পাব। সেই সময় তোমার মুখটা কেমন হবে, তাই ভাবছি। এমন আসর ক'রে বউ তালাক এই দেশেই সম্ভব। ওরা কখন আসবে? তনু গম্ভীর গলায় জবাব দিল—জানি না।

এবং ঘর ছেড়ে নিচে নেমে সাঁজাল তৈরির কাঠখড়ি যোগাড় করতে ব্যস্ত হয়ে গেল। সাঁজাল জেবলে দিয়ে মাটির উনুনে অল্প দুখানা রুটি সেঁকে নেবে আর খানিকটা ভাজা তরকারি করবে এবং ভাবছিল গেরস্তর প্রেরিত তরকারি অন্ধকারে কোথাও ফেলে দিয়ে আসবে কিনা। তনু ফকিরকে ডাক দেয়— সাঁজালে এসে বসবেন?

রুহুল শুধাল—তুমি তখন ছিঃ করলে কেন? রছুল যা বলে গেল, তাতে তোমার মন খারাপ করছে নাকি? এক তানা ছিঁড়েছে, আর এক তানা ছিঁড়বে, ভয় পাও?

তনু বলল—পাই বৈ কি! আজ যদি আপনার চোখের সামনে ওরা খারাপ কিছু করে? আপনার অসম্মান আমার সইবে না।

রুহুল তনুর কথায় ম্লান হেসে বলল—ফকিরের সম্মান কবে ওরা করেছে? আমরা সম্মান চাইনি। ওদের হাত থেকে বরাবর আমরা নিস্তার চেয়েছি। দুনিয়ায় যত ধর্ম আছে, সবই হ'ল কল্পনা। সব অন্ধ আবেগে ধোঁয়ায় তৈরি। যুক্তির ধর্ম একটাই। এক ফকিরের ধর্ম ছাড়া সব ধর্মই যুক্তিকে ভয় পায়। লালন যখন বলেছিলেন :

সুন্নত রাখলে হয় মুসলমান
নারী লোকের কী হয় বিধান
পৈতে দেখে বামুন চিনি
বামনী চিনি কেমনে?

তখন তো সহ্য হয়নি সেই যুক্তির কথা। ওরা ভেবে দেখেনি, যেমন আরো কথা। 'নাই আল্লা লাইলাহাতে, আছে আল্লা ইল্লিল্লাহতে'। ভেবেছে আমরা ওদের ঠাট্টা করছি। একটু থেমে ফকির বলল—ফলে হয়েছে কি, নারীর ধর্ম কিছু নয়, ধর্ম পুরুষের। তাই নারীকে ওরা এত খাটো করে দেখেছে। আর আমরা সেই নারীকেই করেছি ভজনার উপায়। প্রকৃতির সঙ্গ ছাড়া আমার ধর্ম বৃথা। প্রকৃতি-প্রাপ্তিই ধর্ম। ওদের মোসলেম কি দাউদ হাদিসে আছে ঃ পুরুষের বাঁ পাঁজরের বাঁকা হাড়ে রমণী তৈরি। তাকে সোজা করতে চাওয়া নিষ্ফল। বাঁকা হাড় সোজা হয় না। বরং তাকে সোজা করতে না চেয়ে তালাক দেওয়া বুদ্ধির কাজ। হাদিসে নির্দেশ আছে, তা মানুষ কী করবে! তাবৎ হাদিস পুরুষের পক্ষে লেখা। কোথাও দু'এক ফোঁটা করুণার সন্ধান পাবে ঠিকই কিন্তু নারীর সত্যকার মর্যাদা কোথাও নেই। আমরা এই অপমান সইতে পারিনি বলেই লালন তার গানে শুধিয়ে ছিলেন, নারীর বিধান তাহলে কী হবে? বুঝলে তনু, যুক্তির জোরেই মুক্তির আলো জ্বলে। সেই আলো মানুষকেই জ্বালতে হয়। চোরা জীবন ছেড়ে দাও তুমি, আগেই বলেছি।

অনেকক্ষণ কথা বলে রুহুল ফকির ঝোলা থেকে একখানা খাতা বার করে কলম ধরে কীসব কথা লিখতে লাগল কুপির আলোয়। ফটোগুলো ঝোলায় ঢুকিয়ে ফেলল। পাটকাঠি দিয়ে কুপি থেকে আগুন ধরিয়ে নিয়ে তনু সাঁজাল জেবলে দিল। উনানে মাটির খোলা চড়িয়ে ছেনে রাখা আটা নিয়ে বসবার আগে উপুড় হয়ে লেখায় ব্যস্ত ফকিরের গায়ে নকসি কাঁথাখানা চাপিয়ে দিল। বলল—সাঁজাল জেবলেছি। লেখা রেখে আগুনে এসে বসুন। দেখুন কাঁথাখানা কেমন হয়েছে। আমার বাচ্চাকে এই চরের ঠান্ডা মেরে ফেলেছে ফকির ছায়েব। ঠান্ডাকে আমার ভারী ভয়।

তনুর কথায় রুহুলের কলম সহসা চমকে উঠে স্তব্ধ হয়ে যায়। রুহুল তনুর মুখে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। এই দৃশ্যের মাঝে চরের চোরা মাল বওয়া দলটি এসে উঠোনে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ে। হৈচৈ করে সাঁজালের চারপাশে গোল হয়ে বসে যায়। বেশির ভাগ আজ ছেলে ছোকরা। সাথে আরো দুটি মেয়ে। তারা কম বয়েসী কিশোরী। সব ওরা মাঝরাতে 'ভি' পার হবে সঙ্গে বস্তার বান্ডিল। সেই বান্ডিল পাছার তলায় ঠেস দিয়ে পিঁড়ি করে চেপে বসে গিয়েছে। ফকির কলমের খাপ বন্ধ করে উঠোনে নেমে আসে।

কাহারপাড়া থেকে হারুডাঙ্গার দূরত্ব এক মাইল। এক মাইল দূরে স্বামী মজলিস করছে। মিজান মৌলবী যুক্তিদাতা, হাদিস কুরানের ঠিকেদার। দু'

নম্বরী মালের ব্যবসা করেন না বটে, কিন্তু দাদনের ব্যবসা করেন। ঘোড়াগাড়ি দু'খানা রোজে খাটান সহিস দিয়ে। মসজিদে ইমামতি করেন। এখন গ্রামসভার মেম্বার। ওরা এলে পর কী ঘটনা হতে পারে? মাল আনতে যেতে নিষেধ পাঠিয়েছে। তরকারি পাঠিয়েছে। কিসের যেন খারাপ গন্ধ পাচ্ছে তনু।

তনু এই জীবনখানার ছবি কাঁথায় এঁকেছে। কাহারপাড়ার জীবনে চার-পাশে জঙ্গল। ইঁটভাটা। লতানে সবজীর মাচা। সব এঁকেছে তনু। কেন এঁকেছে স্পষ্ট জানে না। আসলে আঁকা তো নয়। বুনে তোলা। একটি গাছের ছবি বুনেছে। একটি গো-সাপ। যাকে সোনাগোরী সাপ বলে। দেখলে গা শিরশির করে। ইঁটভাটার ধূসর বেজি-ও আছে। আছে কালো প্যাঁচা একটা। গাছের নাম কালনাগিনী। সেই কাঁথা গায়ে দিয়ে বসে আছে ফকির। কালনাগিনী গাছ আর সাপের ফণা একই দেখতে। ভয়ংকর। আরো ভয়ংকর এইজন্যে যে, ওটা সাপ নয়। গাছ। দু' নম্বরী দলের সবাই ফকিরকে দেখেছে। কাঁথা দেখছে। কেউ কেউ বেশ ভয় পায়। ফকির কিছুই বুঝতে পারে না।

তনু রুটি বেলে যাচ্ছে। চোখ তুলে তুলে সবার দিকে চায়। ওরা ফকিরকে ওই কাঁথায় জড়িয়ে ফেলে দেখছে এখন। কাঁথা যেন ফকিরের গায়ের চামড়া হয়ে গিয়েছে। ওদের চোখে বিদ্বেষ আর ঘৃণা। অথচ ওরা জানে না, ওটা কাঁথা। চামড়া নয়। ফকির শত্রু নয়। সাপখোপ নয়। অরণ্যের প্রাণী নয়। প্যাঁচা নয়। দিনের মানুষ। দিন আর দ্বীন একই কথা। নবীর দ্বীন আর ফকিরের দিন একই কথা। আমরা ফকিরের গায়ে যে কাঁথাখানা দিলাম তার কী অর্থ হয়? তনু ভাবছিল। আমার চারপাশের যে জীবন জড়িয়ে আছে ফকির জানে না। আমি ফকিরের গায়ে কী জিনিস চাপিয়ে দিলাম ফকির জানতেও পারেনি। তনু ভাবছিল আর তার বুকের ভিতরটা কুলকুল করে কাঁদছিল। ফাঁকা হয়ে যাচ্ছিল। রাত্রি বেড়ে যাচ্ছে দন্ডে দন্ডে। এক সময় দুজন কড়কড়ে জোয়ান ছেলেকে সঙ্গে করে মিজান মৌলবী আর হাজমত প্রবেশ করে। ফকির এই জোয়ান দুটিকে কখনও দেখেনি। কিন্তু দেখেই মনে হ'ল এরা মানুষ খুন করে। ফকির বুঝতে পারল একটা বিপদ ঘনিয়ে আসছে। বুঝতে পারল তনুও। বাড়িতে ঢুকেই একটা হুকুম করে হাজমত সাঁজালে অংশীদার হয়। হুকুম করল দু' নম্বরীদের—তোরা চলে যা, আগুন পুইয়ে রাত সাফা করলে মাল আনবি কখন? তনু আজ যাবে না।

দলের একজন সাথে সাথে ছড়া কাটল :

বুক গরম পিঠ কালহা
আগুন পোয়ায় কোন্ শালা।
এ-ভুঁইয়ের বস্তা ও-ভুঁইয়ে ফেলা।
এ-ভুঁই ইন্ডে, ও-ভুঁই বাংলা।

অতএব আলস্য নাস্তি। চলো হে ওঠা যাক। না। যাবার কথা কেউ বলছে না। একজন কেবল ছড়া কেটেছে। গায়ে তেজ ধরাচ্ছে ঐ ছড়ার মর্ম। উত্তেজনার পয়ার। গা গরমের পুথি-বাক্। তনু শেষ বাটি মাটির খোলায় ফুলিয়ে নিতে নিতে বলে—তোরা কেউ যাস নে রে! ফকিরকে খাইয়ে আমি পা চালাব।

তনু ছেলেদের কাছে আবেদন করে ওঠে। ফকির একা। তনু একা। ফকিরের দোতারায় যে বারুদ আছে, তা দিয়ে পশুবধ করা যায় না। নাকি যায়? যদি সেই পশুতে দু ফোঁটা মানুষ থাকে। সাঁজালের চারপাশে অন্ধকারের চর-বিস্তৃত পর্দা। সাঁজালের আলো উসকে উঠলে সেই অন্ধকার নড়ে সরে দু'হাত তফাতে যাচ্ছে। আলো নিবু নিবু হলে সেই আঁধার ফের চেপে আসছে। অন্ধকার আলোর হুঁই হুঁই কোমর জড়িয়ে নড়াচড়ার সাঁওতালী নাচ, তনু দেখলে, কী অদ্ভুত! একটু দূরে তনুর উনান নিভে গেল।

ফকিরের মুখের দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে মিজান মৌলবী বলে ওঠেন— যাবার আগে ছেলেরা একটু গান শুনে যাক মনটা খানিক খোলতাই হবে। কী বলেন ফকির? একখানা গাইবেন না আপনি? গান হারাম জিনিস, কিন্তু দেহ-তত্ত্বের গানে আমি বেশ স্বাদ পাই। সেই গানখানা আপনার জানা আছে? ছেলেরা বুঝতে পারছে না, আপনি এখানে কেন আসেন। ওরা আমায় শুধোচ্ছিল দু'দিন আগে। আমি ওদের বলেছি ফকিরের গানেই সেকথা আছে। সেইটে আপনি শুনিয়ে দ্যান বাবাজী।

রুহুল কী করবে বুঝে পায় না। বলে, বলুন কোন সেই গান? কার গান? লালনের? মিজান বলেন—'না হে বাবাজী! ওরে, কেরামত দাওয়া থেকে দুতারাখানা এনে দে ফকিরকে। উনি গাইবেন বলেছেন। না হে বাবাজী! লালনের নবী-গান নয়! ফটিক গোঁসাইয়ের নারী ভজনার গান। রাজশাহীতে যখন ছিলাম, মেহেরপুরের এক ফকিরকে গাইতে শুনেছি। কী যেন সেই কথা! ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। 'সাধু হতে লয় কতজন প্রকৃতির আশ্রয়।'

ভারি সুন্দর কথা। চমৎকার কথা। একেবারে গূঢ় কথা। গান দেখি, ছেলেরা শুনুক! রুহুল মিজানের আব্দারে রীতিমত গম্ভীর হয়ে গেল। বুঝতে পারছিল, মোড়লীর কী অসাধারণ ক্ষমতা এই লোকের। কতদূর ভেবে

এসেছে। কেরামত দোতারা এনে ফকিরের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে। হঠাৎ রুহুলের বুকের মধ্যে কে যেন ভালবাসার আর্তনাদ করে ওঠে। নিজেকে সে মনে মনে বলে—কেন এলে এখানে? তুমিও কি আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছ ফকির? প্রকৃতিকে পেতে গিয়ে কী মূল্য দেবে আজ? সবই কি তোমার ভেসে যাবে? তোমার ধর্ম কি এতই কাঙাল? দোতারা হাতে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ফকির। সারা শরীর উত্তেজনায় থরথর করে কেঁপে উঠল। দোতারা সহসা যেন কেমন আর্তনাদ করে কেঁদে উঠল আঙুলের ধাক্কায়। সবাই উৎসুক। তনু অন্ধকারে চোখ জেলে বসে আছে। দুটি চোখ তার জ্বলছে। ফকির গেয়ে ওঠে আত্মধিক্কারে!

"সাধু হতে লয় কতজন প্রকৃতির আশ্রয়।
সাধুর কামসাগরে বান ডাকিয়ে
প্রেমের পসার ভেসে যায়।"

ফকিরের গায়ে কালনাগিনী কিলবিল করে ওঠে। পেঁচা চোখ বুঁজে গদগদ। সোনাগোরী বিষণ্ণ। গায়ের দোলায় নড়ছে চড়ছে। ফকির গাইছে ঃ

"প্রেমের ওঝা না সাজিয়ে
কেন তোর সাপ ধরা মতি হ'ল?
মস্তকে দংশিলে ফণী
তাগা বাঁধবি কোন জায়গায়?
সাধু হ'তে লয় কতজন প্রকৃতির আশ্রয়।"

রুহুলের দোতারা আর্তনাদে ফেটে পড়ছে। বিনিয়ে বিনিয়ে কেঁদে যাচ্ছে। ফকিরের এই দুঃসহ ব্যাকুলতায় তনুর চোখে জল ভরে আসে। ফকির যে পাগল হয়ে গেছে। সাধু থামতেই মৌলবীর কড়া গলার প্রশ্ন—আপনার এই মতি হ'ল কেন ফকির ছায়েব? কেন এলেন এখানে? যাও ছেলেরা, তোমরা উত্তর পেয়েছ, এখন আমাদের কাজ করতে দাও। বলুন ফকির, কার কাছে এলেন আপনি? এ যে মুসলমানের ঘরের বউ? কৈ হে কিসমত, এবার ওনাকে তাগা দিয়ে বাঁধতে হয় যে! ভেড়ার পশম আর ফকিরের গোঁফদাড়ি খুব মূল্যবান বস্তু। আগে ওনাকে গোস্তরুটি খাওয়াও; মুসলমানের প্রিয় খাদ্য। সেইটে খেয়ে আপনার হাজামত হবে, কামান হবে। তনু বিটি, তরকারি এনে দাও মা! বাঁজী গাইয়ের গোস্ত। গেরস্ত আগেই পাঠিয়েছে। কই, কোথায় রেখেছ?

রুহুল বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে জবাব দেয়—আপনি দেহতত্ত্ব শুনেছেন মৌলবী সাহেব। জানেন, আমরা গো-মাংসই শুধু নয়, মাছ ডিম কোন আমিষই খাই না।

মৌলবীর প্রশ্ন—কেন খান না?

রুহুল উত্তর করে—শাস্ত্রে লিখেছে খেতে নেই, তাই খাই না এমন নয়। খাই না, শরীরের পক্ষে ওগুলোর দরকার নেই। রক্ত গরম রাখে। মন স্থির হতে দেয় না। তাছাড়া. এই গরু নিয়ে হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ করে বলেও খেতে ঘেন্না হয়। গরুর মাংস জোর করে খাইয়ে কারুকে মুসলমান করা যায় মনে করেন আপনারা, এইজন্যই আরো খাই না। মুচিরা এত গরু খেয়ে বেড়াচ্ছে ভাগাড়ে ভাগাড়ে. তবু ওরা মুসলমান হতে পারল না। মুসলমানের সতর পেল না। দেখেছি আমার গাঁ স্বরূপপুরে কোরবানীর সময় ওরা মুসলমানের দুয়ারে মাংস ভিক্ষেও করে বেড়ায় কেউ কেউ। তবু আপনারা দয়া করলেন না। হিন্দুরাও তাড়িয়ে দিল। এই জন্য খেতে গেলেই মন খারাপ করে। তাই খাই না। সুরা বাকারায় আছে…

মৌলবীর তপ্ত প্রশ্ন—কোথায় আছে?

উত্তর : কোরানে আছে। সুরা বাকারায় আছে। বাকারা মানে গাভী। কিন্তু আমরা বলি অন্য কথা। হিন্দুমুসলমান বাকারা নিয়ে দ্বন্দ্ব করে। আমরা বলি, গাভীর বর্ণ নানান কিন্তু বিচিত্রবর্ণ গাভী দুইলে দুধের বর্ণ এক।

মৌলভী বলেন—হ্যাঁ গাভী। কী আছে বাকারায়? নানাবর্ণ গাভী?

হাজমত এবার গর্জন করে ওঠে—রাখো তুমার বাকারা। যে মেয়ে গরু খায়, তার কাছে এলে গরু খেতে হবে এই আমার হাদিস, আমাদের হাদিস, মিজানজীর বাকারা। শালা সাধু কোন ডহরে এস্যাছে, তলব জানে না। কেরামত ক্ষুরে শান দে বেটা। সাধুর সব পশম ঝুড়ে দে বাপ।

মিজানজী স্থির মানুষ। ওদের খানিক নিরস্ত করে বলেন—গোলমাল করো না। সব হচ্ছে। আগে শুনি বাকারায় কী বলছে। বলুন বাবাজী! আগুন উসকে দে ছেলেরা।

দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। তার আগেই অন্ধকারে চুপিচুপি তনু ঘরের দরজায় শেকল তুলে তালা এঁটে কোমরের ডোরে চাবি ঝুলিয়ে নেয়।

ফকির বলে—বাকারায় হজরত মুশাকে খোদা নির্দেশ দিয়ে বলছেন, গাভী বধ করো, কেমন গাভী জবাই দেবে তারও বর্ণনা আছে। মুশা সেই নির্দেশ দিচ্ছেন উম্মতকে গাভী বধ করতে হবে, খুব কড়া হুকুম। বোঝা যাচ্ছে, আগে গরু হত্যা হত না। একটা ইতিহাস আছে মিজানজী।

মৌলবী বললেন—ঠিকই বলেছেন, কড়া হুকুম। তাই গরু খেয়ে মুসলমান হলে খোদা খুশি হয়। আর মুচিরা তো মরা গরু খায় সাধুবাবা, সেইটে হালাল নয়। স্বাস্থ্যসম্মত নয়। না হলে বাকারায় বধ করার নির্দেশ হত না। সেটা কুরবানী।

ফকির বলব না ভেবেও বলে ফেলে—কিন্তু আপনারা কি জবাই করার পর তাজা গরু খান? হ'লই বা কুরবানী। জীবন্মৃত গরুর মাংস মুচিরাও খায় না। ভাগাড়ের সব গরুই টানাটানি করে না। ওরাও দেখেশুনেই খায়। তা তাজা গরু খেলেই কি একটা মানুষ…

—এহ্ শালা!

দুই জোয়ানের একজন কেরামত। গর্জন করে ক্ষুর নিয়ে তেড়ে এসে সাঁজালে বসে থাকা ফকিরকে অকস্মাৎ পেছনে টেনে চিৎ করে বুকে চেপে বসে। জোয়ানের দ্বিতীয়জন কিসমত দড়ি দিয়ে ফকিরের দুই পা বেঁধে ফেলে। কেরামত গলায় ক্ষুর তাক করে থাকে। পেছনে দু হাত বাঁধা হয় তারপর। বুকে ওদের ফকিরের কথা ধক করে বিঁধেছে। কারণ মুচিরা তো চটে বসে পূজা মণ্ডপের মাটিতে হর দম ঢোল কাঁসি বাজায়।

মৌলবী বলেন—বেশ তাগা বাঁধা হল। প্রকৃতি খায়, মরাই হোক আর তাজাই হোক, পুরুষও খাবে, এবার। মা তনু বিবি নিয়ে এসো মা। নিজে হাতে মুখে তুলে একটু খাইয়ে যাও। আমরা ভিনজাতির মেয়ে শাদী করে ধর্ম শেখাই। আর এ-শালা ফকির ওর ধর্মে সেই মেয়েকে টেনে নিয়ে যাবে? নিয়ে এসো মা।

তনু জবাব দেয়—ঐ মাংস আমি ফেলে দিয়েছি।

হাজমতের মাথায় খুন চাপে। বলে—ফকির এস্যাছে শুনেই গরু জবাই হল তনু। তুই সেই গোস ফেলে দিলি?

তনুর দিকে এগিয়ে যায় হাজমত। হাতে গরুর গাড়ির 'সিমলে'। (জোয়ালের ফুটোর মোটা পাকানো লাঠি, খাটো মতো)।

বসে থাকা তনুর পা দুখানার একটি খপ করে চেপে ধরে আচমকা প্রহার করে তীব্র। তনু চিৎকার করে ওঠে। হাজমত বলে—চাবি ফেলে দে, ঘরে গোস আছে। দে হারামজাদী, আজ দুই তালাকের রাত। চাই কি, বাধা দিলে, এই রাতেই তিন তালাক হয়ে যাবে।

ফকিরের গোঁফদাড়ি দেখতে দেখতে কাটা হয়। মাথার চুল কেটে দেয়। তনু মার খেতে খেতে অজ্ঞান হয়ে যায়। ফকিরকে তাবৎ দল হৈ চৈ করে কোথায় তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে জ্ঞান হারাতে হারাতে তনু দেখতে পায়। তারপর সম্পূর্ণ চেতনা হারিয়ে ফেলে। অচৈতন্য দেহকে আঁধার দাওয়ায় তুলে সবাই চলে গেলে হাজমত ধর্ষণ করে। তারপর কানের কাছে মুখ রেখে বলে—তালাক।

জ্ঞান ফিরে পেতে পেতে সময় বহে গিয়েছে। মধ্যরাত্রি এসেছে উঠোনের

আকাশে। কানের কাছে গুনগুনিয়ে বেজে চলেছে ঃ 'সাধু হতে লয় কতজন প্রকৃতির আশ্রয়।' সহসা অন্ধকারে তনুর মুখ কঠিন হয়ে ওঠে। আকাশে চায়। অজস্র নক্ষত্রখচিত আকাশ। অন্ধকার। বুঝতে পারে, সর্বাঙ্গ অবশ। পা তুলতে পারে না। ফকিরের দাঁড়ি গোঁফ কামানো করুণ মুখ চোখে ভাসে। ফকির আশ্রয় চেয়েছিল। ফকির কি বেঁচে আছে? ফকির অত দড় হয়েও ডুকরে কেঁদে উঠেছিল। ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিল। দুটি চোখ ছলছল করে উঠেছিল। সামান্য বাধা দিয়েছিল বলে এলোপাথাড়ি ঘুসি চালিয়ে যাচ্ছিল। কিসমত মাথার চুলকে খামচে ধরে ক্ষুর চালানোর সুবিধা করে নিতে টেনে সিধে করছিল বারবার। ফকির ডুকরে উঠেছিল। ফকিরকে ওরা খাড়া করে দিয়েছে. তখনও ওর চোখের জল সাঁজালের আলোয় চিকচিক করছে। দাড়ি গোঁফ সাফ হয়ে গেলে ফকির ঘাড় নীচু করে রইল। লজ্জায় বেদনায় চোখ তুলতে পারছে না। চোখ দিয়ে নিঃশব্দে টপটপ করে জল পড়ল চার ফোঁটা। কিসমত ফের চুল আঁকড়ে খামচালো। অস্ফুট ডুকরালো ফকির। চোখ ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। সেই চোখে চোখ পড়ল তনুর। হাজমত তনুর পায়ের গাঁটে সিমলের আঘাত করল আবার। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে তনু যন্ত্রণা দমন করে। জানে, এরা কোন কথা শুনবে না। সাধ মিটিয়ে মারবে, অপমান করবে। হাজমত চাবি চাইছে। তনু বলল—চাবিখানা অন্ধকারে কোথায় পড়ে গিয়েছে। হাজমত বিশ্বাস করল না। গাঁটে তীব্র যন্ত্রণা দিতে লাগল। ফকিরের ঝাপসা দুই চোখ ক্রমশ দৃষ্টি-ক্ষমতার বাইরে হারিয়ে যেতে লাগল। চেতনালুপ্ত হয়ে গেল। সবাই ফকিরকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে বাইরে চলে গেল। দুটি অপমানিত অশ্রুআচ্ছন্ন চোখ আশ্রয় চেয়ে অন্ধকারে চলে গেছে। মনে মনে বলল তনু—কখনও এভাবে এসো না ফকির। কখনও এভাবে মুচি মেথর করে কথা বলো না। সোনার মানুষ তুমি কোথায় পাবে, মানব জমিন সব যে এই আঁধারে উরান-বিরান হয়ে গিয়েছে, সাধু গো!

তনু উঠোনে বহুকষ্টে লেংচে নেমে আসে। উঠোন পেরিয়ে আসে। সহসা 'খালা গো' শুনে ভয়ে চমকে ওঠে। রছুল। রছুল বাড়িতে ঢোকার মুখে বেড়া ধরে দাঁড়িয়ে আছে। রছুল বলে—চরের উদিকে সাদু পড়ে আছে খালা! বাঁদন খুলা যায়নি। একখান অসতর লিয়ে যাও। আমি পালাই!

রছুল অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। তনু লেংচে লেংচে চরের অন্ধকারে নেমে পড়ে। ফকিরকে চরের অন্ধকারে খুঁজে পায় অনেক দূরে এসে। ভি-পয়েন্টের উপর। ধড় এপারে মুণ্ডু ওপারে। ফকিরের কাছে এসে তনু হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। কতক্ষণ কথা বলতে পারে না। ফকির বলে—বাঁধন খোলো

তনু। আমাকে মুক্ত করো। ওরা চিরকাল এম্নি করে মেরেছে আমাদের। ফেলে দিয়েছে। আমরা এইরকমই আঁধারে লুকিয়ে ফিরেছি তনু। চলো যাওয়া যাক।

—কোথায় যাব ফকির? তনু কাতর প্রশ্ন করে। বলে—আমি যে চলতে পারি না। ফকির তনুকে ঘাড়ে তুলে নেয়। বলে—দোতারা এনেছ?

—হ্যাঁ।

—কাঁথা?

—ওটা বোধ হয় হাজমত গায়ে দিয়ে গেছে। পশুপাখির নকসি।

ফকির পুব দিগন্তে সূর্যোদয়ের পথে হাঁটছে। তনুর রক্তমাখা পায়ে তাঁর জামা ধুতি ঘষা লেগে ভিজে যাচ্ছে। বাঁ বুকের কাছে যেখানে 'কালবুল মোমিনো আরশইল্লাহে তালা' খোদার সিংহাসন, সেখানে নূরের বাতি উদ্ভাসিত। টলতে টলতে ফকির এগিয়ে চলেছে। কাঁধে তার দোতারা ধরে আছে তারই প্রকৃতি। পুব-দিগন্তে ঊষার কুসুমে ভোর হয়ে আসছে।

আকাশবাণী

অবন বসু

আমার বউটা তারস্বরে চেঁচাচ্ছিল. 'এখানে না, এখানে না। ওই গর্তে। লাফ দিয়েছে এখুনি।'

'এখুনি না হাতি। মিনিট দশেক তো খুঁজলাম।'

'আছে, আছে, দাঁড়াও কড়াটইা নামিয়ে আসি।'

আমার বউ এক দৌড়ে ঘরের অন্ধকারে সেঁধিয়ে যায়। আমাদের বাগানেও রোদ মরে আসছে। এর মধ্যেই মাছটা খুঁজতে হবে। গেঁতোর মত খাবুর-খুবুর করে, গর্তগুলোয় হাত ঢোকাই। ক'দিন আগে মেলা বৃষ্টি হয়েছিল। বাগান ভিজে ন্যাতা। মাছ-মাছ করে হাত পায়ের বারোটা বাজালো। অবশ্য খুব একটা রাগ হয় না আমার। বরং রাণু এখন ফুল তুলতে বললে আরো রাগ হতো। ওর মধ্যে বুদ্ধি-বিবেচনা আসছে। মাছের কথাই বলেছে। ফুলের বদলে মাছের কথা বলা ভাল। আমি সংসারী মানুষ। শুনলে ভাল লাগে. সংসারটার দিকে আমি ছাড়াও কারো টান আছে ভাবলে ভাল লাগে। স্বীকার করা উচিত, এই একটা দোষ আমার, খুব সংসার সংসার করি। হাবি-জাবি কিছু ভালবাসি না। আর কেউ বাসুক, তাও চাই না।

ঘ্যাঁচর ঘ্যাঁচর শব্দ করে একখানা ট্রেন গেল। ডাউন হবে। এদিকে কোন স্টেশন হয়নি। রোদ্দুর আরো পড়ে আসছে। রাণু একটা ঝুড়ি হাতে বেরিয়ে এল।

'এতক্ষণেও পাওনি? সরো আমি দেখি।'

'সেই ভাল. তুমি দেখেছ, তুমিই খোঁজ।'

আমি আবার কুমড়ো-মাচার উঁচু লাইনে ফিরে যাই। কার বাড়িতে আলু-পটল রাঁধছে। খাসা গন্ধ আসে। আমার নাক খুব ভাল। একবার শুঁকেই ধরতে পারি। এমনকি কী কী মশলা দিয়েছে, তাও বলে দিতে পারি।

আসলে আমি একটু খেতে ভালবাসি। আমার বউও তাই। এটা একটা দোষ না নিশ্চয়ই। তাছাড়া ভালমন্দ খাওয়ার ক্ষমতাও আছে আমাদের। এই গঞ্জ মার্কা মফস্বলে আমারই একমাত্র রেডিও সারানোর দোকান। এখনো এখানে ইলেকট্রিক আসেনি বলে ট্রানজিস্টর রেডিওর খুব চল। আর সাপ বাড়লে ওঝার ভাত মারে কে? আমার তাই বেশ রমরমা চলছে বলা যায়।

'ওগো, ওগো পেয়েছি', রাণু হঠাৎ বেদম চেঁচিয়ে ওঠে।

হুড়মুড়িয়ে গিয়ে ঝুড়িটা ধরি। সত্যিই তো বেশ বড়সড়। ঝুড়ি ভেঙে বেরোতে চাইছে। কায়দা করতে অনেকক্ষণ লাগল। শেষে কেটেকুটে উনুনে চড়াতে তবে শান্তি। রাণু খুশি মনে ফের রান্নাঘরে ঢোকার আগে বলল, 'পম্পি আসার সময় হয়ে গেল। বিল ধারে একটু এগিয়ে দেখো।'

মাছভাজার গন্ধটা শোঁকার খুব ইচ্ছা ছিল। ব্যাজার মুখে বললাম, 'রোজই এই এক কাজ। কী হয় গান শিখে? যত সব।' এর বেশি কথা বাড়াই না। গান না শিখলে কী হয় জানি। মেয়ের বিয়ে হতে চায় না। বিয়ের পর ক'দিন নতুন বোয়ের গলাবাজি শোনার জন্য বরের ভেতর উথাল-পাথাল করে। পরে ওই কারণেই আবার মারধোর হয়। অতএব গান শিখতে হয়। এই আধা গ্রাম, আধা মফস্বলেও আমার মেয়ে গান শিখতে যায়। ওর জন্যে মাস্টারনী পাইনি এখানে। রামবাবু আমাদের পাড়ার একমাত্র হোমিও-প্যাথ ডাক্তার। খবর পেলাম এক ছোকরা নাকি ওনার থেকে ওষুধ খায়, আর ভোররাতে মিছরী-গোলমরিচ খেয়ে গলা সাধে। তার মানে গান জানে। কী আর করা? পম্পিকে ওর হাতেই দিতে হলো। ছোকরা খুব একটা খারাপ না। তবে বাড়ি এসে শেখাতে পারে না। পাশের শহরে হারমোনিয়াম সারাতে যায়। খবরটা শোনার পর থেকেই মনটা কেমন খিঁচড়ে আছে। নিজে কারিগর বলে কারিগরের ওপর সুনজর রাখতে পারি না হয়ত। কয়েকটা গান-টান শেখার পর পম্পির বিয়েটা দিতে পারলে বাঁচি।

গায়ে জামা গলিয়ে বেরিয়ে গেলাম। ছোকরার বাড়িটা একটু বেখাপ্পা জায়গায়। পরেশের মুদি দোকানে হ্যাজাক জ্বালিয়েছে। চারপাশটা অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। ঘাড় ঘুরিয়ে নিজের বাড়িটাকে দেখি। বড়সড় একটা ছায়ার মত হয়ে গেছে। কুমড়ো মাচাটা সেই ছায়ার বর্ডার। তির তির করে একটা হাওয়া দিয়েছে। পরেশের দোকান ছেড়ে রাস্তা বাঁদিকে গেল। মুলিবাঁশের বেড়া দিয়ে ছোট ছোট ঘর হয়েছে অনেকগুলো। বেড়ার ফাঁক দিয়ে কুপির আলো কাঁপে। দুলে দুলে কাদের ছেলেরা মিড্‌ল স্কুলের পড়া করে। হর্ষবর্ধনের রাজত্ব। অশোকের যুদ্ধ। ভাল। নতুন নতুন ঘরবাড়ি হচ্ছে। ভাল লক্ষণ। হঠাৎ কারো

বাড়ির সামনে থমকে দাঁড়াই। রেডিও চলছে। মান্ধাতার আমলের গান আধো সন্ধ্যায় চলকে ওঠে। উঠ্‌ক গিয়ে। আমি দাঁড়িয়েছি চেনা আওয়াজে। ঘ্যাঁ ঘষঘষ....গান....ঘষঘষ···আবার গান। বাঃ কন্‌ডেন্‌সারটা গেছে নির্ঘাৎ। সেন্‌টারিংয়ের সুতোও ঢিলে মেরেছে। দুটো সেন্টার একসঙ্গে এসে যাচ্ছে। তিরিশ টাকার কম না। আজ হোক, কাল হোক, আসতেই হবে। একটু আনমনা হয়ে গেছিলাম। কার টর্চের আলো গায়ে এসে পড়ে। এই এক বদ্‌রোগ এইসব পাড়াগাঁয়ের। প্রায় লোকের হাতে একটা টর্চ থাকবেই, আর ওগুলো বেয়াড়া ভাবে দোলাতে দোলাতে ওরা হাঁটবে। কার গায়ে আলো পড়ল না পড়ল ভ্রূক্ষেপ নেই। রেডিও সারানো শেখার সময়ে বছর দুয়েক শহরে থেকে, এইসব আচমকা লোকজন আমি দেখতে পারি না। তাছাড়া অনেকবার চেষ্টা করেও টর্চ জিনিসটা সারাতে পারিনি। কেমন তালা সারানোর মত ব্যাপার। এই জন্যই বোধ হয় হাতে হাতে টর্চ জ্বলতে দেখলে বড় গায়ে লাগে। এতগুলো টাকার ব্যাপার।

টর্চওয়ালা চলে গেলে আবার এগোই। এদিকটায় একটা হাজা-মজা বিল আছে। জায়গাটা বেশ বায়োস্কোপ থিয়েটারের মত সুন্দর। পনেরো-কুড়ি বছর আগে এখানে মস্ত বাঁশঝাড় ছিল। বনবাদা ছিল। সারা বছর বিলটায় কালো ছায়া পড়ত। কত বড় বড় মাছের ঘাই। তাদের কী স্বাদ। আঃ মুখে লেগে আছে। মাছের কথায় মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। বাড়িতে মাছ ভাজার গন্ধটা পেলাম না। পাম্পির জন্য। ওর মাস্টারের জন্য। হতচ্ছাড়া গানের মাস্টার। রাগে একটা হোঁচট খাই, ফের সামলে নিই। তখন চাঁদ ওঠে। পুর্ণিমা আসছে হয়ত। বেশ বড় চাঁদ উঠেছে বিলের ওপরে। চাঁদের আলোয় পম্পিকে দেখতে পেলাম। ওর পাশে সেই হারমোনিয়াম সারানেওয়ালা। ওর গানের মাস্টার। আমাকে দেখে পম্পি এগিয়ে আসে।

সকালে উঠতে দেরি হয়ে গেল। পম্পি দুটো গান শুনিয়েছিল রাতে। বেশ অদ্ভুত গান। চাঁদের আলোয় বারান্দায় শতরঞ্চি পেতে গান শোনা হলো, তারপর বাগানের ধরা মাছের ঝোল আর কুমড়োর শাকের সঙ্গে আউশ চালের ভাত। যাকগে, আজ অনেকগুলো নতুন কাজ এসেছে। সারাইয়ের মালপত্র কিনতে শহরে যাব। তাছাড়া, পম্পিও একটা শাড়ি চাইছে বহুদিন ধরে। বেয়াড়া আবদার। গান গাওয়া শাড়ি চাওয়া, যতরকম ভাবে ব্যবসাটা লোকসান করানো যায় আর কি।

শহরে আসাটা একেবারে বেকার হয়ে গেল। এখানে 'শচীমাতা রেডিও-

'যন্ত্রাদি' নামে একটা দোকান থেকে আমার সাপমারা বিদ্যার ওষুধপত্র কিনি। মানে স্পেয়ারস্ আর কি। কনডেনসর, রেসিট্যান্স্, স্পীকার, কয়েল-রড। এখনতো আবার আই. সি. বেরিয়ে কাজকর্মের ধারাই বদলে গেছে। সে যাকগে, এই অর্জুনপুরে আমার স্পেয়ারস্ কেনার দোকানটায় নাকি ডাকাতি হয়ে গেছে গতকাল। কবে দোকান খুলবে কে জানে। আমি গিয়ে দেখি পুলিস বন্দেমাতরম সাহা নামে একটা সিড়িঙ্গে মত লোককে ধরে এনেছে, ও-ই নাকি ডাকাতদের খবর-টবর দেয়। এত বিচিত্র নাম জীবনে শুনিনি। তাছাড়া ঠান্ডা মানুষ আমি। গন্ডগোল দেখলে কেমন পেট গোলায়। লোকটা ভারি অদ্ভুত। স্থানীয় দোকানদারেরাও পুলিস-টুলিসদের তেমন কেয়ার করে না। থানার বড়বাবুরও চালের দোকান আছে তো। সুতরাং দোকানদারেরা মিলে 'অর্জুনপুর ব্যবসায়ী সমিতি'র একটা লাল শালু টাঙিয়ে লোকটাকে তার নিচে বসিয়ে রেখেছে। বড়বাবু ইচ্ছে করেই এখন আসবেন না। ব্যবসায়ীরা গেল-বছর তাঁকে সমিতির প্রেসিডেন্ট বানিয়ে মালা-টালা পরিয়েছে। শালুর নিচে পরিষ্কার রোদ্দুরে লোকটা আকাশের দিকে চেয়ে বসে আছে। আর থানার পুলিস দুটো একটু দূরেই বোষ্টুমের মত উদাস মুখে জিলিপি খাচ্ছে। লোকটাকে বাঁচিয়ে রাখা ছাড়া, তাদের তেমন কোন দায়িত্ব দেওয়া হয়নি।

দোকানদারেরা সবাই এক একটা চাঁটা, কানমলা, গাট্টা দিয়ে যাচ্ছে বন্দেমাতরম্ সাহা নামের 'খবরী' লোকটাকে। বন্দেমাতরম্ নামটা জানার একটু পরেই আমি খবরী কথাটা শিখলাম। ঐ যারা অকাজ-কুকাজের দলকে পয়সাওয়ালা লোকের টাকাকড়ির খবর দেয়। আমি আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, লোকটা ওর নামের মতই গম্ভীর গোছের। একেক বার মার খাচ্ছে, আর মার খাওয়া জায়গাটায় দার্শনিকের মত হাত বুলোচ্ছে। যেন ওর একটা সন্দেহ আছে, মার ধোর করতে আসার আগে সবাই ঠিকমত হাত ধুয়ে আসেনি।

মোটা মত একজন দোকানদার ছুটতে ছুটতে আমার দিকেই এসে পড়ে। 'শচীমাতার খদ্দের না আপনি? আসুন, হাত লাগান একবার। সেই কন্দুর থেকে এসেছেন। ছাড়বেন কেন? তবে দাঁড়ান, আমি আগে সেরে আসি।' আমি কিছু বোঝার আগেই গিয়ে এক চড়। বন্দেমাতরম্ বাবু এবার সত্যিই একটু বিরক্ত হয়। খোল-ভূষির দোকানিটি হাত ধোওয়া দূরে থাক, হাত ঝেড়েও আসেনি। জিলিপিখোর পুলিসগুলোকে এই প্রথম সে বলল, 'কই, চলো হে।'

মোটা দোকানদারটি আমায় খুব জ্বালাচ্ছিল। শেষে আমি মারব না শুনে কী ভেবে বলল, 'অবশ্য আংটি ঘুরে গিয়ে আমার হাতেও লেগেছে। লোকটা সুবিধার না।'

তেতো মেজাজে কিনব না কিনব না করেও পম্পির জন্য একটা শাড়ি কিনলাম। এই কাপড়ের দোকানি আমাকে একটু খাতির করে। কম পয়সায় দুবার রেডিও সারিয়েছে। বদলে কাপড়চোপড়ের দাম কম করে নেয়। খুব সস্তায় আজ একটা কচি-কলাপাতা রঙের শাড়ি দিল। জলের দাম বলা যায়। শাড়িটা দেখে আমি হাঁ হয়ে গেছিলাম। পম্পিকে এটা পরলে কেমন দেখাবে ভেবে একটু ঘোর লাগে। ভেবে রাখি ওর মাকে বলতে হবে, গানের মাস্টারের কাছে এটা পরে যেতে না দেয়। দিনকাল খুব খারাপ পড়েছে। বন্দেমাতরম্ নামের লোক খবরী হচ্ছে। খুব খারাপ ব্যাপার।

শাড়ি কিনেই মনটা পাল্টে গেল। দোকান থেকে বেরিয়ে শুনি, বন্দেমাতরম্ সাহাকে বাহ্যি-প্রস্রাব করাতে থানায় নিয়ে গেছে। আর চকবাঁদার বাস বিকেলের আগে পাওয়া যাবে না। আসার সময়ে চকবাঁদা হয়ে এসেছি। ঐ পর্যন্ত বাস যায়। তারপর চার মাইল হেঁটে আমার গ্রাম। মোটে দুটো বাস যায় আর আসে। একটা বাসের ড্রাইভার সেবা সিং। রোগা মত পাঞ্জাবি। দুপুরবেলা চুল ছড়িয়ে একটা বাংরি বেলগাছের ছায়ায় ঘুমোতো। তা, সেবা সিংকে নাকি পাওয়া যাচ্ছে না কাল থেকে। আমার কেমন মনে হয়। কালই ডাকাতি আর আজ ও উধাও। কে জানে, দিনকাল ভাল না। এই একটা অসুবিধা আমার। বেদম অবিশ্বাসী। কাউকেই বিশ্বাস করতে পারি না। মনে মনে সব কিছুই একবার বাজিয়ে দেখি। কানেকশন ঠিক আছে কিনা। ব্যাণ্ড-সুইচ, ভল্যুম্-কন্ট্রোল, ক্রিস্ট্যাল, আই-সি। একটু উনিশ-বিশ হয়ে গেলেই ডিফেকটিভ। অর্থাৎ খজা মাল। চুরি, ডাকাতি, খবরীগিরির ছাপ। এসব ব্যাপারে আমি খুব সাফসুতরো। কোষ্ঠকাঠিন্য না থাকার মত নির্ঝঞ্ঝাট।

দুপুরবেলা একটা সিনেমা দেখলাম। কাপড়ের দোকানের মালিক, আমি আর সেই মোটাপানা খোলভূষিওয়ালা। এখন ছোকরা বয়স নেই। সিনেমা-টিনেমা প্রায় দেখিই না। দেখলেও এইসব দোকানদারদের সঙ্গে। অর্থাৎ কিনা, আমারো বয়স আসছে। ভার বাড়ছে। ভারী বয়সের তিন দোকানিতে সিনেমা দেখলাম। বইটার নাম দেখতে পেলাম না, পোস্টারও নেই। খোল-ভূষিওয়ালা চুপিচুপি বলল, 'পাকিস্তানের ফিলিম মশাই। লুকিয়ে চুরিয়ে দেখাচ্ছে।' নামের বালাই নেই। নাম দেখালেও চিনতাম না। না বইটাকে, না আর্টিস্টদের।

তবু কেমন মজা লাগে। মান্ধাতার আমলের পোশাক পরে অচেনা লোকজন নাচছে পর্দায়। গান গাইছে, কথা বলছে। বইটা দেখে বেশ ঘোর লেগে গেল। হিন্দিই বুঝি না কেউ, উর্দু কোন্ ছার। কিন্তু ভাষাতে আটকাল না। স্বপ্ন দেখার মত অদ্ভুত প্রেমের ছবি। কী সব গজল। আগে রেডিওতে কিছু শোনা যেত। এখন শুনিই না। অবশ্য রেডিও সারাতে গেলে শোনা চলে না। ছবিটা কেমন মজিয়ে দিল আমাদের। বই ভাঙার পর বস্ত্রালয় মালিক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'ওদের মত প্রেমের বই করতেই পারি না আমরা। কী দরদ! আমাদের দরদে কম পড়ে।' আমিও একটু ভেরে গেছিলাম ছবিটায়। সামলে নিতে নিতে ভাবলাম, ওদেশে তো কাটাকুটি খুব। দরদ আসে কোথেকে? কিছুটা জ্যোৎস্নায়, কিছুটা পাকিস্তানি ছবির সুরে, কিছুটা রেডিও ডেলিভারির দুশ্চিন্তায় বুঁদ হয়ে বাড়ি ফিরলাম সন্ধ্যার পর। আমার হাতে পম্পির কলাপাতা শাড়িতে নতুন গন্ধ।

পরদিন সকালে ভবতারিণী বাবু এলেন। উনি এখানকার মিড্‌ল স্কুলের হেডমাস্টার। এ পাড়ার সবচেয়ে গণ্যমান্য মানুষ। বেশ খানিকটা বেঁটে, মোটাসোটা চেহারা। কথায় কথায় কেঁদে ফেলার অভ্যাস আছে। জাতীয়তা-বাদী ধরনের। আমি তখন আলু-বরবটির চচ্চড়ি দিয়ে রুটি খাচ্ছি বারান্দায় বসে। পাশে চায়ের কাপ। জুড়িয়ে না যায়, তাই ডিশ দিয়ে ঢাকা। আমার কুমড়ো-মাচায় ফনফনে রোদ্দুর। সবুজ সবুজ একধরনের পোকা কুমড়ো পাতাগুলোর ওপরে উঠে আসছে। রোদে তাদের শরীর এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে মনে হচ্ছে যেন, একগাদা আলোর পোকা। ভবতারিণীবাবুকে দেখেই রুটি চচ্চড়ি আর চায়ের কাপ ভেতর-ঘরে চালান করে দিই। মুখের গুঁড়োটুড়ো বন্দেমাতরম্ সাহার ঢঙে মুছে ফেলি। হেডমাস্টারটি খানেওয়ালা লোক।

'আরে, ভবতারিণীবাবু যে!'

'হ্যাঁ, কী খাচ্ছিলেন বলুন তো?'

'খাচ্ছিলাম? না, না, পোকামারা ওষুধ'

'সেকি, পোকামারা ওষুধ খাচ্ছিলেন?'

'আহা খাব কেন, কুমড়ো গাছটায় ছেটাব।'

'ওহ্। তা, কী ওষুধ ওটা?'

'ইয়ে সবুজ কাপড় পোড়া ছাই আর মাথার চুল।'

'অ্যাঁ?'

'হ্যাঁ।'

হ্যাঁ, কালকের নতুন কেনা শাড়িটাকে রাণু অনেকটা পুড়িয়েছে। আর কাপড়-কাটা একটা কাঁচি দিয়ে পম্পির মাথার চুলগুলোও কেটে দিতে যাচ্ছিল। যাতে বাড়ি থেকে আর বেরোতে না পারে। কাল গান শিখতে গিয়ে ও অনেক রাতে বাড়ি ফিরেছিল। আমি না থামালে সর্বনাশ হয়ে যেত। আমি চিন্তা করছি মেয়েটাকে কিভাবে পার করা যায়, আর এখন চুল-মূল কেটে ওকে রাক্ষসী বানিয়ে রাখবে। কী কাণ্ড, অ্যাঁ! তবু শাড়িটাকে বাঁচানো যায়নি। এক দিকটা পুড়িয়ে সর্বনাশ করে ছেড়েছে। কতগুলো টাকা!

'এই ওষুধে পোকা মরে?'

'না হয় নিয়েই যান না কিছুটা।'

'না না আমার কোন গাছটাছ নেই।'

'তা, এলেন কী মনে করে?'

'হ্যাঁ সেটাই ভুলে যাচ্ছিলাম। কেমন ভাজাভুজির গন্ধ আসছে--'

'ও কিছু না। কেন এসেছিলেন?'

'ফাংশন মশাই, ফাংশন, মিড্ল স্কুল পনেরো বছরে পড়ছে। কিছুই খবর রাখেন না? সাহিত্য-সংস্কৃতি মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। তাকে ভুলে গেলে চলে? আকবরের রাজসভায়—'

'ফাংশন হচ্ছে, আমি কী করবো তারিণীবাবু?'

'তারিণী নয়, ভবতারিণী। স্মৃতিশক্তি লোপে ব্রাহ্মীশাক। আপনার অনেক কাজ। শহর থেকে আপনার ব্যবস্থায়ই মাইক আসবে। ব্যাটারি আসবে। তার-মার সব। আপনাকে চাঁদা দিতে হবে। অনুষ্ঠানে ক্ষুদ্রশিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা বক্তৃতা। আর বড় কথা হলো, আপনার মেয়ে কণ্ঠ-প্রতিভা প্রদর্শন করবে, মানে গান।'

একসঙ্গে অনেকগুলো বদখদ ব্যাপার মাথায় ঢুকে পড়ে। ওই কুমড়ো পোকাগুলোর মতই। কোনটারই কানেকশন ঠিক নেই। সবক'টায় একটা না একটা গণ্ডগোল। মাইকের ব্যাপারটা ভালই ছিল। 'শচীমাতা' থেকে ম্যানেজ করা যেত। কমিশন বাবদ দু'পয়সা আমদানিও হয়। বাদ সাধল চাঁদার ব্যাপারটা। লাভের গুড় পিঁপড়েয় খাবে। তাও নাহয় কমিয়ে-বাড়িয়ে কিছু করা গেল। কিন্তু ঐ বক্তৃতা? আমার তিন পুরুষে কেউ বক্তৃতা করেনি। তাছাড়া 'ক্ষুদ্রশিল্পের ভবিষ্যৎ' না কি, ওটা নিয়ে আমি কী বলব? আমি কি গ্রামসুদ্ধু লোককে জানাব আমার রেডিও মেরামত শিল্পে সাড়ে বারো টাকা নিয়ে নেমে আজ আমার শহরের ব্যাঙ্কে টাকা থাকে, পোস্টাপিসে থাকে।

এ-পাড়ার ক'টা মাত্র পাকা-বাড়ির মধ্যে আমারটাই খেলানো। আমাদের গ্রামে স্টেশন হয়নি, ট্রেন দাঁড়ায় না বলে' আমি খুব খুশি। আমার ব্যবসার ভাগী-দার আসতে পারে না। রোজ রেডিও সারাতে কেউ শহরে দৌড়াতে পারে না। তাছাড়া রেডিও-পিছু আমি কেমন গলা কাটা চার্জ নিই। যত পাগলের কাণ্ড। তাছাড়া ঐ মারাত্মক কথাটা! পম্পি! কাল এ বাড়িতে যা হয়ে গেল, তারপর রাণু যদি শোনে পম্পি ফাংশনে গাইবে, কাঁচি না, স্রেফ দা হাতেই নাচতে থাকবে।

'আপনি বরং পোকা মারা ওষুধটাই নিয়ে যান তারিণীবাবু।'

'অ্যাঁ?'

'হ্যাঁ।'

ভবতারিণীবাবু যাবার সময় বলে গেছেন আমার মাথার ঠিক নেই। যন্ত্র-পাতি নিয়ে খুব বেশি কাজ কর্ম করে, মাথার যন্ত্র বিগড়ে গেছে। রাণুর ভয়ে তাই মেনে নিয়েছি। রাণু রেগে গেলে আমার খুব ভয় করে। ওকে তখন ডাকিনীর মত দেখায়। এমনিতে মন্দ না। রান্নাবান্না ভাল পারে। ঘরের কাজকর্ম বোঝে। তবে ছেলে সন্তান নেই, আর পম্পিটা একটু বেয়াড়া রকম সুন্দর বলে' ওর ওপর চটা। ভবতারিণীবাবু হাল ছাড়েননি। বলেছেন, বিকেলে ব্রাহ্মীশাক আর রামবাবুকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন। তাই আসুন। তার মধ্যে পম্পির ঝামেলাটা মিটিয়ে ফেলতে হবে।

দুপুরে রেডিওর ঝামেলাগুলো কিছু কিছু মেটাই। মানে এর রেডিওর মাল খুলে ওরটায় লাগানো। 'শচীমাতা' না খুললে সর্বনাশ হয়ে যাবে। পম্পি সারা দুপুর কেঁদেছে। রাণুর মেজাজ আরো খারাপ। হাল ছেড়ে আমি একটা দুপুরে-ঘোরা ন্যাংটো বাচ্চাকে দিয়ে পম্পির গানের মাস্টারকে তলব পাঠাই। বাড়িতে এত অশান্তি চলতে দেওয়া যায় না। পাওনাগন্ডা বুঝিয়ে দিয়ে ছোকরাকে ছেড়ে দেব। ক'মাসের মাইনে পাবে, কে জানে? মুখ ফুটে চায় না কখনো। অবশ্য আমারও দোষ আছে। গানের মাইনে কলের-গান সারানোয় লাগিয়ে দিয়েছি। ন্যাংটো বাচ্চাটা ফিরে এল। মাস্টার বাড়ি নেই। তালা ঝুলিয়ে কোথায় গেছে। হারমোনিয়াম সারাতে গেছে নিশ্চয়ই। গানের মাস্টার হারমোনিয়াম সারায় কী করে' বুঝি না। আর একটা ব্যাপারও বুঝি না। কোনটা আগে শিখেছে ও, সারানো না বাজানো? দুটো একসঙ্গে হয়? কে জানে!

ঝুলিয়ে বৃষ্টি এল এরপর। আমার বাড়িটা যেন মেঘের ছাতায় ঢাকা। মানে কয়েল, আই. এফ. টি গুলোয় ড্যাম্প ধরবে আবার। শচীমাতা বন্ধ।

কী যে হবে? বেশ একপশলা হয়ে বৃষ্টি থামল। বাগানটা আরো ভিজে গেছে। ঝোড়ো হাওয়ায় দেদার নিমপাতা ঝরে' সবুজে-হলুদে মাখামাখি। ঘাস-ঘাসালি চকচক করছে। কুমড়ো মাচাটা অন্ধকার। বৃষ্টি থামতে দেখি বিকেল হয়ে এসেছে। রাণু হাঁ করে' মেঝেতে ঘুমোচ্ছে। পাশের ঘরে পম্পি বুকে ভর দিয়ে খাটের ওপর শুয়ে। জেগে না ঘুমিয়ে বোঝা যায় না। বোঝার দরকারও নেই। মা-মেয়েতে আমার ব্যবসাটাকে লাটে তুলবে। একটা পাঞ্জাবি গায়ে গলিয়ে বেরিয়ে আসি।

আমার দোকানটার নাম 'আকাশবাণী'। নামটা ঠিক আমার মাথা থেকে বেরোয়নি। পম্পি হওয়ারও আগে দু'বছর তিনধাড়ায় ছিলাম আমি। বেশ বড় শহর। ওখানে একটা বাড়িতে থেকে রেডিও সারাইয়ের কাজকর্ম শিখতাম, আর মাস গেলে একটা থোক টাকা ধরে দিতাম খাওয়া থাকা বাবদ। টাকাটা বলার মত না, কারণ ওটা নিয়ে বাড়িওয়ালা লোকটি আমায় যা-তা বলত। সে কথা থাক। তা, লোকটির পেটে বিদ্যা বুদ্ধি ছিল, এবং সেই আমায় শিখিয়েছিল 'আকাশবাণী' কথার মানে, আর কথাটা যিনি চালু করেছিলেন, তাঁর নাম। তা, তিনধাড়া ছেড়ে আসার সময়ে সে আমায় দুটি জিনিস দিয়ে দেয়। এক 'আকাশবাণী' কথাটা, আর তার মেয়েকে ; অর্থাৎ লোকটি আমার শ্বশুর। এবং মেয়ের মত দোকানের নামও তারই ধার দেওয়া।

দোকানে আমি ঘাড় গুঁজে কাজ করি, আর এটা-ওটা কিনে খাই। এমন কিছু শক্ত কাজ না। তবে ঘাঁত ঘোঁত জানতে হয়। রেডিওর পেটের নাড়িভুঁড়ি চেনার মত লোকজনের মুখচোখও চিনতে হয়। কে সরল, কে ঘোড়েল, কে ঘুঘু, কে গাধা। কার মাল উল্টে-পাল্টে রাখলেই দশটা টাকা বেশি আসবে। কার রেডিও থেকে এক খামচা ধুলো বেশি ঝাড়লেও সে মারতে আসবে। এইসব ছোটখাট বিষয় নিয়ে মন্দ কাটছে না! গানের মাস্টারকে তাড়ালে আরও ভাল কাটবে।

সন্ধ্যার ঝোঁকে দু'চারজন উঁচু ধরনের লোক আমার দোকানে এসে থাকে। আমি সাড়া শব্দ না দিলেও বসে' বকর বকর করে। এত বিরক্ত লাগে। আজ কারা আসবে, আমি জানতাম।

প্রথমে ঢুকলেন রাম ডাক্তার। এ-গ্রামের একমাত্র হোমোপ্যাথ। তারপর ভবতারিণী বাবু, একটু উত্তেজিত মুখ। আমার ব্যাপারেই হবে। আর সব শেষে কালাচাঁদ সাঁপুই। রাম ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার! রামবাবুকে সাইকেলে বসিয়ে বাড়ি বাড়ি যায়। ওষুধ বানাতে পারে কিনা কে জানে? তবে পুজোর সময় নতুন কাপড় চোপড়ের মরশুমে বাড়ি-বাড়িতে ক'দিন চুরি করে।

রামবাবুই এ গ্রামের একমাত্র ডাক্তার বলে' কেউ তেমন কিছু বলতে ভরসা পায় না। কালার হাতে এক আঁটি ব্রাহ্মী শাক।

তিনজনেই বসতে রামবাবু গলা কেশে বললেন ঃ

'আপনার জিভ দেখি?'

'কেন, জিভ দেখাব কেন?'

'দেখান, দেখান, সব বার করে ফেলব।'

'পুরো জিভ বার করবেন? কেন?'

'পুরো নয়। তিন আঙুল প্রমাণ'

'তবে পুরো বললেন যে!'

'আহা জিভ নয়, ব্যাধি'

'ও, কিন্তু রোগব্যাধি হবে কেন?'

'হতে পারত, কিন্তু আমি এসে গেছি। জিভ দেখি—'

'এসেছেন. ভালই হয়েছে। কুচো চিংড়ি-ব্রাহ্মী শাক। রুটি দিয়ে বেশ হবে।'

'আহা, আহা ওভাবে নয়! সর্বগুণ জলাঞ্জলি।'

'কিস্সু জলাঞ্জলি যাবে না। বরবটি-আলু খেয়ে মুখ বিস্বাদ হয়ে আছে।'

'সকালে খাচ্ছিলেন, তাই না?' ভবতারিণী বাবু লাফিয়ে ওঠেন।

'না, না ওটা পোকা মারা ওষুধ'

'দেখুন ডাক্তার. স্মৃতিভ্রংশ কি না—'হেডমাস্টার ফের বসে পড়েন।

'না, স্মৃতিভ্রংশ না। আপনি চাঁদা চেয়েছিলেন মনে আছে। খুব মন খারাপ হয়েছিল শুনে।'

'মন খারাপ কেন? পাড়ার স্কুল। চাঁদা দেবেন, মাইক দেবেন। বক্তৃতা। পম্পি।'

অতএব ব্যাপারটা আবার গোড়াতেই ফিরে যায়। গ্রাম গঞ্জের লোকেরা দারুণ গেঁতো। মাইক দিলে চাঁদা যাবে। বক্তৃতা দিলে দাঁত যাবে। আর পম্পিকে স্টেজে বসিয়ে দিলে যে কী যাবে, এখনো জানি না। ব্যবসাপত্তর, দোকানপাট সব যেতে পারে। মনটা হু হু করে। এর ওপর রাম ডাক্তার আবার জোর করে দু'তিন দাগ একটা ওষুধ খাইয়ে অনেকক্ষণ ধরে বুঝিয়ে গেলেন 'ক্যালিফস্' আর 'ক্যালকেরিয়া ফস্'-এর পার্থক্য কী কী।

ডাক্তার-মাস্তার বিদায় হতে দোকান বন্ধ করব ভাবছি, হঠাৎ কালাচাঁদ সাঁপুই এসে ফের ঢুকে পড়ল। লোকটা এত লম্বা যে, আর একটু হলে

আমার রেডিওর বাক্সগুলো ফেলেছিল আর কি। মাথায় হাত ঘষে' ফস্ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে কালা—'ব্রাহ্মীশাকটা দিতে ভুলে গেছিলাম' তারপর বেরোবার মুখে ফের একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, 'কিছু মনে করবেন না স্যার, মাথা আপনার তো খারাপ হবেই। যে-কাণ্ড দেখে এলাম মাস্টারের বাড়িতে —'

'মাস্টার ?' আমার বুকটা ছ্যাৎ করে ওঠে। লাইন-ওয়্যার ঝালাইয়ের গরম তাতালে রজন ছোঁয়ালে যেমনটা হয়।

'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। ঐ গানের মাস্টার। ডাক্তারকে বলবেন না যেন। গরীব মানুষ, ভুল করে দেখে বসেছি।'

'কী দেখেছো ?' আমায় মাথার মধ্যে একটা সেণ্টারিংয়ের কাঁটা যেন খুব জোরে বাঁদিক-ডানদিকে ঘুরেছে। দুশো পঁচিশ, তিনশো পঞ্চাশ, চারশো সাতচল্লিশ দশমিক পাঁচ। 'গ্রামীণ সংবাদ শুনছেন। আজ বজ্র-বিদ্যুৎ সহ তুমুল বৃষ্টির সম্ভাবনা।'

কালাচাঁদ চলে যায়।

আজ উনিশ বছর রেডিও নিয়ে আছি। পম্পি হবার আগে থেকে। থাকতে থাকতে আমার মধ্যেও কতগুলো গণ্ডগোল হয়ে গেছে। মেজর ডিফেক্ট বলা যায়। কোন জট পাকানো ব্যাপার সইতে পারি না। একটা সেট সারাতে বসে আরেকটায় হাত দিই না। জানি, একেকটার ভুল একেক ধরনের। সব জড়িয়ে গেলেই গণ্ডগোল। তল পাওয়া যাবে না। মাঝে মাঝে ভয় হয়, যদি একদিন সব ভুলভ্রান্তি একটার সঙ্গে একটা জড়িয়ে পেঁচিয়ে, যাচ্ছেতাই হয়ে, আমার ক্ষমতার বাইরে চলে যায় ? আমি যাতে হাত দেব সেটা বিগড়ে থাকবে···যে টাকা নেব, লোকে তা ফেরত চাইবে···আকাশের থেকে যে বাণী এসে রেডিওতে ঢোকে, তা ফের আকাশে ফিরে যাবে। এসব বিচ্ছিরি দুঃখের কথা ভাবি আমি। হয়ত এ দিকে রেল স্টেশন হবে। নতুন রেডিওর দোকান। সবাই আমার কেরামতি জেনে যাবে।

বেশিরভাগ লোকজনই আমার কাছে এসে পাগলের মত কথাবার্তা বলে। অর্জুনপুরের দোকানদারেরা, রাম ডাক্তার, ভবতারিণীবাবু। আমি বহু কষ্টে মাথা ঠিক রাখি। মাথার মধ্যে একটা দুর্দান্ত সার্কিট চালু রাখতে হবে। সে সার্কিটের জন্য ব্রাহ্মীশাক খেতে হয় না। কিন্তু বৌ-মেয়ে নিয়ে তো নিখুঁতভাবে বাঁচতে হয়। সেখানে ডিফেক্ট হলে কোথায় দাঁড়াব !

পম্পি ডিফেক্ট করেছে। গানের মাস্টারের বাড়ি যাওয়া বারণ করেছিল

রাণু, তবু ওখানে গেছে। নিশ্চয়ই গান শিখতে নয়। রাণু ঠিকই বুঝেছিল। চুল কেটে দিতো। শাড়ি-পরা ছেলের মত দেখাতো। রাক্ষসীর মত। বেশ হতো। ভয়ের চোটে কালাচাঁদ সবটা বলেনি। বলল, ওর ভাল ঠেকেনি। কালাচাঁদ ভুজুং ভাজুং দিয়ে কম্পাউণ্ডারি করে। ফি বছর চুরি করে। ওরও ভাল ঠেকেনি। ছি, ছি, কী সাঙ্ঘাতিক কথা!

ফ্যাকফ্যাকে জ্যোৎস্না নেমে গেছিল, বিলধারে আসতে ঠান্ডাও নামল। চারধারে জোনাকি ছুটছে। লেবুঝোপ যেন কুয়াশায় মাখামাখি। হঠাৎ করে শীতকালের কথা মনে হয়। পুজো আসছে। মহালয়ার আগে বাইরে থেকেও নতুন রেডিওর অর্ডার আসে। সে সব এখন মাথায় আসছে না। বিলের ধারটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে। এবড়ো খেবড়ো মাটি। জলের গন্ধে গা ছমছম করে। আলো ছায়ার জল। যেন সত্যিকারের জল না। পম্পি যে মাস্টারের বাড়ি এসেছে, এটা সত্যি। কালাচাঁদ দেখেছে, তাও মিথ্যা না।

আমিও দেখলাম। নিশ্চুপ হয়ে, নিশ্চল হয়ে দেখলাম। লাল টালি ছাওয়া ঘরের মধ্যে একটা হ্যারিকেন। এপাশে বড় একটা বাড়ি ঘর নেই। হ্যারিকেনটার চার পাশে মেঠো পোকা উড়ছে। খাটের ওপর পম্পির গানের খাতা, হারমোনিয়াম, আর ওরা দুজনে। কেমন অদ্ভুতভাবে মাস্টারকে জড়িয়ে আছে পম্পি। পম্পির মুখ দেখা যায় না। এদিকে পিঠটা। পিঠ ভর্তি চুল। চুলে যেন বিলের জলের মত ফসফরাস। তার ওপর ঐ ছোকরার হাত। কী সাঙ্ঘাতিক দৃশ্য!

আমি বেশ কয়েকবার খাবি খাই। একটা পোকা ঢুকে যায় গলায়। নিঃশব্দে থু থু ফেলি। লজ্জায় গা-মাথা জ্বলে। ঘরের ভেতর কেউ নড়ছেও না। দেয়ালের তানপুরাটার মত, হারমোনিয়ামের মত থিতু হয়ে আছে। তবে সামান্য কাঁপছে। হুঁ, কাঁদছে ওরা। কেঁদে নে। শেষ কান্না কেঁদে নে। তারপর ঘাড় ধরে ফেরত নিয়ে যাব। ছোকরার নামটাও ঠিক জানি না। বিশ্ব না ভীষ্ম। যা-ই হোক, ওকে অর্জুনপুরের থানায় দেব। বন্দেমাতরম সাহার মত কাণ্ড হবে। প্রথম চড়টা মারব আমি। সব দোকানদার মারবে। শেষে খোলভূষিওয়ালা। তারপর পুলিসে নেবে।

কিন্তু ব্যাপারটা বেশ বদলে যাচ্ছে। ওরা আবার বেগড়বাই বাধালো। কান্নার মাত্রা বেড়েছে। ছেলেটা কী বোঝাচ্ছে পম্পিকে। চোখের জল মোছাচ্ছে। দাঁড়া, তোর চোখের জল মোছাবে অর্জুনপুরের বড়বাবু। দৃশ্যটা

যেন বড় হচ্ছে। এবার পম্পিকে মুখ সমেত দেখতে পাচ্ছি। মায়ের মতই ফর্সা। মুখটা বলতে নেই, পরীর মত। পরী দেখিনি অবশ্য। যাকগে, বেশ সুন্দর। এ গ্রামের একটা মেয়েও ওর মত না। সবুজ শাড়িখানা কেনার সময়েই বুঝেছিলাম। কার মত যেন লাগছে। কা'র মত? হ্যাঁ মনে পড়েছে। পাকিস্তানি ছবিটা। ওটাতে ওর মতই এক নায়িকা দেখেছি। ধুত্তোরি, ওসব থাক। আমার কথা ওদের একবারও মনে পড়ছে না অ্যাঁ! একবারও ভয় পাচ্ছে না! ভয় পাবে কি—চোখের জলের বন্যা বইছে এখন। সিনেমাটাতেও এমনই ছিল। বস্ত্রালয়-বাবু বলল, পাকিস্তান ছাড়া নাকি এমন প্রেমের বই হয় না। কেন, এরা দুজনে মিলে তো খারাপ করছে না। আমার মাথার পার্টসগুলোই শুধু বাতিল রেডিওর মত নড়বড় করছে।

কেন জানি না, ঘরের ভেতরটা আরো ভাল করে' দেখার ইচ্ছা হয়। কিংবা সিনেমাহলের মত 'সাউণ্ড দে সাউণ্ড দে!' চিৎকার করতে। কখন জানালার পাশে চলে গেছি। ওরা টের পায় না। একটু একটু করে ভল্যুম কন্ট্রোল ঠিক হচ্ছে। সাউণ্ড আসছে। দুজনেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। পম্পির মুখটা ঘাম, চোখের জল আর উড়ো-চুলে ঢাকা পড়ে গেছিল। ছেলেটা খুব যত্ন করে মুখচোখ মুছিয়ে দিল, চুল গোছালো আর একটা হাল্কা-পাতলা চুমো খেল।

কী সর্বনাশ, আমার মাথার সার্কিট আবার খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সতেরো বছর আগে পম্পির জন্ম। তিনধাড়ার বাড়িওয়ালা, মানে আমার শ্বশুর দু' দিন লোক খাওয়াল। দু' গাছি ব্রোঞ্জের চুড়ি দিল। রাম ডাক্তারের ক্যালি-ফস্ না ক্যালকেরিয়া ফস্, নাকি অন্য কিছু খাইয়ে ওর পেট খারাপ সারানো হলো। সেই পম্পিকে ওর ছোকরা মাস্টার চুমো খেল! একটা সেন্টারের পাশে আরেকটা সেন্টার সরে' আসছে। 'কী হয়েছে তাতে, কেউ না কেউ তো খাবেই।' 'বাড়িওয়ালার মেয়েকে খাওনি তুমি?' 'তা বলে—' 'চুপ!' 'কিন্তু আমার চোখের সামনে!' 'ওরা তোমাকে দেখছে না' 'আমি দেখছি যে, বাজে লাগছে খুব!' 'তবে দূরে হও এখান থেকে!' মাঝে মাঝে একটা স্টেশনের জোর বেড়ে যায়। অন্যটার ঘাড়ে চেপে বসে, আমার দ্বিতীয় চিন্তাটা প্রথমটাকে ভাগিয়ে দেয়। আবার ঘরের মধ্যে তাকাই, হারমোনিয়াম-মাস্টারের হাত মুঠো করে ধরেছে রেডিওমেকারের মেয়ে।

'তুমি কোথায় যাবে?'

'জানি না, যাব কোথায়ও'

‘আমায় ফেলে যাবে ?’
‘তোমার মা-বাবা আছেন’
‘তুমিও আছ’
‘বড় ফিকে ভোরবেলায় পথে নেমেছ পম্পি ?’
‘কেন বলছ ?’
‘ওরকম সময়ে বড় কষ্ট হয়’
‘কেন বলছ ?’
‘তোমাকে না দেখলে খুব কষ্ট হবে’
‘কেন বলছ ?’
‘আমাকে যেতে হবে পম্পি। হবেই’
‘আমিও সঙ্গে যাব’
‘আমি যাচ্ছেতাই রকম গরীব, পম্পি। কষ্ট পাবে’
‘আর ওই ফিকে ভোরবেলায় কোন কষ্ট পাব না ?’

এ ভাবে, এইভাবে অচেনা ফিল্মটা চলতে থাকে। পম্পির থেকে ছেলেটাই ভাল পার্ট বলছে। পম্পি ঠিক পারছে না। বারবার কেঁদে ফেলছে। আমার মধ্যেও হাবিজাবি সব উইক স্টেশন বন্ধ হয়ে একটামাত্র পাওয়ারফুল সেন্টার বেজে চলেছে। মিডিয়াম্ ওয়েভে যেমন পাঁচশো আট। পম্পি আমার মেয়ে। পম্পি কাঁদছে। পম্পির জন্য অত বড় একটা ছেলে পাগল হচ্ছে। আমার পম্পির জন্য। ভাবা যায়! মেয়েটাকে কোনদিন ভাল করে সাজাইনি আমি। নজর তুলে দেখিনি। এত বলা কওয়ার পর ওর কলাপাতা রঙের শাড়িটা এল। রাণু পুড়িয়ে দিল। ছেঁড়া শাড়িটাই পড়ে এসেছে মেয়েটা। মুখটা যেন পরীর মত সুন্দর। পরী দেখিনি। তবে হয়ত ওর মত হবে। কী রোগা, আজ প্রথম দেখছি। কালাচাঁদও দেখেছিল। তবে দেখার চোখে দেখেনি। বাপের চোখে দেখেনি। দেখলে বুঝত, ওর চোখে পাপ নেই। গানের মাস্টারের চোখেও :

মাথার রেডিওটা বাজতে বাজতে যেন চৌচির হয়ে যাবে। ডিফেক্ট নেই, ডিসটরশন্ নেই। এত ভালভাবে আমি কখনো সারাতে পারিনি। অদ্ভুতভাবে বাজছে! রাত্রিকালীন অধিবেশনে গ্রামীণ গল্প। এক মধ্যবয়স্ক কারিগরের গল্প। যন্ত্রের ভুল সারানোর খেলা খেলতে খেলতে যে একদিন টের পায়, তার জীবনটাই ভুল সারানো হয়েছে। আদ্যোপান্ত ভুল। আকাঙ্ক্ষা। বিবেক। খাওয়াদাওয়ার লোভ। পরিবারের কাউকে আপন ভাবেনি। গ্রামের কাউকে আপন করেনি। তার নাকে শুধু ভালমন্দ খাবারের গন্ধ আসে। গ্রামে স্টেশন

হোক, সে চায়নি। শ্বশুরকে বাড়িওয়ালার চেয়ে বেশি ভাবতে চায়নি। বাড়িওয়ালা নিজের মেয়ে দিয়েছিল তাকে। ভাবেনি। একটা ভাল কথা শিখিয়েছিল। কথাটা সে সাইনবোর্ডের বাক্সে টাঙিয়েছে। সেই সাইনবোর্ডের নিচে বসেই আকাশের তরঙ্গ ধরে' কাজবাজ করত। একটা তরঙ্গও তার মনে ওঠেনি কখনো।

আমি চুপচাপ বসে থাকি। কখন বসে পড়েছি। সব কানেক্শান নষ্ট হয়ে গেছে। কত কষ্টে সার্কিট করেছিলাম একটা জীবন ধরে। চ্যানেল, ওম্স্, ডায়োড, কনডেনসার। সব জড়াচ্ছে। তালগোল পাকাচ্ছে। যা ইচ্ছা হোক। রং লাইনে গাঁথা বোর্ড খুলে ফেলতে হয়। খুলেই ফেলব। আপাতত এই কাদা ঘাসে ভিজে জ্যোৎস্নায় বসে আমি একটা ভুল কারিগর দুটো কাঁচকাচা মানুষের হৃদয় সারানোর খেলা দেখি। আমার খেলার চেয়েও অনেক দামি।